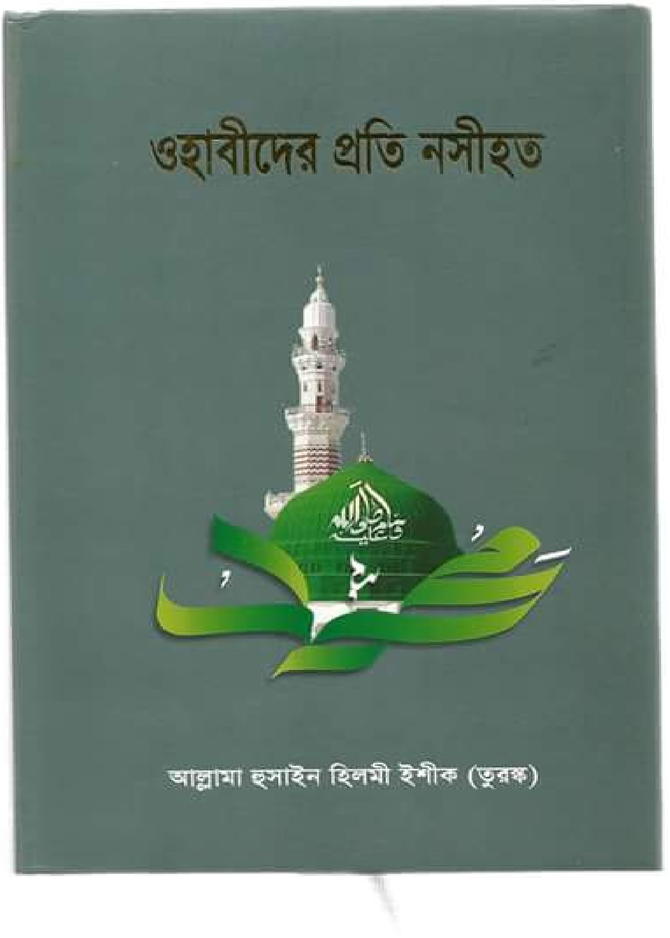
ওহাবীদের প্রতি নসীহত
আল্লামা হুসাইন হিলমী ইশীক (তুরস্ক)

# ওহাবীদের প্রতি নসীহত

**মূল**
আল্লামা হুসাইন হিলমী ইশীক (তুরস্ক)

**অনুবাদ**
কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন

**সম্পাদক**
আবূ আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী আশ্‌রাফী

**সন্‌জরী পাবলিকেশন**
৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫
৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিলা, চট্টগ্রাম-৪০০০

ওহাবীদের প্রতি নসীহত
লেখক: আল্লামা হুসাইন হিলমী ইশীক (তুরস্ক)

**অনুবাদক**

কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন

**সম্পাদনায়**
আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী আশরাফী

**প্রকাশক**
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী

**প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত**
© সন্‌জরী পাবলিকেশনের পক্ষে নুরে জান্নাত তিসা

**প্রকাশকাল**
১৪ জানুয়ারী ২০১৪, ১২ রবিউল আউয়াল ১৪৩৫, ০১ মাঘ ১৪২০।

**প্রকাশনায় :**
সন্‌জরী পাবলিকেশন
৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা- ১২০৫, মোবাইল : ০১৯২৫-১৩২০৩১
৮১, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১
**E-mail : Sanjarypublication@gmail.com**

**পরিবেশনায় :** সনজরী বুক ডিপো

**মূল্য : ----------- [-------------] টাকা মাত্র**

~~**Wahabider Proti Nosihot**, By: ......................................................,~~ Translated By: ........................................................., Edited By: Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By: Mohammad Abu Tayub Chowdhury. Price: Tk: ----------------/-

O

مَــوْلَايَ صَـلِّ وَسَـلِّمْ دَائِـمًا أَبَـدًا
عَلٰي حَبِيْبِكَ خَـيْرِ الْـخَلْقِ كُلِّـهِم
مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيْقَيْنِ مِنْ عَرْبٍ وَّمِنْ عَجَم

﴿صَلَّي اللهُ تَعَالٰي عَلَيْهِ وَعَلٰي آلِـه وَصَحْبِه وَبَارِكْ وَسَلَّمَ﴾

## অনুবাদকের আরয

তুরস্কের বিশিষ্ট সুন্নী আলেম আল্লামা হুসাইন হিলমী ইশীক (রহ:)-এর "ওহাবীদের প্রতি নসীহত" গ্রন্থটি অনুবাদ করতে পেরে আমি মহান আল্লাহতা'লা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং আমার পীর ও মুর্শিদ হযরতুল আল্লামা শাহ্ সূফী সৈয়দ আবু জাফর মোহাম্মদ সেহাবউদ্দীন খালেদ আল কাদেরী আল চিস্তী সাহেব কেবলা (রহ:)-এর দরবারে শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি। এ বইটি ওহাবী মতবাদের খণ্ডনে লিখিত। মুসলিম বিশ্বে শিয়া মতবাদের পরপরই ওহাবী মতবাদের ক্ষতিকর প্রভাব বিরাজমান। এর তিনটি বির্তকিত সুন্নী আকিদাবিরোধী মূলনীতি আছে। সেগুলো হচ্ছে

(ক) এবাদত তথা আমল (কর্ম) মূল ঈমানের অর্ন্তভুক্ত;(খ) নবী (আ:) ও আউলিয়ায়ে কেরামগণের ওসীলা করা শিরক; এবং(গ) মাযারের ওপর গুম্বজ নির্মাণ ও মাযারে সম্মানার্থে আগরবাতি, লোবান জ্বালানো, গরু-মোষ ইত্যাদি নযর-মানত করা শেরক।

উপরোক্ত তিনটি মূলনীতিকেই আল্লামা হুসাইন হিলমী ইশিক (রহ:) তাঁর কৃত "ওহাবীদের প্রতি নসীহত" বইটিতে খণ্ডন করেছেন। তাঁর এই বইটি বাংলায় ভাষান্তরিত হওয়ায় বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ সত্য সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আল্লাহ্ পাক তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আমার পীর মুর্শিদের ওসীলায় এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু কবুল করে নিন।

আমিন সুম্মা আমিন

কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন

## মুখবন্ধ

মহান আল্লাহুতায়ালার নামে আমি 'ওহাবীদের প্রতি নসিহত' গ্রন্থটি লেখা শুরু করছি। আল্লাহ পাক তাঁর সৃষ্টির প্রতি করুণাশীল হয়ে প্রয়োজনীয় বস্তুগুলো সৃষ্টি করেন। আখেরাতে ফাসিক্ব [পাপী] মুসলমানদের মধ্যে যাদের পছন্দ করবেন তাদেরকেই তিনি মাফ করে বেহেশতে দাখিল করবেন। একমাত্র তিনিই সকল বস্তু সৃষ্টি করে থাকেন এবং সকল সৃষ্টিকে বিপদ-আপদে রক্ষা করে থাকেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ নবী ও প্রিয় হাবীব হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি জানাই শত সহস্র সালাত-সালাম। হুজুর (দ:) -এর খাঁটি সাহাবায়ে কেরাম এবং আহল্ আল্ বায়তের প্রতিও রইল সালাত-সালাম।

আল্লাহু তায়ালা রাব্বুল আলামীন। তিনি জীবিত ও জড় সকল বস্তুকে সুপরিকল্পিতভাবে নিয়ম-শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং উপকারী করে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সিফাত (গুণ) খালেক, বারী, বাদি, মুসাব্বির ও হাকিম-এর কারণে তিনি সকল সৃষ্টিকে সুশৃঙ্খল এবং সুন্দরভাবে সৃজন করেছেন। এদের মধ্যে তিনি একটি পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছেন যাতে সৃষ্টিসমূহ সুশৃঙ্খল ও সুন্দরভাবে বিরাজ করতে পারে। তিনি এদের পরস্পরকে পরস্পরের জন্যে ওসীলা, মাধ্যম, কারণ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন যাতে এরা বিরাজ করতে পারে। এদের এই সম্পর্ককে আমরা প্রাকৃতিক ঘটনাবলী, পদার্থ ও রাসায়নিক নিয়ম, সৌরবিদ্যার সূত্র, শারীরিক প্রক্রিয়া ইত্যাদি নামকরণ করে থাকি। আল্লাহ তা'লার সৃজিত বস্তুসমূহের আকার-আকৃতি, পরিসংখ্যান এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ও ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে তার থেকে উপকার আদায় করে থাকে বিজ্ঞান।

আল্লাহ্ পাক সকল বস্তুকে সুপরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খল হবার ইচ্ছা (এরাদা) করেছিলেন এবং তিনি তাঁর এরাদা অনুযায়ী সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি বস্তু এবং শক্তিকে তাঁর সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় মাধ্যম ও কারণ হিসেবে সৃজন করেছেন। তিনি এরাদা করেছিলেন মানুষকে সুশৃঙ্খল ও উপকারী হবার জন্যে এবং মানব জাতির ইচ্ছা শক্তিকে এর কারণ ও মাধ্যম হিসেবে সৃষ্টি করেছিলেন। যখন মানুষ কোনো কিছু করতে চায়, তখন আল্লাহতা'লা ইচ্ছা করলে তা সৃষ্টি করে দেন। মানুষকে ভাল, সঠিক ও উপকারী হবার ইচ্ছা পোষণ করতে হয়, যাতে তাদের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবন সুশৃঙ্খল থাকে। আল্লাহ্ পাক মানুষের মধ্যে বুদ্ধি (আক্বল) দিয়েছেন যাতে তাদের ইচ্ছা ভাল হয়। আক্বল এমন একটা ক্ষমতা যা ভাল-মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। যেহেতু মানুষের বহু প্রয়োজন রয়েছে এবং এ প্রয়োজন মেটানো তাদের জন্যে অপরিহার্য, সেহেতু মানুষের অন্তঃস্থিত নফস্

(কুপ্রবৃত্তি) এগুলো মেটাবার ছল করে আক্বলকে ধোকা দেয়। এটা ক্ষতিকর বস্তুকেও আক্বলের সামনে সুন্দর ও ভাল জিনিস হিসেবে উপস্থাপন করে থাকে।
আল্লাহ তা'লা তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়াবান হয়ে তাঁরই মনোনীত নবীগণের কাছে ফেরেশতা মারফত শরীয়ত নামক জ্ঞান প্রেরণ করেছেন। পয়গম্বরবৃন্দ এ সকল শরীয়ত বান্দাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শরীয়ত ভাল-মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করে আমাদেরকে ভাল ও উপকারী কর্ম সম্পাদনের নিয়্যত করতে আদেশ করে।
তবুও নফস্ মানুষকে ধোকা দেয় এবং শরীয়ত অমান্য করার প্ররোচণা দিতে থাকে। এমন কি তা শরীয়তের পরিবর্তন, বিশেষ করে ঈমানের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন করতে চায় আল্লাহর নবী হুজুর পূর নূর (দ:) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে মুসলমান জাতির মধ্যে কেউ কেউ নফসকে অনুসরণ করে শরীয়তকে পরিবর্তন করতে চেষ্টা করবে। হুজুর (দ:) বলেন, " আমার উম্মত তিয়াত্তরটি দলে বিভক্ত হবে; শুধু একটি দল বেহেশতে প্রবেশাধিকার পাবে"। ভ্রান্ত বিশ্বাস বা আকিদার জন্যে দোযখগামী বাহাত্তরটি দলের আবির্ভাব ঘটেছে। আমার গ্রন্থে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি। ভ্রান্ত দলগুলোর অন্যতম হচ্ছে ওহাবী সম্প্রদায়।
ওহাবী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ ইব্ন আবদুল ওয়াহহাব নজদী। সে 'কিতাবুত্ তওহীদ' নামক একটি বই লিখে। তার পৌত্র সুলাইমান ইব্ন আবদিল্লাহ্ বইটির ওপর আরেকটি ব্যাখ্যামূলক পুস্তক প্রণয়ন করার পূর্বেই সুন্নী গর্ভণর ইব্রাহীম পাশার সৈন্যদের হাতে প্রাণ হারায়। কিন্তু তার দ্বিতীয় পৌত্র আবদুর রহমান ইবনে হাসান বইটি সমাপ্ত করে নাম রাখে 'ফাতহ আল মজিদ'। মোহাম্মদ হামিদ নামের মিশরীয় এক ওয়াহাবী বইটির সপ্তম প্রকাশনায় আত্মনিয়োগ করে এবং ১৯৫৭ ইং সালে তা প্রকাশ করে। বইটিতে মক্কার প্রাক-ইসলামী যুগের কাফেরদের প্রতি নাযেলকৃত আয়াতসমূহ মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাঁদেরকে মুশরিক আখ্যায়িত করা হয়েছে।
'ওহাবীদের প্রতি নসীহত' বইটি বিন্যস্ত করার সময় আমি আরেকটি ওয়াহাবী পুস্তক পাই। বইটির নাম 'জওয়াব-এ-নোমান'। এই দুইটি ওহাবী পুস্তকের খন্ডনে আমি 'ওয়াহহাবীদের প্রতি নসিহত' কিতাবটি প্রণয়ন করেছি। এর দুইট অংশ রয়েছে। প্রথম খন্ডে 'ফাতহ আল মাজিদ' ও 'জওয়াব-এ-নোমান' থেকে ভ্রান্ত উদ্ধৃতিসমূহ পেশ করে আহলে সুন্নতের পক্ষ থেকে জবাব দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় খন্ড ওয়াহাবীদের ইতিহাস নিয়ে ব্যাপৃত।

আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে ওয়াহাবীদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করুন। আর যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরকে আবার সত্য, সঠিক পথে পরিচালিত করুন, আমিন।

হুসাইন হিলমী ইসিক এম,এস,সি, রসায়ন-কৌশল ফার্মাসিস্ট এবং অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্ণেল (তুর্কী সেনাবাহিনী)
১লা জমাদিউল আউয়াল, ১৪০৩ হিজরী/১৪ই ফেবরুয়ারি, ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দ

সূচিপত্র

প্রথমখন্ড

১) তাসাউফ ও মুতাসাওয়ীফ মকতুবাত-এ-ইমাম-এ-রব্বানী
২) এবাদত মূল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়: কাসিদা-এ-আমালী ও হাদিকা
৩) নবী ও বুযূর্গ মুসলমানদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা
৪) মুসলমানগণ কি ওলীদের অর্চনা করেন? : আল উসুল আল আরবায়া
৫) মুসলমানগণ কি মাযার পূজা করেন ? : আস-সাওয়াইক্ক আল-ইলাহিয়া
৬) নবী (দ:) ভিন্ন অন্য কারও কাছ থেকে বরকত আদায়
৭) তাসাউফের উৎস : মকতুবাত-এ-ইমাম মাসুম ফারুকী
৮) বেসালপ্রাপ্ত ওলীগণের রূহ্ মোবারক
৯) নবী পাক (দ:)-এর প্রশংসা এবং সাহায্য প্রার্থনা : মিরাত আল্ মদীনা
১০) বেসালপ্রাপ্তদের শাফায়াত
১১) আহমদ বাদাওয়ীকে কি দেবতা বানানো হয়েছে ?
১২) হুজুর (দ:) এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম
১৩) কাসিদা-এ-বুরদা সম্পর্কে মাসুম ফারূকী কৃত মকতুবাত
১৪) কবর কি ধ্বংস করা উচিৎ ? ইবনে হাজর হায়তামী কৃত যওয়াজীর।
১৫) মসজিদ-এ-নব্বীতে প্রবেশ করে রওযা শরীফ যিয়ারত না করা : মিরাত আল্ মদীনা
১৬) নবী করীম (দ:)-এর প্রতি প্রেরিত সালাওয়াত
১৭) ওলীগণ সাহায্য প্রদানে সক্ষম আল্ হাদিস আল্ আরবাঈন: প্রণেতা- আল্লামা আহমদ ইবনে কামাল আফেন্দী
১৮) ওলীগণের কারামত ইমামে রব্বানী রচিত মকতুবাত এবং ইমাম কসতলানী রচিত আল্ মাওয়াহীব
১৯) ওলীগণ কারামতের প্রদর্শনী দেন না ইমাম মাসুম ফারুকী প্রণীত মকতুবাত
২০) পাক আয়াত "আল্লাহ এবং বিশ্বাসীরা আপনার জন্যে যথেষ্ট" : আল্ বারিকা
২১) মযহাবের ইমামদের অনুসরণ: তক্কলিদ
২২) কারও কাছ থেকে কোনো কিছু প্রত্যাশা করা আল হাদিক্বা
২৩) আহলে সুন্নাত এবং কাসিদায়ে বুরদা
২৪) বেসালপ্রাপ্ত এবং অনুপস্থিত জন মিনহাতুল ওয়াহবীয়া
২৫) ওহাবীদের ইজতেহাদ
২৬) যিয়ারতে কুবুর : রাবিতা-এ-শরীফা
২৭) হুজুর পূর নূর (দ:) সালাওয়াত শুনতে পান

২৮) সাহাবা-এ-কেরাম ও তাবেয়ীনগণ
২৯) জীবিত ও বেসালপ্রাপ্ত : মারাক্ক আল ফালাহ্ এবং যওয়াজীর
৩০) বেসালপ্রাপ্তদের জন্যে মানত ও জন্তু-জানোয়ার জবাইঃ আশাদ্দুল জ্বিহাদ
৩১) ওহাবী মতবাদের প্রতি ফতোয়া : আশাদ্দুল জিহাদ
৩২) জওয়াব-এ-নোমান পুস্তকের খণ্ডনমকতুবাত : মা'সুম ফারুকী
৩৩) তাসাউফ ও তরীকত শরিয়তেই আদিষ্ট হয়েছে ইরাশাদুত তালেবীন
৩৪) তাসাউফ ও কারামতে অবিশ্বাসীদের প্রতি হাদিকা
৩৫) যে যাকে ভালবাসে আখেরাতে সে তার সঙ্গে থাকবে- হাদিক্কা দ্বিতীয়খন্ড
৩৬) ওহাবীদের উৎস
৩৭) ওহাবীদের প্রথম প্রচার মিশন
৩৮) তাইফ নগরীর মুসলমানদের জান-মাল হরণ
৩৯) মক্কা মোয়াযযমাতে ওহাবীদের অত্যাচার
৪০) মদীনা মনোয়ারায় ওহাবীরা
৪১) পবিত্র নগরীসমূহ থেকে দস্যুদের বিতাড়ন
৪২) বিতাড়নের পর আহলে সুন্নতের উলামাবৃন্দ কর্তৃক মহামূল্যবান পুস্তক প্রণয়ন

আলহামদু লিল্লাহ যদি কোনো ব্যক্তির যে কোনো পদ্ধতিতে, যে কোনো স্থানে এবং যে কোনো সময়ে কাউকে ধন্যবাদ দিতে হয়, তবে তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই দিতে হবে; কারণ তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা যিনি সকল বস্তুকে আমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। একমাত্র তিনিই সকল শক্তি ও ক্ষমতার আধার। তিনি স্মরণ করিয়ে না দিলে কেউই ভাল অথবা খারাপের পার্থক্য বুঝতে পারে না। তাঁর ইচ্ছা ও ক্ষমতা প্রদান ছাড়া কেউই কারও ক্ষতি অথবা উপকার করতে পারে না। তাঁর ইচ্ছা হলেই মানুষ তার কাঙ্কিত বস্তু লাভ করে। আল্লাহ পাক যা ডিক্রি দেন তাই ঘটে। তাঁর দয়াপ্রাপ্ত বান্দাগণ যখন খারাপ কাজ করতে চান তখন তিনি তা সৃষ্টি করে দেন না। কিন্তু তাঁদের ভাল কাজ করার ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করে দেন। ওই ধরণের ব্যক্তিত্বদের কাছ থেকে সদা-সর্বদা ভাল কাজই সৃষ্টি হতে থাকে। উপরন্ত, যাদের ওপর তিনি রাগান্বিত, সেই সব শত্রুরা খারাপ ইচ্ছা পোষণ করলে আল্লাহ পাক তাদেরকে আরও খারাপের দিকে ঠেলে দেন। যেহেতু এ সকল লোকেরা ভাল কাজ করতে চায় না, সেহেতু তাদের থেকে শুধু খারাপ কাজই নিঃসৃত হতে থাকে। তার মানে মানুষ হচ্ছে মাধ্যম বা কারণস্বরূপ। তারা লেখকের হাতে কলমের মতো। শুধুমাত্র তাদের কাছে প্রদত্ত 'ইরাদাতে জুযিয়ত' তথা আংশিক স্বাধীন ইচ্ছার সাহায্যে তারা ভাল কাজ সংঘটনের অভিপ্রায় প্রকাশ করার দরুনই তাদেরকে সওয়াব দেয়া হবে, আর যারা খারাপ চাইবে তারা পাপিষ্ঠ/ফাসিক হবে অতএব, আমাদের উচিৎ আল্লাহ পাকের কাছ থেকে ভাল কাজ সৃষ্টির আশা করা। কোন্ জিনিস উপকারী তাও আমাদের শিক্ষা করা উচিৎ। ভাল এবং **খারাপ** সম্পর্কে জানতে হলে একমাত্র আহলে সুন্নতের উলামাগণের বইপত্র পাঠ করেই তা আমরা জানতে পারি। ইসলামী উলামাগণ হচ্ছেন ভাল কাজের উৎস। তাঁরা ঘোষণা করেছেন যে ওয়াহহাবী মতবাদ খারাপ ও ক্ষতিকর। দলিল সহকারে উলামাগণ তা প্রমাণ করেছেন। এই সকল দলিলের পঁয়ত্রিশটি আমরা আমাদের গ্রন্থের এই পর্বে ব্যাখ্যা করবো।

**[এক]**

ওয়াহাবী পুস্তক 'ফাতহ আল মজিদের' ৭৪ পৃষ্ঠায় লেখা আছে,

إِقْرَأْ كِتَابَ اَلشَّعْرَانِيِّ وَ "أَلإِبْرِيزْ" لِلدَّبَّاغِ وَكُتُبَ اَلتِّيجَانِيَةُ وَغَيرِها مِنْ كُتُبِ أُولَئِكَ الضَّالِّينَ الْمُضَلِّينَ، تَجِدُ الشِّرْكَ الَّذِيْ مَا كَانَ يَخْطُرُ عَلى بَالِ أَبِيْ جَهْلٍ وَإِخْوَانِهِ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُوْنُوا بِوَقَاحَةِ هَؤُلَاءِ وَفُجُوْرِهِمْ-

–আবদুল ওয়াহাব আশ্ শারানী ও আহমদ তিজানীর বইপত্র এবং আবদুল আযিয আদ্ দাব্বাগ-এর কিতাব 'ইব্রিয' মহা-শির্কে পরিপূর্ণ। এই শিরক আবু জেহেলের মত লোকেরাও ধারণা করতে পারেনি।" [১]

হযরত আহমদ তিজানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, যিনি ১১৫০ হিঃ সালে আলজেরিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৩০ হিজরী সালে মরোক্কোতে বেসালপ্রাপ্ত হন, তিনি ছিলেন তিজানীয়্যা তরীকার মুরশিদ। তিজানীয়্যা তরীকা খাল্ওয়াতিয়্যা তরীকারই একটি শাখা-বিশেষ। এই তরীকা সম্পর্কে লিখিত 'জওয়াহির-উল-মাআনি ফী ফয়েযে শায়েখে তিজানী' গ্রন্থটি সমধিক প্রসিদ্ধ। ওয়াহাবীটিও লিখেছে যে মানুষের মধ্যে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সুলাহাগণ (নেককার বান্দা) ফেরেস্তাদের মধ্যে গণ্যমান্যদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ এবং সে বিশ্বাস করে যে ফেরেস্তাগণ ক্ষমতাবান, অথচ এ কথা সে বিশ্বাস করে না যে আল্লাহ পাক তাঁর আউলিয়াকে কারামতস্বরূপ পরিচালনা (তাসাররুফ) ও প্রভাব বিস্তার (তা'সির) করার ক্ষমতা প্রদান করেছেন। যাঁরা তাতে বিশ্বাসী তাঁদেরকে ওয়াহাবীটি মুশরিক (মূর্তি-পুজারী) আখ্যায়িত করেছে। উলামা-এ-ইসলাম মনে হয় আগেই জানতেন যে ওয়াহাবীরা আগমন করবে, তাই তাঁরা ওয়াহাবীদেরকে ভ্রান্ত প্রমাণার্থে বহু কিতাব প্রণয়ন করেন। মুহিউদ্দীন ইবনুল আরবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, সাদরুদ্দীন আল্ কনাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও সাইয়েদ আহমদ বাদাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং পূর্বোক্ত আউলিয়া-এ-কেরাম কারামতস্বরূপ বলেছিলেন যে ওয়াহাবীরা আসবে এবং সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হবে; তারা ধর্মের মধ্যে সংস্কার পেশ করবে। এই কারণেই ওয়াহাবীরা আউলিয়া-এ-কেরামের বদনাম করে থাকে।

হযরত ইমাম-এ-রব্বানী আহমদ আল্ ফারুকী আস্ সিরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর রচিত 'মকতুবাত শরীফের' দ্বিতীয় খন্ডের পঞ্চাশ নং মকতুবে (চিঠিতে) লিখেছেন: "শরিয়তের একটি বাহ্যিক (যাহেরী) এবং একটি অভ্যন্তরীন (বাতেনী) প্রকৃত অর্থ রয়েছে। শরিয়তের যাহের হচ্ছে প্রথমত বিশ্বাস করা এবং পরবর্তী পর্যায়ে এর আদেশ-নিষেধ মান্য করা। শরীয়তের যাহেরী (বাহ্যিক) অংশ অর্জনকারী ব্যক্তির 'নফস আল্ আম্মারা' (একগুঁয়ে সত্তা) অস্বীকার ও অমান্য করতে চায় এটাকে। এই লোকটির ঈমান (বিশ্বাস) হচ্ছে বাহ্যিক (যাহেরী) ঈমান। তার আদায়কৃত সালাতও সালাতের বাহ্যিক রূপমাত্র। রোযা এবং অন্যান্য এবাদতও তার একই পর্যায়ভুক্ত। এর কারণ হচ্ছে মানুষের অস্তিত্বের ভিত্তিই তার

---

[১]. ফাতহুল মাজীদ : বাবুল খাওফি মিনাশ শির্‌ক, ১/৭৪।

নফস আল্ আম্মারা। যখন সে বলে 'আমি' তখন সে বোঝায় তার নফসকে। অতএব, তার নফস ঈমান অর্জন করতে পারেনি। এই ধরনের লোকদের ঈমান ও এবাদত কি প্রকৃত এবং সঠিক হতে পারে? যেহেতু আল্লাহু তায়ালা অত্যন্ত করুণাশীল, সেহেতু তিনি এই বাহ্যিক অর্জনকে কবুল করে নেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে সফল বান্দাদেরকে বেহেশতে প্রবেশাধিকার দেবেন। এটা তাঁর একটি অসীম দয়া যে তিনি অন্তরের ঈমানকে কবুল করে নিয়েছেন এবং শর্তারোপ করেননি যে নফসকেও ঈমান আনতে হবে। তবে বেহেস্তের নেয়ামতেরও বাহ্যিক ও প্রকৃত মর্ম রয়েছে। যারা শরিয়তের বাস্তব দিকটি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন, তাঁরা বেহেস্তের বাস্তব স্বাদ গ্রহণ করবেন। শরিয়তের বহির্ভাগ অর্জনকারী এবং বাস্তব দিক অর্জনকারী উভয়ই বেহেস্তে একই ফল ভক্ষণ করবেন, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ পাবেন। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবি সাহেবাগণ তাঁরই সঙ্গে বেহেস্তে অবস্থান করবেন এবং একই ফল খাবেন, কিন্তু তাঁরা অন্য রকম স্বাদ পাবেন। যদি এটা ভিন্ন না হতো, তাহলে হুজুরের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবিগণ অবশ্যই সকল মানবের চেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হতেন এবং যেহেতু প্রত্যেক স্ত্রীলোক তাঁর স্বামীর সঙ্গে অবস্থান করবেন বেহেশতে, সেহেতু প্রত্যেক মহান ব্যক্তির (সালেহ বান্দা) স্ত্রীকেও তাঁরই মত মহান হতে হতো।

"যে ব্যক্তি শরিয়তের বাহ্যিক দিক অর্জন করেছেন তিনি যদি তা মান্য করেন তবে পরকালে রক্ষা পাবেন। আরেক কথায় তিনি সার্বিক বেলায়াতের মর্যাদার অধিকারী। যাঁকে এই সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে, তিনি তাসাউফের পথে সংযুক্ত হয়ে 'বেলায়াতে খাস্‌সা' নামক বিশেষ বেলায়াত পর্যন্ত উন্নীত হতে পারেন। তিনি তাঁর নফস-এ-আম্মারাকে 'নফস আল মুতমাইন্না' (প্রশান্ত সত্তা)-তে উন্নীত করতে পারবেন। একথা নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত হওয়া উচিৎ যে, এই বেলায়াতের পথে অর্থাৎ শরিয়তের বাস্তবতা অর্জনের পথে উন্নতি করার উদ্দেশ্যে শরিয়তের বাহ্যিক দিকটি কোনোক্রমেই পরিহার করা চলবেনা।

"আল্লাহ তা'আলার নামের যিকরই কোনো ব্যক্তিকে তাসউফের পথে উন্নতি করার জন্যে সাহায্য করে অত্যধিক। যিকরও শরিয়তে আদিষ্ট একটি এবাদত। আয়াতসমূহে ও হাদিসে এটা পালনের আদেশ দেয়া হয়েছে এবং এর প্রশংসাও করা হয়েছে। তাসাউফের পথে উন্নতির জন্যে শরিয়তের নিষেধসমূহ এড়িয়ে চলা অপরিহার্য। ফরয পালন করলে এ পথে উন্নতি করা যায়। তাসাউফে জ্ঞানী মুরশিদ যিনি সালেক (পথচারী)-কে পথপ্রদর্শনে সক্ষম, তাঁর খোঁজ করার জন্যেও মানুষকে শরীয়তে আদেশ দেয়া হয়েছে। ঘোষিত হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوَا اللهَ وَابْتَغُوْا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ

وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ–

'আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ওসীলার তালাশ করো'।[১]

শরিয়তের বাহ্যিক বা প্রকাশ্য এবং প্রকৃত মর্মার্থ উভয়ই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে অত্যাবশ্যক। কারণ বেলায়াতের সকল পূর্ণতা ( মাহাত্ম্য/গুণাবলী) শরিয়তের বাহ্যিক অংশকে মান্য করেই অর্জন করা যায়। আর নবুয়তের গুণাবলী হচ্ছে শরিয়তের বাস্তবতা থেকে সৃষ্ট ফলসমূহ।

"বেলায়াতের দিকে অগ্রসরমান পথ হচ্ছে তাসাউফ। তাসাউফের পথে উন্নতি করতে হলে অবশ্যঅবশ্যই আল্লাহ ভিন্ন অন্য সব জিনিসের ভালোবাসা হৃদয় থেকে বিদূরিত করতে হবে। যদি আল্লাহর রহমতে অন্তর (কলব) সকল বস্তুর ভালোবাসা থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তবে 'ফানা'-এর (আত্মবিলীন) উদ্ভব হয় এবং 'সায়ের-এ-ইলাল্লাহ' (আল্লাহর নৈকট্যের দিকে যাত্রা) পূর্ণ হয়। এর পর আরম্ভ হয় 'সায়ের-এ-বিল্লাহ'-এর (আল্লাহর সাথে) যাত্রা, যার শেষ প্রান্তে রয়েছে কাঙ্কিত 'বাকা'-এর (আল্লাহর সান্নিধ্যে অস্তিত্বশীল থাকার) মর্যাদা। ফলে শরিয়তের বাস্তব দিকটি অর্জিত হল। যে মহান ব্যক্তি এই মর্যাদা লাভে সমর্থ হলেন, তাঁকে বলা হয় ওলী। এ পর্যায়ে 'নফস-এ-আমমারা' 'মুতমাইন্না'-তে পরিণত হয়। নফস তখন কুফর (অবিশ্বাস) পরিত্যাগ করে কাযা ও কদরে (তকদীর/নিয়তিতে) আত্মসমর্পণ করে এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে চলে। নিজেকে নিজে বুঝতে আরম্ভ করে এটা। অহম ও ঔদ্ধত্যের ব্যাধি থেকে এটা তখন মুক্তি পায়। তাসাউফের অধিকাংশ গুরুজন বলেছেন যে প্রশান্ত হওয়ার পরও নফস আল্লাহকে অমান্য করার প্রবণতা থেকে মুক্ত হতে পারেনা। একটি গয্ওয়া (জিহাদ) থেকে ফিরে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন,

فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمْتُمْ خَيْرَ مُقَدَّمٍ مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَىٰ الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ–

'আমরা ছোট জিহাদ থেকে ফিরলাম বড় জিহাদ-এর দিকে'।[২]

---

[১]. আল কুরআন : সূরাতুল মায়িদা ৫/৩৫।
[২]. বায়হাক্বী : আয যুহদুল কাবীর, ১/৩৮৮।

এই জিহাদ-এ-আকবরকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে নফসের সঙ্গে জিহাদ হিসেবে। এই ফকির (ইমাম-এ-রব্বানী) কিন্তু ওই অর্থে ব্যাপারটিকে গ্রহণ করি না। আমি বলি নফস প্রশান্ত হওয়ার পর তার মধ্যে আর কোনো অমান্য করার প্রবণতা অথবা খারাপ কোনো কিছু অবশিষ্ট থাকেনা। অন্তরের মতো নফসও সবকিছু ভুলে গিয়ে আল্লাহ ছাড়া আর কিছু দেখেনা সম্মুখে। উচ্চ পদমর্যাদা ও ধন-সম্পত্তির মিষ্ট এবং তিক্ত উভয় স্বাদের প্রতিই নফসের নির্লিপ্ততা তখন প্রকাশ পায়। এটা তখন দমিত এবং অনেকটা অস্তিত্বহীন হয়ে গিয়েছে। আল্লাহর জন্যে এটা নিজেকে কোরবানী করেছে। হাদীসটিতে উল্লেখিত 'জিহাদ' বলতে সম্ভবত দেহের মধ্যে গঠিত উপাদানসমূহের পদার্থগত, রাসায়নিক ও জৈবিক কামনার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে বুঝিয়েছে। 'শাহাওয়াৎ' অর্থাৎ কাম এবং 'গযব' অর্থাৎ ভয় ও সন্দেহ, উভয়ই বস্তুগত কামনা। জন্তু-জানোয়ারের নফস্ নেই, কিন্তু এই সকল ক্ষতিকর ইচ্ছা তাদের মধ্যেও বিরাজমান। দেহের মধ্যে এক ধরণের উপাদান থাকার ফলেই জন্তু-জানোয়ারের কাম, ক্রোধ ও সহজাত প্রবৃত্তিগুলো রয়েছে। মানুষদেরকে এ সকল প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে। নফসের প্রশান্তি মানব জাতিকে এই সব প্রবৃত্তি থেকে রক্ষা করে না। এগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদ অত্যন্ত উপকারী। এটা দেহকে পবিত্র হতে সহায়তা করে।

"কোনো ব্যক্তির নফস্ যখন দমিত হয়ে যায় তখনই তাঁর ভাগ্যে 'আল্ ইসলাম আল্ হাক্বিক্বি' (প্রকৃত ইসলাম) এসে যুক্ত হয়। তখনই প্রকৃত ঈমান অর্জিত হয়। এ সময়ে যে কোনো ধরণের এবাদত পালনই প্রকৃত হবে; সালাত, রোযা এবং হজ্জ সবগুলোই প্রকৃত মূল্যে পাওয়া যাবে।

"অতএব এটা পরিস্ফুট যে, তাসাউফ অথবা হাকিকত হচ্ছে শরিয়তের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন অংশের মধ্যে সংযোজক পথ-বিশেষ যে ব্যক্তি বেলায়াত খাসসা অর্জন করতে পারেনি, সে একজন 'মাজাযী' (রূপক) মুসলমান হওয়া থেকে নিস্তার পায়নি, অর্থাৎ সে প্রকৃত ইসলাম অর্জন করতে পারেনি।

"যে ব্যক্তি শরিয়তের বাস্তব দিকটি অর্জন করতে পেরেছেন এবং যাঁকে প্রকৃত ইসলাম অর্জনে সম্মানিত করা হয়েছে, তিনি নবুয়তের গুণাবলীর অংশীদারিত্ব লাভ করতে শুরু করেন এরপর। হাদীসে ঘোষিত শুভসংবাদ– إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ 'ওলামা-এ-কেরাম নবীগণের ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী'[১]-এর বিষয়বস্তুতে পরিণত হন তিনি। শরিয়তের বাহ্যিক অংশের ফল যেমন বেলায়াতের গুণাবলী (পূর্ণতা),

---

[১]. বুখারী : আস্ সহীহ, বাবুল ইলমি কুবলাল কাওলি, ১/২৪; ইবনে মাজাহ / বাবু ফদ্বলিল ওলামা, ১/৮১।

ঠিক তেমনি শরিয়তের বাস্তবতার ফল হচ্ছে নবুয়তের গুণাবলী। বেলায়াতের গুণাবলী হচ্ছে নবুয়তের গুণাবলীর বাহ্যিক রূপ।"শরিয়তের বাহ্যিক ও শরিয়তের বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্যের উৎস হচ্ছে নফস। আর বেলায়াত ও নবুয়তের গুণাবলীর মধ্যে পার্থক্যের উৎস দেহের উপাদানসমূহ। বেলায়াতের গুণাবলীর স্তরে উপাদানগুলো পদার্থগত, রসায়নিক ও জৈবিক অংশকে মান্য করে; অতিরিক্ত শক্তি আধিক্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং উপাদানগুলো খাদ্যের জন্যে কামনা করতে থাকে। এ সকল প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে হায়া-শরমহীন উদ্ভট কাজ-কারবার সংঘটিত হয়। নবুয়তের গুণাবলীর মধ্যে এ সব উদ্ভট কাজের অবসান ঘটে।

كَانَ شَيْطَانِيْ كَافِرًا فَأَعَانَنِيْ اللهُ عَلَيْهِ حَتَّي أَسْلَمَ-

'আমার শয়তান মুসলমান হয়েছে'।[১]

হাদীসটিতে সম্ভবতঃ এ সচেতনতার অবস্থাটি প্রতিভাত হয়েছে, কারণ মানুষের বাইরে অবস্থিত একজন শয়তানের মতো ভেতরেও একজন শয়তান অবস্থান করছে। অধিক শক্তি মানুষকে বিচ্যুত করে এবং দাম্ভিক বানিয়ে দেয়, আর এটা বদ অভ্যাসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে খারাপটা। এসব খারাপ দিক বর্জন করে নফস মুসলমান হয়ে যায়। নবুয়তের গুণাবলীতে অন্তর (ক্বলব) এবং নফস উভয়ই ঈমানদার হয় এবং দেহের মধ্যে মূলবিহীন উপাদানসমূহেরও মার্জিত আচরণ পরিলক্ষিত হয়। দেহের মধ্যে বস্তু ও শক্তির সামঞ্জস্য বিধানের পরই নফস দমিত হয়ে যায়। প্রশান্ত হওয়ার পর এটা আর ক্ষতিকর হতে পারে না। এ সকল শ্রেষ্ঠ গুণ শরিয়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত। একটা গাছ যতো শাখা-প্রশাখাই বিস্তার করুক না কেন এবং যতো সুস্বাদু ফলই দেক না কেন, সেটা মূলবিহীন হতে পারে না। প্রত্যেক গুণের জন্যে শরিয়ত অত্যাবশ্যক" (মকতুবাত, দ্বিতীয় খন্ড, পঞ্চাশ নং চিঠি)। অতএব এ কথা পরিস্ফুট যে, ওয়াহাবীরা তাসাউফ সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ হয়েই ওলীগণের কুৎসা রটনা করে বেড়ায় এবং তাঁদেরকে শরিয়ত বহির্ভূত আখ্যায়িত করে থাকে।

২। ওয়াহাবী পুস্তকটির ৪৮ এবং ৩৪৮ নং পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে,

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الأَعْمَالَ مِنَ الإِيمَانِ خِلَافًا لِلأَشَاعِرَةِ وَالمُرْجِئَةِ فِيْ قَوْلِهِمْ-

–এবাদত তথা আমল (সৎকর্ম) মূল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। এবাদত করে না এমন ব্যক্তির ঈমান বিদূরিত হয়। ঈমান বৃদ্ধি অথবা হ্রাস পেতে পারে।

---

[১]. বায্যার : আল মুসনাদ, মুসনাদে আবূ হামযা আনাস বিন মালেক ১৪/২৪৯।

আশ্ শাফেয়ী, আহমদ ইবনে হাম্বল এবং অন্যান্যরা সর্বসম্মতভাবে তাই বলেছেন।[১২]

এবাদত যে একটি কর্তব্য তা বিশ্বাস করা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বিশ্বাস ও কর্তব্য পালন দুইটি ভিন্ন বিষয়, যেগুলোকে তালগোল পাকিয়ে ফেলা মোটেই উচিৎ নয়। কোনো ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করে যদি আলস্যবশতঃ তার বিশ্বাসকে আমল না করে, তবে সে কাফেরে পরিণত হবে না। ওয়াহহাবীরা এ ব্যাপারটি বুঝতে না পেরে লক্ষ-কোটি মুসলমানকে কাফের ফতোয়া দিয়ে ফেলছে। অথচ কেউ যদি কোনো মুসলমানকে কাফের আখ্যা দেয়, তা হলে সে নিজেই কাফেরে পরিণত হয়।

'কাসিদা-এ আমলী' পুস্তকের তেতাল্লিশতম পংক্তিটি বলে, "ফরয এবাদত (মূল) ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়"। হযরত ইমামে আ'যম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ঘোষণা করেন যে,

أَنَّ الْعَمَلَ لَيْسَ مِنْ الْإِيمَانِ

আমল (পুণ্যময় কর্ম) ঈমানের অংশ নয়।[৩]

ঈমান অর্থ বিশ্বাস। বিশ্বাসের মধ্যে আধিক্য অথবা স্বল্পতা নেই। যদি এবাদত ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হতো, তাহলে ঈমান বৃদ্ধি বা হ্রাস পেতো। মৃত্যুকালে পর্দা ওঠে যাবার পর যদি আযাব দেখে ঈমান আনা হয়, তবে তা গ্রহণীয় হবে না। কিন্তু মৃত্যুকালে কেউ ঈমান আনলে সেটা হবে অন্তরের বিশ্বাস; এবাদত তার পক্ষে পালন করা সম্ভব হয়নি। আর এটাই হলো আয়াতে উল্লেখিত ঈমান। বহু আয়াতে ঈমানদারদেরকে এবাদত পালন করতে আদেশ দেয়া হয়েছে। অতএব, ঈমান আমল থেকে পৃথক। উপরন্তু,কুরআনের আয়াত– إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 'যারা বিশ্বাস করো এবং যারা সওয়াবদায়ক কাজ করো[৪]' পরিস্ফুট করে যে ঈমান ও এবাদত একই বিষয় নয়। 'ঈমানদার যারা সওয়াবদায়ক কাজ করে' আয়াতটি স্পষ্টই প্রতীয়মান করে যে আমল ঈমান থেকে ভিন্ন। কারণ কোনো কিছু আরোপের আজ্ঞা এবং আরোপিত বিষয় এক হতে পারে না। এ কথা সর্বসম্মতিক্রমে জ্ঞাত হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি মৃত্যুর পূর্বে ঈমান আনে এবং আমল করার সময় না পায়, তবে তাকে ঈমানদার হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

---

১. ফাতহুল মাজীদ : বাবু দু'য়ায়ি ইলা শাহাদাতিল লা ইলাহা ১/৯৩।
২. ফাতহুল মাজীদ : বাবু ফদ্বলিত তাওহীদ ১/৪৮।
৩. উসূলূল ই'তিক্বাদি আহলি সুন্নাহ : আশ শরাহ, ৪/৫১।
ক. আত ত্বাহাবী : আশ শরাহ, আর রাদ্দু আলাল শিবহাতিল ক্বায়িলিন ৩/৪৫।
৪. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২/২৭৭।

হাদীস আল জিবরীল-এ ঘোষিত হয়েছে الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ যে ঈমান অর্থ বিশ্বাস।[১]ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও বহু হাদীসবিদ ওলামা এবং আশ'আরী ও মুতাযিলা সম্প্রদায় বলেছেন যে এবাদত ঈমানের অংগীভূত এবং এটা হ্রাস বা বৃদ্ধি পেতে পারে; এও বলেছেন যে ঈমান ও এবাদত যদি ভিন্ন হতো, তবে নবীগণের ও ফাসিকদের (পাপী) ঈমানও একই (পর্যায়ের) হতো। তাঁরা বলেন যে, إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا 'আমার আয়াতগুলো শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়[২]'- আয়াতটি এবং 'ঈমান বৃদ্ধি পেলে এর অধিকারীকে বেহেশতে নিয়ে যায়, আর হ্রাস পেলে দোযখে'- হাদিসটি ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধিকে বোঝায়। এর বহুকাল পূর্বেই ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ব্যাপারটির প্রত্যুত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, ঈমানের বৃদ্ধি মানে স্থায়িত্ব, দীর্ঘায়ু। ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও একই কথা বলেছেন। ঈমানের প্রাচুর্যের মানে হচ্ছে বিশ্বাস স্থাপনের বিষয়গুলোর বৃদ্ধি। উদাহরণস্বরূপ, সাহাবা-এ-কেরাম প্রাথমিক অবস্থায় অল্প কিছু বিষয়ে বিশ্বাস করেছেন, কিন্তু নতুন নতুন ঐশী আদেশের অবতরণের সাথে সাথে তাঁদের ঈমানও বৃদ্ধি পায়। ক্বলবে (অন্তরে) নূরের (জ্যোতির) বৃদ্ধি হওয়াটাই হচ্ছে ঈমানের বৃদ্ধি। এ আলোকচ্ছটা এবাদত করলে বৃদ্ধি পায় আর গুনাহ করলে হ্রাস পায়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে 'শরহে মাওয়াক্বিফ' এবং 'জওহারাতুত্ তাওহীদ' কিতাবগুলোতে। উলামা-এ-ইসলাম এই বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করে ওহাবী গোমরাহদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন।

ওয়াহাবী পুস্তকটির ৯০ নং পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে,

رَوَى اَلْبُخَارِيْ عَنْ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُسَمَّى عَبْدَ اللهِ وَيُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يَضْحَكُ رَسُوْلَ اللهِ وَكَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَيُؤتَى بِهِ فَيُقِيْمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ

---

১. ইব্‌ন আবী শায়বা : আল মুসান্নাফ,বাবু মা যুকিরা ফিল ঈমান ৬/১৫৭।
ক.আহমদ : আল মুসনাদ, মুসনাদে ওমর ইব্‌ন খাত্তাব, ১/২৮।
খ. বুখারী : আস সহীহ, বাবু সুওয়ালী জিবরাঈল ১/১৯।
গ. মুসলিম : আস সহীহ, বাবুল ঈমানি মা হুয়া ১/৩৯।
গ.ইব্‌ন মাজাহ : আস সুনান, বাবু ফিল ঈমান ১/২৪।
ঘ. তিরমিযী : আস সুনান,বাবু মা জা'য়া ফি ওসফি জিবরাঈল ৪/৩০২।
ঙ. নাসায়ী : আস সুনান, সিফাতুল ঈমান ওয়াল ইসলাম ৮/১০১।
২. আল কুরআন : সূরা আনফাল, ৮/২।

فَلَعَنَهُ بَعْضُ الصَّحَابَةِ، فَقَالَ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: ﴿لَا تَلْعَنْهُ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ﴾ الْحَدِيْثُ.

"একজন সাহাবী মদ্যপান বর্জন করেননি। তাঁকে শাস্তিস্বরূপ বেত্রাঘাত করা হয়; যখন কিছু সংখ্যক সাহাবা তাঁকে লা'নত (অভিসম্পাত) দেন তখন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'তাকে লা'নত দেবে না। কারণ সে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভালোবাসে। [১]

ওয়াহাবীটিও স্বীকার করেছে যে কোনো ফাসিক-গুনাহগার মুসলমান তার ফিসকের (পাপ) জন্যে কাফের (অবিশ্বাসী) হয় না। এ হাদীস ওয়াহাবীদের দাবিকে সমূলে উৎপাটিত করেছে। এটা আরও প্রমাণ করে, لَا يَسْرِقُ وَلَا يَزْنِي "যে ব্যক্তি যেনা করে না, সে চুরিও করে না"- হাদীসটা ঈমানকে নয়, বরং তার পরিপক্বতাকে ইশারা করে।

আল্লামা বিরগিউয়ীর লেখনী ব্যাখ্যাকালে হযরত আবদুল গনী আন্ নাবলুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর প্রণীত 'আল হাদিক্বা' গ্রন্থের ২৮১ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক উন্মোচিত আল্লাহ পাকের জ্ঞানের প্রতি অন্তরের বিশ্বাস এবং জিহ্বা দ্বারা তা ঘোষণা করাই হচ্ছে ঈমান। এ জ্ঞানের প্রত্যেক অংশ অধ্যয়ন এবং উপলব্ধি করা আবশ্যক নয়। মু'তাযিলা গোমরাহ সম্প্রদায় বলেছিল যে, বিশ্বাস করার পর উপলব্ধি করতে হবে। হযরত আয়নী সহিহ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকালে (শরাহ) বলেন যে, মুহাক্কিকিন তথা উলামা-এ-হক্কানী, যেমন, আবুল হাসান আল আশ্‌আরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, কাযী আবদুল জব্বার, ওস্তাদ আবুল ইসহাক্ব আল ইসফারাইনী, হুসেইন ইবনে ফযল প্রমুখ বলেছেন, 'ঈমান হচ্ছে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত বিষয়গুলোর প্রতি অন্তরের বিশ্বাস। জিহ্বা দ্বারা ঘোষণা করা অথবা এবাদত করা ঈমান নয়'। হযরত সা'দ উদ্দীন তাফতাযানীও তাঁর 'শরহে আকাইদ' গ্রন্থে এটা লিখেছেন এবং রেওয়ায়াত করেছেন যে শামস্ আল আয়েম্মা ও ফখরুল ইসলামের মতো উলামা এটাকে জিহ্বা দ্বারা ঘোষণা করা অপরিহার্য বলেছেন। অন্তরের ঈমানকে জিহ্বা দিয়ে সমর্থন করার কারণ হলো, এতে মুসলমানগণ একে অপরকে চিনতে পারেন সহজেই। যে মুসলমান বলেন না যে

[১]. ফাত্‌হ আল মজীদ : বাবুদ দুয়া ফি ইলা শাহাদাতান লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ১/৯০।

তিনি মুসলমান, তিনিও মুসলমান বটে। অধিকাংশ উলামা, যেমন, ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন যে আমল (মূল) ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। যদিও ইমাম আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন যে, ঈমান হচ্ছে বিশ্বাস স্থাপন এবং তা জিহ্বা দ্বারা ঘোষণা ও এবাদত পালন, তবুও বস্তুতঃ তাঁরা বুঝিয়েছেন ঈমানের পরিপক্কতা বা পূর্ণতাকে। এ কথা সর্বসম্মতভাবে ঘোষিত হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি তার অন্তরে ঈমানের উপস্থিতির কথা ঘোষণা করে, তবে সে মু'মিন (বিশ্বাসী)। কোনো আলেমই তাকে বিশ্বাসী আখ্যায়িত না করে থাকেন নি। সহিহ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যায় হযরত আল্ কারমানী লিখেছেন, 'যদি এবাদতকে (মূল) ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করা হতো, তবে ঈমান বৃদ্ধি বা হ্রাস পেতো। কিন্তু অন্তরের ঈমান হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়না। যে বিশ্বাস হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়, সেটা কোনো ঈমানই নয়, বরং সন্দেহ ও অনাস্থা'। ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন্ নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'বিশ্বাস স্থাপনের বিষয়গুলোর কারণসমূহ অধ্যয়ন এবং উপলব্ধি (বোঝা) করাই হচ্ছে ঈমান। হযরত আবু বকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ঈমান অন্য লোকদের ঈমানের মতো না'। ইমাম নববীর এই বাক্যটি ঈমানের দৃঢ়তা অথবা দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করে। এর মানে এই নয় যে ঈমান বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়। এটা অনেকটা একজন অসুস্থ লোকের সঙ্গে স্বাস্থ্যবান লোকের তুলনা দেয়ার মতোই ব্যাপার; তারা একই রকম শক্তিধর নয়, কিন্তু উভয়ই মানুষ এবং তাদের মানুষ হওয়ার গুণের মধ্যে কোনো হ্রাস বা বৃদ্ধি নেই। হযরত ইমাম আল আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ঈমানের গুণ বর্ণনাকারী আয়াত ও হাদীসগুলোকে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেছেন, 'সাহাবা-এ-কেরাম ইসলাম গ্রহণের সময় সকল বিষয় বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন। সময়ের বিবর্তনে পরবর্তীকালে আরও বহু বিষয় ফরয হয়ে যায়। তাঁরা এক এক করে সবগুলোকেই বিশ্বাস করে নেন। ফলে তাঁদের ঈমান ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। এটা শুধু সাহাবা-এ-কেরামের জন্যেই খাস (নির্দিষ্ট)। পরবর্তীকালে আগত মুসলমানদের জন্যে ঈমানের বৃদ্ধি চিন্তাই করা যায় না।' শরহে আকাঈদ গ্রন্থে হযরত সাদ-উদ-দ্বীন তাফতাযানী লিখেছেন, 'যারা অল্প জানে তাদেরকে সংক্ষিপ্তভাবে ঈমান আনতে হবে, আর যারা বিস্তারিত জানে তাদের জন্যে সেই অনুসারে বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। পূর্ববর্তীদের চেয়ে পরবর্তীদের ঈমান অবশ্যই বেশি। কিন্তু পূর্ববর্তীদের ঈমানও সম্পূর্ণ। তাদের ঈমান ত্রুটিযুক্ত নয়।' শরহে আকাঈদ হতে উদ্ধৃতি শেষ হলো।[১]

[১]. আল হাদিকা : ১/২৮১।

হযরত আবদুল গণী নাবলুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এরপর সিদ্ধান্ত টানেন, ”সংক্ষেপে ঈমান নিজে নয় বরং তার দৃঢ়তাই হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়। অথবা যারা বলেছেন যে এবাদত ও আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত, তাঁরা আসলে ঈমানের পূর্ণতা বা মূল্যকে এর হ্রাস-বৃদ্ধির মর্মার্থস্বরূপ বুঝিয়েছেন। ঈমানের সিফাত (গুণ) বর্ণনাকারী আয়াত ও হাদীসগুলোর ব্যাখ্যা তা-ই করা হয়েছে। যেহেতু এটা এ রকম একটা বিষয় যেখানে ইজতেহাদ (গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত) প্রয়োগ করা যায়, সেহেতু বিভিন্ন ধরণের ব্যাখ্যার আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু কোনো ব্যাখ্যাকারী অপর কাউকে দোষারোপ করেননি”। অথচ ওয়াহাবীরা ঘৃণ্য ঔদ্ধত্য দেখিয়ে এবাদতে বিশ্বাসী কিন্তু আলস্যবশতঃ আমল করতে অক্ষম মুসলমানদের কাফের ও মুশরিক ফাতোয়া দিচ্ছে।

‘বারিকা’ গ্রন্থে লিখেন, এবাদত ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। হযরত জালালুদ্দিন আদ্ দাওয়ানী বলেছেন, মু’তাযিলা সম্প্রদায় এবাদতকে ঈমানের অংশ হিসেবে বিবেচনা করতো এবং বলতো যে, এবাদত করে না এমন ব্যক্তিবর্গ বেঈমান (কাফের, অবিশ্বাসী)। এবাদত ঈমানকে পরিপক্বতা ও সৌন্দর্য দান করে; সালাফ আস্ সালেহীন বলেছেন যে এবাদত একটি গাছের শাখা-প্রশাখার মতোই’। ইমাম আল্ আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম আবু বকর রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং আরও বহু আলেম বলেছেন যে, এবাদতের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি অথবা পাপের (গুনাহ) মাধ্যমে ঈমান হ্রাস পায় না কারণ ঈমান মানে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস এবং তাই এটার কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। ক্বলবে (অন্তরে) ঈমানের বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত কুফরের হ্রাস পাওয়া, যেটা একেবারেই অসম্ভব। ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম আশআরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন যে ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ’মাওয়াক্বিফ’ গ্রন্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে তাঁরা এই মন্তব্য দ্বারা ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধিকে বোঝাননি, বরং ঈমানের শক্তি (দৃঢ়তা)-কে বুঝিয়েছেন। কারণ নবী আলাইহিস্ সালাম-এর ঈমান ও তাঁর উম্মতের ঈমান এক নয়। যা শোনে তাতেই বিশ্বাস স্থাপনকারী ব্যক্তির ঈমান, জ্ঞান ও যুক্তি সহকারে বিচার-বিশ্লেষণকারী শ্রোতার ঈমান হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কুরআনে লিপিবদ্ধ আছে যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর ক্বলবে ’ইতমিনান’ (প্রশান্তি) অথবা ‘ইয়াক্বিন’ (দৃঢ় বিশ্বাস) অর্জন করতে চেয়েছিলেন। ইমাম আল আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর ’ফিকাহ-এ-আকবর’ কিতাবে লিখেছেন: ‘বিশ্বাস স্থাপনের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আসমানের বাসিন্দা (ফেরেশতা) এবং পৃথিবীবাসীদের (মানব ও জ্বিন) ঈমান হ্রাস বা বৃদ্ধি পায় না; ইত্বমিনান কিংবা ইয়াক্বিনের ফলেই ঈমান

বাড়ে বা কমে। আরেক কথায়, ঈমানের শক্তি হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়; তবে ইয়াকিনবিহীন (শক্তিবিহীন) ঈমান কোনো ঈমান নয়, বরং ধারণা অথবা সন্দেহ'। ফিকাহ-এ-আকবরের উদ্ধৃতি শেষ হলো।[১]"'মকতুবাত' গ্রন্থে ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, "যেহেতু ঈমান হচ্ছে অন্তরের (ক্বলবের) সম্মতি ও দৃঢ় বিশ্বাস, সেহেতু এর হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। যে বিশ্বাস বাড়ে বা কমে সেটাকে ঈমান বলে না, বরং কল্পনা বলে। যখন কোনো ব্যক্তি এবাদত ও আল্লাহ তা'আলার পছন্দকৃত আদেশসমূহ পালন করে, তখন তার ঈমান আলোকোজ্জ্বল (নূরাণী) হয়ে ওঠে। আর যখন কোনো ব্যক্তি গুনাহ সংঘটন করে, তখন তার ঈমান নিষ্প্রাণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। অতএব, এবাদতের ফলে (ঈমানের) ঔজ্জ্বল্যের পরিবর্তনই হচ্ছে হ্রাস বা বৃদ্ধি। ঈমানের নিজের মধ্যে কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। কেউ কেউ বলেছেন যে নূরাণী (আলোকোজ্জ্বল) ঈমান অন্ধকারাচ্ছন্ন ঈমান থেকে বেশি এবং তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন ঈমানকে ঈমান হিসেবে গণ্যই করেননি। তাঁরা কিছু মানুষের কম আলোকোজ্জ্বল ঈমানকে ঈমান হিসেবে বিবেচনা করেছেন, তবে বলেছেন যে এই ধরণের ঈমান অন্যদের ঈমানের চেয়ে কম যেন এই দুই ধরণের ঈমান দুইটি আয়নার মতো, যেগুলোর ঔজ্জ্বল্য দুইটি ভিন্ন পর্যায়ের এবং উজ্জ্বল আয়নাটি কম উজ্জ্বলটির চেয়ে পরিষ্কার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম। আবার কেউ কেউ বলেন যে উভয় আয়নাই সমকক্ষ, তবে তাদের ঔজ্জ্বল্য এবং প্রতিফলন, অর্থাৎ, তাদের উপাদান ভিন্ন। যাঁরা প্রথমোক্ত তুলনাটা দিয়েছেন, তাঁরা বাহ্যিক চাকচিক্যটাই দেখেছেন কিন্তু মূল বিষয়বস্তু উপলব্ধি করতে পারেন নি। 'আবু বকরের ঈমান আমার সকল উম্মতের ঈমানের চেয়ে ভারি'- হাদিসটি ঔজ্জ্বল্যের দৃষ্টিকোণেরই তুলনামাত্র"।[২]

ওহাবী 'ফাত্হ আল্ মজিদ' গ্রন্থটি একটি হাদীস উদ্ধৃত করে,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ، وَوَالِدَيْهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

"কোনো মুসলমানের ঈমান সম্পূর্ণ হতে পারে না যদি সে আমাকে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্যদের চেয়ে বেশি ভালো না বাসে"।[৩]এবং তার পর লিখে, "ক্বলবের মধ্যে ভালোবাসা আছে। এটা

---

১. হযরত হাদিমী : বারিক্বা।

২. ইমাম-এ-রাববানী আহমদ আল ফারুকী আস সিরহিন্দী : মকতুবাত শরীফ।

৩. বুখারী : আস সহীহ, বাবু হুব্বি রাসূলিল্লাহ ১/১২ হাদীস নং ১৪।

ক. মুসলিম : আস সহীহ, বাবু উজুবি মুহাব্বতি রাসূলিল্লাহ ১/৬৭ হাদীস নং৪৪।

খ. ইব্ন মাজাহ : আস সুনান, বাবু ফিল ঈমান ১/২৬ হাদীস নং ৬৭।

গ. আহমদ : আল মুসনাদ ৩/১৭৭।

> ক্বলবের একটা কাজ; সুতরাং এই হাদীসে প্রতিভাত হয় যে এবাদত ও আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত এবং ঈমানের পূর্বশর্ত।"[১]

ভালোবাসা ক্বলবের (অন্তরের) কোনো কাজ নয়, বরং সিফাত (গুণ)। যদি তাকে আমরা একটি বারের জন্যে কাজ হিসেবে ধারণা করিও, তবুও এ কথা বলা যাবে না যে শরীরের সম্পাদিত কাজসমূহ অন্তরেরই কাজ। মহা-অপরাধীকে শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সেই সব অপরাধ সংঘটনের ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করে, তাকে শাস্তি দেয়া হবে না। সংক্ষেপে, অন্তরের ভাল কাজ হচ্ছে ঈমান স্থাপন করা এবং খারাপ কাজ হচ্ছে অবিশ্বাস (কুফর) করা অথবা বিশ্বাসবিহীন থাকা। অবিশ্বাস (কুফর) দেহের কোনো কাজ নয়। উদাহরণস্বরূপ, মিথ্যা কথা বলা হারাম (নিষিদ্ধ) এবং মিথ্যাবাদী একটি খারাপ কাজ সংঘটনকারী। কিন্তু সে কাফিরে রুপান্তরিত হবে না। তবে, মিথ্যাকে যে ব্যক্তি হারাম হিসেবে বিশ্বাস করবে না, সে কাফের হয়ে যাবে।

ওয়াহাবীটি দাবি করে, "অন্তরের বিশ্বাস ও আমলের মাধ্যমে এবং জিহ্বা দ্বারা সমর্থন ও এবাদতের মাধ্যমে ঈমান খাঁটি হয়।" কিন্তু ৩৩৯ পৃষ্ঠায় সে বলে,

> وَمِنْ لَوَازِمِ مُحَبَّةِ اللهِ أَيْضًا: مُحَبَّةِ أَهْلِ طَاعتِه، كَمُحَبَّةِ أَنْبِيَائِه وَرُسُلِه وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِهِ، فَمُحَبَّةَ مَا يُحِبّه الله وَمَن يحبه اللهَ مِنْ كَمَالِ الإِيْمَانْ–
>
> "যদি কেউ আল্লাহকে ভালোবাসে, তাহলে তাঁর অনুগত ও ভালোবাসাপ্রাপ্ত নবী-ওলীদেরও তার ভালোবাসা উচিৎ।" [২]

অতএব, আউলিয়া এবং মুরশিদদেরকে ভালোবাসা আল্লাহকেই ভালোবাসার চিহ্নমাত্র। যারা এভাবে ভালোবাসা প্রকাশ করে তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলা তাহলে মোটেও যুক্তিসঙ্গত নয়। আল্লাহ্ পাক যাদেরকে ভালোবাসেন না তাদেরকে ভালোবাসা হারাম ও কুফর; আর তিনি যাঁদেরকে ভালোবাসেন তাঁদেরকে ভালোবাসা ঈমানের লক্ষণ এবং অত্যন্ত জরুরি দায়িত্ব বটে। এটাই হলো 'আল হুব্বু ফিল্লাহ ওয়াল বুগদু ফিল্লাহ্' নামক এবাদত। এই এবাদতকে সর্বশ্রেষ্ঠ

---

ঘ. আদ দারেমী : আস সুনান ৩/১৮০১ হাদীস ২৭৮৩।
ঙ. নাসায়ী : আস সুনান আলামাতুল ঈমান ৮/১১৪ হাদীস ৫০১৩।
চ.ইব্‌ন হিব্বান : আস সহীহ ১/৪০৫ হাদীস ১৭৯।
ছ. হাকিম : আল মুস্তাদরাক, ২/৫২৮ হাদীস ৩৮০৫।
জ. বায়হাক্বী : শুয়াবুল ঈমান ২/১২৯ হাদীস ৫৮৮।
[১]. ফাতহুল মজীদ : ১/৩৩৬।
[২]. ফাতহুল মজীদ : ১/৩৩৯।

এবাদত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কাফের ও মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন অন্য জিনিসকে ভালোবাসে। কিন্তু মুসলমানগণ যেহেতু আল্লাহ পাককে ভালোবাসেন, সেহেতু তাঁর ভালোবাসাপ্রাপ্ত নবী-ওলীদেরকেও তাঁরা ভালোবাসেন। ওয়াহ্হাবীরা এই দুই ধরণের ভালোবাসার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে। কাফেরদের ভালোবাসাকে তিরস্কারকারী আয়াতগুলো তারা মুসলমানদের ভালোবাসার ওপর চাপিয়েছে।

ওহাবী পুস্তকটি এবাদতকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করে আহলে সুন্নতের কুৎসা রটনা করেছে। কারণ আহলে সুন্নত ওয়াহাবীটির কথায় বিশ্বাস করেন না। বাহাত্তরটি ভ্রান্ত ফেরক্কার অন্তর্গত খারেজী সম্প্রদায় এবং তাদের ওহাবী অনুসারীরা আয়াত ও হাদীসসমূহ অস্বীকার করে না, কিন্তু ভুল বুঝে থাকে এবং বলে থাকে যে ফরয পালন করা ও হারাম পরিহার করা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত, আর ঈমানের ছয়টি ভিত্তিতেই শুধু বিশ্বাস করা অপরিহার্য নয় বরং মুমিন (বিশ্বাসী) হতে হলে শরিয়ত অনুযায়ী আমলও করতে হবে; এবং তারা আরও বলে যে শুধুমাত্র একটি ফরযকে অমান্য করলেই কাফের হয়ে যেতে হবে এবং যে ব্যক্তি হারাম (নিষিদ্ধ) সংঘটন করে, সে নিঃসন্দেহে কাফের। ভুল বুঝে ওহাবীরা মুসলমানদেরকে কাফের আখ্যায়িত করছে অথচ, ঈমান হচ্ছে ফরযকে ফরয এবং হারামকে হারাম হিসেবে বিশ্বাস করা। অবিশ্বাস (কুফর) ও আমলবিহীন বিশ্বাস দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। খারেজী এবং ওহাবীরা এই দুটোর মধ্যে তালগোল পাকিয়ে শেষ পর্যন্ত আহলে সুন্নত থেকে বিচ্যুত হয়েছে। তবুও এর জন্যে তারা কাফের হবে না। তারা আহলে বিদআত (ধর্মের মধ্যে নতুন প্রথা প্রবর্তনকারী) হবে। কিন্তু যারা বেআমল, ফাসিক মুসলমানদেরকে কাফের আখ্যা দেয় তারা নিজেরাই কাফেরে পরিণত হয়। একটি হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে, "বিদয়াতীদের প্রতি ঘৃণা পোষণকারীদের হৃদয়কে আল্লাহ তা'আলা ঈমান দ্বারা পূর্ণ করে দেন। যে ব্যক্তি বিদয়াতীকে সমালোচনা করবে তাকে আল্লাহ পাক পুনরুত্থান দিবসের ভীতি থেকে নিজ খাস রহমতে মুক্ত করে দেবেন।" পুনরুত্থান দিবসের আযাব থেকে মুক্তি কামীদের উচিৎ আহলে সুন্নতের শিক্ষা গ্রহণ করা এবং ঈমান-আক্বিদা খাঁটি করে সেই অনুযায়ী আমল করা।

৩/ ওহাবী পুস্তকটি মূর্তিপূজারী কাফেরদের প্রতি নাযিলকৃত আয়াতসমূহ প্রদর্শন করে মন্তব্য করে:

فَالآيَةُ خِطَابٌ لِكُلِّ مَنْ دَعَا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَدْعُوًا، وذَلِكَ الْمُدْعُوْ يَبْتَغِي إِلَىْ اللهِ الْوَسِيْلَةَ وَيَرْجُوْ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُ عَذَابَهُ، فَكُلُّ مَنْ دَعَا مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا مِنْ الأَنْبِيَاءِ وَالْصَالِحِيْنَ سَوَاءً كَانَ بِلَفْظِ الِاسْتِغَاثَةِ أَوْ غَيْرُهَا فَقَدْ تَنَاوَلَتْهُ هَذِهِ الآيَةِ–

"আয়াতগুলো স্পষ্টই প্রতীয়মান করে যে মৃত নবী-ওলীবৃন্দ এবং দূরে অবস্থিত (জীবিত) পুণ্যাত্মাদের কাছে মৌখিকভাবে সাহায্য প্রার্থনাকারী একজন মুশরিক (অংশীবাদী)।" [১]

মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন না যে মধ্যস্থতাকারী বুযূর্গানে দ্বীন নিজেদের ক্ষমতায় সাহায্য (মদদ) ও কর্ম সম্পাদন (তাসাররুফ) করে থাকেন। আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ পাক যেহেতু তাঁদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসেন, সেহেতু তিনি তাঁদের দোয়া কবুল করে নেন এবং তাঁদের ইচ্ছা বাস্তবায়িত করে দেন। ওহাবীরা আয়াতগুলোর অর্থ পরিবর্তন করে মুসলমানদের কুৎসা রটনা করে বেড়াচ্ছে। কোনো মানুষকে পূজা করার অর্থ হচ্ছে তার কথানুযায়ী শরিয়ত অমান্য করা এবং তার কথাকে কুরআন ও সুন্নাহের ওপরে সম্মান করা। কিন্তু শরিয়ত মান্য করতে আদেশকারীকে মান্য করার বেলায় তো তা হতে পারে না। ওহাবীরা এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটি উপলব্ধি করতে পারে না। এ দুটোর মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে তারা।

খাইবারের যুদ্ধে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর চক্ষু-বেদনা দেখা দেয়। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পাক লালা চোখের ওপর রেখে দোয়া করেন। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর চোখ ভাল হয়ে যায় এবং তাতে আর কোনো ব্যথা অবশিষ্ট ছিল না। আল্লাহতা'আলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওসিলায় সুস্থতা দিয়েছিলেন। মূল হাদীস[২]টি এরুপ

[১]. ফাতহুল মাজীদ : ৯৬ ও ১০৪।

[২].বুখারী : আস সহীহ, বাবু দুয়ায়িন নবী ৪/৪৭ হাদীস ২৯৪২।

ক. আন নাসায়ী : আস সুনান আল কুবরা, বাবু ফাদ্বায়িলিল আলী রা. ৭/৩১১ হাদীস ৮০৯৩।

খ.আবূ ইয়ালা : আল মুসনাদ, হাদীসু সা'আল ইব্ন সা'আদ ১৩/৫২২ হাদীস ৭৫২৭।

গ. বায়হাক্বী : সুনান আল কুবরা ৫/১৮০ হাদীস ১৮২৩০।

ঘ. ত্ববরানী : আল মু'জামুল কাবীর ৬/১৫২ হাদীস ৫৮১৮।

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، هُوَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَأَمَرَ بِهِ، فَدُعِيَ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأَ مَكَانَهُ.

ঘটনাটি ওহাবী পুস্তকটির ৯১ নং পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে এবং তাতে বুখারী ও মুসলিম শরিফের উদ্ধৃতিও বিস্তারিতভাবে লেখা আছে।

৪/ ১০৮ নং পৃষ্ঠায় ওহাবীটি বলে,

كَأَصْحَابِ اَلْطُرُقِ اَلْصُوْفِيَةِ، فَإِنَّهُمْ اَلَّذِيْنَ زَيَّنُوْا لِمُرِيْدِيْهِمْ وَمَتْبُوْعِيْهِمْ اَلْشِرْكَ وَاْلكُفْرَ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ. فَإِنَّ أَسَاسَ طُرُقِهِمْ اَلْشَيْطَانِيَّةُ: أَنْ يَعْبُدَ اَلْمُرِيْدُ شَيْخَهُ بِأَنْوَاعِ التَعْظِيْمِ وَاْلخَوْفِ وَاعْتَقَادَ أَنَّهُ جَاسُوْسَ قَلْبِهِ يَدْخُلُ وَيَخْرُجُ وَالْمُرِيْدُ لَا يَشْعُرُ. وَأَنَّهُ قَبْلَ أَنْ يَذْكُرَ اللهَ يَسْتَحْضُرُ الشَيْخُ فِيْ قَلْبِهِ. وَيَعْظُمُوْنَهُمْ بِأَنْوَاعِ الطَاعَةِ العُمَيَاءِ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا- كَمَا هُوَ مَدُوْنٌ فِيْ كُتُبِهِمْ- مِنْ شُرُوْطِ الْمُرِيْدِ وَمَا يَسْمُوْنَهُ العَهْدَ الْوَثِيْقَ. وَتَجِدُ أَكْثَرَ هَذَا الْكُفْرُ وَالضَّلَالُ فِيْ كُتُبِ الشَّعْرَانِيْ. وَأَمَّا آيَاتُ سُوْرَةُ الأَحْقَافِ فَإِنَّهَا صَرِيْحَةً فِيْ أَنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِ الْمُشْرِكِيْنَ: هُمْ مِنْ عِبَادِ اللهِ الصَالِحِيْنَ اَلَّذِيْنَ اَتَّخَذَهُمْ النَّاسَ آلِهَةً بَعْدَ مَوْتِهِمْ واتَّخَذُوْا قُبُوْرَهُمْ أَوْثَانًا، وَمَا كَانُوْا يُحِبُّوْنَ ذَلِكَ وَلَا يَرْضُوْنَ بِهِ؛ مِنْ أَمْثَالِ الْحُسَيْنَ وَإِخْوَتِهِ وَأَبِيْهِ وَأَبْنَائِهِمْ، وَالإِمَامِ الشَّافِعِي فِيْ مِصْرَ، وَأَبِيْ حَنِيْفَةَ وَعَبْدِ القَادِرِ فِيْ بَغْدَادٍ وَنَحْوِهِمْ فَإِنَّهُمْ يَتَبَرَّأُوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ أُوْلَئِكَ الْمُشْرِكِيْنْ-

“তাসাউফের আলেমগণ কুফর ও শির্কে লিপ্ত। মুরিদ (শিষ্য) তার শায়েখকে (পীরকে) পূজা করে। আশ্ শারানীর কিতাবপত্র এই ধরণের কুফরে পরিপূর্ণ। তারা (তাসাউফপন্থীরা) হুসেইন, তার পিতা ও সন্তান-

সন্ততি, আশ্ শাফেয়ী, আবু হানিফা এবং আবদুল কাদির আল্ জিলানীকে দেবতা বানিয়ে তাঁদের মাযার-রওযাকে পূজা করে থাকে।" [১]

লামযহাবী-ওহাবীদের এই ধরণের আক্রমণাত্মক কথাকে সুন্নী ওলামায়ে কেরাম দলিল সহকারে ভ্রান্ত প্রমাণ করেছেন তাঁদের বইপত্রে। হাকিকাত কিতাবেভী[২] (ইস্তাম্বুল) কর্তৃক এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু প্রকাশও করা হয়েছে। পারসিক পুস্তক 'আল উসুল আল আরবায়া ফী তারদিদিল ওয়াহহাবীয়্যা-এর নাম এখানে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বইটির প্রণেতা হযরত খাজা হাসান জান ফারুকী আস্ সিরহিন্দী ইবনে আবদির রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে গোলাম মুহাম্মদ মাসুম আস্ সানী ইবনে মুহাম্মদ ইসমাইল ইবনে মুহাম্মদ সিবগাত-আলাহ ইবনে মুহাম্মদ মাসুম উরওয়াত আল উসাকা ফারুকী সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ-এ-আলফে সানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। গ্রন্থের তৃতীয় খন্ডে তিনি লিখেছেন:

"নজদী বা ওহাবীরা দাবি করে যে অনুপস্থিত (গায়েব) কারও নাম ধরে ডাকা মহাশির্ক। এই প্রসঙ্গে তারা বোঝায় যে, যদি কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কেও হাযের (উপস্থিত) মনে করে ডাকে, তবে সে মুশরিক হয়ে যাবে। লা-মযহাবীদের অন্যতম নেতা আশ্ শওকানী ইয়েমেনী তার 'দুরর-উন-নাদিদ' পুস্তকে লিখেছে, 'কবরকে তাযিম (সম্মান) করা এবং যিয়ারত করে বেসালপ্রাপ্ত জনের সাহায্য প্রার্থনা (ইস্তিগাসাহ) করা কুফর।' আর 'তাত্ হিরুল ই'তিকাদ' গ্রন্থে সে বলে, 'নবী ওলী হোন আর ফেরেশতাই হোন, তাঁরা যদি মৃত কিংবা অনুপস্থিত জীবিত হয়ে থাকেন, তবে তাঁদের প্রতি আহ্বানকারী মুশরিক হয়ে যাবে।' লা-মযহাবীরা এই বিষয়টিতে দুই ধরণের মতামত পেশ করেছে; যদি কেউ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভালোবাসার দরুন 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' বলে, কিন্তু বলার সময় মনে করে না যে তিনি শুনবেন, তবে সে মুশরিক হবে না; যদি সে বিশ্বাস করে যে তিনি শুনবেন, তবে সে কাফের। সালাফ আস্ সালেহীনের এবং মুসলমানদের আমলকে শির্ক জ্ঞানকারী এই সব ফিতনাবাজদেরকে আমরা জিজ্ঞাসা করছি: গায়েব বলতে তোমরা কি বোঝাও? যদি তোমরা বোঝাও যা আমরা দেখি না তাই গায়েব, তাহলে তোমাদের পক্ষে 'এয়া আল্লাহ' বলাও শির্ক হবে। বস্তুতঃ তোমরা ওহাবীরা বিশ্বাসই করো না যে বেহেশতে আল্লাহকে দেখা যাবে। যদি তোমরা বোঝাও গায়েব অর্থ অনস্তিত্ব, তাহলে কীভাবে তোমরা নবী-ওলীগণের রূহ মোবারককে

---

[১]. ফাতহুল মাজীদ : বাবু তাফসীরুত তাওহীদ ও শাহাদাতান লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ১/১০৮।

[২]. www.hakikatkitabevi.com

অস্তিত্ববিহীন বলবে? দ্বিতীয় খন্ডে আমরা প্রমাণ করেছি যে রূহসমূহের অস্তিত্ব আছে। যদি তোমরা বলো, আমরা রূহসমূহের অস্তিত্ব, শ্রবণ ও দর্শন ক্ষমতা এবং সচেতনতায় বিশ্বাস করি, কিন্তু তাদের তাসাররুফ (কাজ করার ক্ষমতা)-এ বিশ্বাস করি না; তবে আল্লাহ তা'আলা সুরা নাযিয়াতের ৫নং আয়াতে তা ভুল প্রমাণ করেছেন; ইরশাদ হয়েছে,

فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا.

–আমি তাদের নামে শপথ করছি যারা কঠিন কাজ (কঠোর পরিশ্রম)করে।[১]

তফসীরকার উলামায়ে কেরাম, উদাহরণস্বরূপ, আল্ বায়দাবী (এবং শায়খযাদার 'শরাহ' এবং 'তাফসীরে আযিযী' এবং 'তাফসীর-এ-রূহুল বয়ান' এবং 'তফসীর-এ-হুসেইনী') লিখেছেন যে আয়াতটি ফেরেশতা ও ওলীগণের রূহের কর্ম সম্পাদন (তাসাররুফ) সম্পর্কে ঘোষণা দেয়। রূহ (আত্মা) কোনো বস্তু নয় এবং তাই ফেরেশতাদের মতোই আল্লাহর অনুমতি ও আদেশপ্রাপ্ত হয়ে সেটা পৃথিবীতে কাজ করে।[২] কুর'আনে কারীমের বহু আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে ফেরেশতাগণ প্রাণ হরণ (জান কবজ) অথবা পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমস্বরূপ কাজ করেন। শয়তান ও জ্বীনরাও সহজেই বহু কাজ করে ফেলে। সুলাইমান নবী (আঃ)-এর প্রতি জ্বীনদের সাহায্য কুরআন মজীদ বর্ণনা করে। উদাহরণস্বরূপ, সূরা সাবার ১৩ নং আয়াত ঘোষণা করে,

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ
اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

............................... ।

'তিনি যা চাইতেন তাই জ্বীনেরা করতো দুর্গ, ছবি, অনুত্তোলনযোগ্য বিশাল হাঁড়ি নির্মাণ করতো তারা। যদিও জ্বীনেরা রূহ এবং ফেরেশতাদের মতো পূর্ণাঙ্গ ও ক্ষমতাশালী নয়, তবু তারাও শক্ত কাজ করতে পারে। এই পৃথিবীতে বহু অদৃশ্য বস্তু আছে যেগুলো মানুষের ক্ষমতাবহির্ভূত কাজ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, বাতাস যা একেবারে হালকা ও অদৃশ্য, কিন্তু যখন তা ঝড়ের আকার ধারণ করে তখন গাছকে সমূলে উৎপাটিত করে এবং গৃহ কিংবা ইমারতকে ধ্বংস করে দেয়।

---

[১]. আল কুর'আন : আন নাযিয়াত, ৭৯/৫।

[২]. তাফসীরু বায়দ্বাবী : ৫/ ২৮২।

ক.তাফসীরু রুহুল বয়ান : ১০/৩১৬।

আমরা বদ নজর ও যাদু অথবা বান-টোনা এবং অনুরূপ বস্তুর শক্তিকে চোখে দেখিনা, কিন্তু এগুলোর মারাত্মক ফলাফল সবারই জানা আছে। যা ঘটে নিঃসন্দেহে তার একমাত্র সংঘটনকারী হচ্ছেন আল্লাহ পাক। কিন্তু যেহেতু এগুলো আল্লাহতা'আলার সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় মাধ্যম বা কারণ বিশেষ, সেহেতু আমরা মনে করি এগুলো সংঘটন করে এবং তা আমরা মুখে বলেও থাকি। যেহেতু 'তারা করে' বলাটা কুফর অথবা শির্ক নয়, সেহেতু 'আউলিয়ার রূহ মোবারক করেন' বলাটা কেন শির্ক হবে? আল্লাহর অনুমতি ও সৃষ্টির মাধ্যমে ওগুলো যে রকম কাজ করে, ঠিক একইভাবে আল্লাহরই অনুমতি ও সৃষ্টির মাধ্যমে আউলিয়ার রূহ মোবারক (অলৌকিক) কর্ম সংঘটন করেন। যদি কেউ বলে যে 'তাঁরা করেন' বলাটা শির্ক হবে, তবে সে বস্তুতঃপক্ষে কুরআনের সঙ্গেই দ্বিমত পোষণ করছে।

"যদি ওহাবীরা দাবি করে যে কুরআনে জ্বিন, বাতাস, যাদু ও শয়তানের প্রভাব বিস্তার করার কথা বর্ণিত হওয়ার দরুণ ওগুলো 'কাজ করে' বলাটা অনুমতিপ্রাপ্ত; কিন্তু যেহেতু আউলিয়ার রূহসমূহ 'অমুক কাজ করে' বলে কুরআনে কোনো বর্ণনা নেই, সেহেতু (তাঁদের) রূহসমূহ থেকে কোনো কিছু প্রার্থনা করা শির্ক, তাহলে আমরা উপরোক্ত সুরা নাযিয়াতের ৫ম আয়াতটি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেবো। আমরা ইতিমধ্যে বর্ণনা করেছি হাদীসে উদ্ধৃত একটা দোয়া সম্পর্কে, যেটা অন্ধত্ব থেকে মুক্তিকামী একজন মুসলমানকে (সাহাবীকে) শেখানো হয়েছিল। মরুভূমিতে একা অবস্থায় পাঠ করা উচিৎ এমন একটি দোয়া এবং হাদীসের আদেশ -'মাযার যিয়ারতকালে বেসালপ্রাপ্তদের সম্ভাষণ জানাও' সম্পর্কেও আমরা আলোকপাত করেছি। তাছাড়া পূববর্তী খন্ডে ওসমান বিন হুনাইফ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত ঘটনাটিও আলোচিত হয়েছে। এই সকল এবং অনুরূপ প্রমাণসমূহ পরিস্ফুট করে যে অনুপস্থিত কারও সাহায্য প্রার্থনা অনুমতিপ্রাপ্ত। কিন্তু ওই সব যিনদিক, যারা ওহাবী ও লা-মযহাবীদের কাছে বিক্রি হয়ে গিয়েছে অথবা যারা তাদের দ্বারা ধোকাপ্রাপ্ত হয়েছে, তারা এই মাশহুর এবং সহিহ্ হাদীসগুলোর ওপর যয়ীফ (দুর্বল) কিংবা মওযু (বানোয়াট)-এর সীল বসাচ্ছে। তারা আহলে সুন্নতের আলেম ও মুতাসওয়ীফদের কথাও শুনছে না। কেননা, ওহাবীরা বলে যে চার মযহাবের যে কোনো একটির তক্বলিদ মানা শির্ক ও কুফর। উদাহরণস্বরূপ, গোলাম আলী কুসুরী তার 'তাহক্বিক-উল-কালাম' গ্রন্থে লিখেছে: 'যারা চার মযহাবের যে কোনো একটির অনুগামী হয় অথবা ক্বাদেরীয়া, নকশবন্দীয়া, চিশতীয়া কিংবা

সোহরাওয়ান্দীয়া তরীক্বাভুক্ত হয়, তারা কাফের ও মুশরিক এবং বিদয়াতী।’ তাহ্কিকুল কালামের উদ্ধৃতি শেষ হলো।[১]”

৫/ ওহাবীটি একটি হাদীস উদ্ধৃত করে:

مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ، وَدَمُهُ

”যারা (মুখে) ’লা-ইলাহা’ বলে এবং আল্লাহ ভিন্ন কারও এবাদত করে না, তাদের জান ও মাল হারাম[২]”; অতঃপর সে মন্তব্য করে,

هَذَا شَأْنُ عِبَادِ الْقُبُوْرِ وَالْمَوْتَى الْيَوْمْ. دَقِّقِ فِيْ أَحْوَالِهِم وَطَبِّقْهَا عَلَى آيَاتِ الْمُشْرِكِيْنِ فِيْ الْقُرْآنِ تَجِدُهُمْ زَادُوَا عَلَى مُشْرِكِيِّ الْجَاهِلِيَّةِ الأَوْلَى-

”কলেমা-এ-তৌহিদ মুখে উচ্চারণ করাটা কারও জান ও মালকে রক্ষা করতে পারে না। যারা মাযার পূজা করে এবং মৃতদের অর্চনা করে তারা এই শ্রেণীভুক্ত। তারা কুরআনে বর্ণিত প্রাক-ইসলামী মুশরিকদের চেয়েও জঘন্য।” [৩]

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ-

“মুশরিকদের যেখানে পাও, কতল কর।[৪]

আয়াতটি পেশ করে ওহাবীরা মুসলমানদের জান ও মাল হরণ করে থাকে। তারা বেকতাশী সম্প্রদায় ও অজ্ঞদের সন্দেহজনক এবং ভুল কথাকে উদ্ধৃত করে তাসাউফ ও মুতাসাওয়ীফদের আক্রমণ করে। বৃক্ষ, পাথর ইত্যাদির পূজারীদের ভর্ৎসনাকারী হাদীসসমূহ প্রদর্শন করে তারা বলে যে, মাযার-রওযার ওপর গুম্বজ নির্মাণ এবং কবর যিয়ারত করা কুফর ও শির্ক। ওহাবীরা দাবি করে যে, বুযুর্গ মুসলমানদের মাযার শরীফকে তবাররুক (আশীর্বাদ) নেবার মাধ্যম মনে করা আল-লাত মূর্তি পূজার মতো-ই ব্যাপার। তারা সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে সত্যকে আক্রমণ করে।

---

[১]. খাজা হাসান জান ফারুকী আস্ সিরহিন্দী : আল উসুল আল আরবায়া, ৩য় খন্ড।
[২]. মুসলিম : আস সহীহ, বাবুল আমরি বি ক্বিতালিন নাসি হাত্তা ইকুল ১/৫৩ হাদীস ২৩।
[৩]. ফাতহুল মাজীদ : বাবু তাফসীরিত তাওহীদ ওয়া শাহাদাতান ১/১১২।
[৪]. আল কুরআন: সূরা আত তাওবা ৯/৫।

পাথর, বৃক্ষ কিংবা অজ্ঞাত কবর থেকে তবাররুক নেয়ার চেষ্টা অবশ্যই পথভ্রষ্টতা। কিন্তু আল্লাহর নেয়ামত লাভের উদ্দেশ্যে নবী-ওলীর মাযার-রওযা মোবারক যিয়ারত করা এবং তাঁদেরকে আল্লাহর নেয়ামত পাবার মাধ্যম মনে করা কখনও এক জিনিস হতে পারে না। তুলনাটাই মারাত্মক অজ্ঞতা ও আহাম্মকী। উপরন্তু, মুসলমানদেরকে এই বিশ্বাসটির জন্যে কাফের ও মুশরিক আখ্যা দেয়া ইসলামের প্রতি শত্রুতার-ই নামান্তর। আমরা আগেই লিখেছি যে উলামা-এ-ইসলাম ওয়াহাবীদের আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্যে বহু কিতাব প্রণয়ন করেছেন। এই সকল ওলামাদের একজন হচ্ছেন ইবনে আবদুল ওয়াহাবের ভাই সুলাইমান বিন আবদুল ওয়াহাব। তিনি তাঁর প্রণীত 'আস্ সাওয়াইকুল্ ইলাহিয়্যাতু ফির রাদ্দী আ'লাল ওয়াহাবীয়্যা' গ্রন্থের ৪৪নং পৃষ্ঠায় লিখেন :

"তোমাদের পথ (ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব ও তার অনুসারীদের পথ) যে গোমরাহীমূলক তা প্রতীয়মানকারী দলিলগুলোর একটি হচ্ছে আল বুখারী ও মুসলিম শরীফের মতো প্রকৃত দুটো হাদীস গ্রন্থ 'সহিহাইন'-এ লিপিবদ্ধ হাদীসটি। হাদীসটির রওয়ায়াতকারী উকবা ইবনে আমির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে আরোহণ করেন। হযরত উকবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর ভাষ্যে তাঁর দেখা এটাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেষবারের মতো মিম্বরে আরোহণ। তিনি ঘোষণা করলেন,

وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا

'আমার বেসালের (খোদার সাথে পরলোকে মিলিত হবার) পরে তোমাদের মুশরিক, অর্থাৎ, মূর্তি পূজারী হওয়া নিয়ে আমি শংকিত নই; আমি আশংকা করি যে তোমরা দুনিয়াবী স্বার্থের জন্যে একে অপরকে হত্যা করবে এবং ফলস্বরূপ পূর্ববর্তী গোত্রগুলোর মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।[১]'

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের ভাগ্যে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত কী কী ঘটবে, তার সব কিছুই ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন। এই হাদীসটি ঘোষণা

[১]. বুখারী : আস্ সহীহ, বাবুস্ সালাতি ফীশ্ শহীদ, ২/৯১, হাদিস নং ১৩৪৪;
ক.মুসলিম : আস্ সহীহ, বাবু ইসবাতিকা হাওযি নাবিয়্যিনা, ৭/৬৭, হাদিস নং ৬১১৬।
খ. আহ্মদ : আল মুসনাদ ৪/ ১৪৮।
গ. ইব্‌ন হিব্বান : আস্ সহীহ, যিকরুল খবরি আল মুদ্বাদি ফি জাহিরিল ৭/৪৭২ হাদীস নং ৩১৯৮।
ঘ. বাগাবী : শরহুস সুন্নাহ, বাবু ফি মারদ্বাতি ওয়া ওফাতিহি ১৪/৪১ হাদীস নং ৩৮২৪।

করে যে তাঁর উম্মত মূর্তি পূজা করবে না এবং এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত। হাদিসটি ওহাবীদের দাবিকে সমূলে উৎপাটিত করেছে। কারণ ওহাবীরা দাবি করে যে উম্মত আল্ মুহাম্মদীয়া মূর্তি পূজা করে থাকে এবং মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ মূর্তির ঘর। তারা আরো বলে যে মাযারের কাছে শাফায়াত প্রার্থনার বিষয়টি যে কুফর, তাতে অবিশ্বাসীরাও কাফের হয়ে যাবে। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলমানগণ আউলিয়ার মাযার শরীফ যিয়ারত করে শাফায়াত প্রার্থনা করেছেন। কোনো ইসলামী আলেমই তাঁদেরকে মুশরিক ফতোওয়া দেননি, বরং মুসলমান হিসেবে গণ্য করেছেন। ওয়াহাবীরা নিজেদের রাজ্য ছাড়া সব মুসলিম রাষ্ট্রকে কাফের মনে করে, অথচ তাদের রাষ্ট্রেও দশ বছর আগে তাদেরই আখ্যায়িত 'মুশরিক'-রা বসবাস করতেন।

"প্রশ্ন: একটি হাদিস্ ঘোষণা করে,

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ

'তোমাদের শিরকে নিপতিত হওয়াকেই আমি সবচেয়ে বেশি ভয় করি।'[১]
এ সম্পর্কে আপনি কী বলবেন?

"উত্তরঃ অন্যান্য হাদিস থেকে এই হাদিসের ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে এটা শির্কে আসগর (ছোট শিরক)-এর দিকে ইঙ্গিত করে। শাদ্দান ইবনে আওস, আবূ হুরায়রা ও মাহমুদ ইবনে লাবিদ থেকে বর্ণিত অনুরূপ হাদিসসমূহ ঘোষণা করে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের দ্বারা সংঘটিত শির্কে আসগরের ব্যাপারে আংশকা করেছিলেন। হাদীসসমূহে ঘোষিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তা সত্যে পরিণত হয়েছে এবং অনেক মুসলমান শির্ক-এ-আসগরে নিপতিত হয়েছেন। তুমি (ইব্‌ন আবদুল ওয়াহ্‌হাব) শির্ক-এ-আকবরের সঙ্গে শির্ক-এ-আসগরকে তালগোল পাকিয়ে মুসলমানদের প্রতি কুফরের দোষারোপ করছ এবং মুসলমানদেরকে কাফের মনে করছ।[২]

আল হাদিক্বা কিতাবের ৪৫১ নং পৃষ্ঠায়- "হে মানব জাতি শির্ক-এ-খফি ( شِرْكِ خَفِيْ)-কে এড়িয়ে চল"-হাদিসটি ব্যাখ্যা করার পর মন্তব্য করা হয় : "এই শ্রেণীর শির্ক হচ্ছে কারণসমূহ (সাবাব) দর্শন করা, কিন্তু আল্লাহ যে সৃষ্টি করেন তা চিন্তা না করা। 'সাবাব'সমূহ কর্ম সংঘটন করে বিশ্বাস করাটা তাদেরকে আল্লাহর সঙ্গে

[১]. বায্যার : আল মুসনাদ, মুসনাদু মুয়ায বিন জাবাল রা. ১/৪০৯।
ক. বাগাবী : শরহুস সুন্নাহ, ১/৯৮৫।
[২]. সুলাইমান ইবনে আব্দিল ওয়াহ্‌হাব : আস্ সাওয়াইক আল্ ইলাহিয়া।

অংশীদার বানানোরই নামান্তর। বস্তুসমূহকে চিন্তায় অথবা দর্শনে আল্লাহর সংগে অংশীদার বানানো শির্ক-এ-জলী (প্রকাশ্য শির্ক)। আর শরিয়ত অথবা যুক্তি অথবা প্রথা কর্তৃক বিবেচিত কারণসমূহ সৃষ্টি করতে সক্ষম বিশ্বাস করাটা শির্ক-এ-খফি (গোপন শিরক)। হযরত আবদুল হক দেহেলবী তাঁর 'আশিয়াত-উল-লোমআত' গ্রন্থের ৫০ পৃষ্ঠায় বলেন, 'মূর্তি পূজা করা শির্ক-এ-আকবর। এই ধরণের শির্ক থেকে কুফরের সৃষ্টি হয়। শির্ক-এ-আসগর হচ্ছে নিফাক (কপটতা) সহকারে ধর্মীয় আচার পালন এবং ভালো কাজ করা । এই ক্ষুদ্র শির্ক ব্যক্তিকে কাফেরে পরিণত করে না। এই দুই প্রকৃতির শির্ক, শির্ক-এ-জলীর অর্ন্তভুক্ত।[১]"

আল হাদিক্বা গ্রন্থ থেকে আমি যে হাদিসটি উদ্ধৃত করেছি তা নবী-ওলীর রূহ মোবারক থেকে সাহায্য প্রার্থনা করাকে শির্ক ঘোষণা দেয় না। এটা বলে যে আল্লাহর সৃষ্টি প্রক্রিয়ার কারণগুলোকে ব্যবহার করার সময় তাদেরকে সৃষ্টিকারী মনে করা শির্ক। অর্থাৎ, মানুষের কাছে কোনো কিছুর জন্যে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে অথবা দৃশ্যমান কিংবা অদৃশ্য কোনো জিনিস ব্যবহার করে তাদেরকে সৃষ্টিকারী মনে করাই হচ্ছে শির্ক। কিন্তু আল্লাহ সৃষ্টি করবেন এই বিশ্বাস রেখে, কারণ বা মাধ্যমসমূহের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করাটা তাদেরকে পূজা করা হতে পারে না। মুসলমানগণ এইভাবেই নবী-ওলীগণের কাছে হাজত-মকসূদ চেয়ে থাকেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে আল্লাহ পাক নবী-ওলীদের ওসিলায় তাদেরকে তাদের আশানুরূপ বস্তু প্রদান করবেন। নবী-ওলীগণ আল্লাহর সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় মাধ্যম বা কারণস্বরূপ। মুসলমানগণ এই মাধ্যমকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরেন। এটা শির্ক তো দূরে থাক, ফিসক্ব-ও নয়। কেননা, আমরা আল্লাহর কাছ থেকেই সমস্ত জিনিস আশা করি। নবী-ওলীগণ জীবিত বা বেসালপ্রাপ্ত হলেও কিছু আসবে যাবে না। এই ধরণের বৈধ সাহায্য প্রার্থনাকে বলা হয় তাওয়াসসুল বা ইস্তিগাসাহ্।

উপরোক্ত শরিয়তসম্মত উপায়ে তাওয়াসসুল পালন করলে তা জায়েয হবে, এমন কি সওয়াবদায়কও হবে। আর যদি শরিয়ত-অসম্মত উপায়ে কেউ কারও তাওয়াসসুল করে, তবে সে হারাম সংঘটনকারী। তাকে সঠিক নিয়ম বাতলে দেয়া জরুরি। কিন্ত তাতে সে মুশরিক হবে না। নফসানীয়াতের পূজাকে ইসলাম শির্ক হিসাবে আখ্যা দেয় না, বরং গুনাহ হিসেবে চিহ্নিত করে। এতে মুসলমানগণ ফাসিক্ব হয়ে থাকেন, কিন্তু কাফের হন না।

৬/ ১৪২ পৃষ্ঠায় ওয়াহাবীটি বলেঃ

---

১. আল হাদিক্বা।

وَإِنَّمَا طَلَبُوْا شَجْرَةً يَأذَنُ لَهُمْ النَّبِيِّ فِيْهَا فَيَتَبَرَّكُوْنَ بِهَا وَيَعْلَّقُوْنَ عَلَيْهَا أَسْلَحَتْهُمْ دُوْنَ أَنْ يَصَلُّوْا أَوْ يَتَصَدَّقُوْا لَهَا، فَبَيَّنَ لَهُمْ أَنْ مَا طَلَبُوْا مِنْ التَبَرُّكِ-

"সাহাবাগণ ও তাঁদের উত্তরাধিকারীগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কারও কাছ থেকে তবাররুক নেয়ার প্রয়াস পান নি। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাস্ সিফাত বা সুনির্দিষ্ট গুণগুলোর অধিকারী আর কেউই হতে পারে না।"[১]

এটাও ওয়াহাবীদের আরেকটা বানোয়াট কাহিনী। বৃষ্টির জন্যে দোয়া প্রার্থনাকালে হযরত উমর ফারুক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আব্বাস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর তাওয়াসসুল করেছিলেন। রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সিফাতসমূহ উলামা-এ-ইসলাম বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। 'আল্ মাওয়হিব আল্ লাদুন্নিয়া'র অনুবাদটি এর উৎকৃষ্ট উদহারণ। এ সকল বইয়ের কোনোটাই তবাররুক নেয়াকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্যে খাস্ লিখে নি। কারও মাধ্যমেই বরকত অর্জন করা যাবে না এ কথাও ওইসব কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই। বরং তারা বলে যে অন্যদের মাধ্যমেও নেয়ামত লাভ করা যায়। আল্লাহর প্রিয় ও মনোনীত নবী-ওলীদের মাযার-রওযা যিয়ারতের সঙ্গে লাত-উযযা মূর্তির পূজাকে তুলনা করাটা কুরআন-হাদীসের কুৎসা রটনারই নামান্তর। একটা হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

"যে ব্যক্তি কুরআনের কুৎসা রটনা করবে, সে অমুসলিম হয়ে যাবে"। ওহাবীরা আয়াতসমূহের বিকৃত অর্থ প্রদান করে মুসলমানদেরকে মুশরিক আখ্যা দিয়ে থাকে। ফলে তারাই কাফেরে রুপান্তরিত হয় দ্বিগুণ মাত্রায়।

৭/ ১২৬ নং পৃষ্ঠায় ওহাবীটি বলে :

وَهَذَا وَغَيْرُهُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ أَصْلَ هَذِهِ الْطُّرُقِ الصُّوْفِيَةِ خِدْعَةٌ مِنْ يُهُوْدِيَّةِ هِنْدِيَّةِ فَارِسِيَّةِ يُوْنَانِيَّةِ. كَادُوْا بِهَا لِلْمُسْلِمِيْنَ فَفَرَّقُوهُمْ شِيَعًا وَأَحْزَابًا-

–এটা পরিস্ফুট যে প্রাথমিক অবস্থায় তাসাউফ হিন্দু-ইহুদীদের দ্বারা পরিকল্পিত হয়। প্রাচীন গ্রীকদের কাছ থেকে এটা গ্রহণ করা হয়েছিল।

[১]. ফাতহুল মাজীদ : ১/ ১৪৩।

এই কারণে মুতাসাওয়ীফগণ বিভক্ত হয়ে যান এবং মুসলমানদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত হতে বাধ্য করেন।[১]

ওয়াহাবী মতবাদের প্রচারক পাকিস্তানের জনৈক লা-মাযহাবী আবুল আ'লা মওদূদীও তার 'ইসলামী রেনেসা আন্দোলন' নামক পুস্তকটিতে একই কথা বলেছে। এই সব কুৎসার জবাব আমি আমার (মওদূদী অধ্যায়) গ্রন্থটিতে বিস্তারিত লিখেছি। এ কথা সত্য যে, আজকাল মুসলিম সমাজে বহু ভন্ড পীর মানুষদের ধোকা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে। কিন্তু তাই বলে মহান সূফী সাধক (মুতাসাওয়ীফ)-দের সাথে এদেরকে মিলিয়ে সবাইকে ভন্ড ফতোওয়া দেয়া যায় না। মুসলমানদের উচিৎ নয় বুযূর্গ আলেমদের কুৎসা রটনা করা। হযরত মুহাম্মদ মা'সুম ফারুকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'মকতুবাত' কিতাবের ২য় খন্ডের ৫৯ চিঠিতে লিখেছেন:

"সকল যাহেরী (প্রকাশ্য) ও বাতেনী (আধ্যাত্মিক) পূর্ণতা হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে অর্জিত হয়েছে। আমাদের আয়েম্মা-এ-মযাহীবের (মাযহাবের ইমামগণ) কিতাবপত্রের মাধ্যমে সমস্ত যাহেরী আদেশ-নিষেধ আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে। আর ক্বলব্ ও রূহের গুপ্ত ইল্‌ম জ্ঞাত হয়েছে তাসাউফের মহান উলামার মাধ্যমে। সহীহ বুখারী শরীফে লেখা আছে যে হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ইরশাদ করেছেন,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وِعَاءَيْنِ ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ

–আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে দুইটি পাত্র পূর্ণ করেছি। একটি সম্পর্কে (সাহাবীদের কাছে) ব্যাখ্যা করেছি; যদি অপরটি প্রকাশ করি, তাহলে তোমরা (সাহাবীবৃন্দ) আমাকে হত্যা করবে'। [২]

সহীহ বুখারী শরীফে আরও লেখা আছে যে যখন হযরত উমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বেসালপ্রাপ্ত হন, তখন তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ বলেন যে, জ্ঞানের নয়-দশমাংশ বিলুপ্ত হয়েছে। সাহাবাদেরকে বিচলিত

---

[১]. ফাতহুল মাজীদ : ১/১২৬।

[২]. বুখারী : আস সহীহ, বাবু হিফজিল ইলমি, ১/৩৫ হাদীস নং ১২০।

ক. আহ্‌মদ : আল মুসনাদ, মুসনাদু আবূ হুরায়রা ১৬/৫২৩।

খ. বায্‌যার : আল মুস্‌নাদ, মুসনাদু আবূ হুরায়রা ১৫/১৬৫ হাদীস নং ৮৫১৭।

দেখে তিনি আরও বলেন যে ফিকাহের এলম নয় বরং আল্লাহকে জানবার জ্ঞানই বিলুপ্ত হয়েছে। তাসাউফের সকল পথ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এসেছে। প্রত্যেক শতাব্দীতেই তাসাউফের মহান আলেমগণ তাঁদের মুরশিদগণের মাধ্যমে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্বলব মোবারক থেকে নিঃসৃত মা'আরিফ (ভেদের জ্ঞান) অর্জন করেছেন। তাসাউফ ইয়াহুদ কিংবা মুতাসাউয়ীফগণ (সূফীবৃন্দ) কর্তৃক সৃষ্ট নয়। তাসাউফের পথে অর্জিত 'ফানা', 'বাক্বা', 'জযবা', 'সুলূক' এবং 'সায়ের-এ-ইলাল্লাহ' সংজ্ঞাগুলো অবশ্যই তাসাউফের মহান নেতাগণ সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। 'নাফাখাত' কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে যে আবু সাঈদুল হাররায-ই সর্বপ্রথম 'ফানা' ও 'বাক্বা' সংজ্ঞা দুটো ব্যবহার করেন। তাসাউফের মা'আরিফ হুজুর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিঃসৃত হয়েছে। এ সকল মা'আরিফের নাম পরবর্তীকালে দেয়া হয়েছে। বহু কিতাবে লেখা আছে যে নবুওয়াত সম্পর্কে জ্ঞাত হবার পূর্বে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্কলবের যিকির করতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবা-এ-কেরামের সময়েও আল্লাহ তা'আলার তাফাক্কুর (গভীর চিন্তা), নাফী (নেতিবাচক) ও ইসবাত (ইতিবাচক) যিকরসমূহের এবং মুরাকাবা (মধ্যস্থতা)-এর অস্তিত্ব ছিল। যদিও উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রুত হয় নি, তবুও তাঁর ঘন ঘন নিরবতা প্রতীয়মান করে যে তাঁর মধ্যে ওই সকল আহ্ওয়াল (হালের বহুবচন) বিরাজমান ছিল। তিনি ইরশাদ করেন, 'সামান্য একটু তাফাক্কুর হাজার বছরের এবাদতের চাইতেও উপকারী।' তাফাক্কুর মানে আজে-বাজে চিন্তা বর্জন করে বাস্তবতার ওপর ধ্যান করা। হযরত খিযির আলাইহিস্ সালাম হযরত আবদুল খালেক-এ-গুজদাওয়ানীকে জানিয়েছেন যে মুতাওয়াসীফদের উচিৎ ঘন ঘন কলেমা-এ-তৌহিদের যিকর করা।

**প্রশ্নঃ** যদি মা'আরিফ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিঃসৃত হয়, তবে তো কোনো পার্থক্য থাকা উচিৎ নয়। পক্ষান্তরে, তাসাউফের বহু তরীকা (পথ) আছে। তাদের প্রত্যেকের আহ্ওয়াল (মা'আরিফ) ভিন্ন ভিন্ন কেন?

**উত্তরঃ** পার্থক্যের কারণ হচ্ছে মানুষের কর্মক্ষমতা এবং তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা। উদাহরণস্বরূপ, একটি ব্যাধির জন্যে একটি বিশেষ ওষুধ থাকলেও রোগী বিশেষে চিকিৎসার তারতম্য ঘটে। এটা অনেকটা ভিন্ন ভিন্ন চিত্র গ্রাহকের তোলা

একই ব্যক্তির ছবির পার্থক্যের মতোই ব্যাপার। প্রত্যেক পূর্ণতাই হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নেয়া হয়েছে। গ্রহণ ক্ষমতা ও পদ্ধতির জন্যে সামান্য কিছু পার্থক্য দেখা দিয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাদেরকেও ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় মা'আরিফ বা গোপনতত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছেন। বস্তুতঃ তিনি হাদীসে ইরশাদ করেন, 'প্রত্যেক ব্যক্তিকে শুধু ততটুকুই জানাবে, যতটুকু সে বুঝতে পারে' (হাদীস)। একদিন তিনি হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে কিছু সূক্ষ্ম জ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছিলেন। এমন সময় হযরত উমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সেখানে তাশরীফ আনেন। আর অমনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাচনভঙ্গি পরিবর্তন করেন। এর পর হযরত উসমান যিন্নুরাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আগমন করলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাচন ভঙ্গি পুনরায় পরিবর্তন করেন। কিছুক্ষণ পর হযরত আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সেখানে তশরীফ আনলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারও তাঁরা বাচনভঙ্গি পরিবর্তন করেন। তিনি তাঁদের গুণ ও প্রকৃতির সাথে সঙ্গতি রেখে ভিন্ন ভিন্নভাবে কথা বলেছিলেন।

"তাসাউফের সকল পথ নিঃসৃত হয়েছে ইমাম জাফর আস্ সাদিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে যিনি জন্মগতভাবে দুই দিক থেকে হুজুর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সংযুক্ত। একটা হচ্ছে পৈতৃক দিক, যেটা হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহুহুল করীম-এর মাধ্যমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে। অপরটা মাতৃকুলের, যেটা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মাধ্যমে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে। যেহেতু তিনি মাতৃকুলের দিক থেকে হযরত আবু বকরের উত্তরসূরী এবং যেহেতু তিনি তাঁর মাধ্যমে হুজুর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ফয়েযপ্রাপ্ত হয়েছেন, সেহেতু হযরত জাফর আস্ সাদিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমাকে দুইটি জীবন দান করেছেন'। ইমাম জাফর আস্ সাদিকের প্রাপ্ত ফায়েয ও মারেফতের এই দুইটি পথ কিন্তু সংমিশ্রিত হয়নি। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে মহান নকশবন্দি মুতাসাওয়ীফদের কাছে এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে অন্যান্য সিলসিলার কাছে হযরত ইমাম জাফর আস্ সাদিকের মাধ্যমে ফয়েয প্রবাহিত হচ্ছে।[১]"

ওয়াহাবীটি তার পুস্তকের ১২২ নং পৃষ্ঠায় লিখেছে,

---

[১]. মাসুম ফারুকী : মকতুবাত, ২য় খণ্ড, ৫৯ নং চিঠি।

لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْتَصْحَبَهُ فِيْ عَوْدَتِهِ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ حِيْنَ أَخَذَ فِيْ طَرِيْقِ الْعَقَبَةِ ٱلَّتِيْ كَانَ الْمُنَافِقُوْنَ كَمَنُوْا عِنْدَهَا؛ لِيُنْفِرُوا رَاحِلَةَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَقَعَ عَنْهَا فَيَمُوْتُ. فَأَطْلَعَهُ اللهُ عَلَىْ مَا بَيَّتُوْا وَأَعْلَمَهُ بِأَسْمَائِهِمْ. فَأَعْلَمَ رَسُوْلُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُذَيْفَةَ بِأَسْمَائِهِمْ إِذْ نَادَاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ حِيْنَ حَاذَاهُمْ. ثُمَّ اسْتَكْتَمْ حُذَيْفَة أَسْمَاءَهُمْ اتِّقَاءَ الْفِتْنَةَ. وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ حُذَيْفَةَ سِرٌّ فِيْ الدِّيْنِ كَمَا يُدَعِيُ الضَّالُوْنَ مِنْ الصُّوْفِيَةِ. لِأَنَّ الإِسْلَامَ عَلَانِيَّةٌ لاَ سِرٌّ فِيْهِ

"নবী-এ-আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হুযায়ফাহ্ ইবনিল ইয়ামানকে তাবুকের যুদ্ধ থেকে ফিরবার পথে মুনাফেক্বদের নামগুলো জানিয়েছিলেন। ফিতনার উদ্ভব হবার ভয়ে হুযায়ফাহ্ কাউকে এসব নাম প্রকাশ করেননি। অতএব, একথা নিশ্চিত যে হুযায়ফার কোনো বাতেনী এলম নেই যা গোমরাহ্ সুফীরা দাবি করে থাকে। কারণ ইসলাম প্রকাশ্য; এর মধ্যে কোন গুপ্ত জ্ঞান নেই।[১]

এই উদ্ধৃতিতে সে দাবি করে যে তাসাউফ ইয়াহুদীদের দ্বারা আবিষ্কৃত। তবে ৩০ নং পৃষ্ঠায় সে বলে–

لَا يَعْرِفُهَا أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ أَمَرَ مُعَاذًا أَنْ يَكْتُمَهَا عَنِ النَّاسِ مَخَافَةَ أَنْ يَتَوَكَّلُوْا عَلَىْ سَعَةِ رَحْمَةِ اللهِ وَيَتْرُكُوْا الْعَمْلَ، فَلَمْ يُخْبِرْ بِهَا إِلَّا عِنْدَ مَوْتِهِ تَأْثِمًا. فَلِذٰلِكَ لَمْ يَعْرِفْهَا أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ فِيْ حَيَاةِ معذ

–হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়ায বিন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে যে এলম জ্ঞাত করেছেন তা অধিকাংশ সাহাবাই জানতেন না। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়াযকে বলেছেন যে কাউকে এটা না জানাতে। অতএব, শুভফল এবং সুবিধার কারণে এলম গোপন করার অনুমতি রয়েছে।[২]

---

[১]. ফাতহুল মাজীদ : ১/১২১।
[২]. ফাতহুল মাজীদ : ১/৩০।

এটা নিশ্চিত যে ওহাবী পুস্তকটির বক্তব্যের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি নেই। পাঁচশ পৃষ্ঠার এই বইটি অনুরূপ অসঙ্গতিপূর্ণ মন্তব্য এবং বক্তব্যে পরিপূর্ণ। শত শত আয়াত ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে ওহাবীটি পাঠকদেরকে ধোকা দিতে সচেষ্ট।

'মকতুবাত' দ্বিতীয় খন্ডের ৬১ তম চিঠিতে হযরত মা'সুম ফারুকী লিখেন:

> "পৃথিবীতে সবচেয়ে মূল্যবান ও উপকারী জিনিস হচ্ছে আল্লাহ পাকের মারেফত অর্জন করা; অর্থাৎ তাঁকে জানা। আল্লাহ তা'আলাকে দুইটি উপায়ে জানা যায়। প্রথম উপায়টিতে কোনো ব্যক্তি আহলে সুন্নতের উলামার বর্ণনার মাধ্যমে তাঁকে জানতে পারে; আর দ্বিতীয়টি তাসাউফপন্থী মহান উলামাকে জানার মাধ্যমে। অধ্যয়ন ও গভীর চিন্তার মাধ্যমে পূর্ববর্তী জ্ঞানটি অর্জন করা যায়। আর দ্বিতীয়টি ক্বলবের কাশফ্ ও শুহুদের (দিব্যদৃষ্টির) মাধ্যমে অর্জিত হয়। প্রথমটি জ্ঞানের (এলম) অন্তর্ভুক্ত, যে জ্ঞান আক্বল তথা বুদ্ধি থেকে নিঃসৃত। প্রথমটিতে মধ্যস্থতাকারী একজন আলেমের অস্তিত্ব থাকে। কিন্তু দ্বিতীয়টিতে আ'রিফের (খোদাকে জানেন এমন দরবেশ) জন্যে মধ্যস্থতার অবসান ঘটে। কারণ কোনো কিছুর আরিফ হওয়ার অর্থ হচ্ছে ওই বস্তুর মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া। নিম্নোক্ত পংক্তির মধ্যে তা প্রতীয়মান হয়:

'ঊর্ধ্বগমন অথবা অধঃগমন তোমাকে নিকটবর্তী করবেনা, হক্বের নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ হচ্ছে অস্তিত্বের অবসান ঘটা।'

"পূর্ববর্তীটি ইলমূল হুসুলী (অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত এবং পরবর্তীটি এলমূল হুযুরী (পরিজ্ঞাত হওয়ার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান)-এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। পূর্ববর্তীটিতে নফস অবাধ্যতা বর্জন করেনি, কিন্তু পরবর্তীটিতে নফসের বিলুপ্তি ঘটেছে এবং হক্বের (খোদার) সঙ্গে তা অবস্থান করছে। পূর্ববর্তীটিতে ঈমান ও এবাদত বাহ্যিক আকারে বিরাজ করছিল, কেননা নফস্ তখনো ঈমানদার হয়নি। একটি হাদীস-এ-কুদসী ঘোষণা করে, 'তোমার নফসের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন হও। সেটা আমার (আল্লাহর) প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন' (হাদীস)। উপরোল্লিখিত অন্তরের ঈমানকে বলা হয় ঈমানুল মাজাযী (রূপক বিশ্বাস) এবং এটা বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা আছে। পরবর্তীটিতে যেহেতু মানবীয় কোনো গুণাগুণ আর অবশিষ্ট থাকে না এবং যেহেতু নফস্ নিজেই বিশ্বাসীতে (ঈমানদার) পরিণত হয়, সেহেতু ঈমান বিলুপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা পায়। তাই এটাকে বলা হয় ঈমানুল হাকিকী (প্রকৃত বা খাঁটি বিশ্বাস)। এই অবস্থায় এবাদত একেবারে খাঁটি, নির্মল। রূপকটি হয়তো বিলুপ্ত হতে পারে, কিন্তু হাক্বিক্বিটি অস্তিত্ববিহীন হবে না এই

প্রকৃত বিশ্বাসটি নিমোক্ত হাদীসে প্রতিভাত হয় 'হে আমার আল্লাহ আমি সেই বিশ্বাস চাই যার শেষপ্রান্তে কুফর নেই'। এবং আরেকটি আয়াতেও প্রতিভাত হয়- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ –'হে বিশ্বাসীরা, আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বিশ্বাস করো'।[১] জ্ঞান এবং ইজতেহাদের উচ্চ পর্যায়ে থাকা সত্ত্বেও এই মারেফত অর্জন করার উদ্দেশ্যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, হযরত বিশর আল হাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর খেদমতে নিজেকে পেশ করেন। যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় কেন তিনি বিশর আল হাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সোহবত/সান্নিধ্য লাভ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, তখন তিনি উত্তর দেন, 'তিনি আল্লাহকে আমার চেয়ে ভাল জানেন'। [হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জন্মসূত্রে নিযার বিন মুয়াযের মাধ্যমে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সম্পর্কিত। তিনি উচ্চস্তরের একজন ফকীহ ও মুহাদ্দীস ছিলেন। তাঁর জন্ম বাগদাদে ১৬৪ হিজরী সালে এবং বেসাল ২৪১ হিজরীতে। 'তাযাকিরাতুল আউলিয়া' গ্রন্থে লেখা আছে যে তিনি হযরত যুন্নুন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং বিশর আল হাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতো মহান মাশায়েখগণের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন।]

"হযরত ইমাম আল্ আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর জীবনের শেষ বছরগুলোতে ইজতেহাদের কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। দুই বছর তিনি হযরত ইমাম জাফর আস্ সাদিকের (রহঃ) সোহবত (সান্নিধ্য) লাভ করেন। যখন তাঁকে এর হেতু জিজ্ঞেস করা হয়, তখন তিনি উত্তর দেন, 'ওই দুই বছর না হলে নু'মান (হযরত ইমাম) নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত'। যদিও উভয় ইমামই (মযহাবের ইমাম) জ্ঞানের ও এবাদতের সর্বোচ্চ পর্যায়ে অবস্থান করছিলেন, তবুও তাঁরা তাসাউফের মহান আলেমদের কাছে গমন করেন এবং মারেফত ও তার ফল 'ঈমানুল হাক্বিকি' অর্জন করেন। ইজতেহাদের চেয়ে কি আর কোনো মূল্যবান ইবাদত ছিল? ইসলাম শিক্ষা ও প্রচারের চেয়ে উত্তম কি আর কোনো আমল ছিল? এগুলো ছেড়ে তাঁরা মহান মুতাসাওয়ীফদের খেদমতকে আঁকড়ে ধরেন; ফলে মারেফত অর্জন করতে সক্ষম হন।

"ঈমানের পর্যায়/স্তর (ডিগ্রী) দিয়েই আমল ও ইবাদতের মূল্য পরিমাপ করা হয়। ইবাদতের ঔজ্জ্বল্য এখলাসের (নিষ্ঠার) পরিমাণের ওপর নির্ভরশীল। ঈমান যতো পূর্ণতা লাভ করবে এবং এখলাস যতো অর্জিত হবে, আমলও ততোই উজ্জ্বল ও মক্বুল (গ্রহণীয়) হয়ে উঠবে। ঈমানের পূর্ণতা ও ইখলাসের সম্পূর্ণতা নির্ভর করে

[১]. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪/১৩৬।

মারেফাতের ওপর। যেহেতু মারেফত ও প্রকৃত বিশ্বাস ফানা এবং 'মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যু'-এর ওপর নির্ভর করে, সেহেতু কোনো ব্যক্তির ঈমানের পূর্ণতা তার ফানার অনুপাতেই হয়ে থাকে। এ কারণেই হাদীসে ঘোষিত হয়েছে যে, হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর ঈমান অন্যান্য মুসলমানের চাইতে উচ্চতর 'আবু বকরের ঈমানকে যদি আমার সমস্ত উম্মতের ঈমানের সঙ্গে পাল্লায় মাপা হয়, তাহলেও তারটা ওজনে ভারি হবে' (হাদীস)। কারণ তিনি ফানার ক্ষেত্রে সকল উম্মতের চেয়ে অগ্রগামী। 'জীবিত মুর্দাকে যে ব্যক্তি দেখতে চায় তাকে অবশ্যই আবু কুহাফার পুত্রকে (হযরত আবু বকর) দেখতে হবে'-হাদীসটি আমাদের কথাকে সমর্থন দেয়। বস্তুতঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সকল সাহাবীই ফানা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হাদীসে পছন্দকৃত হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর ফানা পরিস্ফুট করে যে তাঁর ফানার পর্যায় অতি উচ্চে ছিল।[১]"

মকতুবাত দ্বিতীয় খন্ডের ১০৬ নং চিঠিতে হযরত মাসুম ফারুকী ঘোষণা করেন: "সুন্দর কলেমা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্' অধিক সংখ্যকবার পাঠ করবে এই যিকির কৃলব দ্বারা পালন করবে যতো বার পারো ততোবার এটা পড়বে এই নেয়ামতপূর্ণ বাক্যটি অন্তরকে পরিস্কার করার জন্যে বিশেষ উপকারী। এই সুন্দর কলেমার অর্ধাংশ পাঠ করার সাথে সাথে আল্লাহ ছাড়া বাকি সব কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আর অবশিষ্টাংশ পাঠ করা মাত্রই প্রকৃত মা'বুদের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়; এবং সায়ের ও সুলুক, অর্থাৎ তাসাউফের পথে অগ্রসর হওয়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে উপরোক্ত দুটো অবস্থাকে অর্জন করা। একটি হাদীসে ঘোষিত হয়েছে: 'সবচেয়ে মূল্যবান কলেমা হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। বেশি মানুষের সোহবতে থাকবে না। নিঃসঙ্গতা পছন্দ করবে অধিক এবাদত করবে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নতকে শক্তভাবে ধরবে বিদয়াত ও বিদয়াতীকে এড়িয়ে চলবে সালেহ (পুণ্যবান) বান্দাদের একজন ঘোষণা করেছেন: 'ভাল এবং বদকার উভয়ই ভাল কাজ করতে সক্ষম, কিন্তু একমাত্র সিদ্দিক (সত্যনিষ্ঠ বুযূর্গ)-গণই খারাপ জিনিস থেকে দূরে সরে থাকতে সক্ষম।

"তুমি প্রশ্ন করেছ যে তাসাউফের পথিকের জন্যে হালাল উপায়ে অর্জিত দামী পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করা খারাপ কিনা। যাঁর হৃদয় ফানা অর্জন করার ফলে কোনো কিছুতে আগ্রহী নয়, তাঁর হাত কিংবা দেহের সঙ্গে সংযুক্ত কোনো বস্তুই তাঁর অন্তরকে যিকর থেকে ফিরিয়ে রাখে না। তাঁর অন্তর দেহের অন্যান্য অংগের

---

[১]. মাসুম ফারুকী : মকতুবাত ২য় খন্ড, ৬১ চিঠি।

সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না, এমন কি তাঁর ঘুমও তাঁর অন্তরের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না। ফানার পর্যায় পর্যন্ত পৌছুতে পারে নি এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কিন্তু একই রকম অবস্থা হবে না। আর তার দৃশ্যমান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্তরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তবে এ কথা বলা যাবে না যে তার দ্বারা নতুন ও দামী কাপড় পরিধান করাটা তার ক্বলবের কাজের জন্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। দ্বীনের মহান ইমামগণ, আহলে বায়তের ইমামগণ, হযরত ইমাম আল আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং হযরত গাউসুল আযম বড় পীর সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সবাই দামী কাপড় পরতেন। 'খাযানাতুর রিওয়ায়া' ও 'মাতালিব আল মুমিনীন' এবং 'দাহিরা' কিতাবসমূহ বর্ণনা করে যে, রাসূল-এ-করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাজার রৌপ্য দিরহাম মূল্যের একটা জুব্বা (লম্বা কোর্তা) পরিধান করতেন। চার হাজার দিরহাম মূল্যের জুব্বা পরিহিত অবস্থায় তাঁকে একবার সালাত আদায় করতে দেখা গিয়েছিল।[১] আল ইমাম আল আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর শিষ্যদেরকে উপদেশ দিতেন নতুন এবং দামী বস্ত্র পরিধান করতে। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে খাওয়া, পান করা এবং বস্ত্র পরিধানের ব্যাপারে নতুন নতুন পরিবর্তন সম্পর্কে তাঁর মতামত কী। তিনি বলেন, যদি তা হালাল অর্থ দ্বারা করা হয় এবং প্রদর্শনোদ্দেশ্যে অথবা নিফাক (কপটতা) সহকারে করা না হয়, তবে তা হবে আল্লাহর দানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরই মাধ্যমবিশেষ।

"আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোনো বস্তুর প্রতি ভালোবাসা দুই প্রকার। প্রথমটি হচ্ছে ক্বলব ও দেহের মাধ্যমে ভালোবাসা এবং কামনা করা। এটা অজ্ঞদের ভালোবাসা। এ ধরনের ভালোবাসা থেকে ক্বলবকে মুক্ত করবার জন্যেই কোনো ব্যক্তি তাসাউফের পথে প্রাণপণ সাধনা চালিয়ে যান। ফলে একমাত্র আল্লাহর প্রতি প্রেমই ক্বলবে অবশিষ্ট থাকে এবং ওই ব্যক্তি শির্ক-এ-খফি (গুপ্ত শির্ক) থেকে মুক্তি পান। এর ফলে পরিদৃষ্ট হয় যে, কোনো ব্যক্তিকে শির্ক-এ-খফি থেকে মুক্ত করার জন্যে তাসাউফ অপরিহার্য। এটা সেই ঈমান অর্জনের মাধ্যম, যেটা আয়াতে ঘোষিত হয়েছে: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا 'হে বিশ্বাসীরা! ঈমান আনো'[২] সূরা আন'আমের ১২০ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ '(অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিংবা কলব) দ্বারা সংঘটিত প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য গুনাহসমূহ পরিহার করো'[৩]; খোদায়ী এ

[১]. খাযানাতুর রিওয়ায়া ক .মাতালিব আল মুমিনীন খ. দাহিরা।
[২]. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪/১৩৬।
[৩]. আল কুরআন : সূরা আন'আম, ৬/১২০।

পরিস্ফুট করে যে আল্লাহ ছাড়া অন্য সব বস্তুর মোহ থেকে কলবকে মুক্ত করা জরুরি। আল্লাহ্ ছাড়া কি কোনো শুভফল আশা করা যায়? আল্লাহর দৃষ্টিতে তাঁকে ছেড়ে অন্য বস্তুর মোহাচ্ছন্ন ক্বলবের কোনো মূল্য বা গুরুত্বই নেই।

"দ্বিতীয় প্রকারের ভালোবাসা হচ্ছে সেটা, যা'তে শুধুমাত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভালোবাসা কিংবা কামনাই জড়িত। ক্বলব ও রূহ্ আল্লাহ তা'আলার প্রতি নিষ্ঠাবান হয়ে তাঁকে ছাড়া আর কাউকেই চেনে না। ওই ধরনের ভালোবাসাকে বলা হয় 'মাইল ত্ববী-ই' (সহজাত)। এটা শুধু দেহের সঙ্গে যুক্ত। এটা অন্তর কিংবা আত্মাকে কলুষিত করে না। দেহের শক্তি ও পদার্থের চাহিদা থেকে এর উদ্ভব হয়। যাঁরা ফানা এবং বাক্বা অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যেও সৃষ্টির প্রতি এই ভালোবাসাটি বিদ্যমান। বস্তুতঃ তাঁদের সকলের মধ্যেই এটা বিরাজমান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠান্ডা ও মিষ্টি শরবত পছন্দ করতেন। 'তোমাদের পৃথিবীর তিনটা জিনিসকে পছন্দ করতে আমাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে'- হাদীসটা সর্বজনবিদিত। 'শামাইল' কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ আছে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আল বুন্দুল ইয়ামানী' নামক সুতা ও রেশমের তৈরি বস্ত্র পছন্দ করতেন।

"যখন নফস 'ফানা' (লয়) দ্বারা সম্মানিত হয় এবং 'ইতমিনান' (প্রশান্তি) অর্জন করে, তখন সেটা পাঁচ লতিফা, অর্থাৎ, ক্বলব (অন্তর), রূহ্ (আত্মা), সীরর (রহস্য), খফি (গোপন) এবং আখফা (অত্যন্ত গোপন) ইত্যাদির অনুরূপ হয়ে যায়। আর এ পর্যায়ে শুধুমাত্র দেহের পদার্থসমূহের এবং দেহের উষ্ণ ও চলমান শক্তির বিরুদ্ধেই জ্বিহাদ সংঘটিত হয়। একটা হাদীস ইরশাদ করেন, 'ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে যা উপলব্ধি করা হয় তা পরিষ্কার ক্বলব ও নফসসমূহকে ক্ষতিগ্রস্ত করে'। তাহলে অন্যান্য মানুষের ওপর এর প্রভাব যথাযথভাবে অনুমান করা যায়।

"তুমি প্রশ্ন করেছ যে নিম্মোক্ত শ্রেণীর লোকদের পেশকৃত খাদ্য গ্রহণ করা অথবা তাদের গৃহে গমন করা জায়েয (অনুমতিপ্রাপ্ত) কিনা যথা- বিদয়াতী, ঘুষখোর, প্রতারক, ফাসিক্ব (পাপী)। খাদ্য গ্রহণ না করা এবং গৃহে গমন না করাই উত্তম। বস্তুতঃ তাসাউফের পথে বিচরণকারীদের জন্যে তাদেরকে এড়িয়ে চলা অত্যাবশ্যক; তবে জরুরি প্রয়োজনের সময় অনুমতি আছে। হারাম হিসেবে জ্ঞাত জিনিস খাওয়া হারাম। আর হালাল হিসেবে জ্ঞাত জিনিস খাওয়া হালাল (বৈধ)। যদি হালাল বা হারাম হওয়া সম্পর্কে জানা না থাকে, তবে না খাওয়াই উত্তম।

**প্রশ্ন:** তাসাউফ কি বিদয়াত? এটা কি ইহুদীদের দ্বারা আবিষ্কৃত?

**উত্তর:** শরীয়তের আদেশগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে আল্লাহতা'আলাকে জানবার চেষ্টা করা; আর এই উদ্দেশ্যে তাসাউফের পথ সম্পর্কে জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ এবং তাসাউফ শিক্ষাদানকারী মুর্শিদ আল্-কামিলের খোঁজ ও আনুগত্য (মান্য) করা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান– وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ 'আমার সান্নিধ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ওসীলার সন্ধান কর।[১]' রাসূল-এ-করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় থেকেই মুর্শিদ হতে শিষ্যের (মুরীদের) ফায়েয ও মারেফত জ্ঞান লাভ করার প্রথাটা চলে আসছে, আর তখন থেকেই প্রত্যেক মুসলমান এটা জানেন। এটা এমন কোনো নতুন কিছু নয়, যা পরবর্তীকালে তাসাউফপন্থী ইমামগণ পরিবেশন করেছেন। প্রত্যেক মুর্শিদই তাঁর নিজের মুর্শিদকে আঁকড়ে ধরেছেন। এই সংযোজনের শৃংখল (সিলসিলা) হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত ফেরত গিয়েছে। নকশবন্দীয়া তরীকার গুরুজনদের সংযোজনের শৃংখল হযরত আবু বকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাধ্যমে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছেছে। আর অন্যান্য তরীকার সিলসিলা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মাধ্যমে পৌঁছেছে। এটাকে কি বিদয়াত আখ্যা দেয়া যায়? যদিও 'মুর্শিদ' ও 'মুরিদ' সংজ্ঞাগুলো পরবর্তীকালে পরিবেশন করা হয়েছে, তবুও নাম অথবা কথাসমূহ কোনো বিশেষ গুরুত্ব বহন করে না। যদি এ সব কথার অস্তিত্ব তখন নাও থাকতো, তবুও তাদের অর্থ এবং হৃদয়ের সংশ্লিষ্টতা বর্তমান ছিল। তাসাউফের সকল তরীক্বার সার্বিক মূল দায়িত্ব হচ্ছে যিকর সম্পাদনের পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া, যা শরিয়তেরই একটা আদেশ বিশেষ। উচ্চস্বরে যিকির পালন করার চেয়ে নীরবে পালন করার মূল্য বেশি। একটি হাদীস ঘোষণা করে: 'হাফাযা ফেরেশতাগণ যে যিকর শুনতে পান, তার থেকে যেটা তাঁরা শুনতে পান না, সেটার মূল্য সত্তর গুণ বেশি' (হাদীস)। হাদীসে প্রশংসিত যিকরটি হচ্ছে ক্বলব ও অন্যান্য লতিফা দ্বারা সম্পাদিত যিকর। মূল্যবান কিতাবসমুহে লেখা আছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তপ্রাপ্তির আগে ক্বলব দ্বারা যিকর করতেন।

"তাসাউফকে বিদয়াত ও ইহুদীদের দ্বারা আবিষ্কৃত বলাটা আল বুখারীর হাদীস গ্রন্থ অথবা ফিক্বাহর কিতাব 'আল হিদায়া' পাঠ করাকে বিদয়াত বলার মতোই ব্যাপার।[২]"

---

[১]. আল কুরআন : সূরা মায়েদা, ৫/৩৫।
[২]. মাসুম ফারুকী : মকতুবাত ২য় খন্ড, ১০৬ নং চিঠি।

মকতুবাত দ্বিতীয় খন্ডের ১১০ নং চিঠিতে মাসুম ফারুকী তাসাউফ ও তার পথিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা দেন। তিনি লিখেছেন: "বিদআত সংঘটনকারীদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকবে এবং তাদের থেকেও, যারা চার মযহারেব কোনো একটির অন্তর্গত নয়। হযরত ইয়াহ্ইয়া মুয়ায রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তিন ধরনের লোক থেকে দূরত্ব বজায় রাখার পরামর্শ দিয়েছেন: ১। গাফেল (বে-খবর) আলেম, ২। মিথ্যাবাদী ও পদলেহী (তেলাওয়াতকারী) এবং ৩। তাসাউফের অজ্ঞ ব্যক্তি। যে ব্যক্তি শাইখ অথবা মুরশিদ হিসেবে আখ্যায়িত, সে যদি রসূল-এ-করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নতের অমান্যকারী হয় এবং শরিয়ত না মেনে চলে, তাহলে তার থেকে তুমি সাবধান হয়ে দূরে সরে থাকো সে যে নগরীতে বসবাস করে তাতে অবস্থান করবে না; একদিন হয়তো তুমি তার সম্মুখীন হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ওই ধরনের ব্যক্তি পকেটমারের মতোই। সে শয়তানের দ্বারা নিযুক্ত মুসলমানদেরকে প্রতারিত করার ফাঁদ বিশেষ। যদি সে অলৌকিক কর্ম সংঘটন করতে পারেও এবং দুনিয়ার প্রতি মোহাচ্ছন্ন নাও হয়, তবুও তার কাছ থেকে পালাবে, যেমনিভাবে একটি সিংহের কাছ থেকে পালাতে হয়। তাসাউফের গুরুদের মধ্যে অন্যতম হযরত জুনাইদ আল্ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ঘোষণা করেছেন যে, একমাত্র সেই সকল তাসাউফের পথই মানুষকে পূর্ণতা অর্জন করতে সাহায্য করে যেগুলো নিষ্ঠার সঙ্গে রাসূল-এ-করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাংক অনুসরণ করে; আর বাকিগুলো হচ্ছে অন্ধকার গলিপথের মত। তিনি আরও ঘোষণা করেছেন যে, কুরআন কর্তৃক নির্ধারিত সীমা যে ব্যক্তি লংঘন করে এবং যে ব্যক্তি হাদীসসমূহ চেনে না, সে মুরশিদ হতে পারে না। কেননা, তাসাউফের পথ আল্লাহর কুরআন ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাসাউফের মহান ইমামগণ হচ্ছেন সেই সকল উলামা যারা শরীয়ত মান্য করে চলেছিলেন (তাঁদের জীবনে)। তাঁরা হুজুর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওয়ারিশ। তাঁরা তাঁকে তাঁদের সকল কথা, আমল ও স্বভাবে মান্য করেছিলেন। ইয়া আল্লাহ্ আপনি আমাদেরকে সেই সকল মহান ইমামের মাধ্যমে ফয়েয ও নেয়ামত দান করুন, আমিন । আমি (মাসুম ফারুকী) সব সময়ই বলি এবং তোমাকে আবারও বলছি, যে ব্যক্তি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তাবেদারীতে শৈথিল্য প্রদর্শন করে এবং তাঁর মর্যাদাপূর্ণ সুন্নত পরিত্যাগ করে, সে কখনও সূফী হতে পারে না। তাকে আল্লাহ-ওয়ালা মনে করবে না তার অলৌকিক ক্ষমতা ও দুনিয়াবী বস্তুর প্রতি বাহ্যিক অনাসক্ত মনোভাব দেখে ভুল বুঝবে না। যুহদ (কৃচ্ছ্রব্রত), তাওয়াক্কুল (খোদার ওপর ভরসা) ও মারেফত (ভেদের জ্ঞান) সম্পর্কে

তার কথাকে বিশ্বাস করবে না। কারণ বাতিল (পথভ্রষ্ট) ইহুদী, খ্রিষ্টান, হিন্দু-বৌদ্ধ এবং ব্রাক্ষণ সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরাও মুসলমানদের মাহাত্ম্যের মতো মাহাত্ম্য প্রদর্শন করতে পারে। হযরত আবু আমর ইবনে নাজিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইরশাদ ফরমান যে, শরিয়তের জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় এমন হালসমূহ উপকারী নয়, বরং ক্ষতিকর যদিও সেগুলো অতি সুন্দর ও চমকপ্রদ হয়। আর যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তাসাউফ অর্থ কী? তখন তিনি উত্তর দেন যে, শরিয়তের আদেশ-নিষেধ পালন করাই হচ্ছে তাসাউফ।

"তাসাউফের সারমর্ম হচ্ছে শরিয়তকে মান্য করা। মানুষকে শেষ বিচারের দিনে যে জিনিসটা রক্ষা করবে তা হচ্ছে নিষ্ঠার সঙ্গে হুযুর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাংক অনুসরণ। সঠিক পথের অনুসারী ও বাতিল (ভ্রান্ত) পথের অনুসারীদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ক চিহ্ন হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তাবেদারী। তাঁর (আদর্শের) সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ যুহদ (কৃচ্ছ্রব্রত) অথবা পার্থিব অনাসক্তি সম্পূর্ণ নিষ্ফল। তাঁর মধ্যস্থতাবিহীন যিকির, তাফাক্কুর (ধ্যান), আবেগ-উচ্ছ্বাস এবং স্বাদ মানুষকে শূন্য এনে দেয়। শুধু ক্ষুধা ও নফস্ দমনের মাধ্যমেও চমকপ্রদ এবং অত্যাশ্চর্য জিনিস (খাওয়ারিক) করা যায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলাকে জানার সঙ্গে সেগুলোর কোনো সম্পর্কই নেই। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: 'যে ব্যক্তি আদব (শিষ্টাচার) ও মুস্তাহাব (প্রশংসনীয় আমল) পালনে তৎপর নয়, সে সুন্নত পালনে অক্ষম, এবং যে ব্যক্তি সুন্নত পালনে শিথিল, সে ফরয পালনে অক্ষম; এবং যে ব্যক্তি ফরয পালনে শিথিল, সে আল্লাহকে জানা থেকে বঞ্চিত।' এ কারণেই হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 'ফিসক্ব (পাপ) সংঘটন কোনো ব্যক্তিকে কুফরের দিকে পরিচালিত করে' (হাদীস)। যখন হযরত শায়খ আবু সাইদ আবুল খায়েরকে বলা হলো যে, অমুক লোক পানিতে হাঁটতে সক্ষম, তখন তিনি বল্লেন যে, ব্যাঙও পানিতে ভাসতে সক্ষম। তাঁকে আবার যখন বলা হলো, অমুক লোক আকাশে উড়তে সক্ষম, তখন তিনি মন্তব্য করলেন, কাক এবং মাছিও আকাশে উড়তে সক্ষম। আর তাঁকে যখন বলা হলো, অমুক মুহূর্তের মধ্যে এক শহর থেকে অন্য শহরে গমন করতে পারে, তখন তিনি বললেন, 'শয়তানও মুহূর্তে পূর্ব থেকে পশ্চিমে ভ্রমণ করতে সক্ষম। আমাদের ধর্মে ওই ধরনের জিনিসের কোনো মূল্যই নেই। মানুষের মাঝে বসবাস করে বাজার ও বিয়ে করার মতো কর্ম সম্পাদন করে আল্লাহকে এক মুহূর্তের জন্যেও না ভোলার মতো মূল্যবান জিনিস আর নেই।' হযরত আবু আলী রদবারীকে জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যে ব্যক্তিটি বলেছিল, 'আমি তাসাউফের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছি এবং তাই

আমার জন্যে সব কিছুই হালাল হয়ে গিয়েছে, আর পাপ-পঙ্কিলতা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।' হযরত আবু আলী রদবারী উত্তরে বলেন: 'হ্যাঁ, সে অর্জন করেছে; তবে সে জাহান্নাম অর্জন করেছে।' হযরত আবু সুলাইমান আদ্ দারানী বলেন: 'আমি অহরহ আমার হৃদয়ে কিছু জ্ঞানকে উদিত হতে দেখি। আমি সেগুলো গ্রহণ করি না দুটো সাক্ষী আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত ব্যতিরেকে।' একটি হাদীস ঘোষণা করে: **'বিদয়াতী (ধর্মে নতুন প্রথা প্রবর্তক)-রা দোযখবাসীদের কুকুর হবে।'** আরেকটি হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে: 'শয়তান বিদয়াতীকে এবাদত করতে সহায়তা করে এবং তার মধ্যে আল্লাহ্ ভীতির অনুভূতি জাগ্রত করে। এটা বিদয়াতীকে যথেষ্ট কাঁদায়।' আবার আরেকটি হাদীসে ইরশাদ করে: 'বিদয়াতীর রোযা, সালাত, হজ্ব, উমরাহ, জ্বিহাদ, ফরয ও নফল এবাদত আল্লাহ পাক গ্রহণ করেন না। ওই ধরনের ব্যক্তি সহজেই ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়' (হাদীস)। 'গ্রহণ করেন না'-এর অর্থ, 'শর্তসমূহ পূর্ণ হলেও তাতে কোনো সওয়াব অথবা লাভ নিহিত নেই।' শায়েখ ইবনে আবি বকর তাঁর 'মা'আরিজুল হিদায়া' গ্রন্থে লিখেছেন, 'সঠিককে জানতে শেখো এবং সঠিক হও। মানুষের সততা, পূর্ণতা ও মর্যাদা সবই তাদের দ্বারা তাদের প্রত্যেকটি কাজে, চিন্তায়, প্রথায় এবং এবাদতে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর তাবেদারী করার ওপরই নির্ভরশীল। কেননা, সকল ধরনের সুখ-শান্তি একমাত্র তাঁর সুন্নাতকে অনুসরণ করেই অর্জন করা সম্ভব। অর্থাৎ, তাঁর আদেশ-নিষেধ মান্য করতে হবে। সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অন্তর এবং নফসকে তাঁর শরিয়তের প্রতি নিবেদিত হতে হবে। আর এটা যিকর পালন, কুরআন তেলাওয়াত ও উত্তম স্বভাব দ্বারা ক্বলবকে নূরানী (আলোক/জ্যোতির্ময়) করার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব।[১]'

"গুণাহ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের তওবা করা উচিৎ। জনসমক্ষে সংঘটিত গুণাহের তওবা জনসমক্ষে করতে হবে। আর গোপনে সংঘটিত গুণাহের তওবা গোপনে করতে হবে। তওবাকে স্থগিত রাখা উচিৎ নয়। কিরামান কাতেবীন ফেরেশতাগণ গুণাহ সংঘটনের পর তিন ঘন্টা যাবত তা নথিভুক্ত করেন না; এই সময়ের ভেতর যদি গুণাহকারী তওবা করে তবে তাঁরা আর সেই গুণাহটি নথিভুক্ত করেন না। কিন্তু যদি তওবা না করা হয়, তাহলে তাঁরা তা লিপিবদ্ধ করেন। হযরত জাফর ইবনে সিনান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'তওবা স্থগিত রাখা নিজেই একটা গুণাহ বিশেষ। এটা সংঘটিত গুণাহর চেয়েও বড় গুণাহ।' যদি

---

১. মা আরিজুল হিদায়া।

কেউ গুনাহ করে সঙ্গে সঙ্গে তওবা না করে, তবে মৃত্যুর আগে সম্ভাব্য যে কোনো সময়ে তা সমাপ্ত করা উচিত। আল্লাহর কাছে তওবা সব সময়ই গ্রহণীয়। একটা হাদীসে ঘোষিত হয়েছে: 'আল্লাহ্ তা'আলা দিনে সংঘটিত গুণাহের তওবা রাতে কৃত হতে দেখতে চান' (হাদীস)। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিৎ 'ওয়ারা' ও 'তাকওয়া'-কে আঁকড়ে ধরা এবং হারাম ও মুতাশাবিহাত (সন্দেহজনক বস্তু)-কে এড়িয়ে চলা। ফরয পালনের চাইতে হারামকে এড়িয়ে চলার উপকারিতা তাসাউফের পথে অনেক বেশি। আমাদের একজন প্রখ্যাত গুরুজন বলেছেন, 'খারাপরাও' ভালোদের মতো উপকার করতে সক্ষম। কিন্তু শুধুমাত্র সিদ্দিক (সত্যনিষ্ঠ বুযূর্গ)-গণই পাপ এড়িয়ে চলতে পারেন।' হযরত মারূফ আল কারখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন: 'যে সব বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করা হারাম সেগুলোর দিকে তাকানো থেকে সাবধান হও।' একটি হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: 'পুনরুত্থান দিবসে যুহদ ও ওয়ারা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গই আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও নেয়ামত অর্জন করতে পারবে'। আরেকটি হাদীস ইরশাদ ফরমায়: 'গুণাহ বর্জনকারী ব্যক্তির সালাত (নামায) মক্ববুল (গ্রহণীয়)। ওয়ারাসম্পন্ন ব্যক্তির সোহবত (সাহচর্য) লাভ করা এবাদতের মতো (সওয়াবদায়ক)। তার সঙ্গে কথা বলা সাদকা প্রদানের মতো' (হাদীস) [হাদীসটি পরিস্ফুট করে যে ওয়ারাসম্পন্ন মুর্শিদ আল কামেল ওয়াল মোকাম্মেলের সান্নিধ্য আল্লাহরই এবাদত বৈ কিছু নয়; ইশিক]।

"প্রত্যেকের উচিত নিজের আমল ও হালগুলোকে ত্রুটিপূর্ণ বিবেচনা করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা। জাফর ইবনে সিনান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, এবাদতকারীদেরকে পাপিষ্ঠদের থেকে বড় মনে করাটা ফাসিকদের (পাপীদের) ফিসকগুলোর চেয়েও বড় ফিস্ক'। হযরত মুহাম্মদ সুরতাইশকে রাস্তায় দেখতে পেয়ে লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করে কী কারণে তিনি এ'তেকাফ বর্জন করলেন। তিনি উত্তর দেন: 'ক্বারীদেরকে রিয়া (প্রদর্শন) করতে দেখে আমি সেখান থেকে চলে আসি।'

"প্রত্যেক ব্যক্তির স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণ-পোষণের জন্যে একটি কর্মসংস্থান থাকা উচিৎ। চাকরি থাকাটা তাসাউফের পথে অগ্রসর হতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে না। তাসাউফের মহান ইমামগণও ব্যবসা ও প্রকৌশলের কাজ করেছেন। কাজ করে অর্জন করার সওয়াব বর্ণনাকারী বহু হাদীস রয়েছে। তাওয়াক্কুল (আল্লাহ ওপর ভরসা/আস্থা) নিঃসন্দেহে একটি উত্তম গুণ; কিন্তু যারা তাওয়াক্কুল চর্চা করেন তাদের উচিত নয় অন্যদের উপার্জনের ওপর জীবিকা নির্বাহ করা। হযরত মুহাম্মদ ইবনে সালিমকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আমরা কি কাজ করে উপার্জন করবো, নাকি এ দুনিয়ার বিষয়ে তাওয়াক্কুল করবো এবং আখেরাতের জন্যে এবাদত করবো?'

তিনি উত্তর দিলেন: 'তাওয়াক্কুল রাসূল-এ-করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাল ছিল। আর কাজ করে উপার্জন ছিল তাঁর পবিত্র সুন্নত।' যারা তাওয়াক্কুলের শর্তসমূহ পূরণ করতে অক্ষম, তাদের উচিত কাজ করা। হযরত মুহাম্মদ মানাযিল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে, কাজ না করে তাওয়াক্কুল করার চাইতে কাজ করে তাওয়াক্কুল করাই উত্তম। প্রত্যেকের উচিত আহার কার্যে সংযত হওয়া। হযরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দ আল বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, 'ভালো খাও এবং ভালোভাবে কাজ করো।' সংক্ষেপে, যতোটুকু পরিমাণ খাদ্য এবাদতে সাহায্য করে তা (খাওয়া) ভালো, আর যতোটুকু পরিমাণ ক্ষতি করে তা হারাম (নিষিদ্ধ)।

"প্রতেক্যের উচিত নিজের কৃত কর্মগুলোর ক্ষেত্রে উত্তম নিয়্যত মনের মধ্যে পোষণ করা এবং উত্তম নিয়্যত না হওয়া পর্যন্ত কোনো কাজ সংঘটন না করা। বেশি লোকের সঙ্গে কোনো ব্যক্তির সম্পর্ক না রাখা উচিত এবং কথাও অতিরিক্ত না বলা উচিত। একটি হাদীস ঘোষণা করে: 'হিকমত (উপকারী বস্তু) দশটি অংশ দ্বারা গঠিত। এর মধ্যে নয়টি হচ্ছে উযলাত (নিঃসঙ্গতা)। আর বাকিটি হচ্ছে নীরবতা' (হাদীস)। প্রত্যেকের উচিত মানুষের সঙ্গে অল্প সময় ব্যয় করা এবং বাকি সময় যিকির ও মুরাকাবা (মধ্যস্থতা)-তে ব্যয় করা। সোহবত (সান্নিধ্য) মূল্যবান হবে যদি তা কোনো ব্যক্তির এবং অন্যান্যদের জন্যে উপকারী হয়। বে-দরকারি এবং মূল্যহীন কথাবার্তা যদি না বলা হয়, তাহলেও তা উপকারী হবে। প্রত্যেকের উচিত বিদয়াত সংঘটনকারী এবং চার মযহাব বহির্ভূত ব্যক্তিদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকা। ভালো হোক বা খারাপ হোক, সবার সঙ্গে প্রত্যেকের হাসি মুখে আচরণ করা উচিত। প্রত্যেকের উচিত ক্ষমাপ্রার্থীকে ক্ষমা করে দেয়া। কারও সঙ্গেই কোনো ব্যক্তির ঝগড়া করা উচিত নয়; তার কথার প্রতি ঘৃণা পোষণ করাও তার উচিত নয়। প্রত্যেকের সঙ্গে নম্রভাবে কথা বলবে একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তেই কঠোর হওয়া যায়। শায়েখ আবদুল্লাহ বয়াল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'তাসাউফ অর্থ শুধু সালাত, রোযা কিংবা রাতে কৃত এবাদত নয়। বান্দা হিসেবে এগুলো প্রত্যেক মানুষেরই কর্তব্য। দরবেশ হওয়ার অর্থ হচ্ছে কাউকে আঘাত দিয়ে ব্যথিত না করা। যে ব্যক্তি এটা সাধন করতে পারেন তিনিই চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করতে পারেন।' হযরত মুহাম্মদ ইবনে সালিমকে জিজ্ঞেস করা হয় যে কীভাবে একজন ওলীকে অন্যান্য লোকদের মাঝে চেনা যাবে। তাঁর উত্তর: 'তাঁকে চেনা যাবে তাঁর মোলায়েম কথা বার্তায়, সুন্দর আচরণে, সদাহাস্য চেহারায়, দয়া-দাক্ষিণ্যে এবং কথোপকথনের সময় কারও সঙ্গে মতভেদ সৃষ্টি না করায় এবং ক্ষমা প্রদর্শনে এবং সবার প্রতি করুণা প্রদর্শনে।'

"তোমার উচিত আল্লাহর কাছ থেকে সকল বস্তু আশা করা, যিনি তাঁর সকল বান্দার চাহিদা মেটাতে সক্ষম। তিনি তোমাকে সাহায্য করার জন্যে তাঁর সকল বান্দাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায আর-রাযী (কুদ্দেসা সিররূহ) বলেছেন, 'আল্লাহ্ পাককে তুমি যতোটুকু ভালোবাস, যতোটুকু ভয় পাও, অন্যরাও তোমাকে ততোটুকু ভয় পাবে। আল্লাহর আদেশ তুমি যেভাবে মান্য কর, ঠিক ততোটুকু অন্যরাও তোমাকে সাহায্য করবে।' আল্লাহ তা'আলা এবং মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় পর্দা হচ্ছে মানুষের নিজের নফসের অনুসরণ এবং তারই মতো অক্ষম অন্য কোনো মানুষের ওপর আস্থা স্থাপন।

"বিপদের সময় আল্লাহর সাহায্য হতে নিরাশ হওয়া তোমার উচিত নয়; আর সুখের সময় শরিয়তকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে শৈখিল্য প্রদর্শন করাও তোমার উচিত নয়। অন্যদের দোষত্রুটি খোঁজার পরিবর্তে তোমার উচিত নিজের দোষত্রুটি তালাশ করা। অন্যান্য মুসলমানদের থেকে নিজেকে বড় মনে করবে না। যখন তুমি কোনো মুসলমানের সাক্ষাৎ লাভ করবে, তখন বিশ্বাস রাখবে যে তোমার জন্যে তার প্রেরিত দোয়াই তোমার সর্বোত্তম লাভ। যারা তোমাকে সাহায্য করেছে তোমার উচিৎ তাদের দাসত্ব করা।

"তাসাউফ আদবের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যে ব্যক্তি আদব পালনে তৎপর নয়, সে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন কতে পারবে না।[১]"

হযরত মাসুম ফারুকী তাঁর মকতুবাত গ্রন্থের ৩য় খন্ডের ১৭ নং চিঠিতে লিখেছেন: "তাসাউফের অজানা পথে একজন পথ-প্রদর্শক মুর্শিদ আল কামেলের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। তাঁর সাহায্য ছাড়া অগ্রসর হওয়া বড়ই দুষ্কর। আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ 'আমার সান্নিধ্য অজর্নের জন্যে ওসীলার তালাশ কর'।[২] দুনিয়াবী মর্যাদাসম্পন্নদের কাছে পৌঁছানোর জন্যে যেভাবে একজন মধ্যস্থতাকারীর অন্বেষণ করা হয়, ঠিক সে রকম প্রকৃত মাক্বাম (মর্যাদা)-এর অধিকারী সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর জন্যেও মাধ্যম অত্যাবশ্যক। এ পথে অগ্রসর হতে হলে মুর্শিদ আল-কামিলের সোহবত একান্ত আবশ্যক। (তাসাউফের) এ পথটি সুন্নতকে আঁকড়ে ধরার এবং বিদয়াতকে বর্জনের পথ। একজন মুর্শিদ আল কামিলের সন্ধান পাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কালিমা তাওহিদ ঘন ঘন পড়ো। তোমার উচিত এটা দৈনিক এক বা পাঁচ হাজার

---

[১]. মাসুম ফারুকী সিরহিন্দী প্রণীত 'মকতুবাত' ২য় খন্ড/ ১১০ চিঠি।
[২]. আল কুরআন / সূরা মায়েদা, ৫/৩৫।

বার পাঠ করা। তাসাউফের মহান ইমামগণ সর্বসম্মতভাবে জানিয়েছেন যে, এটা কৃলব পরিষ্কার করার বেলায় বিশেষ উপযোগী।[১]"

আল্লাহ তা'আলা সূরা আয্ যারিয়া-তে ইরশাদ করেন: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ "আমি জ্বিন ও ইনসানকে তৈরি করেছি যাতে তারা আমার এবাদত করে"।[২] আর এই এবাদতের দ্বারাই কুরব (নৈকট্য) ও মারেফতের উৎপত্তি। এর অর্থ হচ্ছে মানুষকে আউলিয়া হবার জন্যে আদেশ দেয়া হয়েছে যা ফরযসমূহের সঙ্গে নফল এবাদত পালন করে এবং বিদয়াতীদের থেকে দূরে সরে থেকে করা সম্ভব। তাসাউফের পথে, অর্থাৎ, তরীকায় যে সব কর্তব্য পালন করতে হয়, তার সবই হচ্ছে নফল এবাদত। ইখলাস, যেটা ফরযসমূহের গ্রহণীয় হওয়ার জন্যে একটা শর্তবিশেষ, সেটা এ সব কর্তব্য পালন করেই অর্জন করা যায়। উর্পযুক্ত তথ্যাবলী স্পষ্টই প্রতীয়মান করে যে "তাসাউফ ইহুদি ও প্রাচীন গ্রীকদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে" মর্মে ওহাবীদের বক্তব্যটি একটি ডাহা মিথ্যা এবং জঘণ্য কুৎসাও।

৮/ওয়াহাবী পুস্তকটির ১৬৮ এবং ৩৫৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে:

وَقَالَ ابْنُ القَيِّمُ وَمِنْ أَنْوَاعِهِ – يَعْنِيْ الشِّرْكُ – طَلَبُ الْحَوَائِجِ مِنَ الْمَوْتَىْ، وَالْاِسْتِغَاثَة بِهِمْ وَالتَّوَجُّهُ إِلَيْهِمْ. وَهَذَا أَصْلُ شِرْكُ الْعِالِ–

وَفِيْ الفَتَاوِي البَزَازِيَّةِ مِنْ كُتُبِ الحَنَفِيَّةِ: قَالَ عُلَمَاؤُنَا: مَنْ قالَ أَرْوَاحَ المَشَايِخِ حَاضِرَةٌ تَعَلَّمْ: يَكْفُرُ– فَإِنَّ المَيِّتَ قَدْ انْقَطَعَ عَمَلَهُ، وَهُوَ لَا يَمْلِكِ لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا

"এটা সর্বসম্মত যে আল্লাহ্ এবং তাঁর সৃষ্টিসমূহের মধ্যে একজন মধ্যস্থতাকারীর কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করা কুফর। ইবনে কাইয়েম আল জওযিয়া বলেছেন যে, মৃত ব্যক্তির কাছে কোনো কিছু চাওয়া অথবা আল্লাহর কাছে তার মাধ্যমে সুপারিশ করানো মহা-শির্ক। হানাফী কিতাব 'ফতোয়া-এ-বাযাযিয়্যা' ব্যক্ত করে, যে ব্যক্তি বলবে শাইখদের রূহসমূহ

[১]. মাসুম ফারুকী কৃত মকতুবাত, ৩য় খন্ড/ ১৭ নং চিঠি।
[২]. আল কুরআন / সূরা জারি'য়াত, ৫১/৫৬।

হাযের-নাযের আছেন, সে কাফের হয়ে যাবে। আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে বোঝা যায় যে মৃতজনের কোনো চেতনা এবং স্পন্দন নেই।”[১]

আমি আমার ’সায়াদাতে আবাদিয়্যা’ পুস্তকে এসব কথার উত্তর বিস্তারিতভাবে লিখেছি। আপনারা যদি ওই সব উত্তর পড়েন, তাহলে পরিষ্কার বুঝতে পারবেন যে আহলে সুন্নাতের বিরুদ্ধে ওয়াহাবীদের এসব কুৎসা রটনা অন্যায় এবং অযৌক্তিক। ওয়াহাবীটি নিজেই তার পুস্তকের ৭০ পৃষ্ঠায় লিখেছে:

“উকাশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে দোয়া চেয়েছিলেন যাতে তিনি বিনা বিচারে আখেরাতে বেহেশতে গমন করতে পারেন। মূল হাদীস[২]টি নিম্নরূপ

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هِيَ سَبْعُونَ أَلْفًا، تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ القَمَرِ» فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ الأَسَدِيُّ، يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ، قَالَ: ادْعُ اللهَّ لِي يَا رَسُولَ اللهَّ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ

ওয়াহাবীটি এরপর লিখে,

أَنَّ شَفَاعَةَ الحَيِّ لِمَنْ سَأَلَهُ الدُّعَاءَ إِنَّمَا كَانَتْ بِدُعَائِهِا وَبَعْدَ المُوْتِ قَدْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ بِأُمُوْرِ لَا تَخْفَىٰ عَلَىٰ مَنْ لَهُ بَصِيْرَةٌ فَمَنْ سَأَلَ مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا فَقَدْ سَأَلَهُ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللهُا وَكُلُّ مَنْ سَأَلَ أَحَدًا مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ فَقَدْ جَعَلَهُ نِدًّا للهِ كَمَا كَانَ المُشْرِكُوْنَ كَذَلِكَ-

[১]. ফাতহুল মাজীদ : ১৬৮ ও ৩৫৩।

[২]. বুখারী : আস সহীহ, বাবুল বারুদ ওয়াল হিবার ওয়াশ শামলা ৭/১৪৬ হাদীস নং ৫৮১১।

ক. মুসলিম : আস সহীহ , বাবু দলীলি আলা আলা দুখুলিত ত্বাওয়ায়িফ ১/১৯৭ হাদীস নং ২১৬।

খ. ইব্ন হিব্বান : আস সহীহ, যিকরু ওসফিল আম্বিয়া ১৬/ ৩৪১ হাদীস নং ৭৩৪৬।

গ. ত্ববরানী : আল মু'জামুল কাবীর, ওয়া মিন মুসনাদি আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ৫/ ১০ হাদীস নং ৯৭৬৫।

ঘ. হাকীম : মুস্তাদরাক, যিকরু মানাক্বিবি উকাশা ৩/ ২৫৩ হাদীস নং ৫০১০।

ঙ. বায়হাক্বী : আস সুনান, ১০/ ২৩৫ হাদীস নং ২০৪৪৮।

চ. দারেমী : আস সুনান ৯/ ৫৩ হাদীস নং ২৮৬৩।

এটা পরিস্ফুট করে যে জীবিত ব্যক্তির কাছে দোয়া করার জন্যে আবেদন করা অনুমতিপ্রাপ্ত। কিন্তু 'মৃত' কিংবা 'অনুপস্থিত' ব্যক্তির কাছে দোয়া চাওয়া শির্ক।" রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথ যারা নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেন তাঁদের দোয়াও তাঁর দোয়ার মতোই গৃহীত হয়। ওয়াহাবী পুস্তকটির ২৮১ পৃষ্ঠায় আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রেওয়ায়াকৃত হাদীসের উদ্ধৃতি দেয়, যেটা ঘোষণা করে:

رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ.

"এমন বহু মানুষ আছে (যাদের চুল এলোমেলো এবং) যাদেরকে দরজা থেকে দূর করে দেয়া হয়। অথচ যখন তারা (এলাহীর নামে) কসম (শপথ) করে, তখন আল্লাহ তা নিশ্চয়ই সৃষ্টি করে দেন"।[১]

আল্লাহ তা'আলা, যিনি তাঁর বান্দাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্যে তাঁদের কসমকৃত বস্তু সৃষ্টি করে দেন, তিনি নিঃসন্দেহে তাঁদের দোয়া কবুল করে নেবেন। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ ফরমান, أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ "আমার কাছে দোয়া কর। আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো।[২]"

দোয়া কবুল হবার কিছু শর্ত আছে। ওই সব শর্ত যদি পূরণ করা যায়, তবে নিঃসন্দেহে দোয়া কবুল হবে। যেহেতু কোনো ব্যক্তি সমস্ত শর্ত পূরণ করতে পারে না, সেহেতু তার দোয়া কবুল হয় না। তাহলে আউলিয়া ও উলামা-এ-হাক্কানী যাঁরা এ সকল শর্ত পূরণ করেছেন, তাঁদের কাছে শাফায়াত প্রার্থনা করা কেন শির্ক হবে? আমরা বলি, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের রূহ্সমূহকে শ্রবণ করার ক্ষমতা প্রদান করেছেন এবং তাঁদের ভালোবাসার ওয়াস্তে কাংখিত বস্তু সৃজন করে থাকেন। আমরা পশু-পাখি জবেহ্ করে এবং কুরআন তেলাওয়াত করে সওয়াবগুলো কোনো বেসালপ্রাপ্ত ওলীর রূহের প্রতি বখশিয়ে দেই এবং তাঁর শাফায়াত ও সাহায্য কামনা করি। যে ব্যক্তি শুধু মৃতদের খাতিরে ওই সব কাজ করে সে নিশ্চয়ই ভ্রান্ত; কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার এবাদত করেন এবং তার সওয়াব বেসালপ্রাপ্ত ওলীর রূহের প্রতি বখশিয়ে দেন, তিনি মুশরিক কিংবা ফাসিক্ব (গুণাহ্গার) হন না। এটা নিশ্চিত যে ওয়াহাবীরা নিজেদেরকেই প্রতারিত

[১]. মুসলিম : আস সহীহ, বাবুন নারি ইদখুলুহাল জাব্বারুন, ৪/২১৯১ হাদীস নং ২৮৫৪, হাদীস নং ২৬২২।
ক. বায়হাক্বী : শু'য়াবুল ঈমান, ১৩/৮৮ হাদীস নং ৯৯৯৯।
খ. বাগাবী : শরহুস সুন্নাহ, বাবু ফদ্বলিল ফুক্বারা, ১৪/ ২৬৯ হাদীস নং ৪০৬৯।
[২]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২/১৮৬।

করেছে এবং বিচ্যুত হয়েছে। ওয়াহাবী পুস্তকটির লেখকও হযরত মরিয়ম আস্ইয়াদ ইবনে হাদির এবং আবু মুসলিম হাওলানীর কারামতের বর্ণনা দেয়। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় ও মনোনীত বান্দাদের রূহসমূহ জীবিত কিংবা বেসালপ্রাপ্ত অবস্থায় আল্লাহরই অনুমতিক্রমে পৃথিবীর মানুষদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতাসম্পন্ন, সেহেতু আমরা আউলিয়ার রূহসমূহের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। ক্বলবের মধ্যে এ বিশ্বাস রেখে আউলিয়ার ইস্তিগাসাহ (সাহায্য প্রার্থনা) করাটা আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারও এবাদত করা নয়, বরং এর অর্থ আল্লাহর ইবাদত করা, তাঁর প্রতি আস্থা রাখা এবং তাঁরই কাছে সাহায্যপ্রার্থী হওয়া। জ্ঞানী-গুণীজন এটা সহজেই বুঝতে পারবেন।

৯/ পৃষ্ঠা ১৭৯ এবং ১৯১-এ ওয়াহাবীটি একখানা হাদীস উদ্ধৃত করে

يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، سَلِينِي مَا شِئْتِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا

–হে ফাতেমা আমার কাছ থেকে যে কোনো সম্পত্তি তুমি চাইতে পারো। কিন্তু আমি তোমাকে আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবো না।[১]

অতঃপর সে মন্তব্য করে:

أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ أَنْ يَسْأَلَ الْعَبْدُ إِلاَّ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ أُمُوْرِ الدُّنْيَا. وَأَمَّا الرَّحْمَةُ وَالْمَغْفِرَةُ وَالْجَنَّةُ وَالنَّجَاةُ مِنَ النَّارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا لَا يَقْدِرُ عليه إلا الله تعالى، فَلَا يَجُوْزُ أَنْ يَطْلُبَ إِلَّا مِنْهُ تَعَالِيفَإِن مَا عِنْدَ اللهِ لاَ يَنَالُ إِلَّا بِتَجْرِيْدِ التَّوْحِيْدِ، وَالإِخْلَاصُ لَهُ بِمَا شَرْعَه وَرَضِيَه لِعِبَادِهِ أَنْ يَتَقَرَبُوْا إِلَيْهِ بِهِ، فَإِذَا كَانَ لَا يَنْفَعُ بِنِيِّتِهِ وَلَا عَمَّه وَلا عَمَّته وَلَا قَرَابَت إِلَّا ذَلِكَ، فَغَيَّرهم أَوْلَى وَأحرَى. وَفِيْ قِصَّةِ عَمه أَبِيْ طَالِبٍ مُعْتَبَرٌ.

[১]. বায্যার/ আল মুসনাদ, ৪/ ১৬৯ হাদীস নং ৩০২৪।

فَانْظُرْ إِلَىٰ الوَاقِعِ الآن مِنْ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ مِنْ الالتِجَاءِ إِلَىٰ الأَمْوَاتِ وَالتَوَجُّهِ إِلَيْهِمْ بِالرُّغْبَاتِ وَالرُّهْبَاتِ، وَهُمْ عَاجِزُوْنَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِأَنْفُسِهِمِ ضَرًّا وَلَا نَفعًا فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِم يَتَبَيَّنُ لَكَ أَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَىٰ شَيٍء

"মানুষের কাছে এ পৃথিবীতে তার ক্ষমতার আওতাধীন বস্তুর জন্যে সাহায্য কামনা করা যায় (অনুমতি প্রাপ্ত)। কিন্তু যে সকল বস্তু আল্লাহর ক্ষমতার আওতাধীন (এখতেয়ারে), যেমন ক্ষমা প্রদর্শন, বেহেশত দান, জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা ইত্যাদির জন্যে একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে। শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই বিপদ-মুক্তি ও সাহায্য চাওয়া যেতে পারে। যারা দূরে অবস্থিত অথবা 'মৃত', তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া যায় না। তারা শ্রবণও করতে পারে না, উত্তরও দিতে পারে না। তারা কিছুই করতে পারে না। হযরত হুসাইন ও তাঁর পিতা (হযরত আলী) কবরে শাস্তি ভোগ করছেন না, কিন্তু যারা দেবতা হিসেবে জ্ঞাত, যেমন আহমদ তিজানী, ইবনুল আরবী ও ইবনুল ফরিদ গং, তারা শাস্তি পাচ্ছে। তারা কিছুই শুনে না। নবীদের কাছেও সাহায্য কামনা করা যাবে না। আল বুসাইরী এবং বারী তাদের ক্বাসিদাসমূহে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এতো বেশি প্রশংসা করেছে যে তারা কাফের ও মুশরিক হয়ে গিয়েছে" ।[১]

ওয়াহাবীটি তার পুস্তকের বিভিন্ন অংশে, উদাহরণস্বরূপ, ৩২৩ পৃষ্ঠায় লিখেছে:

دُعَاءُ الْمَيِّتِ وَالْغَائِبِ يَجْلِبُ لَهُمْ نَفْعًا، أَوْ يَدْفَعُ عَنْهُمْ ضَرًّا. أَوْ أَنَّهُ يَشْفَعُ بِدُعَائِهِمْ إِيَّاهُ، فَهَذَا هُوَ الشِّرْكُ الَّذِيْ بَعْثَ اَللّٰهُ رَسُوْلَهُ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنْهُ وَقِتَالُ مَنْ فَعَلَهُ

"মৃতজন অথবা অনুপস্থিত জনের দোয়া ক্ষতি দূর করতে পারে অথবা তারা আল্লাহর কাছে দোয়াপ্রার্থীদের জন্যে শাফায়াত করতে পারেন, এই বিশ্বাস রাখাটা শির্ক। আল্লাহ্ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রেরণ করেছেন এই ধরনের শির্ককে নিশ্চিহ্ন করতে এবং এই ধরনের মূর্তিপূজারী (মুশরিক)-দের সঙ্গে লড়তে" ।[২]

---

[১]. ফাতহুল মাজীদ ১/ ১৯১।

[২]. ফাতহুল মাজীদ ৩২৩।

ওয়াহাবী গ্রন্থটি পরস্পরবিরোধী মত ব্যক্ত করেছে। কারণ ২০১ পৃষ্ঠায় সেটা বলে:

أَنَّ السَّمَاوَاتَ تَخَافُ اللهَ، بِمَا يَجْعَلَ تَعَالَى فِيْهَا مِنَ الإِحْسَاسِ وَمَعْرَفَةِ مِن خَلْقِهَاأَنَّ هَذِهِ المَخْلُوْقَاتُ تُسَبِّحُ للهَ وَتَخْشَاهُ حَقِيْقَةً–

"আসমানসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা চেতনা ও মারেফত সৃষ্টি করেছেন। তারা আল্লাহকে ভয় করে। প্রতিটি অনুকণা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং ভয় পায়"।[১]

উপর্যুক্ত মন্তব্যটির বিরোধিতা করে সে দাবি করেছে যে নবী-ওলীগণ তাদের মাযার-রওযায় কিছুই শুনেন না অথবা অনুভবও করেন না। নিম্নের উদ্ধৃতিটি 'মিরাতুল মদীনা' হতে গৃহীত হয়েছে:

"মুসলিম উলামা সবসময়ই আল্লাহর করুণা ও সাহায্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফায়াতের মাধ্যমে কামনা করেছেন। মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম-কে যখন পৃথিবীতে নামিয়ে দেয়া **হয়, তখন তিনি দোয়া করেন:**

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيئَةَ قَالَ: يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَمَا غَفَرْتَ لِي، فَقَالَ اللهُ: يَا آدَمُ، وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ؟ قَالَ: يَا رَبِّ، لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوحِكَ رَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَى اسْمِكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ، فَقَالَ اللهُ: صَدَقْتَ يَا آدَمُ، إِنَّهُ لَأُحِبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ ادْعُنِي بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ.

'হে আল্লাহ আমার পুত্র মুহাম্মদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওসীলায় আমাকে ক্ষমা করে দিন।' আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করে নেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করেন: 'তুমি কীভাবে আমার প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-কে চেনো? আমি তো তাঁকে

---

[১]. ফাতহুল মাজীদ : ১/২০১।

এখনও সৃষ্টি করিনি।' হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম উত্তর দিলেন: 'আমি ওপরের দিকে তাকিয়ে আরশের সীমানায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ শব্দটি দেখতে পেলাম। আমি বুঝতে পারলাম যে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-ই সাইয়্যেদুল মুরসালিন (নবীকুলশ্রেষ্ঠ)। যদি তাঁকে আপনি সবচেয়ে বেশি ভালো না বাসতেন, তাহলে তো আর তাঁর নাম আপনার নামের সঙ্গে স্থাপন করতেন না।' অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বললেন: 'হে আদম তুমি সত্য বলেছ আমি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-কে অত্যন্ত ভালোবাসি। তাঁর চেয়ে অধিক প্রিয় আর কাউকেই আমি সৃষ্টি করিনি। তাঁকে যদি আমি সৃষ্টি না করতাম, তা হলে তোমাকেও আমি সৃষ্টি করতাম না। যেহেতু তাঁর ওয়াস্তে তুমি ক্ষমা প্রার্থনা করেছ, সেহেতু আমি তোমার দোয়া কবুল করে নিয়েছি।'[১]

أَنَّ رَجُلاً ضَرِيرَ البَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَنِي قَالَ: إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ، وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. قَالَ: فَادْعُهْ، قَالَ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لِيَ، اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ

"একবার দুই চোখ অন্ধ এক ব্যক্তি (সাহাবী) রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে দোয়া করার জন্যে আবেদন জানান। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: 'যদি তুমি চাও, তবে দোয়া করতে পারি; কিন্তু তোমার জন্য ধৈর্যই উত্তম হবে।' বৃদ্ধটি বললেন, 'ধৈর্য ধরার ক্ষমতা আমার তিরোহিত হয়েছে। আপনি দোয়া করুন।' নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাহলে ওযু করো এবং পড়ো: হে আল্লাহ্ আমি আপনার দিকে ফিরলাম আপনারই নবী মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে, যাঁকে রহমতস্বরূপ আপনি এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি আল্লাহর কাছে চাওয়ার সময়

[১].ইব্ন কাসির : মুসনাদ আল ফারূকে, কিতাবুল মু'জিযাতি ওয়াল মানাক্বিবি ওয়াল ফাদ্বায়িল ২/ ৬৭১।
ক. হাকিম : আল মুস্তাদরাক আলাস সহীহাঈন, ২/ ৬৭২ হাদীস নং ৪২২৮।

> আপনাকে মধ্যস্থতাকারী বানালাম। ইয়া আল্লাহ্ তাঁকে আমার জন্যে শাফায়াতকারী বানিয়ে দিন’ ।[১]

ওই ব্যক্তি দোয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ তাঁর দোয়া কবুল করে নেন এবং তিনি তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। হাদীস শাস্ত্রবিদ ইমাম নাসাঈ-ও এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। এটাকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ ওয়াহাবীদের কাছে অবশিষ্ট নেই। এ ঘটনাটির মূল বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত উসমান বিন হুনাইফ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ‘যখন উসমান ইবনে আফফান (যিন্নুরাইন) খলিফা হয়েছিলেন, তখন মহাবিপদগ্রস্ত এক ব্যক্তি আমাকে তার দুঃখের কথা খুলে বলে এবং জানায়, সে হযরত উসমান যিন্নুরাইনের কাছে তার অভিযোগ পেশ করার ব্যাপারে লজ্জিত। আমি তাকে ওযু করে মসজিদ আস-সায়াদায় গিয়ে উক্ত দোয়াটি পড়বার পরামর্শ দেই। ওই দুঃখী ব্যক্তি দোয়া পাঠ করে খলিফার কাছে গমন করে। তাকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। খলিফা তাকে তাঁর জায়নামাযে বসিয়ে তার অভাব-অভিযোগ শোনেন এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন। ওই অভাবগ্রস্ত দুঃখী ব্যক্তি তার সমস্যার সহসা সমাধান হতে দেখে হযরত উসমান বিন হুনাইফের কাছে যায় এবং উৎফুল্ল চিত্তে বলেঃ ‘আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন আপনি যদি খলিফার কাছে সুপারিশ না করতেন, তাহলে আমার সমস্যাগুলোর সমাধান এতো তাড়াতাড়ি হতো না।’ কিন্তু হযরত উসমান বিন হুনাইফ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আমি তো খলিফার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিনি। এটা আসলে তোমাকে শেখানো দোয়ার বরকতে হয়েছে। আমি ওই দোয়াটি শুনেছি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে, যিনি সেটা একজন অন্ধ লোককে শিখিয়েছিলেন, যে অন্ধ লোক  আল্লাহর কসম নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবার থেকে হেঁটে বেরিয়ে যাবার আগে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছিল।’

”একবার হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফত আমলে খরা দেখা দেয়। হযরত বিলাল ইবনে হারিস মু’যানী নামের জনৈক সাহাবী রওযা-এ-আকদস গমণ করে সম্ভাষণ জানানঃ ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার উম্মত ক্ষুধায় মৃত্যুপথযাত্রী। আমি বৃষ্টির জন্যে আপনার শাফায়াত কামনা করছি।’ সেই রাতে তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখেন। রাসূলে

---

[১]. আহ্মদ : আল মুসনাদ, ৪/ ১৩৮ হাদীস নং ১৭২৮০।
ক. তিরমিযী : আস সুনান, ৫/ ৪৬১ হাদীস নং ৩৫৭৮।
খ. নাসায়ী : আস সুনান, ৯/ ২৪৪ হাদীস নং ১০৪২০।
গ. ইব্ন খুযামা :  আস সহীহ, বাবু ছলাতি তারগীব ওয়াত তারহীব  ২/ ২২৫ হাদীস ১২১৯।
ঘ. হাকিম : আল মুস্তাদরাক ১/ ৪৫৮ হাদীস নং ১১৮০।

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন: 'খলিফার সঙ্গে দেখা করো। সে বৃষ্টির জন্যে দোয়া করতে বের হবে।' হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বৃষ্টির জন্যে দোয়া করতে বের হন এবং সহসা বৃষ্টি আরম্ভ হয়। ফলে সর্বত্র আবার উর্বরতা ফিরে আসে।

মূল হাদীস[১]টি নিম্নরূপ,

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، فَاسْقِنَا

"আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের ওয়াস্তে দোয়া কবুল করে নেন। এই পৃথিবীতেও কোনো মানুষের কাছ থেকে তার প্রিয়জনের ওয়াস্তে সাহায্য আদায় করা যায়। আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন যে তিনি হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভালোবাসেন। সুতরাং যদি কেউ দোয়া করার সময় বলে: اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِجَاهِ نَبِيِّكَ الْمُصْطَفَي 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্ আলুকা বে-জাহে নাবিইয়্যেকাল মুস্তফা', তাহলে তার দোয়া প্রত্যাখ্যান করা হবে না। কিন্তু দুনিয়াবী জিনিসের জন্যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে শাফায়াতকারী বানানো আদবের খেলাফ।

"বুরহানুদ্দীন মালেকী একজন গরিব ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণনা দেন, যে ব্যক্তিটি হুজরাহ আস্ সায়াদা (মহানবীর রওযা)-তে গমন করে বলেছিলেন: 'ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি ভুখা আছি।' এর পর তিনি রওযাতুল মুতাহহারা-এর এক কোণায় বসে পড়েন। কিছুক্ষণ পর এক লোক এসে তাঁকে তাঁর ঘরে নিয়ে যান এবং তাঁর সামনে খাবার পরিবেশন করেন। যখন গরিব লোকটি বললেন যে তাঁর দোয়া কবুল হয়েছে, তখন গৃহকর্তা বললেন 'হে ভ্রাতা আপনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারত লাভের জন্যে এতো দীর্ঘ তকলীফপূর্ণ যাত্রা করে এসেছেন; তাঁর হুযুরে (উপস্থিতিতে) এক মুঠো খাবার চাওয়া কি আপনার সমীচীন হয়েছে? ওই রকম মহান ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুযুরে তো আপনার বেহেশ্ত এবং অনন্ত নিয়ামত (আশীর্বাদ ও কল্যাণ) কামনা করা উচিত ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা সেখানে

---

[১]. বুখারী : আস সহীহ, বাবু সুয়ালিন নাস আলাল ইমাম ২/ ২৭ হাদীস নং ১০১০।
ক. বাগাবী : শরুহস সুন্নাহ, ৪/ ৪০৯ হাদীস নং ১১৬৫।

দোয়া প্রত্যাখ্যান করে না।' যাঁরা রসূল-এ-আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারত দ্বারা সম্মানিত হন তাঁদের উচিত শেষ বিচারের দিনে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফায়াত কামনা করা।

"একবার ইমাম আবু বকর মূকরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম তৃবরানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও আবু শায়েখ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মসজিদ আস্ সায়াদাতে ভুখা অবস্থায় কিছু দিন অতিবাহিত করেন। অবশেষে এশা নামাজ বা'দে ইমাম আবু বকর আর সহ্য করতে না পেরে অত্যন্ত লজ্জিতভাবে বলেন, 'আমি ক্ষুধার্ত, ইয়া হাবীব-আল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলে তিনি এক কোণায় গিয়ে বসে পড়েন। তাঁর অপর দুই বন্ধু একটি পুস্তক পাঠে রত ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি, যিনি সাইয়্যেদ ছিলেন, তিনি তাঁর দুইজন গোলামসহ খাদ্য নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন এবং বলেন, 'হে ভ্রাতৃবৃন্দ আপনারা আমার দাদা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আপনাদের জন্যে খাবার যোগাড় করার অনুরোধ করেছেন। তিনি আমাকে তন্দ্রা থাকাকালীন অবস্থায় স্বপ্নে আদেশ করেন আপনাদেরকে তা দিতে।' তাঁরা সবাই আহার করেন এবং ওই সাইয়্যেদ ব্যক্তি বাকি খাদ্য তাঁদের কাছে রেখে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

"একবার আবুল আব্বাস ইবনে নাফিস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যিনি অন্ধ ছিলেন, তিনি তিন দিন অভুক্ত থাকার ফলে এতো দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁর হাঁটবার ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি হুজরাহ আস্ সায়াদাতে গমণ করে সম্ভাষণ জানান: 'হে রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি ক্ষুধার্ত।' এরপর তিনি এক কোণায় যেয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর জনৈক ব্যক্তি এসে তাঁকে তাঁর ঘরে নিয়ে যান। তিনি খাদ্য পরিবেশন করে বলেন: 'হে আবুল আব্বাস আমি আমাদের মনিব হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখি। তিনি আমাকে আপনার জন্যে খাদ্য পরিবেশন করতে আদেশ দেন। আপনার যখনই খিদে লাগবে তখনই আমাদের এখানে আসবেন।'

"আলেম-এ-ইসলাম ইমাম মূসা ইবনে নুমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শত শত মুসলমানের নাম এবং তাঁদের দোয়ার বিবরণ তাঁর প্রণীত 'মিসবাহ্ উয্ যুলাম ফীল মুস্তাগিসীন বি খাইরিল আনাম' কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। এঁরা সবাই হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে শাফায়াতকারী বানিয়ে এঁদের হাজত-মকসূদ পূর্ণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন, মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির বলেন যে এক ব্যক্তি জিহাদে যাবার আগে তাঁর পিতার কাছে ৮০টি স্বর্ণমুদ্রা আমানত রাখেন এবং বলেন: 'আমার জন্যে এগুলো জমা রাখবেন। তবে, অভাবগ্রস্ত লোকদের

কাছে ধার দিতে পারবেন।' তাঁর পিতা খরাপীড়িত লোকদের কাছে সেই টাকা ধার দেন। যখন ওই ব্যক্তি প্রত্যাবর্তন করে টাকা ফেরত চান, তখন তাঁর পিতা তাঁকে পরবর্তী রাতে আবার আসতে বলেন এবং তিনি নিজে হুজরাহ্ আস্ সায়াদায় যেয়ে সকাল পর্যন্ত প্রার্থনা করতে থাকেন। মুনকাদির বলেন, 'আমার পিতা বলেছেন যে একজন লোক তাঁর কাছে এসে হাত খুলতে বলেন। লোকটি তাঁকে স্বর্ণমুদ্রার একটি থলে প্রদান করেন। আমার পিতা মুদ্রাগুলো গুণে ৮০টি মুদ্রা দেখতে পান। আনন্দিত হয়ে তিনি সেগুলো উক্ত (আমানতকারী) ব্যক্তির কাছে ফেরত দেন।'

"মদিনায় গরিব থাকাকালীন ইবনে জালাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হুজরাহ্ আস্ সায়াদায় যান এবং বলেন: 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আজ আপনার কাছে এসেছি অতিথি হিসেবে। আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত।' এরপর তিনি এক কোণায় যেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। রাসূল-এ-পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে স্বপ্নে দেখা দেন এবং একখানা বড় রুটির টুকরো প্রদান করেন। পরবর্তীকালে তিনি বলেছেন, 'আমি ক্ষুধার্ত হওয়ার দরুণ রুটি তৎক্ষণাৎ খাওয়া আরম্ভ করি। যখন অর্ধেকটুকু খাওয়া শেষ করি তখনই ঘুম থেকে জেগে উঠি। বাকি অর্ধেক রুটি আমি আমার হাতে দেখতে পাই।'

"আবুল খায়েল আক্বতা পাঁচ দিন মদীনায় অভুক্ত থাকার পর হুজরাহ আস্ সায়াদায় গমন করেন এবং হুজুর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সালাম দেন। তিনি আরয করেন যে তিনি ক্ষুধার্ত। এর পর তিনি এক কোণায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। এরপর স্বপ্নে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করতে দেখলেন। তাঁর ডান পাশে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং বাম পাশে হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, আর হযরত আলী মুরতাদা কুদ্দা সির্রুহু আলাইহি তাঁর সামনে হাঁটছিলেন। হযরত আলী কুদ্দা সির্রুহু আলাইহি এসেই বললেন, 'হে আবুল খায়ের। উঠে দাঁড়াও। কেন তুমি শুয়ে আছ?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেই তাঁকে এক টুকরো রুটি দিলেন। পরবর্তীকালে আবুল খায়ের বলেছেন, 'অত্যাধিক ক্ষুধার্ত থাকার দরুণ আমি সঙ্গে সঙ্গে রুটি খাওয়া আরম্ভ করি। অর্ধেকটুকু খাওয়ার পর ঘুম থেকে জেগে উঠে বাকি অর্ধেক রুটি আমার হাতের মধ্যে দেখতে পাই।'

"হযরত আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে বার'আ বলেছেন যে তিনি এবং তাঁর পিতা আবু আব্দুল্লাহ ইবনে হাফিফ মক্কায় কপদ্দকহীন হয়ে পড়েন। একটা কষ্টদায়ক সফরশেষে তাঁরা মদীনায় এসে পৌঁছেন। শিশু হওয়ার দরুণ তিনি খিদে লেগেছে জানিয়ে কান্নাকাটি করতে থাকেন। তাঁর পিতাকে তিনি অস্থির করে ফেললেন,

যিনি বহু চেষ্টা করেও স্থির ও শান্ত থাকতে পারলেন না। হুজরাহ আস্ সায়াদায় গমন করে তাঁর পিতা সম্ভাষণ জানালেন, 'হে হাবীবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রাতে আমরা আপনার অতিথি।' এরপর তিনি বসে পড়ে চোখ বুজলেন। কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে হেসে উঠলেন। তারপর দীর্ঘক্ষণ কাঁদলেন। চোখ খুলে তিনি বললেন: 'রাসুল-এ-পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাতে টাকা দিয়েছেন।' আবু আবদুল্লাহ বলেন : 'তিনি যখন হাতের মুঠো খুলেন তখন তার মধ্যে আমি টাকা দেখতে পাই। আমরা কিছু খরচ করি এবং সাদকাও দেই। এরপর আমরা আমাদের স্বদেশ শিরায-এ ফিরে আসি'।

"আহমদ ইবনে মুহাম্মদ সূফী বলেছেন : 'হিজাযের মরুভূমিতে আমি তিন মাস ঘুরাফেরা করি। আমার আর কোনো সম্পত্তি অবশিষ্ট ছিল না। বহু কষ্টে মদীনায় পৌঁছি। হুজরাহ আস সায়াদায় আমি রাসুল-এ-মক্বুবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সালাম জানাই। এরপর এক কোণায় বসে ঘুমিয়ে পড়ি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে আগমন করলেন। তিনি বললেন, 'তুমি এসেছ আহমদ? তোমার হাত দাও দেখি।' আমার প্রসারিত হাত তিনি স্বর্ণ দ্বারা পূর্ণ করে দিলেন। আমি জেগে উঠে দেখি আমার হাতগুলো স্বর্ণ-ভর্তি'।

"যদি কখনও আশেক-এ-রাসূলগণ তাঁদের নির্মল হৃদয় হতে নিঃসৃত কোনো কথা বলেন, যা বাহ্যতঃ নম্রতা অথবা ভদ্রতার ক্ষেত্রে দৃষ্টিকটু দেখায়, তাহলেও কারও উচিৎ নয় তাঁদের বিরুদ্ধে কিছু বলা, বরং নীরবতা পালনই বাঞ্ছনীয়। ওই অবস্থায় নীরবতা পালনই বিনয়ী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়ার পরিচয় বহন করবে। রওয়ায়ে আকদস-এর কাছে জনৈক আশেক-এ-রাসূল আযান দিতেন এবং বলতেন যে ঘুমের চেয়ে সালাত (নামায) উত্তম। মসজিদ আস্ সায়াদার জনৈক সেবক তাঁকে বললো: 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুযুরে তুমি উদ্ধত আচরণ করেছ' এবং তাঁকে প্রহার করলো। তখন ওই আশেক-এ-রাসূল বলল, 'হে রাসূল-এ-খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার হুযুরে একজন মানুষকে প্রহার করা এবং গালি দেয়া কি ঔদ্ধত্য নয়?' তিনি অনেক কাঁদলেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, যে সেবকটি তাঁকে প্রহার করেছিল, সে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং নড়াচড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। তিন দিন পর সে মারা যায়। হাকিম আবুল কাসিম আসকারী তাঁর পুস্তকে এ ঘটনাটি বর্ণনা করেন এবং আরও জানান যে সাবিত ইবনে আহমদ বাগদাদীও এ ঘটনার একজন সাক্ষী।

"ইবনে নুমান তাঁর পুস্তকে বর্ণনা করেন নিম্নোক্ত ঘটনাটি: হযরত ইবনে আস সাঈদ ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু মদীনাতে তাঁদের সমস্ত টাকা খরচ করে ধার-কর্জ

করার মতো আর কোনো পরিচিত লোককে না পেয়ে হুজরাহ আস্ সায়াদা গমন করেন। যিয়ারতের শেষ পর্যায়ে হযরত ইবনে আস্ সাইদ বলেন, 'এয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের আর কোনো টাকা-পয়সা অবশিষ্ট নেই, খাদ্যও নেই।' এ কথা বলে তিনি পেছন দিকে হেঁটে বেরিয়ে যাবার সময় মসজিদের দরজায় একজন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পান। তিনি তাঁকে এবং তাঁর বন্ধুদেরকে নিজের বাড়িতে নিয়ে প্রচুর খেজুর ও টাকা-কড়ি প্রদান করেন।

"শরীফ আবু মুহাম্মদ আবদিস সালাম ফার্সী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মদীনায় তাঁর তিন দিনের সফরের শেষ পর্যায়ে (মসজিদ-এ-নববীর) মিম্বরের পেছনে দু'রাকাত সালাত পড়ে আরয করেন: 'হে আমার মহান পূর্বপরুষ আমি এতোই ক্ষুধার্ত যে দাঁড়াবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি।' কিছুক্ষণ পর এক ব্যক্তি তাঁর জন্যে রান্নাকৃত গোস্ত এবং রুটি ও মাখন নিয়ে আসেন। যদিও তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন যে ওগুলোর একটা হলেই চলবে, তবুও তাঁকে ওই ব্যক্তি বলেন: 'দয়া করে সবগুলোই খান। আমি এগুলো এনেছি রাসূল-এ-মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে আদেশপ্রাপ্ত হয়ে। আমার সন্তানদের জন্যে খাদ্য তৈরি করার পর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখি, যিনি আমাকে আদেশ দেন "মসজিদে অবস্থানরত তোমার দ্বীনী ভাইয়ের জন্যে কিছু খাবার নিয়ে খেতে দাও"- এজন্যেই এখানে এসেছি।'

"শরীফ মুদাসসির কাসিমী একবার হুজরাহ আস সায়াদার উত্তর দেয়ালের দিকে অবস্থিত তাহাজ্জুদ মেহরাব-এর সামনে ঘুমিয়ে পড়েন। হঠাৎ তিনি উঠে দাঁড়িয়ে হুজরাহ আস্ সায়াআর সামনে চলে আসেন। এরপর তিনি হাসতে হাসতে পেছন দিকে হাঁটেন। মসজিদ আন্ নববীর খাদেমদের নেতা শামসুদ্দীন সওয়াব তাঁকে তাঁর হাসার কারণ জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন যে তাঁর ঘরে কয়েক দিন ধরে কোনো খাবার ছিল না এবং হযরত ফাতিমা (রঃ)-এর রওয়ায় 'ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি ক্ষুর্ধাত।'- এই কথা বলে তিনি এখানে এসেছিলেন। তিনি আরও বলেন: 'এখানে আমি ঘুমিয়ে পড়ি এবং স্বপ্নে আমার মহান পূর্বপুরুষকে দেখি আমাকে এক পাত্র দুধ প্রদান করতে। আমি তা পান করে ঘুম থেকে জেগে উঠি। আমার হাতে তখনও দুধের পাত্রটি বর্তমান। আমি হুজরাহ আত্ তাহিরা গমন করি ধন্যবাদ জ্ঞাপণের উদ্দেশ্যে। আমার অনুভূত আনন্দ ও স্বাদের জন্যেই আমি হেসেছি। এই তো সেই পাত্রটি।' এ ঘটনাটি বিস্তারিত লিপিবদ্ধ আছে 'মিসবাহ-উয্-যুলাম' কিতাবে।

"আলী ইবনে ইব্রাহীম বুসরী রওয়ায়াত (বর্ণনা) করেন যে, হযরত আবদুস্ সালাম ইবনে আবি ক্বাসিম আস্ সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হুজরাহ আস্ সায়াদার সামনে আরয করেন: 'ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি মিসর থেকে এসেছি। এখানে আপনার অতিথি ছিলাম পাঁচ মাস। বহু দিন অভুক্ত আছি। আমি আল্লাহর কাছে খাবার চাই।' তারপর তিনি এক কোণায় যেয়ে বসে পড়েন। জনৈক ব্যক্তি হুজরাহ আস্ সায়াদায় সালাম পেশ শেষে আবদুস্ সালামকে হাত ধরে তাঁর তাঁবুতে নিয়ে যান এবং খেতে দেন। তিনি ওর মধ্যে কিছু খাবার গ্রহণ করেন। এরপর তিনি যখনই মদীনায় যেতেন তখনই ওই ব্যক্তি তাঁকে তাঁর তাঁবুতে নিয়ে খেতে দিতেন।

"একবার ইমাম সামহুদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর চাবি হারিয়ে ফেলেন। অবশেষ তিনি হুজরাহ আস্ সায়াদায় গিয়ে বলেন: 'এয়া নবীইয়্যাল্লাহ আমি আমার চাবি হারিয়ে ফেলেছি; বাড়ি যেতে পারছি না' একজন বালক চাবিটি নিয়ে আসে। ইমাম সামহুদীর লিখিত 'মদীনার ইতিহাস' নামক গ্রন্থে লেখা আছে যে ওই বালক তাঁকে বলেছিল 'এ চাবিটি আমি পেয়েছি। এটা কি আপনার?'

"হযরত শায়েখ সালেহ আবুদল কাদের বলেছেন: 'মদীনায় আমি বেশ কিছুদিন অভুক্ত ছিলাম। হুজরাহ আস্ সায়াদা যিয়ারত করে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আরয করি রুটি, গোস্ত ও খেজুর মন্‌জুর করতে। এরপর রওদাত আল মুতাহহারায় দুই রাকাত নামায পড়ি এবং পার্শ্ববর্তী স্থানে বসে পড়ি। কিছুক্ষণ পর একজন ভদ্রলোক এসে আমাকে তাঁর গৃহে নিয়ে যান। তিনি আমাকে গোস্ত, রুটি ও খেজুর খেতে দেন। তিনি বলেন যে বিকেলে যখন কায়লুলা নামক বিশ্রাম নেয়ার সুন্নতটি তিনি পালন করছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে স্বপ্নে দেখা দেন এবং তাঁর কাছে আমার বিবরণ দিয়ে পরিচয় করিয়ে দেন এবং তাঁকে নির্দেশ দেন যেন তিনি আমাকে খেতে দেন।

"১৩৩১ হিজরী সালে এ বই 'মিরাতুল মদীনা' যখন প্রণীত হয়, তখন 'দালাইল আল খাইরাত' গ্রন্থের লেখক এবং সুলাইমান জাযুলী আফেন্দীর উত্তরসূরী সাইয়েদ আহমদ আল মাদানী আফেন্দী জীবিত ছিলেন। তিনি বলেন তাঁর পিতা এতোই গরীব ছিলেন যে তিনি তাঁর পুত্রের চাহিদা, যেমন আপেল, খেজুর ইত্যাদি মেটাতে পারতেন না। তাই তাঁকে শান্তনা দেয়ার জন্যে তিনি তাঁকে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা মুবারকে গিয়ে চাইবার পরামর্শ দেন। এর ফলে সাইয়েদ আহমদ মাদানী আফেন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হুজুরাহ আস্

সায়াদার দরজায় যেয়ে যা খুশি তাই চাইতেন এবং শাবাকাত আস্ সায়াদার ভেতর থেকে তাঁকে তা দেয়া হতো এবং তিনি তা গ্রহণ করে খেতেন।

"ফিলিস্ নিবাসী মুস্তাফা ইশক্বী আফেন্দী তাঁর ইতিহাস পুস্তক 'মাওয়ারিদ-এ-মাজিদিয়্যা'-তে লিখেছেন: 'আমি মক্কাতে বিয়ে করে বিশ বছর বসবাস করি। আমি, আমার স্ত্রী ও সন্তানেরা ষাটটি স্বর্ণ মুদ্রা জমিয়ে ১২৪৭ হিজরী সালে মদীনায় চলে আসি। সফরের মধ্যে সমস্ত টাকা খরচ হয়ে যায়। একজন বন্ধুর বাসায় অতিথি হিসেবে থাকতে যাই। আমি হুজরাহ আস্ সায়াদায় গিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহায্য কামনা করি। তিন দিন পর জনৈক ভদ্রলোক আমার ওই বন্ধুর ঘরে এসে আমাদেরকে জানান যে তিনি আমাদের জন্যে একটি আলাদা বাসা ভাড়া করেছেন। সেই বছরের সম্পূর্ণ ভাড়া তিনি মিটিয়ে দেন। কয়েক মাস পরেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং এক মাসের জন্যে শয্যাশায়ী হই। ঘরে তখন আর কোনো জিনিস অবশিষ্ট ছিল না। আমার স্ত্রীর সাহায্য নিয়ে আমি ঘরের সিঁড়ি বেয়ে উঠি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সবুজ গুম্বজের দিকে মুখ ফেরাই। কিন্তু যখন আমি দোয়া করবার জন্যে হাত ওঠাই, তখনই দুনিয়ার কোনো বস্ত চাইতে লজ্জা বোধ করি। আমি কিছু বলতে পারি নি। তাই নিজের ঘরে নেমে আসি। পরের দিন জনৈক ব্যক্তি এসে আমাকে বলেন যে অমুক আফেন্দী (সাহেব) আমাকে উপহারস্বরূপ কিছু স্বর্ণমুদ্রা দান করেছেন। বাহক কিংবা প্রেরকের পরিচয় না জেনেও আমি (স্বর্ণের) থলেটি গ্রহণ করি। আমাদের বিপদ কেটে যায়। কিন্তু আমার অসুখের অবসান ঘটে না। সাহায্য নিয়ে আমি হুজরাহ আস সায়াদায় যাই এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সুস্থতা দানের জন্যে আবেদন জানাই। এরপর আমি মসজিদ থেকে বের হয়ে আসি এবং কারও সাহায্য ছাড়াই হেঁটে বাড়ি ফিরে আসি। বাসায় ঢোকার সময় আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাই। কিছু দিন বাড়ি থেকে বেরোবার সময় একটা লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটতাম যাতে বদ নযর না লাগে। সহসা সমস্ত টাকা আবার ফুরিয়ে যায়। ফলে আমাদের ঘরে আর একটা মোমবাতিও জ্বালাবার ক্ষমতা ছিল না। আমার স্ত্রী ও সন্তানদেরকে অন্ধকারে রেখে আমি মসজিদ আন্ নববীতে গিয়ে এশার নামায পড়ি এবং হুজরাহ আস্ সায়াদায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আমার বিপদের কথা জানাই। বাসায় ফেরার পথে অজ্ঞাত একজন মানুষ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এক থলে ভর্তি টাকা দিয়ে চলে যান। আমি দেখি যে সেখানে ঊনপঞ্চাশটি স্বর্ণ মুদ্রা রয়েছে (যার প্রত্যেকটির মূল্য নয় পিয়াষ্টার)। আমি দিক পরিবর্তন করে মোমবাতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে বাড়ি ফিরে আসি।

“মুস্তফা ইশক্বী আফেন্দী আরও লিখেছেন যে যখন তাঁর পুত্র মুহাম্মদ সালেহ শিশু ছিল, তখন তার মাতা (অর্থাৎ, ইশকী আফেন্দীর স্ত্রী) অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ফলস্বরূপ শিশুকে বুকের দুধ পান করাবার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেন। দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে ইশক্বী আফেন্দীর পুত্রকে হুজরাহ আস্ সায়াদায় নিয়ে পর্দার এক পার্শ্বে রেখে দোয়া করেন: ‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা ওয়া আতাওয়াজ্জাহু ইলাইকা বি নাবিই-ইনা ওয়া সাইয়েদীনা মুহাম্মাদীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাবিই-ইর-রাহমা, ইয়া সাইয়েদিনা ইয়া মুহাম্মদ ইন্নী আতাওয়াজ্জাহু ইলা রাব্বীকা আরসিল মুরদি’আতা লি-হাযাল মা’সূম।’ পরের দিন প্রত্যুষে শরীফ নামে (প্রশাসনের) একজন অফিসার আগমন করে বলেন: ‘জনাব, আমার তিন মাসের কন্যা মারা গিয়েছে। আমরা তার মায়ের দুধ বন্ধ করতে পারবো না। আমি জানতে চাই এখানে কারও দুধ-মায়ের প্রয়োজন আছে কিনা। ইশকী আফেন্দী তাঁর পুত্রকে দেখালে অফিসার ভদ্রলোক বলেন: ‘আল্লাহর ওয়াস্তে একে আমরা লালন পালন করবো যদি আপনি একে আমাদের কাছে দেন। একে ভালভাবে বড় করবো। আমার স্ত্রী খুবই আনন্দিত হবে।’ এরপর শিশুটিকে তিনি নিয়ে যান সঙ্গে করে।

“আব্বাসীয় খলিফা আবু জাফর মনসুরের সঙ্গে মসজিদ আন্ নববীতে কথা বলার সময়ে ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: ’ওহে খলীফা মনসুর আমরা এখন মসজিদ আস্ সায়াদাতে আছি। আস্তে কথা বলুন আল্লাহ তা’আলা কিছু লোককে ভর্ৎসনা করে বলেছেন, **لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ** “আমার রাসূলের উপস্থিতিতে তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করবে না”।[১] আরেকটি আয়াতে **إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ** “যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপস্থিতিতে নিচু স্বরে কথা বলে”,[২] তিনি মৃদু স্বরে কথোপকথনকারীদেরকে প্রশংসা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বেসালপ্রাপ্তির পর সম্মান প্রদর্শন করা তাঁর জীবদ্দশায় সম্মান প্রদর্শন করার মতোই।’

“এই উপদেশ শুনে খলিফা মনসুর তন্দ্রা হতে জাগ্রত হলেন এবং মাথা নত করে বললেন, ’ইয়া আবা আব্দাল্লাহ আমি কি ক্বিবলার দিকে মুখ ফেরাবো? নাকি রওযায়ে আকদসের দিকে?’ হযরত ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন: ‘রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিক থেকে আপনি মুখ ফিরিয়ে নেবেন না। ওই মহান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি শেষ বিচারের

---

[১]. আল কুরআন : সূরা হুজরাত, ৪৯/২।

[২]. প্রাগুক্ত ৩।

দিনে শাফায়াত করবেন, তিনি আপনার এবং আপনার পিতা আদম আলাইহিস্ সালাম-এর নাজাতের জন্যে শাফায়াত করবেন। তাঁর রওযা পাকের দিকে মুখ ঘুরিয়ে এবং তাঁর পবিত্র রুহ মুবারকের সঙ্গে নিজের রুহকে সংশ্লিষ্ট করে আপনার উচিৎ তাঁর সুপারিশ প্রার্থনা করা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করমান,

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

–তাদের (মুমিনদের) নফসের প্রতি যুলুম করার পর যদি তারা আপনার কাছে আসে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় আর আপনিও যদি তাদের সপক্ষে ক্ষমা চান (অর্থাৎ শাফায়াত করেন), তাহলে নিশ্চয়ই তারা আল্লাহকে তওবা কবুলকারী ও অত্যন্ত দয়াবান হিসেবে পাবে।[১]

আয়াতটা ওয়াদা করে যে যারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নিজেদের তওবার মধ্যে শাফায়াতকারী বানাবে, তাদের দোয়া কবুল করা হবে। এ কথা বলার পর খলীফা মনসুর উঠে দাঁড়িয়ে হুজরাহ আস্ সায়াদার সামনে গিয়ে দোয়া করেনঃ 'হে আমার আল্লাহ আপনি ওয়াদা করেছেন যে আপনি তাদের তওবা কবুল করবেন যারা আপনার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে শাফায়াতকারী বানাবে। তাই আমি আপনার মহান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুযুরে (উপস্থিতিতে) আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যাহেরী (প্রকাশ্য) জিন্দেগীতে ছিলেন তখন যেভাবে আপনি আপনার বান্দাদেরকে ক্ষমা করেছিলেন, ঠিক সেভাবে আমাকেও ক্ষমা করুন। হে আমার আল্লাহ আমি আপনার কাছে কামনা করি। আপনার মহান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি "নবী আর রাহমা" (রহমতের নবী) তাঁরই শাফায়াতের মাধ্যমে আপনার কাছে প্রার্থনা করছি। ইয়া আল্লাহ সেই মহান নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমার জন্যে শাফায়াতকারী বানিয়ে দিন।' যখন তিনি এই দোয়া করছিলেন তখন তিনি মুওয়াজাহাত আস্ সায়াদার জানালার দিকে মুখ করে এবং ক্বিবলার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর বাম পাশে ছিল মিম্বর আন্ নববী। উপরোক্ত আয়াতটি কিছু মানুষের (সাহাবায়ে কেরামের) বেলায় অবতীর্ণ হলেও তাফসির কিতাবসমূহ লিখে যে আদেশটি সকল মুসলমানের প্রতি বর্তাবে।

---

[১]. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪/৬৪।

“**টীকা:** হযরত ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক খলিফা মনসুরকে প্রদত্ত উপদেশটি প্রতিভাত করে যে হুজরাহ্ আস্ সায়াদার সামনে দোয়া পাঠকারীদের অত্যন্ত তৎপর হতে হবে। সেই স্থানে যারা যথাযথ মর্যাদা ও তা'যিম প্রদর্শন করতে অপারগ তাদের উচিৎ নয় মদীনা-এ-মুনাওয়ারায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত করা। হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন: ‘আমাদের এখানে (মদীনায়) অবস্থান করে বাগদাদে থাকার চেয়ে বাগদাদে অবস্থান করে এখানে থাকা অনেক উত্তম’।

“এক আনাতোলীয় গ্রামবাসী হুজরাহ আস্ সায়াদার একটা বিশেষ কাজে খেদমত করতো। সে বিয়ে করে একদিন জ্বরজনিত অসুখে আক্রান্ত হয়। তখন সে আয়রান নামক ঠান্ডা দধি কামনা করে মনে মনে চিন্তা করে: ‘আমি যদি আমার গ্রামে থাকতাম তাহলে আয়রান পান করতাম।’ সেই রাতে শাইখুল হারামের (প্রধান খাদেমের) স্বপ্নে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করেন এবং তাঁকে আদেশ দেন যেন তিনি উক্ত লোকটির কাজ অন্য কারও ওপর ন্যস্ত করেন। যখন শাইখুল হারাম আরয করেন: ’ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার অমুক উম্মাত ওই কাজের দায়িত্ব পালন করে থাকে’, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ’ওই লোককে বলো তার গ্রামে গিয়ে আয়রান পান করতে।’ পরের দিন ওই গ্রামবাসীর কাছে আদেশটি জানানো হলে সে ‘জো হুকুম’ বলেই স্বদেশ যাত্রা করে। অতএব, এটা উপলব্ধি করা উচিৎ যে যদি ওই রকম একটা সামান্য চিন্তা ওই ধরণের মারাত্মক ক্ষতি বয়ে আনতে পারে, তাহলে আল্লাহ মাফ করুন শরীয়তের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ কোনো কথা কিংবা কাজ আরও মারাত্মক ক্ষতি বয়ে আনতে সক্ষম, এমন কি যদি তা ঠাট্টাচ্ছলেও হয়ে থাকে।

“যারা হুজরাহ্ আস্ সায়াদা যিয়ারত করতে যান, তাঁদের উচিৎ অত্যন্ত তৎপর হওয়া এবং দুনিয়াবী চিন্তা মনের মধ্যে পোষণ না করা। তাঁদের উচিৎ হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নূর (জ্যোতি) ও উচ্চমর্যাদা সম্পর্কে চিন্তা করা। যে সমস্ত লোক দুনিয়াবী/পার্থিব চিন্তা করে এবং ব্যবসায় উন্নতি ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন লোকদের কাছ থেকে মর্যাদা লাভের কথা চিন্তা করে, তাদের দোয়া কবুল হবে না, তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত বস্তু পাবে না।

“হুজরাহ আস্ সায়াদার যিয়ারত একটা মহামূল্যবান ইবাদত। এটা আশংকা করা হয় যে যারা এতে ঈমান রাখে না, তারা ইসলাম হতে বিচ্যুত হতে পারে। বস্তুতঃ তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলমানদের

বিরুদ্ধাচরণকারী। যদিও কিছু মালেকী মাযহাবের উলামা বলেছেন যে যিয়ারতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াজিব, তবুও এটা সর্বসম্মতভাবে ঘোষিত হয়েছে যে সেটা মুস্তাহাব।[১]”

১০/ ২০৮ নং পৃষ্ঠায় ওয়াহাবীটি বলে:

ثُمَّ قَالَ: وَمِنْ أَنْوَاعِهِ- أَيِ الشِّرْكِ- طَلَبُ الْحَوَائِجِ مِنَ الْمَوْتَىٰ وَالِاسْتِغَاثَةُ بِهِمْ، وَهَذَا أَصْلُ شِرْكِ الْعَالَمِ. فَإِنَّ الْمَيِّتَ قَدْ انْقَطَعَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، فَضْلاً عَمَّنْ اِسْتِغَاثَ بِهِ وَسَأَلَهُ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ إِلَى اللهِ. وَهَذَا مِنْ جَهْلِهِ بِالشَّافِعِ وَالْمَشْفُوعِ عِنْده؛ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ عِنْدَ اللهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَاللهُ لَمْ يَجْعَلْ اسْتِغَاثَتَهُ وَسُؤَالَهُ سَبَبًا لِإِذْنِهِ، وَإِنَّمَا السَّبَبُ كَمَالُ التَّوْحِيْدِ، فَجَاءَ هَذَا الْمُشْرِكُ بِسَبَبٍ يَمْنَعَ الإِذْنَ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مِنْ اسْتِعَانِ فِيْ حَاجَتِهِ بِمَا يَمْنَعُ حُصُوءلَهَا،

”ইবনুল কাইয়েম আল্ জওযিয়া বলেছেন যে শির্ক বহু প্রকার; কোনো ব্যক্তি তার অভাব মোচনের জন্যে মৃতদের কাছে প্রার্থনা করলে শির্ক হবে। মৃতজন কোনো কাজ (তাসাররুফ) করতে অক্ষম। যেহেতু মৃতজন নিজেদের চাহিদা মেটাতে এবং ক্ষতি থেকে নিজেদের রক্ষা করতেই অক্ষম, সেহেতু তাঁরা অন্যদেরকে সাহায্য করতেও অক্ষম। মৃতদেরকে আল্লাহর কাছে শাফায়াত করার জন্যে আবেদন জানানোও শির্ক। আল্লাহ যদি অনুমতি দেন, তবেই মৃতজন শাফায়াত করতে পারেন। কোনো ব্যক্তির দ্বারা মৃতজনকে আবেদন জানানো কখনও আল্লাহ কর্তৃক তাঁদেরকে অনুমতি প্রদানের কারণ হতে পারেনা। ওই ধরণের মুশরিক এমন একটা পন্থায় শাফায়াত চাইলেন যেটাতে শাফায়াতের অনুমতি রহিত হয়ে গেল।”[২]

বাস্তবক্ষেত্রে, যে সব জিনিস শাফায়াত করতে অক্ষম বলে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, যেমন মূর্তি, এবং যেগুলোকে আল্লাহর শরীক হিসেবে ধারণা করা হয়, সেগুলোর কাছে শাফায়াত কামনা করাই শুধু নিষিদ্ধ। নবী-ওলীবৃন্দ

---

[১]. মিরাতুল মদীনা।

[২]. ফাতহুল মাজীদ : ১/২০৮।

শাফায়াত করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত বলে ঘোষিত হয়েছে। তাঁদেরকে শাফায়াত করার জন্যে আবেদন জানানোয় কুরআন-হাদীসের ওপর মুসলমানদের অবিচল আস্থারই প্রতিফলন ঘটে। এ কথা সত্য যে শাফায়াত আল্লাহরই অনুমতিক্রমে হবে; কিন্তু কুরআন-হাদীসও তো বর্ণনা দেয় কারা শাফায়াত করতে পারবেন এবং কারা পারবে না। আর আল্লাহ যাঁদেরকে অনুমতি দেবেন তাঁরা তাঁদের সন্তুষ্টি অর্জনকারীদের জন্যেও শাফায়াত করবেন। এটা সুরা ওয়াদ্ দুহা-এ ইঙ্গিত করা হয়েছে: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى "আল্লাহ আপনাকে (হে রাসূল) আপনার সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করে দেবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি সন্তুষ্টি হবেন।[১]" ফিক্বহুল আকবর গ্রন্থের ১৪ নং পরিচ্ছেদে ইমামুল আযম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, "নবীগণ, উলামা ও পরহেযগার মুসলমানগণ মহা-গুনাহগারদের জন্যে শাফায়াত করে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন।"

মুসলমানগণ আউলিয়াকে আবেদন জানান তখনই, যখন তাঁরা অনুমতি পান শাফায়াত করার বেলায় এবং এ কারণে আবেদন জানান না যাতে আল্লাহ পাক তাঁদেরকে শাফায়াত করার অনুমতি প্রদান করেন। ওয়াহাবীরা এ সূক্ষ্ম পার্থক্য নির্ণয় করতে না পেরে বিচ্যুত হয়েছে। তারা কোটি কোটি মুসলমানকে শাফায়াত প্রার্থনার দায়ে 'কাফের' আখ্যায়িত করছে। তাদের পুস্তকটিও লিখছে যে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, তিনি বিশ্বাসী (ঈমানদারদের) জন্যে শাফায়াত করেন, মুশরিকদের জন্যে নয়। ওয়াহাবীটি নিজেই এই দোষারোপ করার বিষয়টি উদ্ভাবন করে নিয়েছে যে বেসালপ্রাপ্ত আউলিয়ার কাছে শাফায়াত চাওয়া শির্ক। 'কুরআন-এ-করীম মুশরিকদের জন্যে শাফায়াত নেই ঘোষণা করেছে'- এ কথাটা বলে সে আল্লাহ তা'আলার কুরআনকে নিজের জন্যে মিথ্যা সাক্ষী বানিয়ে নিয়েছে।

১১/ ওয়াহাবীটি ফাতহ আল্ মজিদের ২১৬, ২২০ এবং ২২৪ নং পৃষ্ঠায় নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা আবু তালিবের উদ্দেশ্যে নাযিলকৃত আয়াত উদ্ধৃত করে:

إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ.

> –আপনি যাদেরকে ভালোবাসেন তাদেরকে চাইলেই হেদায়েত দিতে পারবেন না, আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়েত দিতে পারেন[২]।

---

[১]. আল কুরআন : সূরা দ্বোহা, ৯৩/৫।
[২]. আল কুরআন : সূরা আল ক্বাসাস ১৯/৫৬ ।

এরপর সে বলে যে–

فَمَنْ اَدْعَاهَا مِنْ مَشَايِخِ الطُرُقِ الصُّوْفِيَةِ وَنَحْوِهِمْ، وَزَعَمَ أَنَّهُ يَدْخُلُ قُلَوْبَ مُرِيْدِيه وَتَلَامِيْذِهِ وَيَعْلَمُ مَا فِيْهَا وَيصَرِّفُهَا عَلَىٰ مَا يُرِيْدُ، فَهُوَ كَاذِبٌ ضَّالٌ مُضِّلٌ. وَمِنْ صِدْقِ ذَلِكَ فَهُوَ ضَّالٌ مُكَذِبٌ للهِ وَلِرَسُوْلِهِ–

–একমাত্র আল্লাহই ক্বলবসমূহকে কুফর (অবিশ্বাস) ও গুণাহ (পাপ) থেকে মুক্ত করে ঈমানদার এবং একান্ত বাধ্য করতে পারেন। এই মন্তব্যের পর সে বলে, ”যারা বলে যে তাসাউফের ইমামগণ তাঁদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবলে মুরিদদের ক্বলবের সব খবরাখবর নিতে পারেন এবং তাদেরকে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে পরিচালনা করতে পারেন, তারা মিথ্যাবাদী।[১]

আর যারা তাদেরকে বিশ্বাস করে তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও নবীগণের ওপর অবিশ্বাসকারী।

وَكُلُّ مَا عَبْدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ قَبْرٍ أَوْ مَشْهَدٍ أَوْ صَنَمٍ أَوْ طَاغُوْتٍ، فَالأَصْلُ فِيْ عِبَادَتِهِ هُوَ الغُلُوُّ. كَمَا لَا يَخْفَىٰ عَلَىٰ ذَوِيْ البَصَائِرِ. كَمَا جَرَىٰ لِأَهْلِ مِصْرَ وَغَيْرِهِمِ؛ فَإِنَّ أَعْظَمَ آلِهَتِهِمْ أَحْمَدْ البَدَوِيِّ، وَهُوَ لَا يَعْرِفُ لَهُ أَصْلَ وَلَا فَضْلَ وَلاَ عِلْمَ وَلاَ عِبَادَةَ. وَمَعَ هَذَا فَصَارَ أَعْظَمُ آلِهَتِهِمْ مَعَ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ إِلَّا أَنَّهُ دَخَلَ المَسْجِدَ يَوْمَ الجُمْعَةِ فَبَالَ فِيْهِ ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَصِلْ. ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ عَنْ أَبِيْ حَيَّانْ. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عِبَادَتَهُ فَاعْتَقَدُوا أَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِيْ الكَوْنِ، وَيَطْفِئُ الحَرِيْقَ وَيَنْجِيُ الغَرِيْقَ وَصَرَفُوْا لَهُ الإِلَهِيَّة والرُبُوْبِيَّة وَعَلَمَ الغَيْبَ وَكَانُوْا يَعْتَقِدُوْنَ أَنَّهُ يَسْمَعُهُمْ وَيَسْتَجِيْبُ لَهُمْ مِنَ الدِّيَارِ البَعِيْدَةِ. وَفِيْهِمْ مَنْ يَسْجُدُ عَلَىٰ عُتْبَةِ حَضْرَتِهِ. وَكَانَ أَهْلُ العِرَاقِ وَمِنْ حَوْلَهُمْ كَأَهْلِ عَمَّانَ يَعْتَقِدُوْنَ فِيْ

[১]. ফাতহুল মাজীদ : ১/২১৬।

عَبْدِ القَادِرِ الجِيْلَانِيْ وَأَعْظَمُ مِنْ هَذَا عِبَادَةُ أَهْلُ الشَّامِ لِابْنِ عَرَبِيْ، وَهُوَ إِمَامُ أَهْلُ الوَحْدَةِ الَّذِيْنَ هُمْ أَكْفَرُ أَهْلُ الأَرْضِ.

আল্লাহ ভিন্ন যে কোনো জিনিসকে পূজা করার নাম ওয়াসান। কবর ও রওযা সবই ওয়াসান। উদাহরণস্বরূপ, মিসরীয়দের সর্বশ্রেষ্ঠ মূর্তি হচ্ছেন আহমদ বাদাউয়ী। তাঁর নাম যে রকম প্রসিদ্ধ হয়নি, ঠিক সে রকম তার এবাদত, এলম এবং মাহাত্ম্যও প্রসিদ্ধ নয়। আস্ সাহাওয়ী বর্ণনা করেন যে একবার আহমদ বাদাউয়ী একটা মসজিদে প্রবেশ করে প্রশ্রাব করে নামায না পড়েই স্থানত্যাগ করেন। মানুষ তাঁকে দু'জাহানের মুশকিল আসানকারী মনে করে এবং আরও মনে করে যে তিনি আগুণ নেভাতে এবং ঝড়ে আক্রান্ত জাহাজকে বাঁচাতে সক্ষম। তারা তাঁকে দেবতা জ্ঞান করে এবং বলে যে তিনি গায়েব (অদৃশ্য জ্ঞান) জানেন, আর দূর থেকে শ্রবণ করতে পারেন এবং হাজত (প্রয়োজন) পূরণ করতে পারেন। অনুরূপভাবে, আম্মান ও ইরাকের জনগণ শায়খ আবদুল ক্বাদের জ্বিলানীকে পূজা করে।মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় কাফের ছিলেন।"[১]

যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়েত ও রহমত দান করেছেন এবং আযাব থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন, তাদেরকে তাসাউফের ইমামবৃন্দ চিনতে পারেন। তাদের মুক্তি অর্জনে তাঁরা ওয়াসিতা (বাহন)-স্বরূপ কাজ করেন। আউলিয়ার সাক্ষাৎ পাওয়া এবং তাঁদেরকে জানা ও আবেদন করা সবই আল্লাহ তায়ালা অনন্তকালে ইরাদা (ইচ্ছ) করেছিলেন এবং নিয়ামতস্বরূপ দান করেছিলেন। এই নেয়ামত তিনি মুসলমানদেরকে দান করবার নিয়্যত করেছিলেন মুতাসাউয়ীফগণের সোহবত (সান্নিধ্য) ও আহল্ আস্ সুন্নাতের উলামাগণের বইপত্রের মাধ্যমে। আর যাদেরকে তিনি ইচ্ছা করেছিলেন আযাব দেবার তাদেরকে ওয়াহাবীদের ফাঁদে ফেলে দিয়েছেন। ওয়াহাবীদের গোমরাহ বই-পুস্তকের হীন মিথ্যার মাধ্যমে তারা জাহান্নামে যাবে। আল্লাহ তা'আলার প্রিয় আউলিয়া, সুলাহা ও উলামাকে ওয়াহাবীটি গালমন্দ করেছে তখনই, যখন সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগ তুলেছে। যদিও কিছু বদকার লোক দুনিয়াবী স্বার্থসিদ্ধির জন্যে শরিয়তের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ কিছু কথা ও কাজ করে থাকতে পারে, তবুও তাদের এরকম অপকর্মের জন্যে সমগ্র মুসলিম মিল্লাতকে দোষারোপ করার অধিকার

[১]. ফাতহুল মাজীদ : ১/২২০।

ওয়াহাবীটিকে দেয়া যায় না। এটা অনেকটা হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম-কে দোষারোপ করার মতোই ব্যাপার যেহেতু খৃষ্টানরা তাঁকে পূজা করে।

হযরত আহমদ আল বাদাউয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একজন মহান ওলী ছিলেন। তাঁর পীর, যিনি তাঁকে খিলাফত দেন, তিনি ছিলেন মহান মুতাসাউয়ীফ শায়খ বারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, যিনি খিলাফত পেয়েছিলেন আলী নুয়াইম বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে। আলী নুয়াইম বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আহমদ কবীর রেফাঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক শিক্ষা-দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। হযরত রেফাঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একজন মহান ওলী ও শরীফ (ইমাম হাসানের বংশধর) ছিলেন। হযরত বাদাউয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-ও শরীফ ছিলেন এবং তিনি ৬৭৫ হিজরীতে বেসালপ্রাপ্ত হন। প্রতি বছর শত-সহস্র মুসলমান তান্তায় অবস্থিত তাঁর মাযার শরীফ যিয়ারত করে অশেষ ফয়েয লাভ করেন। এ সময় কোনো শরিয়ত-গর্হিত কাজ করা হয় না।[১] আর হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও হযরত মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর উচ্চ মর্যাদা এবং মাহাত্ম্য শত শত পুস্তকে লেখা আছে। হযরত আহমদ ফারুকী সিরহিন্দীর 'মাকতুবাত' গ্রন্থেও তিনি তাঁদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

১২/ ওয়াহাবী পুস্তকটির ২২৪ পৃষ্ঠায় লেখা আছে:

اَدْعَىْ ذَلِكَ الشَّعْرَانِيْ فِيْ كِتَابِ العُهُودِ المُحَمَّدِيَة. وَزَعَمَ أَنَّ شَيْخَهُ الخَوَّاصِ كَانَ لَا يَفَارِقُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَهَذَا كُلُّهُ كِذْبٌ وَبُهْتَانٌ. فَكَمْ وَقَعَ بَيْنَ الصَحَابَةِ مَعَ الخِلاَفَاتِ مَا كَانَ أَوْلَىٰ أَنْ يَجِيْئَهُمْ فِيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَرْجِعَهُمْ فِيْهَا إِلَىٰ الصَوَابِ الَّذِيْ يَطْفِئ الفِتْنَةَ،

–আশ্ শারানী লিখেছেন যে তাঁর শায়েখ আলী খাওয়াস হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এক মুহূর্তের জন্যেও জুদা (আলাদা) হন নি। এটা একটা মিথ্যা কথা। যদি এটা সত্য হতো, তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে তাঁর সাহাবীদের মধ্যকার বিভক্তি রহিত করতেন।[২]

---

১. মিরাতুল মদীনা : ১০১৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
২. ফাতহুল মাজীদ : ১/২২৫।

দ্বীন (ধর্ম) সম্পর্কে যার জ্ঞান ও বুদ্ধি আছে তিনি নিশ্চয়ই এভাবে তর্ক করবেন না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাদের মধ্যে ফিতনা ও বিভক্তি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন; তাহলে কীভাবে এ কথা ধারণা করা যায় যে তিনি এসে সেটাকে রহিত করবেন? আশ্ শারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক লিখিত তাঁর শায়খ ও হযরত রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আধ্যাত্মিক যোগাযোগের বর্ণনা প্রকৃতপক্ষে কাশ্‌ফ এবং মুশাহাদার (দিব্যদৃষ্টির) অর্থেই ব্যক্ত হয়েছে। এটা বস্তুগত কিছু নয় যা ওই সকল আহাম্মক যারা উপলব্ধির অতীত বিষয়কে অস্বীকার করে, তারা ধারণা করে বসে আছে। ওয়াহাবীদের জন্যে নিম্নোক্ত প্রবাদ বাক্যটিই প্রযোজ্য: "নিজেদের অজ্ঞাত বিষয়গুলোর প্রতিই মানুষ বেশি শত্রুতাভাব পোষণ করে।" হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলতেন যে তিনি সর্বদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখতে পেতেন এবং অনুতপ্ত হয়ে বলেছিলেন, "আপনার সামনে আমি নিজেকে লজ্জিত বোধ করছি"।

১৩/ ১৮০ নং পৃষ্ঠায় ওয়াহাবীটি ইমাম বূসীরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর 'ক্বাসিদাতুল বুরদা' পুস্তক হতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করে বলে,

لِأَنَّهُمْ فِيْ زَعْمِهِمْ لَمْ يَبْلغُوا مِنَ الغُلُوِّ وَالإِطْرَاءِ مَا بَلَغَ البُوْصِيْرِيْ. وَهَذَا هُوَ الغُلُوُّ الَّذِيْ جَرَ إِلَىٰ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ–

–এই সকল কথায় আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারও ওপর আস্থা স্থাপিত হয়েছে; আর এটাই হচ্ছে মহা শির্ক।[১]

আল্লাহ তায়ালা হযরত রসূল-এ-করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রশংসা করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও নিজেকে তারিফ করেছেন। তিনি নিজেকে এতোই প্রশংসা করেছেন যে হযরত ইমাম বুসীরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর প্রশংসাকে তার সঙ্গে তুলনা করাই চলে না। এ সব প্রশংসাপূর্ণ হাদীস আমার 'সায়াদাতে আবাদিয়া' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। রাসূল-এ-আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা করা এবাদত বৈ কিছু নয়। সকল সাহাবীই তাঁর প্রশংসা করেছিলেন; উদাহরণস্বরূপ, হযরত হাসান ইবনে সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত কাআব ইবনে যুহাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর দীর্ঘ প্রশংসাসমূহ সর্বজনবিদিত। হযরত কা'আব ইবনে যুহাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর 'বানাত সুয়াদ' পুস্তকে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ইমাম বুসীরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর চেয়েও বেশি তারিফ করেন। রাসূলুল্লাহ

১. ফাতহুল মাজীদ ১/১৮০।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে (ইবনে যুহাইরকে) নিজের খিরকা মোবারক উপহারস্বরূপ দান করেন। সেই একই খিরকা আজকে ইস্তাম্বুলের তোপকাপি প্রাসাদে (জাদুঘরে) সংরক্ষিত আছে। ওয়াহাবীটি ইমাম বুসীরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ক্বাসিদা থেকে একটি পংক্তি উদ্ধৃত করে,

يَا أَكْرَمُ الخَلْقِ مَا لِيْ مِنْ أَلُوْذِ بِهِ ♦ سِوَاكَ عِنْدَ حُدُوْثِ الحَادِثِ العُمَمِ

[হে মহান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি সৃষ্টিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে বেশি দয়াবান আমার শেষ নিঃশ্বাসের মুহূর্তে আপনি ছাড়া আর কেউ নেই যার কাছে আশ্রয় নিতে পারি]

এবং বলে যে হুজুর পূর নুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহায্য প্রার্থনা করা শিরক। ত্ববরানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রেওয়ায়াতকৃত একটা হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে সে বলে যে সৃষ্টির কাছে সাহায্য প্রার্থনা (ইসতিগাসা) করা শির্ক। এই হাদীসের উৎপত্তি ঘটে তখন, যখনি একজন মুনাফেক মুসলমানদের অতিষ্ঠ করছিল। সেই সময় হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: "চল আমরা হুযূরের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছে যাই এবং তাঁর কাছে আশ্রয় ও সাহায্য চাই।" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উত্তরে বলেন, "সাহায্য আমার কাছে চাওয়া যাবেনা; আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে" (হাদীস)। ওয়াহাবীটি এই হাদীস খানা পেশ করে আহল্ আস্ সুন্নাতকে আক্রমণ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। অথচ এই হাদিসের অর্থ হচ্ছে: "একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সকলকে সব ধরণের ক্ষতি থেকে রক্ষা করেন এবং রক্ষা করার মাধ্যমসমূহ সৃষ্টি করে দেন। আর সেই মাধ্যমগুলোকে রক্ষা করার ক্ষমতা ও প্রভাব প্রদান করেন। যদি তিনি তা ইচ্ছা না করেন তাহলে তিনি কোনো ব্যক্তিকে সেই মাধ্যমসমূহ পর্যন্ত পৌঁছুতে দেন না। আরেক কথায়, মাধ্যমগুলোর অস্তিত্ব থাকলেও সেগুলোর কোনো প্রভাব থাকবে না। যারা আমার সাহায্য প্রার্থনা করে তাদের জানা উচিৎ যে এই প্রভাব আমার (নিজস্ব) নয়, বরং আল্লাহ তায়ালার।" এটা কি হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জানতেন না? নিশ্চয়ই জানতেন কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যাতে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আগমনকারী মুসলমান প্রজন্ম এই কথাকে ভুল না বোঝেন। অতএব, জেনে রাখুন যে এই প্রভাব সমস্তই আল্লাহ তা'আলার। 'মকতুবাত' প্রথম খন্ডের ১১০ নং চিঠিতে ইমাম মাসুম ফরুকী বলেন: "আল্লাহ পাক তাঁর ক্ষমতাকে মাধ্যমসমূহের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছেন। তিনি যেমনভাবে ঘোষণা করেছেন যে একমাত্র তিনিই

সকল ক্ষমতার আধার, ঠিক তেমনিভাবেই তিনি আমাদেরকে মাধ্যমসমূহ আকড়ে ধরার আদেশ দিয়েছেন। তিনি এটা জ্ঞাত করেছেন যে মুমিন মুসলমানগণের উচিত মাধ্যমসমূহকে আঁকড়ে ধরে স্রষ্টার ওপর তাওয়াক্কুল করা যে স্রষ্টা মাধ্যমসমূহকে প্রভাব বিস্তারকারী ক্ষমতা প্রদান করেছেন। আর তাই তিনি কুরআন-এ-করীমে হযরত ইয়াকুব নবী আলাইহিস্ সালাম-এর প্রশংসা করেছেন এই মর্মে যে তিনি মাধ্যমগুলোকে আঁকড়ে ধরে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করেছিলেন। আল্লাহ সূরা ইউসুফ-এ ইরশাদ করেন:

وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

> –ইয়াকুব জানেন আমরা তাঁকে যা শিক্ষা দিয়েছি। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ জানে না যে তাকদীর (ভাগ্য/নিয়তি) সাবধানতার ওপর আধিপত্যশীল'।[১]

তাফসীর কিতাব 'তিবইয়ান'-এ এই আয়াতটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে: 'মুশরিকরা জানতে পারেনা আল্লাহ তা'আলা তাঁর আউলিয়াকে কী কী জিনিস জানিয়েছেন। যারা বিশ্বাস করে যে প্রভাব (তা'সির) মাধ্যমসমূহেরই আয়ত্ত্বাধীন এবং আল্লাহর ক্ষমতা ছাড়াই মাধ্যমসমূহ তা'সির (প্রভাব বিস্তার) করতে পারে, তারা গোমরাহ যে ব্যক্তি মাধ্যমগুলোকে পরিহার করতে চায় এবং আল্লাহ তা'আলার দূরদর্শিতাকে উপলব্ধি করতে অক্ষম, সে প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করে যে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিসমূহকে কারণ ছাড়াই অথবা বিনা প্রয়োজনেই সৃজন করেছেন। এই বিশ্বাসটি কোনো ব্যক্তিকে অলস বানিয়ে দেয়। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে আল্লাহ পাক মাধ্যমসমূহের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা দিয়েছেন, সে সঠিক পথপ্রাপ্ত হয় এবং সে-ই এ দু'টি বিপদ থেকে রক্ষা পায়" (মাসুম ফারুকী: 'মকতুবাত')। যদি ওয়াহহাবীরা এই সূক্ষ্ম বিষয়টি বুঝতে পারতো, তাহলে তারা উপরোক্ত হাদীসটিও বুঝতে সক্ষম হতো।

ইমাম বুসীরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন একজন মহান মুতাসাওয়ীফ (বেসাল ৬৯৫ হিজরী)। তাঁর পীর ছিলেন শাযিলী তরীক্বার প্রবর্তক হযরত আবুল হাসান আশ্ শাযিলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সুযোগ্য খলিফা হযরত আবুল আব্বাস আল্ মুরসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। যখন ইমাম বুসীরী পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন এবং তাঁর এক পাশ অবশ হয়ে যায়, তখন তিনি হুযূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং তাঁর বিখ্যাত কাসিদাটি সাইয়্যেদুল মুরসালিনের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শানে রচনা করেন। স্বপ্নে

[১]. আল কুরআন : সূরা ইউসুফ, ১২/৬৮।

তিনি এটা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পড়ে শোনান। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা খুবই পছন্দ করেন এবং নিজের খিরকাটি খুলে নিয়ে ইমাম বুসীরীকে পরিয়ে দেন এবং নিজের পবিত্র হাত দিয়ে হযরত ইমামের পক্ষাঘাতগ্রস্ত দেহের অংশগুলো ঘষে দেন। যখন ইমাম বুসীরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ঘুম থেকে জেগে ওঠেন, তখন তাঁর শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ, আর ওই খিরকাটি তাঁর পরণেই ছিল। এ কারণেই তাঁর ক্বাসিদার নাম 'ক্বাসিদাতুল বুরদা'। 'বুরদ' মানে খিরকা। হযরত ইমাম আনন্দিত হয়ে ফজরের নামায পড়তে মসজিদে গমন করেন। ফেরার পথে জনৈক সৎ ও পরহেযগার ব্যক্তির সাথে তাঁর দেখা হয়ে যায়, যিনি তাঁকে বলেন: "আমি আপনার ক্বাসিদাটি শুনতে ইচ্ছুক।" হযরত ইমাম বুসীরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উত্তর দেন: "আমার বহু ক্বাসিদা আছে। প্রত্যেকেই সেগুলো জানেন।" তখন ওই পরহেযগার ব্যক্তি বলেন: "আমি সেটা শুনতে চাই যেটা কেউই জানেন না এবং যেটা গত রাতে আপনি রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পড়ে শুনিয়েছেন।" হযরত ইমাম বিস্মিত হয়ে বললেন: "আমি তো কেউকেই এটা বলিনি। আপনি কীভাবে জানলেন?" এ কথায় পরহেযগার ওই ব্যক্তি হযরত ইমামের স্বপ্নের বর্ণনা দিলেন।

উযির বাহাউদ্দীন এ ক্বাসিদাটি সম্পর্কে জানতে পেরে এর আবৃত্তি শোনার ব্যবস্থা করেন। যখন ক্বাসিদাটি আবৃত্তি করা হচ্ছিল তখন তিনি কিয়াম করেন। এটা পরিদৃষ্ট হয়েছে যে 'ক্বাসিদাতুল বুরদা' যখনই আবৃত্তি করা হয়েছে, তখনই ব্যাধিগ্রস্তরা আরোগ্য লাভ করেছেন এবং রোগ ও দুর্যোগ দূর হয়ে গিয়েছে। এর থেকে বরকত আদায় করতে হলে এর ওপর বিশ্বাস রাখা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে এটি পাঠ করা একান্ত আবশ্যক।

'ক্বাসিদাতুল বুরদা' দশ ভাগে বিভক্ত: প্রথম ভাগ ব্যক্ত করে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ইশক্ বা ভালোবাসার মূল্য। দ্বিতীয়টি কোনো ব্যক্তির নফসের শয়তানী সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়। তৃতীয় ভাগ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা করে। চতুর্থ ভাগে রয়েছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা। পঞ্চম ভাগ ঘোষণা দেয় যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়া সাথে সাথেই ক্বুবুল হয়। ষষ্ঠটি কুরআন-এ-করীমের প্রশংসা করে। সপ্তম ভাগ মিরাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সূক্ষ্ম বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করে। অষ্টম ভাগটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জ্বিহাদগুলো সম্পর্কে আলোচনা করে। নবম খন্ডে হযরত ইমাম বুসীরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহর কাছে দয়া ও মাগফেরাত কামনা করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

শাফায়াত প্রার্থনা করেন। দশম ভাগটি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা দেয়।

এই ওয়াহাবী তার বইয়ে সৌদি পরিবারের গুণ-কীর্তন যতটুকু সম্ভব করেছে। অথচ এই সৌদি পরিবার শত-সহস্র মুসলমানের হত্যাকারী। এক পক্ষে ওয়াহাবীটি নির্দোষ মানুষের রক্তমাখা সৌদিদের নিষ্ঠুর তলোয়ারগুলোকে মুসলিম মুজাহিদগণের রহমতপ্রাপ্ত তলোয়ারগুলোর সমকক্ষ বানিয়েছে, অপর পক্ষে আল্লাহতা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসাকে মূর্তিপূজারীদের দ্বারা তাদের মূর্তিগুলোর প্রতি গাওয়া প্রশংসাগীতের সঙ্গে তুলনা দিয়েছে। যারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা করেন, তাঁদেরকে সে মুশরিক আখ্যায়িত করেছে। আহাম্মক ওয়াহাবীটি বুঝতে পারে না যে কাফেররা তাদের মূর্তির প্রশংসা করে ওগুলোকে দেবতা এবং স্রষ্টা জ্ঞান করে। ওই ধরণের প্রশংসা শুধু আল্লাহ পাকের জন্যেই সুনির্দিষ্ট। মুসলমানগণ একমাত্র আল্লাহকেই এভাবে প্রশংসা করে থাকেন। আমরা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হিসেবে হুযূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা করে থাকি; এবং কোনো ইসলামী আলেমই যিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশার্থে অনেক প্রশংসা করেছেন, তিনিও কখনোই তাঁকে প্রশংসা করে স্রষ্টার আসনে বসাননি। উলামাগণ আল্লাহকে যেভাবে প্রশংসা করেন, সেভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা করেন না। ওয়াহাবীরা সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে একেবারেই অক্ষম। ওয়াহাবীটি তার বইটিকে মক্কার কাফেরদের প্রতি নাযিলকৃত আয়াতসমূহ এবং হাদীসসমূহ দিয়ে ভরপুর করে বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়েছে, আর সেই বিকৃত ব্যাখ্যা দ্বারা আল্লাহর ভালোবাসাপ্রাপ্ত মুতাসাওয়ীফ ও ইসলামী উলামাকে 'কাফের' এবং 'মুশরিক' ফতোওয়া দিয়েছে। যারা এই ওয়াহাবী পুস্তকটি পাঠ করবেন তারা যদি অজ্ঞ হন, তাহলে তারা এই বইটির প্রত্যেক পাতায় আয়াত ও হাদীস লিপিবদ্ধ দেখে সেগুলোর ব্যাখ্যাকে সহীহ মনে করবেন এবং ফলস্বরূপ বিভ্রান্তিতে পতিত হয়ে অনন্ত আযাব (শাস্তি) ভোগ করবেন (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ পাক আমাদের ঈমান হেফাযত করুন এবং গোমরাহদেরকে হেদায়েত দান করুন, আমিন।

১৪/ ফাতহ আল মজীদ পুস্তকের ২৩১ পৃষ্ঠায় ওয়াহাবীটি বলে:

أُوْلَئِكَ إِذَا مَاتَ فِيْهِمْ الرَجُلُ الصَالِحُ -أَوْ العَبْدُ الصَالِحُ-، بَنَوْا عَلَىٰ قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَرَوْا فِيْهِ تِلْكَ الصَّوَرْ، أُوْلَئِكَ شَرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللهِ وَقَدْ وَقَعَ

هَذَا فِيْ الأُمَّةِ كَثِيْرًا كَمَا وَقَعَ فِيْ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا لَا يَخْفِى عَلَىْ ذَوِيْ البَصَائِرِ. وَقَدْ زَادَ هَؤْلَاءِ الْمُتَأَخِرُوْنَ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ عَلَىْ مَا وَقَعَ مِنْ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ مِنْ هَذَا الشِّرْكِ بِأُمُوْرٍ:(مِنْهَا) أَنَّهُمْ يَخْلِصُوْنَ عِنْدَ الِاضْطِرَارِ لِغَيْرِ اللهِ وَيَنْسُوْنَ اللهَ. (وِمِنْهَا) أَنَّهُمْ يَعْتَقِدُوْنَ أَنْ آلِهَتِهِمْ مِنَ الأَمْوَاتِ يَتَصَرِفُوْنَ فِيْ الكَوْنِ دُوْنَ اللهِ. وَجَمَعُوْا بَيْنَ نُوْعِي الشِّرْكِ فِيْ الإِلَهِيَّةِ وَالرُبُوْبِيَّةِ وَقَدْ سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْهُمْ مَشَافَهَةً وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ اِبْنِ كَمَال مِنْ أَهْلِ عَمَّانْ وَأَمْثَاله: إِنَّ عَبْدَ القَادِرِ الجِيْلَانِي يَسْمَعُ مَنْ دَعَاهُ وَمَعَ سَمَاعَهُ يَنْفَعُ فَزَعَمَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الغَيْبَ وَهُوَ مَيِّتٌ، فَلَقَدْ ذَهَبَ عَقْلَ هَذَا وَضَلَّ فَكَفَرَ بِمَا أَنْزَلَهُ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ-

"একটা হাদীসে ইরশাদ হয়েছে যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক হচ্ছে তারা যারা কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকবে এবং যারা কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করবে। ইসলামের পূর্বেও কবরকে মসজিদ বানানো হয়েছিল। ইসলামী ইতিহাসের শেষলগ্নে মুসলমানরা প্রাক-ইসলামী সমাজের চেয়েও বেশি সীমা লংঘন করছে। তারা তাদের বিপদের সময় আল্লাহকে ভুলে যায়। তারা মৃতজনকে প্রতিমা বানিয়ে ফেলে। তার বিশ্বাস করে যে মৃতজন তাদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম। তারা বলে যে আবদুল কাদের জিলানী শুনতে পান এবং তাদেরকে সাহায্য করেন, যারা তাঁর কাছে সাহায্য চায়। তারা মনে করে যে তিনি মৃত (নাউযুবিল্লাহ) হওয়া সত্ত্বেও গায়েব জানেন। যারা ওই ধরণের কথাবার্তা বলে তারা কাফের হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে তারা কুরআনকে অস্বীকার করে।[১]

وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ يَجِبُ هَدَمَ القُبَّابِ الَّتِيْ بُنِيَتْ عَلَىْ القُبُوْرِ-

ইবনুল কাইয়্যুম আল জওযিয়া বলেছেন যে কবরের ওপর নির্মিত গুম্বজ ধ্বংস করা ওয়াজিব।[২]

---

১. ফাতহুল মাজীদ ১/২৩৯।
২. ফাতহুল মাজীদ ১/২৪০।

وَجَزَمَ النَّوَوِيُّ رَحْمَهُ اللهُ فِيْ شَرْحِ الْمُهْذِبِ بِتَحْرِيْمِ الْبِنَاءِ مُطْلَقًا–

ইমাম নববী বলেছেন, যে নিয়্যতেই হোক না কেন, কবরের ওপর গুম্বজ নির্মাণ করা হারাম।[১]

যারা বলে যে কবরস্থানে সালাত পড়া ওর নোংরা পরিবেশ হওয়ার কারণে নিষিদ্ধ, তারা ভ্রান্ত। কারণ নবীগণের কবরসমূহ নাপাক নয়।

وَقَدْ صَرَّحَ اِبْنُ حُجَرْ الهَيْتَمِيّ المكِّيْ فِيْ كِتَابِهِ الكَبَائِرِ أَنَّ بِنَاءَ القُبَّابِ عَلَىْ القُبُوْرِ مِنْ الكَبَائِرِ المحْرِمَةِ بِالنَّصِّ الصَرِيْحِ. وَأَنَّ الوَاجِبَ عَلَىْ مُلُوْكِ المسْلِمِيْنَ وَأُمَرَائِهِمْ وَوَلاَتِهِمْ أَنْ يَهْدَمُوْا هَذِهِ القُبَّابُ وَيَبْدَأ وَبِقُبَةِ الإِمَامِ الشَّافِعِيْ.

–ইবনে হাজর আল হায়তামী মক্কী তাঁর 'কাবাইর' গ্রন্থে বলেছেন: 'কবরের ওপর গুম্বজ নির্মাণ করা মহাপাপ। মুসলমান শাসকদের জন্যে ওই ধরণের গুম্বজ ধ্বংস করা জরুরি। সর্বপ্রথমে ইমাম শাফেয়ীর গুম্বজবিশিষ্ট কবর ধ্বংস করা উচিৎ ' (ইবনে হাজর হায়হামী)।[২]

এখানেও ওয়াহাবীটি মুসলমানদের কুৎসা রটনা করেছে। মুসলমানগণ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর করুণা প্রার্থনা করেন। এই ধরণের মুসলমানগণ আল্লাহকে ভুলে যান বলাটা ডাহা মিথ্যা কথা। মুসলমানগণ বেসালপ্রাপ্ত আউলিয়ার পূজা-অর্চনা করেন না। যেহেতু বহু হাদীস ঘোষণা করে যে আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাগণ তাঁদের মাযার শরীফে শুনতে পান, সেহেতু মুসলমানগণ তাঁদের মাযার শরীফ যিয়ারত করে তাঁদেরকে মধ্যস্থতাকারী বানিয়ে আল্লাহর কাছে হাজত-মকসূদ কামনা করেন এবং তাঁদের শাফায়াত প্রার্থনা করেন। বেসালপ্রাপ্ত আউলিয়া তাঁদের (নিজ) ইচ্ছানুযায়ী কিছুই করতে পারেননা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করেছেন যে তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের, বিশেষ করে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় নবীদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া কবুল করে নেবেন। মুসলমানগণ নবী-ওলীগণের কাছে কোনো কিছু করার আবেদন জানান না, বরং আল্লাহ তা'আলার কাছে তা জানিয়ে থাকেন। আউলিয়া কেরাম যিয়ারতকারীদের ফরিয়াদ বুঝতে পারেন এবং তাঁরা আল্লাহর কাছে তাদের হয়ে দোয়া করেন। আর

---

[১].ফাতহুল মাজীদ ১/২৪২।

[২]. ফাতহুল মাজীদ ১/২৪২।

আল্লাহ সাথে সাথেই তাঁদের দোয়া কবুল করে ফরিয়াদকারীদের ফরিয়াদ মঞ্জুর করে দেন।

নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি ইমাম ইবনে হাজর হায়তামী মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর 'যাওয়াজির' গ্রন্থের ১২১ পৃষ্ঠা হতে অনূদিত হয়েছে, যাতে ওয়াহাবীটির বানোয়াট কাহিনী সবার কাছে স্পষ্ট হয়। উপরোক্ত হাদীসসমূহ এবং অনুরূপ আরও কিছু হাদীস উদ্ধৃত করে ইমাম ইবনে হাজর লিখেন: "উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে কিছু শাফেয়ী উলামা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে ছয়টি মহা-গুনাহের মধ্যে একটি হচ্ছে কবরকে মসজিদ বানানো। এর কারণ এই যে, যারা নবীদের মাযার-রওযাকে মসজিদ বানিয়েছিল, তাদেরকে একটি হাদীসে লা'নত (অভিসম্পাত) দেয়া হয়েছে; হাদীসটি আরও বর্ণনা দিয়েছে যে যারা পরহেযগার মুসলমানদের কবরকে মসজিদ বানাবে, তারা কেয়ামত দিবসের নিকৃষ্ট মানুষদের মতো (বিবেচিত) হবে। 'কবরকে মসজিদ বানানোর' অর্থ হচ্ছে 'সেই সকল কবরের দিকে মুখ করে সালাত (নামায) আদায় করা।' এই জন্যে শাফেয়ী উলামাগণ ঘোষণা করেছেন যে কোনো নবী অথবা ওলীর প্রতি তা'যিম প্রদর্শনার্থে তাঁর মাযারের দিকে মুখ করে সালাত (নামায) পড়া হারাম। ওই ধরনের একটি কাজ হারাম, কারণ প্রথমতঃ কবরস্থ ব্যক্তি নিশ্চয়ই অসাধারণ এবং ভক্তির যোগ্য। দ্বিতীয়তঃ সালাত বেসালপ্রাপ্ত ওই ব্যক্তির জন্যে আদায় করা হয়েছে। একইভাবে কবরের তাওয়াফ করা হারাম। অতএব, এই সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে ওই ধরণের কর্মকান্ড মকরুহ, যখন সেগুলো তা'যিম করার উদ্দেশ্যে করা না হয়। কিছু হাম্বলী উলামা বলেছেন, 'তাযিমের উদ্দেশ্যে কবরে সালাত আদায় করা মহাপাপ এবং এটা কুফর সৃষ্টিকারী (পাপ)।[১]"

ইমাম ইবনে হাজর হায়তামী মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'আল ফাতওয়া আল কুবরা আল ফিকাহিয়্যা' (মিসরীয় সংস্করণ) কিতাবের 'জানাযা' অধ্যায়ে বলেন: "সর্বসাধারণের গোরস্থান যেখানে অনেক মুন্দাকে দাফন করা হয়, সেখানে গুম্বজবিশিষ্ট কবর নির্মাণ করা উচিৎ নয়। যদি ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়ে থাকে, তবে সেগুলো ধ্বংস করা উচিৎ। সর্বসাধারণের গোরস্থানে নতুন কোনো মুন্দাকে একই স্থানে দাফন করার উদ্দেশ্যে গুম্বজবিশিষ্ট কবর ভেঙ্গে ফেলার অনুমতি নেই।" প্রাগুক্ত গ্রন্থের পৃষ্ঠা ১৭-তে তিনি বলেন: "সর্বসাধারণের কবরস্থানে গুম্বজবিশিষ্ট মাযার নির্মাণ করা হারাম। যেগুলো ইতোমধ্যেই নির্মিত হয়েছে সেগুলোকে ভেঙ্গে ফেলতে হবে। ওয়াক্বফকৃত অথবা ব্যক্তিগত কোনো কবরস্থানে

---

[১]. ইবনে হাজর হায়তামী মক্কী : যওয়াজির, ১২১ পৃঃ।

মালিকের অনুমতি ছাড়া ইমারত নির্মাণ করাও হারাম। নিজস্ব অথবা অন্য কারও জমিতে তার অনুমতিক্রমে গুম্বজবিশিষ্ট কবর নির্মাণ করা মকরুহ।" ২৫ নং পৃষ্ঠায় ইমাম ইবনে হাজর হায়তামী বলেনঃ "সর্বসাধারণের কবরস্থানে গুম্বজবিশিষ্ট কবরসমূহ নির্মাণ করা হারাম, কারণ সেগুলো বহু স্থান দখল করে রাখে যার ফলে অন্যদের দাফন করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। ওই ধরণের গুম্বজসমূহ ধ্বংস করা উচিৎ। এই কারণেই অধিকাংশ শাফেয়ী উলামা ফাতওয়া জারি করেন যে ইমাম শাফেয়ীর গুম্বজবিশিষ্ট কবর শরীফটা ভেঙ্গে ফেলা উচিৎ, যেহেতু সেটা সর্বসাধরণের কবরস্থানে অবস্থিত।[১]"

অতএব, এটা প্রতীয়মান হলো যে ইমাম ইবনে হাজর হায়তামী মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রত্যেক গুম্বজবিশিষ্ট কবরকে হারাম এবং ভেঙ্গে ফেলার যোগ্য বলে ফাতওয়া দেন নি। ওয়াহাবী পুস্তকটি শুধু কুরআন-হাদীসেরই অপব্যাখ্যা করেনি, উলামা-এ-দ্বীনের ফাতওয়ারও অপব্যাখ্যা করেছে।

'যাওয়াজির' পুস্তকের ২০১ পৃষ্ঠার লেখা আছে যে প্রদর্শনোদ্দেশ্যে বিশাল ইমারত নির্মাণ করা মহা-গুণাহ। হাদীসকে অনুসরণ করে ওয়াহাবীদের উচিৎ গুম্বজবিশিষ্ট কবরসমূহকে নয়, বরং ভোগ-বিলাস ও পতিতাবৃত্তির জন্যে তাদেরই দ্বারা নির্মিত রিয়াদ, তায়েফ এবং জেদ্দাস্থ বিশাল ইমারতসমূহ ধ্বংস করা। ওয়াহাবীটি পুস্তকটিতে ২৪৮ পৃষ্ঠায় একটি হাদীস উদ্ধৃত করেঃ

فَزُوْرُوا الْقُبُوْرَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ-

> –কবর যিয়ারত করো, কেননা তা (কবর যিয়ারত) তোমাদেরকে শেষ বিচারের দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।[২]

অতঃপর সে বলে যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত করেছিলেন। কিন্তু এ ঘটনাটা মৃতজনের কাছ থেকে কিছু চাওয়ার বৈধতা প্রমাণ করে না এ কথাটি বলে সে মুসলমানদের দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু

---

১. ফাতওয়া-এ-কুবরা-এ-ফিক্কাহিয়্যা।

২. মুসলিম : আস সহীহ, বাবুল ইস্তিযানি নাবিয়্যি ২/৬৭১ হাদীস নং ৯৭৬।

ক. নাসায়ী : আস সুনান, যিয়ারাতুল কুবুর আলাল মুশরিক ২/৪৬৫ হাদীস নং ২১৭২।

খ. হাকিম : আল মুস্তাতাদরাক, কিতাবুল জানায়িয ১/৫৩১ হাদীস নং ১৩৯০।

গ. বায়হাক্বী : আস সুনান, বাবু যিয়ারতিল ক্বুবুর ২/৩৬ হাদীস নং ১১৫২।

ঘ. আহ্মদ : আল মুসনাদ ২/৪১।

ঙ. শাফেয়ী : আল মুসনাদ ১/২১৭ হাদীস ৬০৩।

চ. বাগাবী : শরহুস সুন্নাহ ৫/ ৪৬৩ হাদীস নং ১৫৫৪।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আউলিয়ার মাযার শরীফ যিয়ারত করাকে কাফেরদের কবর পূজার সঙ্গে তুলনা করতে সচেষ্ট।

১৫/ ২৬০ পৃষ্ঠায় ওয়াহাবীটি লিখে,

هَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ النَّهِي عَنْ قَصْدِ القُبُوْرِ وَالمَشَاهِدِ لِأَجَلِ الدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ عِنْدِهَا، وَكَرَهَ مَالِكُ لِأَهْلِ المَدِيْنَةَ كُلَّمَا دَخَلَ الإِنْسَانُ المَسْجِدَ أَنْ يَأتِيَ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَانَ الصَّحَابَةُ وَالتَابِعُوْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَأْتُوْنَ إِلَىٰ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَصَلُّوْنَ، فَإِذَا قَضُوْا الصَّلَاةَ قَعِدُوْا أَوْ خَرَجُوْا، وَلَمْ يَكُوْنُوْا يَأْتُوْنَ القَبْرَ لِلسَّلَامِ؛ لِعَلَّمَهُمْ أَنَّ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْهِ فِيْ الصَّلَاةِ أَكْمَلُ وَأَفْضَلُ، وَأَمَّا دُخُوْلُهُمْ عِنْدَ قَبْرِهِ لِلصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ هُنَاكَ، أَوْ للصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ فَلَمْ يَشْرَعْهُ لَهُمْ وَيَظَنُّوْنَ أَنَّ نَفْسَ أَبْدَانِ المَوْتَىٰ خَرَجَتْ تَكَلَّمَهُمْ، وَأَنَّ رُوْحَ المَيِّتِ تَجَسَدَتْ لَهُمْ فَرَأَوْهَا كَمَا رَآهُم النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ المِعْرَاجِ. وَالمَقْصُوْدُ: أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ لَمْ يَكُوْنُوْا يَعْتَادُوْنَ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْهِ عِنْدَ قَبْرِهِ كَمَا يَفْعَلُهُ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنَ الخُلُوْفِ، وإِنَّمَا كَانَ بَعْضُهُمْ يَأتِيْ مِنْ خَارِجٍ فَيَسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، كَمَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ

وَمِنْ ذَلِكَ الحِكَايَةُ المفْتَرَأةُ المَنْسَوْبَةُ إِلَىٰ الشَّيْخِ أَحْمَدُ الرِّفَاعِيْ، وَأَنَّهُ طَلَبَ مِنْ النَّبْيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدَّ يَدَهُ لِيُقَبِّلُها ففعَلَ وَخَرَجَتْ اليَدَ فَقَبَّلَهَافَقَدْ اتَّفَقَ الأَئِمَّةُ عَلَىٰ أَنَّهُ إِذَا دَعَا لَا يَسْتَقْبَلُ القَبْرَ وَفِيْ الحَدِيْثِ دَلِيْلٌ عَلَىٰ مُنعَ شَدُّ الرِّحَالِ إِلَىٰ قَبْرِهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَىٰ غَيْرِهِ مِنْ القُبُوْرِ وَالمَشَاهَدِ-

-মসজিদ-এ-নববীতে সালাত আদায় করার উদ্দেশ্যে প্রবেশকারীর জন্যে কবর আস্ সায়াদায় গমন করে রসূল-এ-করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-কে সালাম জানানো নিষিদ্ধ। ইমাম মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে মসজিদে প্রবেশকারীর জন্যে প্রত্যেকবার প্রবেশের পর রওযায়ে আকদসের কাছে যাওয়া মকরূহ। সাহাবা ও তাবেয়ীনবৃন্দ মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়তেন এবং তারপর বেরিয়ে যেতেন; তাঁর রওযার কাছে যেয়ে সম্ভাষণ জানাতেন না, কেননা শরিয়াতে এ ধরণের কোনো আদেশ নেই। এটা একটা মিথ্যা কথা যে বেসালপ্রাপ্তদের রূহসমূহকে তাঁদের জীবদ্দশার চেহারায় দেখা যায়। এই ধরণের দর্শন একমাত্র মি'রাজ রজনীতেই ঘটেছিল। পরবর্তীকালের মুসলমানরা এমন সব কাজ করেছেন, যা সাহাবাগণ করেন নি। কতেক সাহাবী দূরবর্তী স্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর শুধুমাত্র সালাম জানানোর জন্যেই যিয়ারত করতেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সফরশেষে (এ রকম) যিয়ারত করতেন। আর কেউই এ রকম করেন নি। এটাও একটা বানোয়ট কাহিনী যে শায়খ আহমদ কবীর রেফাঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (রওযার ভেতর থেকে প্রসারিত) হাত মোবারক চুম্বন করেছিলেন। এটা সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত যে হুজরাহ আস্ সায়াদার সামনে দোয়া করার সময় কাবা শরীফের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে। রওযার দিকে মুখ ফেরানো চলবে না। দূরবর্তী স্থান থেকে হুজরাহ আস্ সায়াদা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাকে হাদীসসমূহে নিষেধ করা হয়েছে।" [১]

নিম্নের দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি 'মিরাতুল মদীনা' বইটি হতে গ্রহণ করা হয়েছে:

"ইবনে হুযায়মা, আল বাযযার, দারা-কুতনী ও আত্ তাবারানী রওয়ায়তকৃত একটা হাদীস ঘোষণা করে,

مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي

যারা আমার রওযা যিয়ারত করে তাদের জন্যে শাফায়াত করা আমার ওপর ওয়াজিব হয়ে গেছে।[২]

হযরত বাযযার কর্তৃক রেওয়ায়েতকৃত আরেকটি হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

[১]. ফাতহুল মাজীদ ২৬০-২৬১।

[২]. দারে কুত্নী : আস সুনান, বাবুল মাওয়াক্বিত ৩ /৩৩৪ হাদীস নং ২৬৯৫।

ক. বায়হাক্বী : শুয়াবুল ঈমান, ফাদ্বলুল হুজ্জ ওয়াল উমরা ৬/৫১ হাদীস নং ৩৮৬২।

খ. তিরমিযী : নাওয়াদিরুল উসূল ১/৫৮৫।

’আমার রওযা যিয়ারতকারীদের জন্যে শাফায়াত করা আমার পক্ষে হালাল করা হয়েছে।[১]

সহীহ মুসলিম শরীফ ও আবু বকর ইবনে মাককারীর ‘মুজামা’ পুস্তকে লিপিবদ্ধ হাদীসটি ঘোষণা করে,

مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لَا تُعْمِلُهُ حَاجَةٌ إِلَّا زِيَارَتِي، كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

–যদি কেউ অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া শুধুমাত্র আমার রওযা যিয়ারতের নিয়্যতে তা করে, তবে সে শেষ বিচারের দিনে আমার শাফায়াতের দাবিদার হবে।[২]

হাদীসটি আমাদেরকে শুভসংবাদ দেয় যে যাঁরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনায় গমন করেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফায়াত লাভ করবেন।

”ইমাম তাবারানী ও আদ্ দারা কুতনী এবং অন্যান্য হাদীসবেত্তা ইমামগণ কর্তৃক রেওয়ায়েতকৃত একটি হাদীস ইরশাদ ফরমায়:

مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ وَفَاتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي-

’হজ সমাপনের পর যে ব্যক্তি আমার রওযা যিয়ারত করলো, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমারই যিয়ারত (সাক্ষাৎ) পেল।[৩]

ইবনুল জাওযীও এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আদ্ দারেকুতনী বর্ণিত অপর এক হাদীস ঘোষণা করে:

---

[১]. বায্যার : আল মুস্নাদ।
[২]. ত্ববরানী : মু‘জামুল কাবীর, সালেম আন ইব্ন উমর, ১২/২৯১ হাদীস নং ১৩১৪৯।
ক. ইব্ন মাজাহ : আস সুনান, বাবু  ফাদ্বলিল মদীনা, ২/১০৩৯ হাদীস নং ৩১১২।
খ. ত্ববরানী : মু‘জামুল আওসাত ৫/১৬ হাদীস নং ৪৫৪৬।
গ. হায়ছামী : মাজমাউত যাওয়ায়িদ ২/৪।
ঘ.যাহাবী : মি‘যানুল ই‘তিদাল ৬/৪১৫।
[৩]. ত্ববরানী  : মু‘জামুল আওসাত্ব ৩/৩৫১ হাদীস নং ৩৩৭৬।
ক. ত্ববরানী : মু‘জামুল কাবীর ১২/৪০৬ হাদীস নং ১৩৪৯৭।
খ. দারে কুত্বনী : আস সুনান, বাবুল মাওয়াক্বিত ৩/৩৩৩ হাদীস নং ২৬৯৩।
গ. বায়হাক্বী : আস সুনান আল কুবরা, বাবু যিয়ারতিল ক্বরিন নাবিয়্যি ৫/৪০৩ হাদীস নং ১০২৭৪।
ঘ.বায়হাক্বী : শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফদ্বলিল হজ্জ্ব ও উমরা ৬/৪৮ হাদীস নং ৩৮৫৮।

مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِيْ فَقَدْ جَفَانِيْ–

'যে ব্যক্তি হজ করলো, কিন্তু আমার যিয়ারত করলো না, সে আমার প্রতি রুঢ় আচরণ করলো'।[১]

হাদীসটি ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-ও রেওয়ায়াত করেছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে এভাবে সওয়াব লাভের জন্যে তাঁর যিয়ারত করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইমাম বায়হাকী বর্ণিত একটি হাদীস ইরশাদ ফরমায়:

مَا مِنْ أَحَدٍ سَلَّمَ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللهُ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ

'যখন কেউ আমাকে সালাম দেয়, তখন আল্লাহ তা'আলা আমার দেহে আমার রূহ ফিরিয়ে দেন এবং আমি তার সালাম গ্রহণ করি'।[২]

এই হাদীসের ওপর ভিত্তি করে ইমাম বায়হাকী বলেছেন: 'নবীগণ তাঁদের মাযার শরীফে জীবিতাবস্থায় আছেন।' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রূহ মোবারককে ফিরিয়ে দেয়ার অর্থ হচ্ছে তিনি সকল নেয়ামত ও উচ্চ মর্যাদা ফেলে রেখে তাঁর প্রতি সালাম প্রদানকারীর প্রত্যুত্তর দেন।"নবীগণের মাযার-রওযায় তাঁদের হায়াত সম্পর্কে বর্ণনাকারী এতো হাদীস আছে যে সেগুলো একে অপরকে সমর্থন দেয়। সেগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে আবু বকর ইবনে আবি শায়বা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণিত হাদীস

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا أُبْلِغْتُهُ.

'আমার রওযায় পঠিত সালাওয়াত আমি শুনতে পাই। দূরে পঠিত সালাওয়াত সম্পর্কে আমাকে জানানো হয়'।[৩]

এটা এবং অন্যান্য হাদিসগুলো ছয়জন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দীস ইমামের গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে।

---

[১]. মালেক : মুয়াত্তা, বাবু ক্বরিন নবিয়্যি ৩/ ৪৪৮ হাদীস নং ৯৪৭।
ক. দারে কুত্বনী : আস সুনান।
খ. সুবকী : শিফাউস সিক্বাম ফি যিয়ারতি খাইরিল আনাম ২১।
গ. আল জাওয়াহিরুল মান্যার : ইব্ন হাজ্র মক্কী ২৮।
ঘ. নাবহানী : শাওয়াহিদুল হক্ব ফি ইস্তিগাছা বি সায়্যিদিল খলক ৮২।
[২]. ইসহাক্ব ইব্ন রাহভিয়া : আল মুসন্াদ ১/৪৫২।
[৩]. বায়হাক্বী : শু'য়াবুল ঈমান, বাবু তা'জিমিন নবী ৩/১৪০ হাদীস নং ১৪৮১।

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে ইবনে আবিদ্ দুনইয়া রেওয়ায়েতকৃত হাদীসটি ঘোষণা করেঃ 'যদি কেউ তার পরিচিতজনের কবর যিয়ারত করে সম্ভাষণ জানায়, তাহলে ওফাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাকে চিনতে পারেন এবং সালামের প্রত্যুত্তর দেন। যদি সে অপরিচিত কাউকে সালাম জানায়, তাহলে ওফাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি আনন্দিত হন এবং তার সম্ভাষণের প্রত্যুত্তর দেন'।[১]

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একই মুহূর্তে প্রত্যেকের সালাম আলাদা আলাদাভাবে গ্রহণ করার ব্যাপারটা অনেকটা মধ্যদিবসে সূর্যের দ্বারা সহস্র শহরে আলো বিকিরণের মতোই। এটা বোঝা গেল যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণকারীর সালাম সম্পর্কে জানতে পারেন এবং সালামের প্রত্যুত্তর দেন; একজন মুসলমানের জন্যে কি এর থেকে বড় নেয়ামত ও সম্মান আর হতে পারে?

"হযরত ইব্রাহীম ইবনে বিশার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন: 'হজের পর আমি রওযায়ে আকদস যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে মদীনা গমন করি। হুজরাহ আস্ সায়াদার সামনে সালাম জানানোর পর আমি উত্তর শুনতে পাই "ওয়া আলাইকাস সালাম"।'

"কবি নবী এ সম্পর্কে বলেন,

'গোস্তাখি হতে অবলম্বন কর সতর্কতা,
এখানেই আছেন আল্লাহর হাবীব, অতি পেয়ারা, এ
টাই হলো নাযার গাহে ইলাহী,
মকামে মোস্তফা, আদবশীল হলেই, নবী,
তুই এই দরগাহের ভেতরে যা,
যেথায় তওয়াফ করেন সকল ফেরেশতা,
আর আম্বিয়াগণ চুম্বন দেন সর্বদা।।' {ভাব অনুবাদ}

"একটি হাদীস ঘোষণা করে,

'আমার বেসালের পরে আমি শ্রবণ করবো যেভাবে আমি জীবিতাবস্থায় শ্রবণ করছি'।

আরেকটি হাদীস ইরশাদ ফরমায়,

---

[১]. ইব্‌ন আবীদ দুনিয়া।

الأَنبِيَاءُ أَحيَاءٌ يُصَلُّونَ فِي قُبُورِهِمْ.

–নবীগণ তাঁদের মাযার-রওয়ায় জীবিত, তাঁরা সালাত আদায় করেন।[১]

এ হাদীসগুলো পরিস্ফুট করে যে আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রওযা শরীফে জীবিতাবস্থায় রয়েছেন এবং তাঁর এই হায়াত সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। নির্ভরযোগ্য কিতাবাদিতে লেখা আছে যে মহান ওলী হযরত আহমদ কবীর রিফাঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং আরও বহু আউলিয়া কেরাম হুজরাহ আস্ সায়াদার ভেতর থেকে প্রত্যুত্তর শুনতে পেয়েছিলেন, যখনি তাঁরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সালাম জানান। হযরত রেফাঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নবী-এ-আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র হস্ত মুবারক চুম্বন করার মহাসম্মান অর্জন করেন। ওয়াহাবীদের এটাকে মিথ্যা বলাটা অনেকটা সূর্যের দিকে কাদা ছুঁড়ে মারার মতোই ব্যাপার। এতে তাদের একগুঁয়েমিই প্রতিভাত হয়। মহান আলেম-এ-ইসলাম ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর ‘শারাফ আল মুহকাম’ পুস্তকে ওয়াহাবীদের এসব দাবি সমূলে উৎপাটিত করেন এ কথা দলিল দ্বারা প্রমাণ করে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রওযা শরীফে জীবিতাবস্থায় আছেন এবং তিনি সম্ভাষণদানকারীর সালাম বুঝতে পারেন এবং ওর প্রত্যুত্তর দেন। ইমাম সুয়ুতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর কিতাবে বহু হাদীস উদ্ধৃত করেন, যেগুলোর মধ্যে নিম্নোক্তটি অন্যতম,

رأيت موسي يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ.

‘মিরাজ রজনীতে আমি মূসা নবী আলাইহিস্ সালাম-কে তাঁর রওযা শরীফে নামায পড়তে দেখি’।[২]

হাদীসটি ’হিলইয়া’ গ্রন্থের লেখক আবু নুয়াইম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-ও উদ্ধৃত করেছেন তাঁর পুস্তকে।

”আবু ইয়ালার ’মুসনাদ’ গ্রন্থে উদ্ধৃত একটি হাদীস ঘোষণা করে:

الأَنبِيَاءُ أَحيَاءٌ يُصَلُّونَ فِي قُبُورِهِمْ-

–নবীগণ তাঁদের মাযারে জীবিত এবং তাঁরা সেখানে সালাত আদায় করে থাকেন’।[১]

---

[১]. বায্যার : আল মুস্নাদ, মুসনাদু আবী হামযা আনাস, ১৩/৬২ হাদীস নং ৬৩৯১।

[২]. বায্যার : আল মুস্নাদ, মুসনাদু আবূ হামযা আনাস, ১৪/১১৯ হাদীস নং ৭৬১৬।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শেষ অসুখের সময় বলেন: খাইবারে যে খাবার আমাকে দেয়া হয়েছিল তার তিক্ত স্বাদ আমি সব সময় অনুভব করেছি। সেই দিন যে বিষ আমি খেয়েছি তার প্রতিক্রিয়ায় এখন আমার হৃদযন্ত্র ছিঁড়ে যাবার উপক্রম'(হাদীস)। এই হাদীসটি ইঙ্গিত দেয় যে হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন শহীদ হিসেবে বেসাল পেয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা সুরা আল-ই-ইমরানের ১৬৯ আয়াতে ইরশাদ করেন, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ 'আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাৎপ্রাপ্তদের কখনও মৃত বিবেচনা করবে না। তারা আসলে জীবিত'।[২] অতত্রব, এটা নিশ্চিত যে আমাদের মনিব হযরত রসূল-এ-করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য শহীদদের মতোই তাঁর মুবারক রওযায় জীবিতাবস্থায় রয়েছেন।

"হযরত ইমাম সুয়ুতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন: 'মহামর্যাদাসম্পন্ন আউলিয়া কেরাম নবীদের দেখতে পান এমনিভাবে যেন তাঁদের বেসাল ঘটেনি। আমাদের হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম-কে তাঁর রওযা শরীফে দর্শন লাভ একটি মু'জেযা এবং একজন ওলীর অনুরূপ দর্শনক্ষমতা হচ্ছে কারামত। কারামতে অবিশ্বাসের উৎপত্তি অজ্ঞতা থেকে।'

"ইবনে হাব্বান, ইবনে মাজা এবং আবু দাউদ বর্ণিত একটি হাদীস ইরশাদ ফরমায়:

أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَإِنَّهَا مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ-

'শুক্রবার দিনগুলোতে আমার প্রতি ঘন ঘন সালাওয়াত পাঠ করবে; সালাওয়াত আমার কাছে পৌঁছানো হবে।[৩]

قَالَ : قُلْتُ : وَبَعْدَ الْمَوْتِ ؟ قَالَ : وَبَعْدَ الْمَوْتِ ، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ ، فَنَبِيُّ اللهِ حَيٌّ يُرْزَقُ-

---

১. আবূ ইয়ালা : আল মুস্‌নাদ।

২. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩/১৬৯।

৩. ইব্‌ন মাজাহ : আস সুনান, বাবু যিকরি ওফাতিহি, ১/৫২৪ হাদীস নং ১৬৩৭।

ক. বায়হাক্বী : আস সুনান, ৩/৩৫৩ হাদীস নং ৫৯৯৪।

খ. ইব্‌ন আসাকীর : আল মু'জাম ১/১০৩ হাদীস নং ১০৯।

গ. ইব্‌ন আবূ শায়বা : আল মুস্‌নাদ, ২/২৫৩ হাদীস নং ৮৭০০।

ঘ. শাফেয়ী : আল মুস্‌নাদ, ১/১৭২ হাদীস নং ৪৯৮।

যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো এটা কী তাঁর বেসালের পরও বহাল থাকবে, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বল্লেন: 'মাটি নবীদের দেহকে পচন ধরাতে পারে না।[১]

إِنَّ مَلَكًا مُوَكَّلٌ بِمَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَلِّغَ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ فُلاَنًا مِنْ أُمَّتِكَ صَلَّى عَلَيْكَ-

যখন কোনো মুসলিম আমার প্রতি সালাওয়াত পাঠ করে, তখনই একজন ফেরেশতা তা আমাকে জানায় এবং বলে: আপনার উম্মতের মধ্যে অমুকের পুত্র অমুক আপনার প্রতি সালাম প্রেরণ করেছে এবং দোয়া করেছে'।[২]

হাদীসটা প্রতীয়মান করে যে আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রওযা শরীফে এমন এক জীবনে অস্তিত্বশীল, যেটা দুনিয়ার মানুষের পক্ষে জানা সাধ্যাতীত। হযরত যাইদ ইবনে সাহল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন:

'একদিন আমি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সোহবত দ্বারা ধন্য হচ্ছিলাম। তাঁর পবিত্র মখুখানা আনন্দময় দেখাচ্ছিল। আমি আর কখনও তাঁকে এতোটা আনন্দিত দেখিনি। আমি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করি। তিনি উত্তর দেন: "আমি কেন খুশি হবো না?

إِنَّ جِبْرِيلَ جَاءَنِي فَقَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا

–জিবরীল একটু আগে আমাকে শুভসংবাদ দিয়েছে, আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে যখনই আমার উম্মাত আমার প্রতি সালাওয়াত প্রেরণ করবে, তখনই আল্লাহ পাক তাদের প্রতি তার দশগুণ সালাওয়াত প্রেরণ করবেন।[৩]

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমনভাবে তাঁর যাহেরী জীবদ্দশায় তাঁরই সাহাবাগণের জন্যে আল্লাহর রহমতস্বরূপ ছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে তাঁর বেসালপ্রাপ্তির পরও তিনি তাঁর উম্মাতের জন্যে আল্লাহর করুণাস্বরূপ বিরাজ করছেন। তিনিই সকল রহমতের কারণ।

---

[১]. ইব্‌ন মাজাহ : আস সুনান, কিতাবুল জানায়িয, ২/৫৫৬ হাদীস নং ১৬৩৭।

[২]. ইব্‌ন আবূ শায়বা : ফি ছাওয়াবিস সালাতি আলান নবী ২/২৫৩ হাদীস নং ৮৬৯৯।

[৩]. বুখারী : আদাবুল মুফরাদ, বাবু সালাতি আলান নবী ১/২২৩ হাদীস নং ৬৪২।

"মাহাল ইবনে আমর বলেছেন: 'একদিন সাইদ ইবনে মুসাইয়াবের সঙ্গে আমাদের মা হযরত উম্মে সালামা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি- এর ঘরের পাশে বসেছিলাম। এমনি সময়ে বেশ কিছু লোক হুজরাহ আস্ সায়াদা যিয়ারত করতে এলো। সাইদ আশ্চর্যান্বিত হয়ে বল্লেন: "কী আহাম্মক এ সকল লোকেরা তারা মনে করছে যে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝি রওযার মধ্যে আছেন। চল্লিশ দিনের বেশি কি নবীগণ তাঁদের মাযার-রওযার অভ্যন্তরে থাকেন?" একথা বলা সত্ত্বেও সাইদ-ই আবার বলেছিলেন, যে দিবসে হাররা (এই দিনে এয়াযিদ মদীনা আক্রমণ করে এবং অত্যাচার করে) নামক দুর্যোগ এসেছিল সেদিন তিনি রওযায়ে আকদাস হতে আযানের শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন। হযরত উসমান (রা) যখন তাঁর ঘরে শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যান, তখন তিনি বলেন, 'আমি অন্য কোথাও যাবো না। আমি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মদীনা শরীফ ত্যাগ করতে পারবো না।" যদি মাহাল ইবনে আমর বর্ণিত সাইদের বক্তব্য সত্য হতো, তাহলে হুজূর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে তাঁর রওযা শরীফ যিয়ারত করতে আহ্বান করতেন না। বস্তুতঃ জেরুজালেম জয়ের পর হযরত বিলাল হাবাশী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে মদীনা শরীফে গিয়ে রওযা মোবারক যিয়ারত করেন। আমিরুল মু'মিনীন খলীফা উমর বিন আব্দিল আযীয বিশেষ দূতের মাধ্যমে সব সময় দামেস্ক থেকে মদীনায় সালাম পাঠাতেন। জেরুজালেম জয়ের পর খলীফা হযরত উমর (রা) মদীনা প্রত্যাবর্তন করে সর্বপ্রথমে হুজরাহ আস্ সায়াদায় গমন করেন এবং সালাম জানান।

ইয়াযিদ ইবনে আমর বলেছেন, 'দামেস্ক থেকে মদীনা যাওয়ার পথে আমি মিসরের শাসনকর্তা উমর বিন আব্দিল আযীযের সঙ্গে দেখা করি। তিনি আমাকে বলেন: 'হে এয়াযিদ যখন তুমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারতের নেয়ামত লাভ করবে, তখন দয়া করে আমার সালাত-সালাম তাঁর কাছে পৌঁছে দেবে।'

হযরত ইমাম নাফী' রওয়ায়াত করেছেন, যখন আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কোনো সফরশেষে মদীনা প্রত্যাবর্তন করতেন, তখনই তিনি হুজরাহ আস্ সায়াদায় যেয়ে প্রথমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার পর হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং সবশেষে নিজ পিতা হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে সালাম দিতেন। যদিও ওয়াহ্হাবী পুস্তক 'ফাতহ আল মজীদ' এ বিষয়টিকে স্বীকার করেছে, তবুও সেটা আরও লিখেছে যে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারত শরীয়তে নিষিদ্ধ এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে

উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া আর কেউই এটা করেন নি। কিন্তু নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন কেতাবে লেখা আছে যে অন্যান্য সাহাবাও যিয়ারত করেছেন। এক্ষণে আমরা তা প্রমাণ করবো। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু শরিয়ত-গর্হিত একটা কাজ করেছেন বলে ওয়াহ্হাবীটা যে কুৎসা রটনা করেছে, সে জন্যে সে মোটেও লজ্জিত নয়; আর তার অন্যান্য মিথ্যা কথা তো আছেই। নিজের স্বার্থের অনুকূলে গেলে সে সাহাবা-এ-কেরামকে অত্যধিক প্রশংসা করে, কিন্তু তাঁদের কার্যাবলী যখন তার স্বার্থের প্রতিকূলে যায় তখনি সে তাদের প্রতি জঘন্য অপবাদ দেয়। যে বই কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা করে নিজেস্ব ধ্যান-ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, সেটার কাছ থেকে সাহাবাগণের সমলোচনা আর বিচিত্র কী যদি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওয়া শরীফ যিয়ারত করা অনুমতিপ্রাপ্ত না হতো, তবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তা কখনও যিয়ারত করতেন না, আর যদি তিনি তা করতেনও তাহলেও অন্যান্য সাহাবাগণ যাঁরা তাঁকে তা করতে দেখেছিলেন তাঁরা তাঁকে নিষেধ করতেন। হযরত ইবনে উমরের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আচরণ এবং অন্যান্য সাহাবাগণের নীরবতা পরিস্ফুট করে যে যিয়ারত বৈধ এবং বরকতমর। ইমাম নাফী'রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে রওযা যিয়ারতকালে শতাধিকবার বলতে শুনেছি, আস্ সালামু আলাইকা এয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আস্ সালামু আলাইকা এয়া আবা বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। আস্ সালামু আলাইকা এয়া আবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।'

"একদিন হযরত আলী (ক:) মসজিদ আশ্ শরীফে প্রবেশ করে হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘরের সামনে দীর্ঘক্ষণ কাঁদেন। এরপর তিনি হুজরাহ আস্ সায়াদায় প্রবেশ করে বলেন, 'আস্ সালামু আলাইকা এয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'; এবং আবার কাঁদেন। তারপর তিনি হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি 'আলাইকুম আস্ সালাম এয়া আখাওয়াই-ইয়্যা ওয়া রাহমাত-আল্লাহ' সম্ভাষণ জানিয়ে হুজরাহ আস্ সায়াদা থেকে বেরিয়ে যান।

"এ কারণেই আমাদের ফকীহ উলামাবৃন্দ মদীনা এসে মসজিদ আশ্ শরীফে নামায পড়েছেন হজ্জের পর। তারপর তাঁরা যিয়ারত করেছেন রওয়াদাতুল মুতাহহারাত, মিম্বর আল মুনীর এবং রওয়ায়ে আকদাস, যেগুলো দেখে তাঁরা নেয়ামত লাভ করেছেন। এ সকল স্থান 'আরশুল আ'লা' হতে বহু উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন; আরশুল আ'লা হচ্ছে সেই সকল স্থান যেখানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসেছেন, হেঁটেছেন, হেলান দিয়েছেন, ওহী আগমনকালে যে কাঠের ওপর হেলান

দিয়েছেন এবং সাহাবা ও তাবেয়ী যাঁরা মসজিদ আন্ নববী নির্মাণকালে কায়িক পরিশ্রম অথবা আর্থিক সাহায্য দান করেছিলেন, তাঁরা যেখানে হেঁটেছেন। আমাদের ফকীহ উলামাবৃন্দের উত্তরসূরী উলামা ও পরহেযগার মুসলমানগণও হজ্জের পর একইভাবে মদীনা গমন করেছেন। এই কারণেই হাজীগণ মদীনা সফর করে থাকেন।

"হাজীগণ কি প্রথমে মদীনা যাবেন, নাকি হজ্জের পর যিয়ারতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পন্ন করবেন এ প্রশ্নটির উত্তর উলামায়ে কেরাম বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। তাবেয়ীনগণের তিনজন শীর্ষস্থানীয় ইমাম আলকামা, আসওয়াদ ও আমর ইবনে মায়মূন বলেছে যে হাজীদের প্রথমে মদীনা শরীফ যাওয়া উচিৎ। ইসলামী উলামার শিরোমণি ইমামুল আযম হযরত আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন যে হজ্জ সমাপণ করে মদীনা গমন করাই উত্তম। হযরত আবুল লায়েস সামারকান্দির ফতোওয়ায়-ও একই কথা লেখা আছে। দুই ঈদের মধ্যবতী সময়টুকু মদীনায় অবস্থান করে হজ্জের সময় মক্কা শরীফ গমন করাটা ওসমানীয় তুর্কী হাজ্বীদের একটা প্রথা ছিল। কতেক হাজ্বী অবশ্য সরাসরি মক্বা শরীফ গমন করে আরাফাতশেষে যিয়ারত করতে মদীনা যেতেন। এরপর তাঁরা মদীনার বন্দর ইয়ানবু হয়ে ষ্টিমারে চড়ে সুয়েজ খাল দিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করতেন।

"শেফা শরীফ নামক গ্রন্থপ্রণেতা ইমাম কাজী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, শাফেয়ী আলেম ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং হানাফী আলেম ইবনে হুমাম বলেছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা মোবারক যিয়ারত করা বরকতময় হওয়ার বিষয়টার ওপর এজমা-এ-উম্মত (ঐকমত্য) হয়েছে। বেশ কিছু আলেম এটাকে ওয়াজিব বলেছেন। তবে কবর যিয়ারত করা সুন্নাত। আর সবচেয়ে মূল্যবান রওযা হুজরাহ আস্ সান্দা যিয়ারত করা সব চেয়ে মূল্যবান সুন্নাত।

"রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় উহুদের জেহাদে শাহাদাতপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কেরাম ও বাকী কবরস্থানের সাহাবীদের যিয়ারত করতে যেতেন। উহুদের জেহাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে ফারসী কিতাব 'মাদারিজুন্ নবুয়্যত' আবু ফারদার কথা উদ্ধৃত করে: 'একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের জেহাদে শহীদ সাহাবীদের যিয়ারত করতে যান। "হে আল্লাহ আপনি-ই একমাত্র উপাসনার যোগ্য। আমি আপনার বান্দা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে এরা আপনারই নেয়ামত লাভের উদ্দেশ্যে শাহাদাত বরণ করেছে" এই কথা বলে হুযূর

পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন: "যদি কেউ এ সকল শহীদের যিয়ারত করে তাদের প্রতি সম্ভাষণ জানায়, তবে এরা তাকে সালামের জওয়াব দেবে। শেষ দিন (কেয়ামত) পর্যন্ত তারা এভাবে উত্তর দেবে" (হাদীস)'। আরেকবার শহীদদের যিয়ারতকালে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "তোমরা ধৈর্যশীল ছিলে; তোমাদের প্রতি সালাম।" খলীফা থাকাকালীন হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-ও উহুদের জেহাদে শহীদদের যিয়ারত করে অনুরূপ সম্ভাষণ জানাতেন। ফাতিমাতুল্ হুযাযিয়্যা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'আমি একবার উহুদের ময়দান দিয়ে যাচ্ছিলাম; আমি বল্লাম: এয়া হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা আপনার প্রতি সালাম। আমি জওয়াব শুনতে পেলাম: "আল্লাহর শান্তি, করুণা ও আশীর্বাদ তোমার প্রতি বর্ষিত হোক"।' উতাফ ইবনে খালেদ আল মাহযুনী বলেন যে তাঁর ফুপু যখন উহুদের শহীদদেরকে সালাম জানান, তখন তাঁরা তার জওয়াব দেন: 'আমরা তোমাকে চেনি।' উতাফ আরও বলেন যে হাদীসে যা বলা হয়েছিল, ঠিক তা-ই ঘটেছিল।

"সুরা নিসার ৬৪ নং আয়াতে ঘোষিত হয়েছে,

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

'ঈমানদার মুসলমান সবাই যদি নিজেদের নফসের ওপর যুলুম (অর্থাৎ,পাপ) করে আপনার দরবারে আসতো, হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতো; আর আপনিও তাদের পক্ষে সুপারিশ করতেন, তাহলে নিশ্চয় তারা আল্লাহকে তওবা কবুলকারী ও দয়াবান হিসেবে পেতো'।[১]

এ আয়াত প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীকে আদেশ করে হুযূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা মোবারক যিয়ারত করতে (কেননা, আয়াতোল্লিখিত 'জাআ' শব্দটির অর্থ রসূলের কাছে 'আসা' অনুবাদক)। কথিত আছে, যিয়ারতকালে এ আয়াত পাঠ করা মুস্তাহাব।

"ইমাম আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত মুহাম্মদ ইবনে হারব হেলালী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর কথা উদ্ধৃত করেন, যিনি বলেন: 'হুযূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

১. আল কুর'আন : সূরা নিসা, ৩/৬৪।

ওয়াসাল্লাম-এর দাফনের তিন দিন পর আমি হুজরাহ আস্ সায়াদা যিয়ারত করতে যাই। যিয়ারতশেষে আমি এক কোণায় বসে পড়ি। এমন সময় এক গ্রামবাসী এসে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওযার ওপরের মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং রওযার মাটি নিয়ে নিজের মুখমন্ডলে মাখেন। এরপর তিনি সম্ভাষণ জানান: "এয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহতা'আলা আপনার সম্পর্কে ঘোষণা দিয়েছেন (সুরা নিসার উপরোক্ত ৬৪ নং আয়াত যা তিনি তেলাওয়াত করেন)। আমি নিজের নফসের প্রতি যুলুম করেছি। তাই আপনারই শাফায়াতের মাধ্যমে আমি সম্পূর্ণ ক্ষমা প্রার্থনা করছি।" আমি রওযা শরীফ হতে প্রত্যুত্তর শুনতে পাই: "তোমার জন্যে শুভ সংবাদ তোমার সমস্ত গুণাহ মাফ হয়ে গিয়েছে"।'

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى

–শুধুমাত্র তিনটি মসজিদ, (মসজিদ-এ-হারাম, মসজিদ-এ-নববী এবং মসজিদ-এ-আকসা) ছাড়া অন্য কোনো স্থানের দিকে সফর করবে না'।[১]

এই হাদীসটি প্রতীয়মান করে যে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা শরীফ যিয়ারত করার নিয়্যত করে মদীনা যাওয়া খুবই বরকতময়। যারা তা করবে না, তারা এই মহা-সওয়াব হতে বঞ্চিত থাকবে এবং হয়তো তারা একটি ওয়াজিবের ইনকার (অবহেলা/অবজ্ঞা) করবে। এই তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্যান্য মসজিদে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘ পথ সফর করা জায়েয (অনুমতিপ্রাপ্ত), যদি তা আল্লাহর ওয়াস্তে করা হয়। কিন্তু অন্য কোনো নিয়্যতে করলে তা হারাম হবে।

"প্রশ্ন: হযরত ইমাম হাসান ইবনে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যিয়ারতকারীদেরকে রওযায়ে আকদাস-এর সামনে আসতে দিতেন না। আর ইমাম যাইনুল আবেদীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিম্নোক্ত হাদীসটি পেশ করে অনুরূপ আচরণ করতেন। হাদীসটি ইরশাদ ফরমায়: 'আমার কবরকে ঈদগাহ বানাবে না। তোমাদের ঘরগুলোকে কবরস্থান বানাবে না। যেখানেই থাকবে আমার প্রতি ঘন ঘন সালাওয়াত পাঠ করবে; তোমাদের সালাম আমার কাছে পৌঁছানো হবে।' এ বিষয়ে আপনি কী বলবেন?

[১]. মুসলিম : আস সহীহ, বাবু লা তুশাদ্দুর রিহাল ইল্লা ছালাছাতি মাসাজিদ, ২/১০১৪ হাদীস নং ১৩৯৭।
ক. আবূ ইয়ালা : আল মুস্নাদ, মিন মুসনাদি আবী সাঈদ খুদ্রী, ২/৩৮৮ হাদীস নং ১১৬০।

"উত্তরঃ এ সকল কথা 'শুধুমাত্র তিনটি মসজিদ সফর করা উচিৎ'- হাদীসটির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। উপরন্তু, উক্ত দুই ইমাম সম্ভবতঃ তাদেরকেই বাধা দিতে চেয়েছিলেন যারা ঔদ্ধত্যপূর্ণ অথবা আদবহীন/বে-আদবিপূর্ণ আচরণ করতে পারে। তাই ইমাম মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হুজরাহ আস্ সায়াদার সামনে দীর্ঘক্ষণ কাটানোটাও জায়েয দেন নি। হযরত ইমাম যাইনুল আবেদীন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হুজরাহ আস্ সায়াদা যিয়ারতকালে সবসময়ই রওদাতুল মুতাহহারার দিকে অবস্থিত স্তম্ভের পাশে দাঁড়িয়ে সালাম দিতেন। অতএব, এটা বোঝা যায় যে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাক শ্রে/মস্তক মুবারক হুজরাহর এদিকে অবস্থিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আযওয়াজে মোতাহহারাত (পবিত্র বিবিগণ)-এর মাযারগুলো মসজিদ আস্ সায়াদাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যিয়ারত সমাধা করতে হতো। যিয়ারতকারীরা এখানে হুজরাহ আস্ সায়াদার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সালাম দেন।

"হারুন ইবনে মূসা আল হিরাওয়ী তাঁর প্রপিতা আল্ ক্বামাকে জিজ্ঞাসা করেনঃ 'মসজিদ আস্ সায়াদাতে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র বিবিদের মাযারগুলো অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগে রওযায়ে আকদাসের কোন্ পার্শ্বে যিয়ারতকারীরা যিয়ারত করতে দাঁড়াতেন?' আলক্বামা উত্তর দেনঃ 'যেহেতু হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর বেসালের আগে হুজরাহ আস্ সায়াদার দরজাটা দেয়াল করা ছিল না, সেহেতু যিয়ারতকারীরা দরজার সামনেই দাঁড়াতেন।'

"মুহাদ্দীস উলামাবৃন্দের অন্যতম হযরত আবদুল আযিম মুনযিরী বলেছেন, 'আমার কবরকে ঈদগাহ বানিও না' হাদীসটির অর্থঃ 'যথাসম্ভব ঘন ঘন আমার যিয়ারত করবে।' অর্থাৎ, 'তোমাদের যিয়ারতকে (ঈদের মতো) বছরে একবার কি দু'বারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবে না, ঘন ঘন আমার যিয়ারত করবে।' আর 'তোমাদের গৃহগুলোকে কবরস্থান বানাবে না'- হাদীসটির অর্থঃ 'সালাত না পড়ে তোমাদের ঘরগুলোকে কবরস্থান সদৃশ করবে না' (মুনযিরী)। যেহেতু কবরস্থানে সালাত আদায় করা অনুমতিপ্রাপ্ত নয়, সেহেতু হযরত আবদুল আযীম মুনযিরীর কথাই সঠিক।

"প্রথমোক্ত হাদীসটিকে অধিকাংশ উলামা নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করেছেনঃ 'আমার যিয়ারতের জন্যে ঈদের দিনের মতো একটি দিন নির্দিষ্ট করো না।' ইহুদী এবং খৃষ্টানরা তাদের নবীগণের মাযার যিয়ারতকালে সমবেত হয়ে নাচ-গান ও আনন্দ-উৎসব পালন করতো। এই হাদীস এবং এর তফসীর থেকে বোঝা যায় যে রওযায়ে আকদাস যিয়ারতকালে উৎসব-মুখর হওয়া আমাদের পক্ষে উচিৎ নয়।

"অতএব, রওযা মোবারকের যিয়ারতকারীগণের উচিৎ দীর্ঘক্ষণ সেখানে অতিবাহিত না করা, বরং সালাম ও দোয়াশেষে স্থান ত্যাগ করা। রওযায়ে আকদাসের যিয়ারতকে একটি মহামূল্যবান এবাদত হিসেবে মুসলমানদের জানা উচিৎ। তাঁদের উচিত ঘন ঘন যিয়ারত করতে চেষ্টা করা তাঁরা যতো দূরেই থাকুন কেন। অর্থাৎ, বছরে একবার যিয়ারত করায় এটাকে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রত্যেকের উচিৎ সাধ্যানুসারে ঘন ঘন যিয়ারত করা এবং যিয়ারতকালে হুজরাহ্ আস্ সায়াদার সামনে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা না করা। মুসলমান উলামাদের নয়নমণি হযরত ইমামুল আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন যে যিয়ারত-এ-রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছে সবচেয়ে মূল্যবান মুস্তাহাবগুলোর মধ্যে অন্যতম এবং এটা এমনই একটা এবাদত যার মর্যাদা ওয়াজিবের সমান।

"শাফেয়ী মযহাবে যদি কেউ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাযার শরীফ যিয়ারত করার নযর (মানত) করে, তবে তাকে নযর পূর্ণ করতে হয়। অন্যান্য মাযারের প্রতি নযর সম্পর্কে ইজমা না হলেও নযর পূর্ণ করাই কোনো ব্যক্তির জন্যে ভাল হবে। পদব্রজে মসজিদুল হারাম সফর করার নযর যে ব্যক্তি করবে, তার উচিৎ নযর পূর্ণ করা; কারণ হজের ফারিদা (অবশ্য করণীয়) মসজিদুল হারামেই সম্পন্ন করতে হয়। আর যেহেতু মসজিদুস্ সায়াদায় হুযূর পাকের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওযায়ে আকদস অবস্থিত যেটা কাবাতুল মুয়াযযামা ও মসজিদুল আকসা থেকেও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন এবং যেহেতু মসজিদ আস্ সায়াদা সফর করার সময় রওযা পাকের যিয়ারতও নিয়্যতের মধ্যে থাকে, সেহেতু এই বরকতময় মসজিদে পদব্রজে যাওয়ার নযরকে অবশ্যঅবশ্যই পূরণ করতে হবে।

"চার মযহাব অনুযায়ী, কাবা শরীফ সফর করার নযর করলে তা পূরণ করা উচিৎ। মসজিদ আস্ সায়াদা অথবা মসজিদ আল্ আক্সা সফর করার নযর পূরণ করা উচিত নাকি অনুচিৎ সেই বিষয়ের ওপর কোনো এজমা হয়নি। তবে মতপার্থক্যটুকু শুধু মসজিদ সফর সংক্রান্ত। যে ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা শরীফ যিয়ারত করার নযর করে, তাকে অবশ্যই তা পূরণ করতে হবে।

"শায়েখ আবদুল্লাহ আবু মুহাম্মদ ইবনে আবি যাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে জিজ্ঞাসা করা হয়: 'কোনো ব্যক্তি, যাকে অন্য কারো সপক্ষে হজ্ব ও যিয়ারত-এ-রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাধা করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সে যদি শুধুমাত্র হজ্বকার্য সমাপণ করে এবং যিয়ারতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না করে, তাহলে কি তাকে যিয়ারতের জন্যে প্রদত্ত টাকাটা ফেরত দিতে হবে?'

হযরত যাইদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উত্তর দেন: 'হ্যাঁ, তাকে টাকা ফেরত দিতে হবে'।

"নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারত সম্পর্কে ইমাম মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'প্রত্যেকের উচিৎ কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে হুজরাহ্ আস্ সায়াদার দিকে মুখ করা এবং বিনয় ও আদবের সঙ্গে সালাম দেয়া এবং সালাওয়াত পাঠ করা। মসজিদে প্রবেশের পর রওদাতুল মুতাহহারাতে দুই রাকাত নামায পড়া উচিৎ। এরপর মুওয়াজাহাত আস্ সায়াদার সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তারপর হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং সবশেষে হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি সালাম জানাতে হবে। এরপর কিছু বিশেষ দোয়া-দরূদ পাঠ করতে হবে; কেননা, রসূল-এ-মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা প্রত্যেক মোমেন মসলমানই তাঁর যিয়ারতকারীদের কথাবার্তা এবং তাদের সালাম ও দোয়া শুনতে পান। যদিও কোনো ব্যক্তির যে কোনো দোয়া পড়ার এবং যে দোয়া মনে পড়ে তা পড়ার অনুমতি রয়েছে, তবুও উলামাবৃন্দ কর্তৃক নিন্দেশিত বিশেষ দোয়াসমূহ পাঠ করাই উত্তম।'

"ইমামুল আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন যে যখন তিনি মদীনায় ছিলেন, তখন হযরত আউয়ুব সাহতিয়্যানী নামের এক বুযর্গকে মসজিদে প্রবেশ করে রওয়া-এ-আকদাসের দিকে মুখ করে কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে দেখেন এবং পিছু হেঁটে বেরিয়ে যেতে দেখেন। হযরত আবুল লায়েস্ সমরকন্দী হযরত ইমামুল আযমের রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন: 'যিয়ারতকারীদের উচিৎ ক্বিবলার দিকে মুখ করা এবং রওযাকে পিছনে রাখা।' কিন্তু শায়েখ কামাল ইবনে হুমাম লিখেছেন: 'ইমামুল আযম তাঁর মুসনাদ পুস্তকে যিয়ারতের আইন-কানুন বর্ণনা করেছেন; তাই আবুল লায়েস এবং তাঁর অনুসারীরা যা রেওয়ায়াত করেছেন তা ইমামুল আযমের পূর্ববর্তী কোনো ইজতেহাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইমামুল আযম পরবর্তীকালে ফতোওয়া দিয়েছেন যে হুজরাহ আস্ সায়াদার দিকে মুখ করে যিয়ারত করতে হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-ও ঘোষণা করেছেন যে কিবলা পেছনে রেখে হুজরাহ আস্ সায়াদার দিকে মুখ করে সালাম ও সালাওয়াত পাঠ করতে হবে।' (ইবনুল হুমাম)

"ইবনে জামা'আ তাঁর 'মানাসিক' গ্রন্থে লিখেন, 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা শরীফ যিয়ারতকালে প্রত্যেকের উচিৎ হুজূর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্রে মোবারক যেদিকে অবস্থিত তার দুই মিটার দূরত্বে দাঁড়ানো; এই কোণা তখন যিয়ারতকারীর বাম পাশে এবং ক্বিবলা ডান পাশে থাকবে। এরপর যিয়ারতকারী ব্যক্তি ধীরে ধীরে মুওয়াজাহাত আস্ সায়াদার দিকে মুখ ফেরাবেন এবং কিবলার দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াবেন; যখন রওযা শরীফের দিকে তাঁর মুখ ফিরবে, তখনই তাঁকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সালাম দিতে হবে।'

"অতএব, যিয়ারাতকারীকে রওযা শরীফের দিকের কোণা এবং কিবলার দেয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে দন্ডায়মান হতে হবে; এবং হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্রে মোবারক থেকে দুই মিটার দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। এরপর ধীরে ধীরে হুজরাহ আস্ সায়াদার দিকে মুখ ফিরাতে হবে। কিবলা পেছনে থাকবে এই সময়। অতঃপর তাঁকে সালাত-সালাম পাঠ করতে হবে। ইমাম শাফেয়ী ও অন্যান্য মুজতাহিদগণের ইজতেহাদও একই কথা ব্যক্ত করে। বর্তমানকালে এভাবেই যিয়ারতকার্য সমাধা করা হয়।

"মসজিদ আস্ সায়াদাতে হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র স্ত্রীদের মাযার-রওযা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগে হুজরাহ আস্ সায়াদার কিবলার দিকের স্থানটাতে বেশি জায়গা ছিল না; ফলে মুওয়াজাহাত আস্ সায়াদার দিকে মুখ করে দাঁড়ানো কষ্টকর ছিল। যিয়ারতকারীদেরকে হুজরাহ আস্ সায়াদার রওদাতুল মুতাহহারার দেয়ালের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কিবলামুখো হয়ে সালাম দিতে হতো। পরবর্তীকালে ইমাম যাইনুল আবেদীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রওযাতুল মুতাহহারাকে পেছনে রেখে সালাম দিতেন। দীর্ঘকাল ওইভাবে হুজরাহ্ আস্ সায়াদার যিয়ারত চলেছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র স্ত্রীগণের মাযার শরীফ মসজিদ আস্ সায়াদার ভেতরে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর মুওয়াজাহাত আশ্ শরীফার জানালার সামনে দাঁড়িয়ে যিয়ারত করার কাজ সুসম্পন্ন করা হয়।

"ইমামগণ মদীনাবাসী ও যিয়ারতকারীদের পালনীয় আদব-কায়দার বহু নিয়ম-কানুন সংগ্রহ করেছেন। এ সকল শর্তসমূহ ফিক্বাহ ও 'মানাসিক' কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। 'মিরাতুল মানাসিক' পুস্তকে সমস্ত নিয়ম-কামুন বিস্তারিতভাবে লেখা আছে।

"ইসলামের ইতিহাসে প্রথম যে গুম্বজবিশিষ্ট মাযারটি নির্মিত হয়, তা হচ্ছে হুজরাহ্ আল মু'আত্তারা, যেখানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দাফন করা হয়েছিল। আমাদের মনিব রসূল-এ-করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘরে বেসালপ্রাপ্ত হন। দিনটি ছিল সোমবার, ১২ই রবিউল আউয়াল, ১১ হিজরী। দুপুরের আগেই তিনি বেসালপ্রাপ্ত হন। পরবর্তী বুধবার রাতে তাঁকে সেই ঘরে দাফন করা হয়। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘরটি তিন মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট ছিল। এটা রোদে শুকানো ইট ও খেজুর গাছের শাখা দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। পশ্চিম দিকে এর দুটো দরজা ছিল যা রওদাতুল মুতাহহারা-মুখো ছিল এবং উত্তরে একটা দরজা ছিল। খলীফা থাকাকালীন ১৭ হিজরীতে হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হুজরাহ আস্ সায়াদাকে একটা নিচু পাথরের দেয়াল দ্বারা ঘেরাও করে দেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু খলিফা হওয়ার পর এই দেয়ালটাকে কালো পাথর দ্বারা পুণঃনির্মাণ করে দেন। দেয়ালটা ছাদবিহীন ছিল এবং এর উত্তর দিকে একটা দরজা ছিল। ৪৯ হিজরীতে যখন হযরত হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শাহাদাতপ্রাপ্ত হন, তখন তাঁর ভাই হযরত হুসেইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর লাশ মুবারককে হযরত হাসানের অন্তিম ইচ্ছানুসারে হুজরাহ্ আস্ সায়াদার দরজার সামনে নিয়ে আসেন এবং রওযা শরীফের ভেতরে শাফায়াত ও দোয়া চাইবার জন্যে নিয়ে যেতে চান। তখন কিছু লোক এর বিরোধিতা করে। তারা মনে করেছিল যে ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে বুঝি রওযা শরীফের ভেতরেই দাফন করা হবে। এই গোলযোগ বন্ধ করার জন্যে লাশ মুবারককে হুজরাহ্ আস্ সায়াদার অভ্যন্তরে আর না নিয়ে জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে দাফন করা হয়। পরবর্তীকালে যাতে এ ধরণের আর কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার উদ্ভব না হয়, তার জন্যে ঘরের দরজাগুলো এবং বাইরের দরজাটি দেয়াল দ্বারা বন্ধ করে দেয়া হয়।

"ষষ্ঠ উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ মদীনার গভর্ণর থাকাকালীন হুজরাহ্ আস্ সায়াদাকে বেষ্টন করে একটি দেয়াল নির্মাণ করে দেন এবং ওপরে একটি ক্ষুদ্রাকার গুম্বজও নির্মাণ করে দেন। ফলে তিনটি রওযা-ই বাইরে থেকে দৃষ্টিগোচর হতো না। ঘরটিতে প্রবেশ করার পথ রুদ্ধ হওয়াতে হুজরাহ আস্ সায়াদা নিরাপদ হয়ে গেল। যখন ওয়ালিদ খলিফা হলেন, তখন তাঁর উত্তরাধিকারী এবং মদীনার গভর্ণর ওমর বিন আব্দুল আযীযকে আদেশ দিলেন যেন তিনি পূর্ব দিকের দেয়ালকে বেষ্টন করে আরেকটা দেয়াল নির্মাণ করে দেন। হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র স্ত্রীগণের মাযারসমূহ অপসারণ করার পর মসজিদ আস্ সায়াদার সম্প্রসারণ সম্পন্ন হয়। এই দেয়ালটি পাঁচ কোণ্ বিশিষ্ট এবং ছাদবিশিষ্ট ছিল; এর কোনো দরজা ছিল না।

"গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর চাচাতো ভাই এবং ইরাকে 'আতা বেগ' রাষ্ট্রের গভর্ণর যেনগিস-এর উযির জামালুদ্দিন ইসফাহানী ৫৮৪ হিজরী সালে হুজরাহ

আস্ সায়াদার বহিন্দেয়ালের চার পাশে চন্দন-কাঠনির্মিত শিকের দেয়াল তৈরি করে দেন। এর উচ্চতা মসজিদের ছাদের সমান ছিল। লোহার শিকের দেয়াল ৬৮৮ হিজরীতে নির্মাণ ও রং করা হয়। এই শিকটাকে বলা হতো 'শাবাকাতুস সায়াদা'। শাবাকাতুস সায়াদা-এর ক্বিবলার দিককে বলা হয় মুওয়াজাহাত আস্ সায়াদা এবং পূর্বদিককে বলা হয় রওদাতুল মুতাহহারা এবং উত্তর দিককে বলা হয় হুজরাতুল ফাতিমা। যেহেতু মক্কা শরীফ মদীনা শরীফের দক্ষিণে অবস্থিত, সেহেতু যদি কেউ মসজিদ আন্ নববীর মধ্যবর্তী স্থানে ক্বিবালামুখ হয়ে দাঁড়ায়, অর্থাৎ, রওদাতুল মুতাহহারাতে দাঁড়ায়, তাহলে তার বাম পার্শ্বে থাকবে হুজরাহ আস্ সায়াদা এবং ডান পার্শ্বে থাকবে মিম্বর আশ্ শরীফ।

"২৩২ হিজরীতে শাবাকাতুস্ সায়াদা ও বহিন্দেয়ালগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে মার্বেল পাথরের মেঝে নির্মাণ করা হয় এবং বহুবার পুনঃনির্মাণ করা হয়। সুলতান আব্দুল মজীদ খানের আদেশক্রমে শেষবারের মতো মেঝেতে নবায়নকার্য সমাধা করা হয়।

"পাঁচ কোণাকৃতি দেয়ালের সঙ্গে যে গুম্বজটা নির্মাণ করা হয়েছিল সেটার নাম 'কুব্বাতুন্ নূর'। ওসমানীয় সুলতানদের প্রেরিত 'কিসওয়াত্ আশ্ শরীফা' উক্ত গুম্বজের ওপরে ছাউনিস্বরূপ বিছানো হতো। বিশাল সবুজ গুম্বজটা যেটার নাম 'কুব্বাতুল খাদরা' এবং যেটা কুব্বাতুন্ নূরের ঠিক ওপরে অবস্থিত, সেটাই হলো মসজিদ আস্ সায়াদার গুম্বজ। শাবাকা নামের শিকের দেয়ালের বহির্ভাগে অবস্থিত কিসওয়াটি কুব্বাতুল খাদরাকে সমর্থন দানকারী মন্ডপের ওপর ঝুলানো হতো। এই অভ্যন্তরীন ও বহির্ভাগের পন্দাগুলোকে বলা হতো সাততারা। শাবাকাতুস সায়াদা তিন দরজাবিশিষ্ট; পূর্বে, পশ্চিমে এবং উত্তর দিকে এগুলো অবস্থিত। হারাম আশ্ শরীফের পরিচালকগণ ছাড়া আর কেউই শাবাকাতুস্ সায়াদার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না এবং যেহেতু দেয়ালগুলোর মধ্যে কোনো দরজা বা জানালা নেই, সেহেতু কেউই ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। গুম্বজের ওপরে শুধু একটা ছিদ্র আছে যা তারনির্মিত জালি দ্বারা আবদ্ধ। এই ছিদ্রটির ঠিক ওপরে কুব্বাতুল খাদরার ছিদ্রটি অবস্থিত। ১২৫৩ হিজরী পর্যন্ত গুম্বজের রং ছিল ছাই বর্ণের, যেটা সুলতান মাহমুদ আদলী খানের আদেশক্রমে করা হয়েছিল। ১২৮৯ হিজরীতে সুলতান আবদুল আযীম খানের আদেশক্রমে গুম্বজটিতে পুনরায় রং দেয়া হয়।

"সুলতান আবদুল মাজীদ খানের মতো আর কেউই মসজিদ আস্ সায়াদাকে সুশোভিত করার প্রচেষ্টায় এত বেশি আত্মনিয়োগ করেননি। হারামাইনকে সংরক্ষণ

করার জন্যে তিনি ৭ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করেন। ১২৭৭ হিজরীতে সংস্কার কাজ শেষ হয়। প্রত্যেক দিন তিনি হুজূর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শানে একটি মাহফীল করতেন যেগুলোতে তাঁর কাশফ ও কারামত প্রত্যক্ষ করা হতো। সুলতান আবদুল মাজীদ খান আদেশ দেন যেন মসজিদ আন্ নববীর একটা ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি ইস্তাম্বুলস্থ খিরকাত-এ-শরীফ মসজিদে স্থাপন করা হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং স্থপতি মেজর হাজী ইযযাত আফেন্দীকে ১২৬৭ হিজরীতে মদীনায় প্রেরণ করা হয়। ইযযাত আফেন্দী সমস্ত দৈর্ঘ-প্রস্থ মেপে এক বছরের মধ্যে ১/৫৩ মডেল নির্মাণ করেন এবং ইস্তাম্বুল পাঠান। মডেলটি খিরকা-এ-শরীফ মসজিদ, যেটা সুলতান আবদুল মাজিদ খান তৈরি করেছিলেন, সেটাতে সংরক্ষণ করা হয়।

"কিবলার দেয়াল ও শাবাকাত আস্ সায়াদার মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে সাত মিটার; পূর্বদিকের দেয়াল হতে কদম আস্ সায়াদার শিকের দূরত্ব হচ্ছে ছয় মিটার; শাবাকাত আশ্ শামী-এর প্রস্থ হচ্ছে এগারো মিটার; মুওয়াজাহাতুশ্ শরীফার শিকের দৈর্ঘ্য তেরো মিটার এবং মুওয়াজাহাতুশ্ শরীফা ও শাবাকাতুশ্ শামীর দূরত্ব হচ্ছে উনিশ মিটার। মসজিদ আন্ নববীর ক্বিবলার দিকটা ৬৪ মিটার প্রশস্ত এবং কিবলার দিক থেকে দামেস্কের দিকের দেয়ালটির দূরত্ব হচ্ছে ৯৯ মিটার। হুজরাহ্ আস্ সায়াদা ও মিম্বর শরীফের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত রওযাতুল মুতাহহারার প্রস্থ ১৬ মিটার। এ সকল পরিমাপ নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে করা হয়েছে: মদীনায় এক 'য্রা' সমান তেতাল্লিশ সেন্টিমিটার। ফিক্বাহ্ কিতাবসমূহে বর্ণিত এরাক্বী 'য্রা' হচ্ছে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার।

"মদীনা শরীফের একমাত্র কবরস্থান বাক্বীতে সর্বপ্রথম হযরত উসমান ইবনে মাযউন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে দাফন করা হয়। হুজূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এই দুগ্ধ ভাইয়ের জন্যে নিজের পবিত্র হাত দ্বারা কবরের ওপর একটা পাথরের ফলক স্থাপন করে দেন। তাই কবরের ওপর পাথরের ফলক স্থাপন করা সুন্নতে পরিণত হয়েছে।

"ওয়াহাবীরা মদীনার এ সকল মাযার ধবংস করে ফেলে। সুলতান মাহমুদ খান তা আবার সংরক্ষণ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংরেজরা উসমানীয়দের কাছ থেকে মদীনা শরীফ কেড়ে নিয়ে তা ওয়াহহাবীদের হাতে অর্পণ করে; ওয়াহহাবীরা পুনরায় মাযারগুলো ধ্বংস করে দেয়। তারা সমস্ত পবিত্র ইমারত বিধ্বস্ত করে, এমন কি যমযম কূপের ওপর সুলতান আবদুল হামিদ খান- ১-এর নির্মিত কারুকার্যপূর্ণ ইমারতটিও ওয়াহহাবীরা বিধ্বস্ত করে। আর আজকে তারা ধীরে

ধীরে মসজিদুল হারাম ও মসজিদ আন্ নববীকেও ধ্বংস করে ফেলছে, যেগুলো উত্তরাধিকারসূত্রে উসমানীয় তুর্কীদের কাছ থেকে তারা পেয়েছিল।

"হুজরাহ্ আস্ সায়াদার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র স্ত্রীগণের মাযারের ওপরেই সর্বপ্রথম গুম্বজ নির্মাণ করা হয়। আমাদের মা যাইনাব বিনতি জাহস্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর ইন্তেকাল দিবসে আবহাওয়া এতোই গরম ছিল যে হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কবর খননকালে লোকদেরকে আশ্রয় দান করার জন্যে একটা তাঁবু খাটিয়ে দেন। সেই তাঁবুটা দীর্ঘসময় মাযারের ওপর পাতানো ছিল। তাই এরপর থেকে মাযারের ওপর তাঁবু, গৃহ এবং পরবর্তীকালে গুম্বজ স্থাপন করা শুরু হয়। মুন্দার খাটিয়া প্রথমবারের মতো তৈরি করা হয় আবারও আমাদের মা হযরত যায়নাবের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জন্যে। যখন হযরত উমর (রা) হযরত যাইনাবের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মাহরাম আত্মীয়বর্গ (যে আত্মীয়-স্বজন সাক্ষাৎ করতে পারেন) ছাড়া সাহাবাদেরকে জানাযা ও দাফনকার্যে অংশগ্রহণ করার অনুমতি দিলেন না, তখন সাহাবাগণ অত্যন্ত দুঃখিত হলেন জানাযা হতে বঞ্চিত হওয়ার আশংকায়। এই সময় হযরত আসমা বিনতে উমাইস্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বল্লেন, 'আমি ইথিওপিয়াতে একটা খাটিয়া দেখেছি। সেটার ভেতরে মুন্দাকে দেখা যায় না'। এরপর হযরত আসমা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর নির্দেশানুযায়ী ওই রকম একটা খাটিয়া তৈরি করা হয় এবং সকল সাহাবী জানাযায় অংশ নেন।

"আমাদের আকা ও মওলা হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক বছর উহুদের জ্বিহাদে শহীদানের যিয়ারত করতেন। 'হুররাতুল ওয়াকুম' নামের স্থানটিতে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁদের প্রতি সালাম দিতেন। হিজরীর অষ্টম বছরে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিয়ারতকালে তাঁদের প্রত্যেকের নাম ধরে সম্ভাষণ জানান। তিনি বলেন: 'তারা শহীদ। তারা যিয়ারতকারীকে চিনতে পারে; যখন কেউ তাদেরকে সালাম দেয়, তখনই তারা তা শুনতে পায় এবং প্রত্যুত্তর দেয়' (হাদীস)। হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দুই দিন অন্তর অন্তর হযরত হামযার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর মাযার শরীফ যিয়ারত করতেন এবং মাযারে তিনি একটি চিহ্ন দেন যাতে তা বিস্মৃত না হতে পারে। প্রত্যেক শুক্রবার রাতে তিনি সেখানে যেয়ে বহু রাকাত নামায পড়তেন এবং অনেক কান্নাকাটি করতেন।

"ইমাম বায়হাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে উদ্ধৃত করেন, যিনি বলেন: 'আমার পিতা হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং আমি একবার সূর্যোদয়ের আগে উহুদের শহীদানের যিয়ারত করতে

যাই। তিনি তাঁদেরকে সালাম জানান, আমরা তাঁদের প্রত্যুত্তর শুনি। আমার পিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন: 'তুমি কি প্রত্যুত্তর দিয়েছ? আমি বললাম : না, শহীদানবৃন্দ দিয়েছেন।' তিনি আমাকে তাঁর ডান পাশে নিয়ে তাঁদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে সালাম দেন। আমরা তাঁদের প্রত্যেককে তিনবার করে প্রত্যুত্তর দিতে শুনলাম। সহসা আমার পিতা সাজদায় যেয়ে আল্লাহর কাছে ধন্যবাদ জ্ঞাপণ করেন।' হযরত হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, তাঁর দুই ভাতিজা আবদুল্লাহ ইবনে জাহস্ ও মুস্আব ইবনে উমাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন) একই মাযারে সমাহিত হন। সত্তর জন শহীদানের বাকিরা দু'জন-তিনজন করে একেক মাযারে শায়িত আছেন এবং অল্প কিছু সংখ্যককে জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে দাফন করা হয়।"[১]

১৬/ ওয়াহাবী পুস্তক ফাতহুল মজীদের ২৫৭ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে:

يُشِيْرُ بِذَلِكَ إِلَىٰ أَنْ مَا يَنَالَنِيْ مِنْكُمْ مِنَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ يَحْصُلُ مَعَ قُرْبِكُمْ مِنْ قَبْرِيْ وَبُعْدِكُمْ، فَلَا حَاجَةُ لَكُمْ إِلَىٰ اتِّخَاذِهِ عِيْدًا–

> "আবু দাউদ রওয়ায়াতকৃত একটা হাদীস ইরশাদ ফরমায় যে আমরা যেখানেই থাকি না কেন আমাদের সালাওয়াত পাঠ করা উচিৎ; কেননা তা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জানানো হয়। অতএব, কাছে হোক অথবা দূরে হোক তাতে কোনো পার্থক্য হবে না। রওযা শরীফকে উৎসব উদযাপন করার স্থানে পরিণত করা উচিৎ নয়।"[২]

হুজরাহ আস্ সায়াদা যিয়ারত করার দরকার নেই প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে সে লিখেছে যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতি প্রেরিত সালাওয়াত শুনতে পান। কিন্তু ওয়াহহাবীটির কথা পরস্পরবিরোধী। সে-ই কিন্তু আগে বলেছিল যে বেসালপ্রাপ্ত জন শুনতে অথবা অনুভব করতে পারেন না। অথচ, এখানে সে বলছে যে তাঁরা শুনতে পান। তার বক্তব্যগুলো একে অপরকে মিথ্যা প্রমাণিত করে।

পৃষ্ঠা ৪১৬-তে সে লিখেছে:

---

[১]. মির'আতুল মদীনা।

[২]. ফাতহুল মাজীদ ১/২৫৭।

وَأَمَّا فِيْ حَقِّ الأَمْوَاتِ الَّذِيْنَ لَا إِحْسَاسُ لَهُمْ بِمَنْ يَدْعُوهُمْ، وَلَا قُدْرَةٌ لَهُمْ عَلَىٰ نَفْعٍ وَلَا ضَرٍّ، فَلَا يُقَالُ فِيْ حَقِّهِمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ–

–বেসালপ্রাপ্ত জন তাঁদেরকে যা বলা হয় তা শুনতে পান না। তাঁদের কাছে দোয়া ও শাফায়াত চাওয়ার অর্থ হচ্ছে তাঁদের এবাদত করা।[১]

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতি পঠিত সালাওয়াত শুনতে পান মর্মে ওয়াহাবীটির ভাষ্য এবং উপরোক্ত ভাষ্যের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নেই। উপরন্তু সে ইমাম আবু দাউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রওয়ায়াতকৃত দুটো হাদীসের শুধুমাত্র একটাকে উদ্ধৃত করেছে। অপরটি তার স্বার্থ সিদ্ধির পরিপন্থী বলে সে সেটা লিখেনি। হযরত আবদুল হক মুহাদ্দীসে দেহেলভী লিখেছেন, "আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে আবু দাউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণিত একটা হাদীস ঘোষণা করে: 'যখন কেউ আমাকে সালাম দেয়, তখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে আমার রূহ ফিরিয়ে দেন। ফলে আমি তার সালাম শুনতে পাই এবং প্রত্যুত্তর দিতে পারি' । আর ইবনে আসাকির রওয়ায়াতকৃত অপর এক হাদীস ইরশাদ ফরমায়: 'আমার কবরে পঠিত সালাওয়াত আমি শুনতে পাই' (হাদীস)" (মাদারিজুন নবুওয়াত, ৩৭৮ পৃষ্ঠা)। অতএব, এ কথা পরিস্ফুট যে ওয়াহাবীদের দাবি 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত ব্যক্তি, তাই শ্রবণ করতে অক্ষম'-একেবারেই ভিত্তিহীন ও মিথ্যা।

১৭/ ২৭১ পৃষ্ঠায় ওয়াহাবিটি লিখেছে:

"হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِيْ الأَئِمَّةَ المُضَلِّيْنَ আমি আশংকা করি যে আমার উম্মাতের ওপর গোমরাহ ইমামরা ইমামতী করতে আসবে।' অর্থাৎ,

أَيْ الأُمَرَاءُ وَالعُلَمَاءُ وَالعِبَادُ فَيَحْكُمُوْنَ فِيْهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَيُضِلُّوْنَهُمْ، وَكَانَ بَعْضُ هَؤُلَاءِ يَقُوْلُ لِأَصْحَابِهِ: مَنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ فَيَأْتِ إِلَىٰ قَبْرِيْ فَإِنِّيْ أَقْضِيْهَا لَهُ، وَلَا خَيْرٌ فِيْ رَجُلٍ يَحْجُبُهُ عَنْ أَصْحَابِهِ ذِرَاعٌ مِنْ تُرَابٍ، وَنَحْوُ هَذَا. وَهَذَا هُوَ الضَّلَالُ البَعِيْدُ، يَدْعُوْ أَصْحَابَهُ إِلَىٰ أَنْ يَعْبُدُوْهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ، وَيَسْأَلُوْهُ مَالَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ قَضَاءِ حَاجَاتِهِمْ وَتَفْرِيْجِ كُرْبَاتِهَاوَمِنْ هَذَا

[১].প্রাগুক্ত ১/৪১৭।

الضَّرْبُ: مَنْ يدَّعي أَنَّهُ يَصِلُ مَعَ اللهِ إِلَىٰ حَالٍ تَسْقُطُ فِيْهَا عَنْهُ التَكَالِيْفَ; وَيدَّعِي أَنَّ الأَوْلِيَاءَ يَدْعُوْنَ وَيَسْتَغَاثُ بِهِمْ فِيْ حَيَاتِهِمْ وَمَمَاتِهِمْ، وَأَنَّهُمْ يَنْفَعُوْنَ وَيَضُرُّوْنَ وَيَدَبِرُوْنَ الأُمُوْرَ عَلَىٰ سَبِيْلِ الكَرَامَةِ، وَأَنَّهُ يطَّلَعُ عَلَىٰ اللَّوْحِ المَحْفُوْظِ، يَعْلَمُ أَسْرَارَ النَّاسِ وَمَا فِيْ ضَمَائِرِهِمْ وَيَجُوْزُ بِنَاءَ المَسَاجِدِ عَلَىٰ قُبُوْرِ الأَنْبِيَاءِ والصَّالِحِيْنِ وَإِيْقَادِهَا بِالسُّرَجِ وَنَحْو ذَلِكَ مِنَ الغُلُوِّ وَالإِفْرَاطِ وِالعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللهِ، فَمَا أَكْثَرُ هَذَا الهِذْيَان وَالكُفْرُ وَالمُحَادَةُ للهِ وَلكتابه وَلِرَسُوْلِهِ!

এমন সব ইমাম ও নেতারা মুসলমানদের ওপর শাসন করতে আসবে, যারা কুরআনের পরিপন্থী ফতোওয়া প্রদান করবে। এই ধরণের ইমামের অধিকাংশই বলে: 'যে ব্যক্তি বিপদ-আপদগ্রস্ত অথবা যে ব্যক্তির কোনো ফরিয়াদ আছে, সে যেন আমার কবরে আসে; আমি তার হাজত পূর্ণ করবো। আমি আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যপ্রাপ্ত। আমার ওপর হতে এবাদত মওকুফ হয়েছে। আউলিয়া যাকে ইচ্ছা তাকেই সাহায্য করতে পারেন। প্রত্যেকের উচিৎ তাঁদের কাছে হাজত পূরণের জন্যে আবেদন করা। যারা বিপদ-আপদগ্রস্ত তারা যদি মৃত কিংবা জীবিত আউলিয়ার শরণাপন্ন হয়, তবে তারা সমৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হবে; কারণ আউলিয়া যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তাঁরা কারামত প্রদর্শন করেন। তাঁরা লাওহ্ আল মাহফুয-এর ভেতরের খবরাখবর জানেন। মানুষের গোপন চিন্তাগুলো তাঁরা বুঝাতে পারেন।' আর এই ধরণের লোকেরাই নবী ও ওলীগণের কবরের ওপর গুম্বজ নির্মাণ করে থাকে। এ সবগুলোর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর পূজা করা। একটা হাদীস ইরশাদ ফরমায়–

وَقَدْ يَقُوْلُ المُنَافِقُ كَلِمَةَ الحَقِّ–

'মুনাফেকরা সত্য কথা বলে ধোকা দেয়।' আরেকটা হাদীস ঘোষণা করে:

وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةَ حَتَّىٰ يُلْحِقَ حَيٌّ مِنْ أُمَّتِيْ بِالمُشْرِكِيْنَ–

'আমার উম্মতের অধিকাংশ লোক মুশরিক না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত হবেনা। সে মন্তব্য করে,

وَقَدْ اسْتَحَكَمَتْ الفِتْنَةَ بِعِبَادَةِ الأَوْثَانِ حَتَّى إِنَّهُ لاَ يَعْرِفُ أَحَدً فِيْ هَذِهِ القُرُوْنِ المتَأخِرَة أَنْكَرَ مَا وَقَعَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى أَقَامَ الله شَيْخَ الإِسْلاَمْ مُحَمَّد بِنْ عَبْدُ الوَهَّاب الَّذِيْ أَنْكَرَهُ وَنَهَى عَنْهُ، وَدَعَا النَّاسَ إِلَى تَرْكِهِ وَإِلَىْ أَنْ يَعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ فِيْ أُلُوْهِيَّتِهِ وَأَسْمَائِه وَصِفَاتِهِ، فَرَمَاهُ المُلُوْك وَأَتبَاعَهُمْ عَنْ قَوْسِ العَدَاوَةِ، فَأَظْهَرَهُ اللهُ بِالحُجَّةِ وَأَعِزُّ أَنْصَارَهُ عَلَىْ مِنْ نَاوَأَهُمْ. وَبَلَغَتْ دَعَوَتَهُ مَشَارِقَ الأَرضِ وَمَغَارِبَهَا; وَلَكِنَّ مِنَ النَّاسِ مِنْهُمْ مَنْ عَرَفَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ-

যারা কবর পূজা করে এবং সেগুলোকে আল্লাহর শরীক বানায়, তারা এ সম্পর্কে কী বলবে? মূর্তি পূজার ফিতনাটা আজকাল এতোই বৃদ্ধি পেয়েছে যে কেউই তা বুঝতে পারে না। মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব রুখে দাঁড়িয়ে এই মূর্তি পূজার ব্যবস্থাটি রহিত করেন। যদিও কিছু সংখ্যক সরকার তাঁর বিরোধিতা করেছিল, তবুও তিনি সর্বত্র প্রসিদ্ধ (?) হয়ে যান। তাঁকে বহু লোক বিশ্বাস করে, আবার বহু লোক অবিশ্বাসও করে। আবু তাহের বলেন,

قَالَ أَبُوْ طَاهِرُ -غفر الله لهما-: وَإِنَّمَا أَظْهَرَه اللهُ بِتَوْفِيْقِ آلِ سَعُوْدِ لِلانْضَوَاءِ تَحْتَ رَايَةِ التَّوْحِيْدِ الَّذِيْ دَعَا إِلَيْهِ الشَّيْخُ ابْنُ عَبْدُ الوَهَّابْ. فَكَانَ لِجَدِيْدِهِمْ مَعَ بَيِّنَاتِ الشَّيْخِ هَذَا الأَثْرُ فِيْ ظُهُوْرِ كَلِمَةِ التَّوْحِيْدْ، وَقِيَامُ دَوْلَةِ مَرْهُوْبَةِ الجَانِبِ لِأَهْلِ التَّوْحِيْدِ تَصْدِيْقًا.

সৌদি রাজবংশ আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাওহীদ (একেশ্বরবাদ)-এর পতাকা উড্ডীন করেন। শির্কের প্রসারকে রহিত করা এবং শির্ককে ধ্বংস করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

কবরসমূহের ওপর নির্মিত গুম্বজগুলো এই ধরণের (শির্ক)। এগুলোর সবই মূর্তির ঘরে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীতে এগুলোর অস্তিত্ব রাখা উচিত নয়। এদের অধিকাংশকেই আল্ লাত ও উযযা মূর্তির মতো তা'যিম (সম্মান) করা হয়।

অধিকাংশ মুসলমানই মুশরিকে রূপান্তরিত হয়েছে। يَكُوْنُ فِيْ أُمَّتِيْ كَذَّابُوْنَ دَجَّالُوْنَ سَبْعُ وَعِشْرُوْنَ 'আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন দাজ্জাল আগমন করবে'- এই হাদীসটি সুপ্রসিদ্ধ। সাইয়্যেদ সিদ্দিক হাসান খান তার 'কিতাবুল ইযাগা' পুস্তকে লিখেছেন–

للسَيِّدْ صِدِّيْق حَسَنْ خَانْ كِتَابِ "الإِذَاعَةُ لِمَا كَانَ وَيَكُوْنُ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَة". عَدَّ فِيْهِ أُوْلَئِكَ الدَجَّالِيْنَ إِلَىْ زَمَنِهِ، وَعَدَّ مِنْهُمْ الدَّجَال الإِفْرَنْجِيْ الخَبِيْثُ غُلَام أَحْمَدْ القَادِيَانِيْ الهِنْدِيْ قَبَحَهُ اللهُ وَأَخْزَاهُ وَمَنْ اتَّبَعَهُ عَلَىْ كُفْرِهِ فَإِنَّهُ مَا قَامَ بِفِتْنَتِهِ وَادَّعَى المَهْدُوِيَةَ ثُمَّ النُّبُوة إِلَّا بِإِيْعَازِ وَمُسَاعِدة دَوْلَة نَصْرَانِيَّة سِيَاسَتهَا التَفْرِيْق لِجَمَاعَاتِ المُسْلِمِيْنَ.

–যে বদমায়েশ গোলাম আহমদ কাদিয়ানী দজ্জালদের মধ্যে একজন। এই হিন্দুস্তানী কাফেরটা প্রথমে বলেছিল যে সে আল্ মাহদী; কিন্তু পরবর্তীকালে খ্রীষ্টান (বৃটিশ) সরকার কর্তৃক সমর্থনপুষ্ট হয়ে সে নিজেকে নবী হিসেবে ঘোষণা করে।

خَرَجَ المُخْتَارُ ابن أَبِيْ عُبَيْد الثَّقَفِي وَغَلَبَ عَلَىْ الكُوْفَةِ فِيْ أَوَّلِ خِلاَفَةِ اِبْن الزُبَيْر، وَأَظْهَرَ مُحَبَّةَ أَهْلِ البَيْتِ

وَدَعَا النَّاسُ إِلَىْ طَلَبِ قَتَلَةِ الحُسَيْنْ، فَتَتَبَّعَهُمْ فَقَتَلُ كَثِيْرًا مِمَّنْ باشر ذَلِكَ، وَأَعَانَ عَلَيْهِ. فَأَحِبُّهُ النَّاسُ، ثُمَّ ادْعَى النُّبُوْةَ وَزَعَمَ أَنَّ جِبْرِيْلَ –عَلَيْهِ السَّلاَمْ

–আবদুল্লাহ বিন জুবাইর-এর খিলাফত আমলের মুখতার আস্ সাক্বাফীও দজ্জালদের একজন ছিল। সে বলেছিল সে আহল্ আল্ বায়তকে ভালোবাসে এবং হযরত হুসাইনের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হত্যার প্রতিশোধ নেবে। সে বহু মুসলমানকে হত্যা করেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে সে নিজেকে নবী দাবি করে এবং বলে, হযরত জীবরীল আলাইহিস্ সালাম তার কাছে ওহী নিয়ে এসেছেন।[১]

---

১. ফাতহুল মাজীদ ১/২৭১-২৭৫।

ওয়াহাবী গ্রন্থটি ব্যক্ত করেছে যে গোমরাহ অধার্মিক সরকার ও ধর্মীয় পদে সমাসীন ব্যক্তিবর্গ মুসলিমদের ওপর শাসন করবে। বস্তুতঃ হাদীসটিতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইসলামী উলেমা সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত টেনেছেন যে মুসলিমদেরকে বিচ্যুতির দিকে পথপ্রদর্শনকারী সেই সব গোমরাহ লোকেরা হচ্ছে ওয়াহাবীরা, যারা বর্তমানে তা করছে। আহল্ আস্ সুন্নতের আলেমগণ লিখেছেন যে ওয়াহাবীরা গোমরাহ্-পথভ্রষ্ট। আর এ কথাও সন্দেহাতীত যে আলোচিত গোমরাহ শাসনযন্ত্রটি হচ্ছে সৌদি রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত সৌদি আরব সরকার। যেহেতু তাদের অনেক ধন-সম্পদ আছে, সেহেতু তারা মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে গুপ্তচর নিয়োগ করে তাদের মাধ্যমে মুসলিমদেরকে ধোকা দিচ্ছে। গোমরাহ বইপত্র প্রকাশ করে ওয়াহাবীরা আহল্ আস্ সুন্নতের আউলিয়া ও ওলামার প্রতি কলঙ্ক লেপনের অপচেষ্টায় লিপ্ত।

ইমামে রাব্বানী আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী (মোজাদ্দেদে আলফে সানী) তাঁর 'মকতুবাত' পুস্তকের ২২৫ চিঠিতে লিখেছেন, "ইমাম আল্ মাহদী ইসলাম প্রচার করবেন। তিনি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করবেন। মদীনার সর্বোচ্চ ধর্মীয় পদে সমাসীন ব্যক্তিটি, যে নাকি ইসলামের নামে বিদয়াত সংঘটন করতে অভস্ত হবে, সে তাঁর কথায় বিচলিত হয়ে বলবেঃ 'এই লোক আমাদের ধর্মকে ধ্বংস করতে চায়।' ইমাম আল্ মাহদীর আদেশক্রমে গোমরাহ এই ইমামটিকে হত্যা করা হবে" (মকতুবাত)। এই উদ্ধৃতিটি ভবিষ্যদ্বাণী করে যে শুধুমাত্র মদীনাতেই ওয়াহাবীবাদ দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং ইমাম আল্ মাহ্দী কর্তৃক তা সমূলে উৎপাটিত হবে।

ওয়াহাবীটি তার স্বভাব অনুযায়ী পুনরায় কাফের, মুনাফেক ও মুশরিকদের প্রতি নাযেলকৃত আয়াত ও হাদীসসমূহ উদ্ধৃত করে এবং আহলে সুন্নাতের উলামা কৃত এতদসংক্রান্ত তাফসীরগুলো বিশদভাবে লিখে নিজেকে সঠিক পথের অনুসারী হিসেবে দেখাতে চায়। এরপর সে খাঁটি সুন্নী মুসলমানদেরকে আক্রমণ করে, যেভাবে সে তার বইয়ের প্রথম থেকেই করেছে। গুম্বজবিশিষ্ট মাযারকে 'মূর্তির ঘর' এবং আউলিয়াকে 'মূর্তি' বলার উদ্দেশ্যে সে নির্লজ্জভাবে আয়াত ও হাদীসসমূহের বিকৃত ব্যাখ্যা দিতে উদ্যত। যে ব্যক্তি আয়াত ও হাদীসের বিকৃত ব্যাখ্যা দেয় কিংবা মুসলমানদেরকে মুশরিক আখ্যা দেয়, সে নিজেই কাফেরে পরিণত হয়। সে মুসলমানদের মাঝে ফিতনার সূত্রপাত করে। ওয়াহাবীদের কাছে তারা নিজেরাই শুধু মুসলমান গত কয়েক'শ বছরে পৃথিবীতে আগত সকল মুসলমানই মুশরিক ওয়াহাবীটি আরও পরামর্শ দেয়, যেহেতু বর্তমানকালের

মুসলমানগণ 'মৃতদের পূজা' করে থাকেন, সেহেতু ওয়াহাবীদের উচিৎ মুসলমানদেরকে হত্যা করে পথিবী থেকে শিরক বিতাড়ন করা।

এটা স্পষ্ট যে হাদীসে বর্ণিত অজ্ঞ-গোমরাহ ইমামরা হচ্ছে ওয়াহাবীরা। এক হাজার বছরের ঐতিহ্যের বাহক মুসলমানদের সাথে মতভেদ সৃষ্টি করে তারা বিচ্যুত হয়েছে। আর প্রত্যেকেই জানেন যে সৌদি আরব হচ্ছে একটা স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্র যেটা মুসলমানদেরকে পথবিচ্যুত করতে সচেষ্ট। 'ইসলাম' এবং আহল্ আত্ তাওহীদের নামে তারা সঠিক পথের অনুসারী সুন্নী মুসনলমানদের ওপর হত্যাযজ্ঞ ও নির্যাতন চালিয়েছিল। মুসলমানদেরকে মুশরিক আখ্যা দেয়ার উদ্দেশ্যে কুরআন-হাদীসের বিকৃত ব্যাখ্যা করে তারা কুরআনের সঙ্গে মতভেদ সৃষ্টিকারী ফতোয়াসমূহ জারি করছে। পৃথিবীতে কোনো ইসলামী আলেমই বলেন নি, 'যে ব্যক্তি বিপদ-আপদগ্রস্ত অথবা যে ব্যক্তির কোনো আবেদন রয়েছে, তার উচিৎ আমার কবরে আসা; আমি তার হাজত (প্রয়োজন) পূরণ করবো।' ওয়াহাবীটি এই মিথ্যা বাক্যটি বানিয়ে মুসলমানদের বদনাম করছে। ইসলামী উলামাগণ কখনও বলেন নি যে তাঁরা আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হয়েছেন। উপরন্তু, আল্লাহ কর্তৃক তাঁদেরকে প্রদত্ত কারামত প্রচার হোক, এটা তাঁরা চাননি কখনও। তাঁরা শিক্ষা দিয়েছেন যে সর্বোত্তম কারামত হলো ইসলামের বিধান তথা আদেশ-নিষেধ মান্য করা এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অনুসরণ করা। একদিন হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন তাঁর মুরিদানসহ বজ্রপাতের মধ্য দিয়ে মরুভূমিতে হাঁটছিলেন, তখন আকাশ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে এবং সেখান থেকে একটা কণ্ঠস্বরকে বলতে শোনা যায়, "হে আমার বান্দা আবদুল কাদির। আমি তোমাকে অত্যন্ত ভালোবাসি। এখন থেকে তোমার প্রতি ইবাদত করার দায়িত্ব মওকুফ করে দিলাম। পর মুহূর্তেই এই মহান ওলী প্রত্যুত্তর দিলেন, "কাযযাবতা এয়া কাযযাব ওহে মিথ্যাবাদী শয়তান, তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি আমাকে ধোকা দিতে পারবে না। আল্লাহর প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও ইবাদত করা হতে অব্যাহতি দেয়া হয়নি। তাঁর সর্বশেষ ব্যাধির সময়েও তিনি জুমআর নামায আদায় করার জন্যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মসজিদে প্রবেশ করেছিলেন। কাউকেই ইবাদত করা হতে অব্যহতি দেয়া হয় না।" ওয়াহাবীটি এই ধরণের মহান আউলিয়ার কুৎসা রটনা করতে মোটেও লজ্জিত নয়। সে মনে করেছে যে সে তার মিথ্যা কথা দিয়ে মুসলমানদেরকে প্রতারিত করতে পারবে। সে মাযারস্থ আউলিয়ার কাছে মুসলমানদের শাফায়াত ও সাহায্য কামনা করাকে ঠাট্টা করছে এবং তাওয়াসসুলকে শির্ক মনে করেছে। অথচ আমাদের রাসূলে-এ-করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইযা

তাহাইয়্যারতুম ফীল উমূরে ফাসতাঈনূ মিন আহলিল কবূর "তোমাদের বিষয়সমূহে বিপদ-আপদগ্রস্ত হলে মাযারস্থ আউলিয়ার সাহায্যপ্রার্থী হবে"(হাদীস)। মুসলমানগণ এই হাদীসটিকে অনুসরণ করে আউলিয়ার রওযা শরীফ যিয়ারত করেন এবং তাঁদের কাছে এসতেমদাদে রূহানী (আধ্যাত্মিক সাহায্য) কামনা করেন।

উলামা-এ-ইসলাম ওই হাদীসটির আদেশ মেনে আউলিয়ার মাযার শরীফ যিয়ারত করেছেন এবং বলেছেন যে তাঁরা ফয়েয অর্জন করেছেন। ইমাম-এ-রব্বানী আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী তাঁর 'মকতুবাত' কিতাবের ২৯১ নং চিঠিতে বলেন, "দিল্লীতে এক ঈদের দিনে আমি আমার সম্মানিত মুর্শিদ হযরত বাক্বীবিল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মাযার শরীফ যিয়ারত করি। আমি যখন তাঁর নেয়ামতপূর্ণ মাযারের প্রতি মনোনিবেশ করি, তখন তিনি আমাকে তাঁর পবিত্র রুহ্ দ্বারা নেক-নযর করেন। এই ফকিরকে তিনি এতোই দয়া প্রদর্শন করেন যে তিনি হযরত খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে প্রাপ্ত ফয়েয আমাকে মঞ্জুর করেন। এই নিসবাত (অংশ) অর্জন করার পর তাওহীদের মা'রেফতগুলোর বাস্তবতা অর্জিত হয়।" (মকতুবাত)

উপরোক্ত হাদিসটি বহু কিতাবে উদ্ধৃত হয়েছে এবং মুসলমানদের মাঝে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। মহান আলেম আহমদ সামসুদ্দিন ইবনে কামাল আফেন্দী যিনি ওসমানীয় তুর্কী সাম্রাজ্যের নবম শাইখুল ইসলাম এবং মুফতি আস্ সাক্বালাইন ছিলেন, তিনি 'তোমাদের বিষয়সমূহে যখন বিপদগ্রস্ত হও তখন মাযারস্থ আউলিয়ার সাহায্যপ্রার্থী হবে'-এই হাদিসটিকে নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন, "মানুষের রূহ তার দেহের প্রতি আসক্ত। সে যখন মারা যায় এবং তার রূহ দেহকে ত্যাগ করে, তখনও এই ভালোবাসাটুকু নির্মূল হয়ে যায় না। মৃত্যুর পরেও দেহের প্রতি রূহের আসক্তি এবং আকর্ষণ বন্ধ হয়ে যায় না। তাই হাদীসে মৃতদের হাড় ভেঙ্গে ফেলা অথবা কবরের ওপর পা ফেলা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। যখন কেউ কোনো ওলির মাযার শরীফ যিয়ারত করে, তখন উভয়েরই রূহ মিলিত হয় এবং অনেক ফায়দার উদ্ভব হয়। এই ফায়দার জন্যেই শরীয়ত কবর/মাযার যিয়ারতের অনুমতি দিয়েছে। তবে নিশ্চয়ই এর আরও কিছু গোপন ফায়দা আছে।

"মাযারস্থ আউলিয়াবৃন্দের রূহসমূহ এবং যিয়ারতকারীদের রূহসমূহ আয়নাসদৃশ, যেটাতে পরস্পরের প্রতিফলন ঘটে থাকে। যখন যিয়ারতকারী মাযারের দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং আল্লাহ পাকের ক্বাযায় আত্মসমর্পণ করে, তখন তার রূহ্ এই বিষয়টা উপলব্ধি করতে পারে এবং তার জ্ঞান ও নৈতিক গুণগুলো ফয়েয অর্জন

করতে সমর্থ হয়, যেটা এরপর মাযারস্থ বেসালপ্রাপ্ত ওলীর কৃলবে প্রতিফলিত হয়। আর তখনই আল্লাহর কাছ থেকে বেসালপ্রাপ্ত ওলীর রূহের কাছে আগত জ্ঞান ও ফায়েয যিয়ারতকারীর রূহের ওপর প্রতিফলিত হয়। শাফেয়ী আলেম আলাউদ্দিন আলী বিন ইসমাইল তাঁর রচিত 'আল আলম ফী হায়াতিল আম্বিয়া আলাইহিম আস সালাতু ওয়াস সালাম' কিতাবে বলেন: 'নবীদের এবং সকল বুযূর্গ মুসলমানের রূহ তাঁদের মাযার-রওযায় অথবা যেখানে তাঁদের নাম উচ্চারিত হয় সেখানে নেমে আসেন। তাঁদের মাযারের সঙ্গে রূহের একটা সম্পর্ক আছে। অতএব, মাযার যিয়ারত করা মুস্তাহাব। তাঁরা সম্ভাষণদানকারীদের সালাম শুনতে পান এবং প্রত্যুত্তর দেন। 'আক্বিবা' গ্রন্থে হাফেয (মুহাদ্দিস) আবদুল হক আসবিলী একটা হাদিস উদ্ধৃত করেন: 'যদি কেউ তার কোনো বেসালপ্রাপ্ত মুসলিম ভাইয়ের কবর যিয়ারত করে সম্ভাষণ জানায়, তাহলে বেসালপ্রাপ্ত জন তাকে চিনতে পারে এবং প্রত্যুত্তর দেয়' (হাদিস)। শায়েখ ফখরুদ্দিন গাযানফার তাবরিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন: 'অবোধগম্য একটি বিষয়ে আমি একবার খুব গভীর চিন্তামগ্ন হই। এরপর আমার শায়েখ হযরত তাজুদ্দিন তাবরিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মাযারের পাশে বসে ধ্যান করি। ফলে আমি সমাধান পেয়ে যাই।' বহু উলামার মতানুযায়ী, 'মাযারস্থদের সাহায্যপ্রার্থী হবে' এই হাদিসটিতে মাযারস্থ ব্যক্তি হচ্ছেন আউলিয়া যাঁরা 'মৃত্যুর পূর্বে মৃতুবরণ করো'-হাদীসের আদেশটি পালন করে তাসাউফের পথে উন্নতি করেছেন।" [১]

'মুনাকেফরা সত্য কথা বলে মুসলমানদেরকে প্রতারিত করে' এই হাদিসটি ওয়াহহাবী পুস্তকটার দিকে ইশারা করে, যেটাতে অসংখ্য আয়াত, হাদিস ও সুন্নি উলামার কথার মধ্যে গোমরাহ ধ্যান-ধারণা সন্নিবেশিত হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেসালপ্রাপ্ত আউলিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করতে আদেশ দিয়েছিলেন। অথচ, ওয়াহহাবীরা আদেশ পালনকারীদেরকে মুশরিক আখ্যা দিচ্ছে এবং হাদীসের আদেশকে পালন করতে নিষেধ করছে। তারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশকে শির্ক বলছে। এটাই প্রতীয়মান করে যে ওয়াহহাবীরা হাদীসে উল্লেখিত দজ্জালদের একটা অন্যতম দল।

১৮/ ১৬৮ পৃষ্ঠায় সে লিখেছে:

هَذَا وَإِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ الآنْ فِيمَا بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ جَمَاعَاتٌ يَدَّعُوْنَ أَنَّ لِلأَوْلِيَاءِ تَصَرُّفَاتٌ بِحَيَاتِهِمْ وَبَعْدَ مَمَاتِهِمْ، وَيَسْتَغَاثُ بِهِمْ فِيْ الشَّدَائِدِ وَالبَلَيَاتِ

[১]. শরহে হাদীসে আরবেঈন : ১৮ নং হাদীসের ব্যাখ্যা।

وَبِهُمَمِهِمْ تَكْشِفُ المهِمَّات، فَيَأْتُوْنَ قُبُوْرَهُمْ وَيُنَادُوْنَهُمْ فِيْ قَضَاءِ الحَاجَاتِ، مُسْتَدْلِيْنَ أَنْ ذَلِكَ مِنْهُمْ كَرَامَاتٌ وَقَالُوْا: مِنْهُمْ أَبْدَالُ وَنُقَبَاءُ، وَأَوْتَادُ وَنُجَبَاءُ، وَسَبْعُوْنَ وَسَبْعَةٌ، وَأَرْبَعُوْنَ وَأَرْبَعَةٌ، وَالقُطْبُ هُوَ الغَوْثُ لِلنَّاسِ، وَعَلَيْهِ المدَارُ بَلا التِبَاسُ، وَجَوَزُوْا لَهُمْ الذَبَائِحَ وَالنُّذُوْرَ، وَأَثْبَتُوا لَهُمْ فِيْهِمَا الأُجُوْر، قَالَ: وَهَذَا كَلامُ فِيْهِ تَفْرِيطٌ وَإِفْرَاطٌ، بَلْ فِيْهِ الهَلاكُ الأَبَدِيُّ وَالعَذَابُ السَّرمدي؛ لِمَا فِيْهِ مِنَ رَوَائِحِ الشِّرْكِ المحَقَّقِ،

"এটা দাবি করা হয় যে আউলিয়া বেসালপ্রাপ্ত কিংবা জীবিতাবস্থায় যাকে ইচ্ছা তাকে অলৌকিকভাবে সাহায্য করেন। মানুষ বিপদ-আপদের সময় তাঁদের কাছে সাহায্য পাওয়ার জন্যে আবেদন জানায়। তারা আউলিয়ার মাযার-রওযায় যেয়ে বিপদমুক্তি কামনা করে। তারা মনে করে যে তাঁরা কারামত সংঘটন করবেন। বেসালপ্রাপ্তদেরকে তারা আবদাল, নুক্বাবা, আওতাদ, নুজাবা, ৭০ জন, ৪০ জন, ৪ জন, কুতুব ও গাউস ইত্যাদি নামে ডাকে। ইবনুল জাওযী ও ইবনে তাইমিয়া প্রমাণ করেছেন যে এগুলো মিথ্যা। এর অর্থ কুরআনের বিরোধিতা করা। জীবিত কিংবা বেসালপ্রাপ্ত আউলিয়া কিছু করতে পারার ধারণাটিকে কুরআন ভ্রান্ত প্রমাণ করেছে। আল্লাহই সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, অন্যরা কিছুই করতে পারে না। বহু আয়াতে বিবৃত হয়েছে যে বেসালপ্রাপ্তদের মধ্যে কোনো অনুভূতি বা কর্মক্ষমতা নেই। বেসালপ্রাপ্ত জন নিজেদের জন্যেই কিছু সৃষ্টি করতে পারেন না, অন্যরা তো দূরের কথা। আল্লাহ জ্ঞাত করেন যে রূহসমূহ তাঁর কাছেই আছে। কিন্তু এই সব যিন্দিকরা বলে, রূহসমুহ ইচ্ছানুযারী কাজ করতে পারে। তাদের কারামত প্রদর্শনের দাবিটাও মিথ্যা বৈ কিছু নয়। আল্লাহ যে ওলীকে ইচ্ছা কারামত মঞ্জুর করে থাকেন। এটা ওলীর ইচ্ছাধীন নয়। এটা অত্যন্ত জঘন্য যে তাঁদেরকে মানুষেরা বিপদের সময় সাহায্যের আবেদন জানায়। আম্বিয়া, আউলিয়া ও ফেরেশতাগণ কারোরই ক্ষতি অথবা উপকার করতে পারেন না। জীবিতদের কাছে বস্তুগত জিনিস চাওয়া অনুমতিপ্রাপ্ত। কিন্তু বস্তু নয় এমন অদৃশ্য জিনিসের জন্যে আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছে সাহায্য চাওয়া যায় না। ব্যাধিগ্রস্ত অথবা গরিব লোকদের জন্যে নবী, ওলী, রূহ কিংবা অন্য কোনো জীবের

কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা শির্ক। মূর্তি পূজারীরা বিশ্বাস করে যে তাঁরা (নবী-ওলীবৃন্দ) অলৌকিক ক্রিয়া সংঘটন করতে সক্ষম, যাকে তারা কারামত নামকরণ করে থাকে। আল্লাহর আউলিয়া ওরকম নয়।" [১]

বইটির ২৯৯ পৃষ্ঠায় সে বলে:

مَنْ ادَعَى الوِلَايَةَ، وَاَسْتَدَلَّ بِإِخْبَارِهِ بِبَعْضِ المغِيْبَاتِ فَهُوَ مِنْ أَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ لاَ مِنْ أَوْلِيَاءِ الرَّحْمَن، إِنَّ الكَرَامَةَ أَمْرٌ يُجْرِيَهُ اللهُ عَلَىٰ يَدِ عَبْدِهِ المُؤْمِنِ التَّقِي، إِمَّا بِدُعَاءِ أَوْ أَعْمَالِ صَالِحَةٍ لاَ صَنَعَ لِلْوَلِي فِيْهَا، وَلاَ قُدْرَةُ لَه عَلَيْهَا، بِخِلَافِ مَنْ يَدْعَيْ أَنَّهُ وَلِيٌّ وَيَقُوْلُ لِلنَّاسِ: اَعْلَمُوْا أَنِّيْ أَعْلَمُ المغِيْبَاتُ; فَإِنَّ هَذِهِ الأُمُوْرُ قَدْ تَحْصُلُ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الأَسْبَابِ، وَإِنْ كَانَتْ أَسْبَابًا مُحْرِمَةً كَاذِبَةً فِيْ الغَالِبِ،، وَهَكَذَا حَالُ مَنْ سَلَكَ سَبِيْلَ الكَهَانِ مِمَّنْ يَدْعَيْ الوِلَايَة وَالعِلْم بِمَا فِيْ ضَمَائِرِ النَّاسِ، مَعَ أَنَّ نَفْس دَعْوَاه دَلِيْل عَلَىٰ كِذْبِهِ؛ لِأَنَّ فِيْ دَعْوَاهِ الوِلَايَة تَزْكِيَةٌ النَّفْسِ المنْهِيَ عَنْهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ-

–যদি কেউ বলে সে একজন ওলী এবং তার কাছে গায়েবের খবর জানা আছে, তবে সে আল্লাহর ওলী নয়, বরং শয়তানের ওলী। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সালেহ্ বান্দাদের হাত দিয়ে যা সৃষ্টি করেন, তা-ই হচ্ছে কারামত এবং এটা তাঁরা এবাদতের মাধ্যমে অর্জন করে থাকেন। ওলীর ক্ষমতা বা ইচ্ছা এটাকে প্রভাবিত করে না। আউলিয়া কখনো বলেন না যে তাঁরা আউলিয়া। তাঁরা আল্লাহকে ভয় করেন। সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীনবৃন্দ সর্বশ্রেষ্ঠ আউলিয়া ছিলেন। অথচ তাঁরা কখনও বলেননি যে তাঁরা গায়েব জানেন। তাঁরা আল্লাহর ভয়ে কাঁদতেন। তামিম আদ-দারী দোযখের ভয়ে ঘুমোতে পারতেন না। সুরা রা'দ আউলিয়া সম্পর্কে বিস্তরিত ব্যাখ্যা দেয়। ওই ধরনের মুতাসাউয়ীফদেরকেই আউলিয়া বলা যায়।[২]

---

[১]. ফাতহুল মাজীদ ১/১৬৮।

[২]. ফাতহুল মাজীদ ১/২৯৯।

প্রথমতঃ আমাদেরকে বলতে হচ্ছে যে ওয়াহাবীটি তার শেষ উদ্ধৃতিতে সত্য কথা বলেছে। এটা খুবই ভাল হতো যদি সে আউলিয়ার মাযারে সাহায্য প্রার্থনাকে শির্ক না বলতো এবং সাহায্যপ্রার্থী মুসলমানদেরকে কতল (হত্যা) ও মাযার-রওযা ধ্বংস করার ফতোয়া না দিতো ওয়াহহাবীটি শুধু সত্যই লিখে নি, তার লেখনীর মধ্যে মিথ্যার বিষও ছড়িয়েছে। সে মুসলমানদের মধ্যে ফিতনার উদ্ভব করেছে।

নিম্নোক্ত দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি হযরত ইমাম-এ-রব্বানী আহমদ ফারুকী সিরহিন্দীর 'মকতুবাত' গ্রন্থ হতে গৃহীত হয়েছে:

“কারামত সত্য। এর অর্থ শির্ক হতে দূরে থাকা, মা'রেফাত অর্জন করা এবং নিজেকে বিলীন করে দেয়া। কারামত ও ইসতিদরাজের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলা উচিৎ নয়। কারামত ও কাশফের অধিকারী হওয়ার আকাঙ্ক্ষার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ভিন্ন অন্য জিনিসকে ভালোবাসা। কারামত মানে কুরব্ (নৈকট্য) এবং মা'রেফত। কারামতের ঘন ঘন পুনরাবৃত্তির কারণ হলো তাসাউফের পথে অধিক ঊর্ধ্বগমন (আফাক) এবং স্বল্প অধঃগমন (আনফুস) । ইয়াক্বিন বা বিশ্বাসকে দৃঢ় করার জন্যে কারামতের প্রয়োজন। যে ওলী ইয়াক্বীনের বরকতপ্রাপ্ত, তাঁর কারামতের প্রয়োজন নেই। যিকর করতে অভ্যস্ত ক্বলবের হাল (অবস্থা)-এর সঙ্গে তুলনা করলে কারামতের কোনো মূল্যই নেই। একজন ওলীর কাশফে ভুল থাকতে পারে। কাশফ সংঘটনের স্থানটি হচ্ছে ক্বলব। সহীহ্ বা খাঁটি কাশফ্ কল্পনা হতে উদ্ভূত নয় এবং এটা ইলহামের (ঐশী প্রত্যাদেশের) মাধ্যমে কলবে (অন্তরে) সংঘটিত হয়ে থাকে। কল্পনার সঙ্গে মিশ্রিত কাশফ নির্ভরযোগ্য নয়। শরিয়াতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হলেই আউলিয়ার কাশফ নির্ভরযোগ্য হবে। তা যদি না হয়, তবে তাতে আস্থা স্থাপন করা যাবে না। আউলিয়ার কাশফ ও ইলহামকে লোকেরা দালিলিক প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে না। তবে একজন মুজতাহিদের কথা অবশ্যই তাঁর মযহাবের অনুসারীদের জন্যে দলিল হবে। কাশফ ও কারামতের মালিকানা আধ্যাত্মিক উচ্চমর্যাদার মাপকাঠি নয়। তাসাউফের সালেক (পথচারী)-দেরও কাশফ ও তাজাল্লী (আলোকচ্ছটা) ঘটতে পারে। যাঁরা পথের শেষপ্রান্তে পৌঁছেছেন, তাঁরা আত্মহারা হয়ে এবাদতে মশগুল। প্রত্যেকের উচিৎ বিনয়ের সঙ্গে অবনত মস্তকে একজন ওলীর সামনে হাযির হওয়া, যাতে লাভবান হওয়া যায়। তা'যিম (সম্মান) এবং বিনয়ের সঙ্গে আউলিয়ার অনুরূপ বস্ত্র বা পোষাক পরিধান করলেও কোনো ব্যক্তি লাভবান হবে। আল্লাহতা'আলা আউলিয়াকে মহাগুণাহ সংঘটন করা থেকে রক্ষা (হেফাযত) করে থাকেন। কিছু আউলিয়াকে তাঁদের বসবাসের স্থান থেকে বহু দূরে অবস্থান করতে দেখা গিয়েছে। আসলে তাঁদের রূহই তাঁদের শারীরিক আকার ধারণ করেছিলেন। তবে ছোট-খাটো গুণাহ থেকে

আউলিয়াকে রক্ষা করা হয়না; কিন্তু তাঁদেরকে শিগগির 'গাফলাত' (ঔদাসীন্য) হতে জাগ্রত করা হয়, ফলে তাঁরা তওবা করেন এবং সওয়াবদায়ক কাজ করেন এবং ক্ষমাপ্রার্থী হন। আউলিয়া কেরাম লোকদেরকে শরীয়তের প্রকাশ্য আদেশ-নিষেধ এবং গোপন ও সূক্ষ্ম জ্ঞান উভয়ের দিকেই আহ্বান করেন। কিছু আউলিয়া 'সাবাব' (কারণ সমূহ)-এর ভূবনে নেমে ফিরে আসেন নি। তাঁরা নুবওয়তের মাহাত্ম্য সম্পর্কে সচেতন নন; এবং তাঁরা মানুষের জন্যে উপকারীও নন। তাঁরা ফয়েয সরবরাহ করতে অক্ষম। অধিকাংশ আউলিয়া বেলায়াতের মাহাত্ম্যের অধিকারী। উদাহরণস্বরূপ, এঁদের মধ্যে কুতুব, আওতাদ ও আবদালগণ অন্যতম। তাঁরা হযরত আলী (ক:)-এর সাহায্যে যুব সম্প্রদায়কে গড়ে তুলতে সক্ষম।

"আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার ডিগ্রী (পর্যায়) অনুপাতে আউলিয়ার মর্যাদার মাহাত্ম্য বিরাজমান। বেলায়াত হচ্ছে যিলসমূহ (ছায়া, আকার-আকৃতি) অর্জনকারী অবস্থাবিশেষ। আউলিয়া শুধুমাত্র ছায়াগুলোকেই (যিল) ভালোবাসেন এবং উপভোগ করেন। বেলায়াত হচ্ছে নবুয়্যতের ছায়া। প্রত্যেকের উচিত বেলায়াতকে ওযু-তুল্য এবং শরীয়তকে সালাত-তুল্য মনে করা। বেলায়াতের অর্থ বদ অভ্যাসগুলোকে শুদ্ধ করা। একজন ওলীকে তার ওলীত্ব সম্পর্কে না জানলেও চলে। এটা ওলীর জন্যে ত্রুটিদায়ক নয় যদি তাঁকে জ্ঞাত না করিয়ে বেলায়াত দেয়া হয়ে থাকে। ওলী হতে হলে এ পৃথিবী এবং পরবর্তী জগতের মায়া কলব্ থেকে বিতাড়িত করা একান্ত প্রয়োজন। পরবর্তী জগতের প্রতি আসক্ত হওয়া ভাল, কারণ এটা নবুয়্যতের মাহাত্ম্যগুলোর মধ্যে একটা। মানুষের মধ্যে দশটি লতিফা বিরাজমান যেগুলো আধ্যাত্মিক জগতের (পদার্থ)। বেলায়াত ও নবুয়্যতের মাহাত্ম্যসমূহ এই দশটি লতিফার ওপর সংঘটিত হয়। বেলায়াতের অর্থ হচ্ছে ফানা (আল্লাহর মাঝে বিলীন) ও বাক্বা (আল্লাহর সাথে চির অস্তিত্বশীল)। এর অর্থ এ পৃথিবী থেকে ক্বলবকে মুক্ত করে পরবর্তী জগতের সঙ্গে সংযুক্ত করা। বুদ্ধি অথবা যুক্তি দিয়ে বেলায়াতকে উপলব্ধি করা যায় না। বেলায়াত মানে আল্লাহর নৈকট্য এবং এটা এমন ব্যক্তিত্বদেরই প্রদান করা হয়, যাঁরা তাঁদের কলবগুলো থেকে অন্যান্য সৃষ্টির চিন্তা দূর করেছেন। সৃষ্টির চিন্তাসমূহ ক্বলব হতে দূর করাকে বলা হয় 'ফানা'। শরিয়তকে মান্য করেই বেলায়াতের সকল গুণাবলী বা মাহাত্ম্য অর্জন করা সম্ভব। আর শরিয়তের অভ্যন্তরীন সূক্ষ্ম বিষয়গুলো যা প্রত্যেকের জানা নেই, তা মান্যকারীদেরকেই নবুয়্যতের মাহাত্ম্য প্রদান করা হয়। নবুয়্যতের মাহাত্ম্যগুলো কিন্তু স্বয়ং নবুয়্যত নয়। যাঁরা সব ডিগ্রী (পর্যায়) অতিক্রম করে বেলায়াতের শেষপ্রান্তে পৌঁছেছেন, তাঁদের দ্বারা সংঘটিত কাশফ ও ইলহামগুলো আহল্ আস্ সুন্নাতের উলামা কর্তৃক কুরআন-হাদীস থেকে নিঃসৃত জ্ঞানের সঙ্গে

সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। বেলায়াতের অগ্রসরমান পথের অর্ধেক নিচের দিকে। বহু লোক মনে করেছিল যে ওপরের দিকে অগ্রসর হওয়াটাই হচ্ছে বেলায়াত এবং নিচের দিকে অগ্রসর হওয়াটা নবুয়্যত। বস্তুতঃ অধঃগমনও ঊর্ধ্বগমনের মতোই বেলায়াতের অংশ। বেলায়াত হচ্ছে 'জযবা' (আকর্ষণ) ও 'সুলুক' (অগ্রসর হওয়া)-এর সমষ্টি। এই দুটোই বেলায়াতের ভিত্তিস্তম্ভ; কিন্তু নবুয়্যতের মাহাত্ম্যগুলোর জন্যে এগুলো জরুরি নয়। বেলায়াতের সর্বশেষ পর্যায় হচ্ছে আবদিয়্যাত (গোলামি)। এর চেয়ে বড় ডিগ্রী আর নেই। আল্লাহর দিকেই আউলিয়া পরিচালিত। তবে নবুয়্যতের গুণাবলীতে এটি আল্লাহ এবং খালক্ (সৃষ্টি) উভয়ের দিকে পরিচালিত, আর এই দু'টো দিক পরস্পরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না। যদিও আউলিয়া কেরামের নফস 'মুতমাইন্না' (প্রশান্ত) হয়ে গিয়েছে, তবুও দেহের পদার্থগুলো এখনও কামনা করতে থাকবে।

"বেলায়াত পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেকটি পর্যায়-ই পাঁচ লতিফার একটির উন্নতিতে অর্জিত হয় এবং প্রত্যেকটি পর্যায়-ই উলুল আ'যম নবীগণের পথের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যার মধ্যে প্রথমটি হযরত আদম (আঃ)-এর পথের সঙ্গে সম্পর্কিত। বেলায়াতের প্রথম পর্যায়ভুক্ত একজন নবীর বেলায়াতও পঞ্চম পর্যায়ের ওলীর বেলায়াতের চেয়ে বেশি মূল্যবান। 'বেলায়াত খাসসা' নামের সর্বোচ্চ পর্যায়ের বেলায়াত অর্জন করতে হলে নফসকে নির্মূল করতে হবে। 'মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যু বরণ করো'- হাদীসের আদেশটি এই নির্মূল করার প্রক্রিয়ার দিকে ইঙ্গিত করে। বেলায়াত হয় খাসসা (বিশেষ), নয়তো আম্মা (সার্বিক)। বেলায়াত খাসসা হচ্ছে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বেলায়াত এবং এটা সম্পূর্ণ ফানা ও পরিপক্ব বাক্বা। নফস্ এই সময় আল্লাহর মাঝে বিলীন হয়ে গিয়েছে এবং আল্লাহ এর প্রতি সন্তুষ্ট আছেন। পর্যায়গুলো অথবা পাঁচ লতিফার উন্নতির ওপর বেলায়াতের উচ্চমর্যাদা নির্ভর করে না। যে ব্যক্তি লতিফায়ে আখফা-এর বেলায়াত হাসিল করেছেন, যেটা সর্বোচ্চ লতিফা, তিনি যে অন্যান্য লতিফার বেলায়াতসম্পন্ন আউলিয়ার থেকে বড় হবেন, এমন কোনো কথা নেই। বেলায়াতের শ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র 'আসল' বা উৎসের নৈকট্য অথবা দূরত্বের দ্বারাই পরিমাপ করা হয়। যে ওলী নিচু পর্যায়ের 'লতিফা ক্বলব'-এর বেলায়াত অর্জন করেছেন, তিনি যদি উৎসের নিকটবর্তী হন, তাহলে তিনি 'লতিফা আখফা'র বেলায়াত অর্জনকারী ওলী যাঁর চেয়ে তিনি উৎসের নিকটবর্তী রয়েছেন, সেই ওলীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারেন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বেলায়াত অর্জনকারী ওলীর বেলায়াত পদচ্যুতি হওয়া থেকে নিশ্চিতভাবে মুক্ত। অন্যান্য পর্যায়ের ওলীদের এই নিশ্চয়তা নেই এবং তাঁরা সংকটাপন্ন। একমাত্র

ক্বলব ও রূহের নিমূর্ল হওয়ার মাধ্যমেই বেলায়াত অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু এর জন্যে আবার দরকার অপর তিন লতীফার লয়। কোনো ওলীর বেলায়াতকে বলা হয় 'বেলায়াত সুগরা' ( ক্ষুদ্র বেলায়াত) এবং কোনো নবীর বেলায়াতকে 'বেলায়াত কুবরা' (মহা বেলায়াত)। 'আনফুস' ও 'আফাক'-এ উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত 'বেলায়াত সুগরা' চলতে থাকে। বেলায়াত সুগরা-তে ত্রুটি এবং কল্পনা থেকে মুক্ত থাকার কোনো পথ নেই। কিন্তু 'বেলায়াত কুবরা'-এ এর ঠিক উল্টোটা ঘটে। বেলায়াত সুগরা আরম্ভ হয় আরশের বাইরে অবস্থিত মূল পাঁচ লতিফাকে অতিক্রম করে এবং সমাপ্তি ঘটে যিলসমূহ অথবা আল্লাহ তা'আলার সিফাতগুলোর বাহ্যিক আবরণগুলো, যেগুলো উপরোক্ত মৌলিক পাঁচ লতিফার মূল, সেগুলোকে অতিক্রম করে। বেলায়াত সুগরা সংঘটিত হয় আফাক্ব এবং আনফুসে মানবের বাইরে এবং ভেতরে। আরেক কথায়, যিল বা ছায়াসমূহে এটা সংঘটিত হয়। পথের এই অংশের শেষপ্রান্তে যারা পৌঁছেছেন, তাঁরা 'তাজাল্লী আল বারক্বী,' অর্থাৎ, আকস্মিক বিদ্যুৎ চমকের মতো তাজাল্লীসমূহ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। এ সকল ছায়ার মূলসমূহে বেলায়াত কুবরা সংঘটিত হয় এবং সেটা আল্লাহর নৈকট্যের দিকে অগ্রসরমান।"[১]

একটি হাদীসে বিবৃত হয়েছে, وَقَدْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةُ الحَقِّ. যে মুনাফেক্বরা হয়তো সত্য বলবে।[২] এই হাদীসটি ভবিষ্যদ্বাণী করে যে ওয়াহাবীরা আয়াত ও হাদীসসমূহ উদ্ধৃত করে মুসলমানদের ধোকা দিতে চেষ্টা করবে। আল্লাহ যাঁদেরকে ভালোবাসেন, তাঁদের দোয়া কবুল করবেন বলে তিনি ওয়াদা করেছিলেন। তাই মুসলমানগণ আল্লাহতা'আলার এই ওয়াদার ওপর আস্থা রেখে শরীয়ত মান্যকারী এবং নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাংক অনুসরণকারী ইসলামী হক্কানী আলেমগণের দোয়া কবুল হওয়ার বিষয়টাতে বিশ্বাস করেন। তাঁরা ওই সকল মহান এবং নেয়ামতপ্রাপ্ত বুযুর্গানে দ্বীনের কাছে তাঁদের জন্যে দোয়া করতে আবেদন জানান এবং শাফায়াত চান।

সুরা ফাতেহায় আমাদের আদেশ দেয়া হয়েছে এ কথা বলতে وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ "আমরা শুধু আল্লাহরই সাহায্য প্রার্থনা করি"[৩] এই আয়াতটি

---

[১]. মকতুবাত : মুজাদ্দিদে আলফে সানী।
[২]. আবূ দাউদ : আস সুনান, বাবু লুযূমিস সুন্নাহ, ৪/২০২ হাদীস নং ৪৬১১।
ক. বায়হাক্বী : আস সুনান, ১০/৩৫৫ হাদীস নং ২০৯১৬।
খ. হিলইয়াতুল আউলিয়া : ১/২৩২।
[৩]. আল কুরআন : ১/৫।

প্রতীয়মান করে যে সৃষ্টিকুল কোনো কিছু সৃজন করতে পারেন না। শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করে থাকেন। আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারও কাছে তাকে সৃষ্টিকারী মনে করে যদি কেউ কোনো কিছুর প্রত্যাশী হয়, তবে সে মুশরিক হয়ে যাবে। ওয়াহহাবী পুস্তকটি মানুষদেরকে দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত করে জীবিত ও বেসালপ্রাপ্ত এবং লিখে যে যদি কেউ বেসালপ্রাপ্ত কিংবা অনুপস্থিত জীবিতদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, তাহলে সে মুশরিকে পরিণত হবে। অপরপক্ষে, বইটি উপস্থিত জীবিতদের বস্তুগত সাহায্য প্রদানের বিষয়টি জায়েয (অনুমতিপ্রাপ্ত) বলে স্বীকার করে। অতএব, ওয়াহহাবীটি সুরা ফাতেহার বিরোধিতা করে কুরআন মজিদকে বিকৃত করেছে। কেননা, আয়াতটি ওয়াহহাবীটির মতানুযায়ী ব্যক্ত করে যে এমন কি উপস্থিত জীবিতদের কাছেও কোনো কিছু চাওয়া যাবে না এবং আল্লাহ ছাড়া কেউই কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। সুতরাং আয়াতটির নিজস্ব উপলব্ধি অনুযায়ী ওয়াহাবীরাই মুশরিকে পরিণত হয়েছে।

বস্তুতঃ একমাত্র তা'আলাই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করে থাকেন। কিন্তু তিনি কোনো না কোনো কারণের মাধ্যমে তা করে থাকেন। আয়াত ও হাদীসমূহ এবং দৈনন্দিন ঘটনা প্রবাহই এর সুনিশ্চিত প্রমাণ। শুধু জ্ঞানী ব্যক্তিরাই নন, অশিক্ষিতরাও এ কথা জানে। কোনো কিছু অর্জন করতে হলে ওর জন্যে প্রয়োজনীয় ওসীলাতুল্য কাজগুলো সম্পন্ন করতে হয়, যেটা ওই বস্তু সৃষ্টি হবার কারণস্বরূপ। সৃষ্টি হবার কারণগুলোকে আঁকড়ে ধরাটা সুরাতুল ফাতেহার বিরুদ্ধাচরণ নয়। আল্লাহতায়ালা যে সকল বস্তু ওসীলা বা কারণের মাধ্যমে-ই সৃষ্টি করেন, তার প্রমাণ হচ্ছে নিম্নোক্ত হাদীসগুলো: "সকল বস্তু অর্জনের উপায়সমূহ আছে। জান্নাতের উপায় হচ্ছে জ্ঞান;" "মাগফেরাত অর্জনের মাধ্যম হচ্ছে মুসলিমদেরকে সন্তুষ্ট করা," "মাগফেরাত অর্জনের মাধ্যমগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে ক্ষুধার্ত মুসলিমদেরকে খাদ্য প্রদান করা;" "আমরা কোনো মুশরিকের সাহায্যপ্রার্থী হই না;" "জ্ঞান শিক্ষা দেয়ায় মহাপাপও ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়;" "প্রত্যেক রোগেরই ওষুধ আছে;" "যে ব্যক্তি স্মৃতিকে শক্তিশালী করতে চায়, তার উচিৎ মধু খাওয়া;" এবং "মদ্যপান শয়তানী প্ররোচণা দেয়" (হাদীস)। এ রকম আরও বহু হাদীস আছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান, "আমি যুলকারণাইনকে সকল বস্তুর কারণসমূহ শিক্ষা দিয়েছি" [১]

---

[১]. আল কুর'আন : সূরা আল কাহাফ।

আমরা এ গ্রন্থের মুখবন্ধে উল্লেখ করেছি যে আমাদের থেকে দূরে কিংবা কাছে প্রত্যেকটি জীবিত এবং জড় বস্তুই একটি ঘটনা অথবা প্রতিক্রিয়ার কারণস্বরূপ বর্তমান রয়েছে। কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সেগুলোকে উপকারী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে হলে বিভিন্ন জড় বস্তু ও প্রাণীকে যুক্তিসঙ্গত উপায়ে ব্যবহার করতে হবে। কোনো ব্যক্তিকে মধ্যস্থতাকারী হতে হলে প্রথমতঃ তাকে মধ্যস্থতাকারী হওয়াতে সম্মতি দিতে হবে এবং কিছু কাজ বা দোয়া করতে হবে। মধ্যস্থতায় তার এই সম্মতি হয় তারা দ্বারা প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুধাবনের ফলে হবে, নয়তো মধ্যস্থতার জন্যে অনুরোধের ফলে হবে। ওয়াহহাবীরা আহলে সুন্নতের মতোই বিশ্বাস করে যে প্রাণহীন জড় বস্তু এবং প্রাণীসমূহ আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় কারণ হতে পারে এবং তারা বলে না যে কারণসমূহকে আঁকড়ে ধরা শির্ক। তারা বিশ্বাস করে যে মানুষেরা কারণের মাধ্যমে যা আশা করে তা আল্লাহ সৃষ্টি করে দেবেন এবং উপস্থিত জীবিতরা যদি আবেদন শ্রবণ করেন, তবে দোয়া করে সাহায্য করবেন। কিন্তু তারা বিশ্বাস করে না যে দূরবর্তী অনুপস্থিত এবং বেসালপ্রাপ্ত আউলিয়া শ্রবণ ও সাহায্য প্রদানে সক্ষম।

এটা নিশ্চিত সত্য, আহল আস্ সুন্নাত এবং ওয়াহাবীরা উভয়েই বিশ্বাস করে যে মধ্যস্থতাকারীরা সৃষ্টিকারী নন। ফলে তারা নিজেদেরকে শির্ক থেকে রক্ষা করে। ওয়াহাবীরা আহলে সুন্নাত থেকে বিচ্যুত হয় এ কথা অবিশ্বাস করে যে দূরবর্তী অনুপস্থিত এবং বেসালপ্রাপ্ত আউলিয়া শ্রবণ করতে সক্ষম। আর এটা বুঝা গেল যে তারা সুন্নীদেরকে এই বিশ্বাসের জন্যে মুশরিক আখ্যায়িত করে থাকে। আমরা ২৪ তম অধ্যায়ে (অর্থাৎ ২৪তম উদ্ধৃতির জবাবে) প্রমাণ করবো যে ওয়াহাবীরা মহাভ্রান্ত এবং অনুপস্থিত ও বেসালপ্রাপ্ত আউলিয়া শ্রবণ করতে সক্ষম এবং আল্লাহর সালেহ্ বান্দাগণের দোয়াও কবুল হয়। নিম্নোক্ত হাদীসগুলো কানযুদ্ দাকাইক' গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত হয়েছে -"একজন মুসলমান ভাইয়ের জন্যে তার অনুপস্থিতিতে প্রেরিত দোয়া প্রত্যাখ্যাত হবে না;" "উম্মতের মধ্যে গুণাহ বর্জনকারী যুবকদের দোয়া গৃহীত হবে;" "পুত্রের জন্যে পিতার দোয়া উম্মতের জন্যে নবীর দোয়ার মতোই;" "দোয়া ক্ষতি দূর করে।" (হাদীস)

'তানবিহ্ আল গাফিলীন' পুস্তকে লিপিবদ্ধ কিছু হাদীস ইরশাদ ফরমায়: "যদি কোনো মুসলমান দোয়া করে, তবে নিশ্চয়ই তা গৃহীত হবে" এবং "এক মুঠো হারাম যে ব্যক্তি খায়, তার দোয়া চল্লিশ দিন পর্যন্ত কবুল করা হয় না" (হাদীস)। 'বোঁস্তা' গ্রন্থে উদ্ধৃত একখানা হাদীস ঘোষণা করে:

" مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَىٰ ثَلَاثَ مَرَارٍ : بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ " لَمْ يُصِبْهُ فِيْ يَوْمِهِ وَلَا فِيْ لَيْلَتِهِ شَيْءٌ-

–বিসমিল্লাহিল্ লাযি লা ইয়াদুররু মা'আসমিহি শাইয়্যুন ফিল আরদি ওয়া লা ফিস্ সামায়ী ওয়া হুয়াস্ সামী'উল আ'লিম'- এই দোয়াটি যে ব্যক্তি সকালে তিনবার পড়বে, সে বিকেল পর্যন্ত ক্ষতি হতে রক্ষা পাবে; আর যদি সে বিকেলে তা পাঠ করে, তবে সে (পরবর্তী) সকাল পর্যন্ত ক্ষতি হতে রক্ষা পাবে। [১]

এ সকল হাদীস ইঙ্গিত করে যে সালেহ (পুণ্যবান) আউলিয়ার দোয়া কবুল করা হবে। ওয়াহাবী পুস্তকটি সারাক্ষণ এ বিষয়টিকে আক্রমণ করেছে এ কথা বলে যে আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের কাছে প্রার্থনা জানানো শির্ক। ওয়াহাবীটি এতোই অজ্ঞ আহাম্মক যে সে আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় আউলিয়ার কাছে সাহায্য প্রার্থনাকে মুশরিকদের মূর্তি পূজার সঙ্গে তুলনা করেছে। কীভাবে একজন লোক আউলিয়া-এ-আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনাকে মূর্তির কাছে সাহায্য প্রার্থনার সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে ফেলতে পারে?

মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নামের এক যিনদিক (অন্তর্ঘাতী শত্রু) ওয়াহাবী মতবাদের ফিতনা আরম্ভ করে। সে ইসলামের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। সে অন্যায়ভাবে বলে যে ওয়াহহাবীরা ছাড়া আর বাকি সব মুসলমানই কাফের ও মুশরিক। যদিও সে মৃত্যুবরণ করেছে, তবুও তার মতাদর্শের শরাব পান করে মাতাল হয়ে অজ্ঞ আহাম্মকরা মুসলিম দেশগুলোতে ফিতনা-ফাসাদ জিইয়ে রেখেছে। তাই মুসলমানদেরকে সঠিক ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হলে আহল্ আস্ সুন্নাতের উলামার কিতাবাদি পাঠ করতে হবে এবং ওয়াহহাবীদের ধোকাপূর্ণ কথায় আকৃষ্ট হওয়া থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। যাঁরা ইসলামকে সঠিকভাবে জানতে পেরেছেন, তাঁরা স্পষ্টই বুঝতে পারেন যে ওয়াহহাবীরা একটা আলাদা সংস্কারবাদী দল, যারা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু অজ্ঞরা তাদের মিথ্যা কথায় ধোকা খেয়ে ওয়াহহাবীদের ফাঁদে পা

---

[১]. ইব্‌ন আবূ শায়বা : আল মুসান্নাফ, ৭/৪০।
ক. বুখারী : আদাবুল মুফরাদ, ১/১৫১।

দিয়েছে। বিশেষ করে যারা হজ্জে যেয়ে ওয়াহহাবীদের স্বর্ণে মজে গিয়েছে, তারা এই ভ্রান্তদের বিষাক্ত ও ক্ষতিকর বইপুস্তক পাঠ করে বিচ্যুত হয়েছে। এ সকল অজ্ঞ লোকেরা দেশে ফিরে এসে ওয়াহহাবী মতবাদ প্রচার করতে উঠে পড়ে লেগে যায়। বহু হাদিস ভবিষ্যদ্বাণী করে যে এ সকল গোমরাহ লোকদের আবির্ভাব ঘটবে এবং তাদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য একদম দজ্জালের মতো হবে। একটি হাদীসে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে যে হযরত ইমাম আল মাহদী পথভ্রষ্ট দজ্জালকে হত্যা করার পর মক্কা ও মদিনায় যাবেন এবং সেখানে সহস্র সহস্র ওয়াহহাবীকে হত্যা করবেন। হযরত ইমাম আহমদ ফারুকী সিরহিন্দি (মুজাদ্দেদে আলফে সানী) তাঁর 'মকতুবাত' গ্রন্থে এ হাদিসের বিশদ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করেছেন। যদি ওয়াহহাবীরা সুন্নিদের পরিবর্তে কাদিয়ানীদেরকে ভর্ৎসনা করতো, তাহলে তারা ইসলামের একটা খেদমত করতো নিঃসন্দেহে। সৌভাগ্যক্রমে, ইসলামের খেদমত তাদের ভাগ্যে জুটে না যারা ইসলামকে ধ্বংস করতে চায়। মহান ইসলামী আলেম হযরত ইমাম কৃসতলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজ 'আল মাওয়াহিব আল লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে লিখেছেন: "নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতের ওপর আল্লাহ তা'আলার বর্ষিত কারামতগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, أَنَّ فِيْهِمْ أَقْطَابًا وَأَوْتَادًا وَنُجَبَاءَ وَأَبْدَالاً তাঁদের মধ্যে আকতাব (কুতুবগণ), আওতাদ, নুজাবা এবং আবদালবৃন্দ আছেন। আনাস্ বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন الأَبْدَالُ أَرْبَعُوْنَ যে আবদালগণের সংখ্যা চল্লিশজন।[১] ইমাম তাবারানীর 'আওসাত'-এ উদ্ধৃত হাদীসটি ঘোষণা করে,

لَنْ تَخْلُوَ الْأَرْضُ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا مِثْلَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ، فَبِهِمْ يُسْقَوْنَ وَبِهِمْ يُنْصَرُونَ، مَا مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَبْدَلَ اللهُ مَكَانَهُ آخَرَ.

–ইব্রাহীম নবী আলাইহিস্ সালাম-এর মতো নেয়ামতপ্রাপ্ত চল্লিশজন সবসময়ই বিরাজ করেন। তাঁদের বরকতে বৃষ্টিপাত হয়। তাদের মধ্যে কেউ একজন বেসালপ্রাপ্ত হলে আল্লাহ তা'আলা আরেকজনকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন'।[২]

[১]. মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া : ২/৪১৬।
[২]. তৃবরানী : মু'জামুল আওসাতৃ, ৪/২৪৭ হাদীস নং ৪১০১।

ইবনে আদি বলেছেন,

وَرَوَاهُ اِبْنُ عَدِىْ فِىْ كَامِلِهِ بَلَّفْظ الْبُدَلاَءُ أَرْبَعُوْنَ.

'আবদালবৃন্দ চল্লিশজন।'

ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণিত একটি হাদিস ঘোষণা করে,

الأَبْدَالُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ ثَلاَثُونَ مِثْلُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ أَبْدَلَ اللهُ مَكَانَهُ رَجُلاً.'

–এ উম্মতের মধ্যে সব সময়েই ত্রিশজন বিরাজমান যারা প্রত্যেকেই ইব্রাহীম নবী আলাইহিস্ সালাম-এর মতো রহমতপ্রাপ্ত'।[১]

'হিলইয়া' পুস্তকে আবু নুয়াইম রওয়ায়াতকৃত একটি হাদিস ইরশাদ ফরমায়:

خِيَارُ أُمَّتِي فِي كُلِّ قَرْنٍ خَمْسُمِائَةٍ وَالأَبْدَالُ أَرْبَعُونَ.

'আমার উম্মতের মধ্যে প্রত্যেক শতাব্দীতেই বেশ কিছু নেককার বা সালেহ মানুষ বিরাজ করবেন। তাঁরা সংখ্যায় পাঁচ'শ জন। এঁদের মধ্যে চল্লিশজন হচ্ছেন আবদাল; প্রত্যেক দেশেই তাঁরা আছেন'।[২]

এই বিষয়ে বহু হাদিস আছে। 'হিলইয়া' গ্রন্থে আবু নুয়াইম রওয়ায়াতকৃত অপর এক মরফু হিসেবে জ্ঞাত হাদিস ইরশাদ ফরমায়,

«لَا يَزَالُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ إِبْرَاهِيمَ، يَدْفَعُ اللهُ بِهِمْ عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، يُقَالَ لَهُمُ الْأَبْدَالُ» . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُمْ لَمْ يُدْرِكُوهَا بِصَلَاةٍ وَلَا بِصَوْمٍ وَلَا بِصَدَقَةٍ» . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَبِمَ أَدْرَكُوهَا؟ قَالَ: «بِالسَّخَاءِ وَالنَّصِيحَةِ لِلْمُسْلِمِينَ.

–আমার উম্মতের মধ্যে সবসময় চল্লিশজন বিরাজমান। তাঁদের ক্বলব (অন্তর) হযরত ইব্রাহীম নবী আলাইহিস্ সালাম-এর ক্বলবের মতো। তাঁদের ওয়াস্তে আল্লাহতা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে বিপদ থেকে ক্ষমা বা রক্ষা করেন। তাঁদেরকে আবদাল বলা হয়। তাঁরা সালাত, রোযা অথবা যাকাতের মাধ্যমে ওই পর্যায়/স্তর

---

[১]. আহমদ : আল মুস্‌নাদ, ৫/৩২২।

[২]. আবূ নুয়াইম : হিলইয়াতুল আউলিয়া ১/৮।

অর্জন করেন না।' এরপর হযরত ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁরা ওই মাকাম/পর্যায় কিসের মাধ্যমে অর্জন করে থাকেন?' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেন: 'তাঁরা তা অর্জন করেন দানশীল হয়ে এবং মুসলিমদের সৎ-পরামর্শ দিয়ে।[১]

অপর এক হাদিসে ঘোষিত হয়েছে,

عَلَامَةُ أَبْدَالِ أُمَّتِیْ أَنَّهُمْ لاَ يَلْعَنُوْنَ شَيْئًا أَبَدًا.

–আমার উম্মতের মধ্যে আবদালবৃন্দ কোনো কিছুকে লা'নত দেন না।

তারিখ-এ-বাগদাদ' গ্রন্থে আল খাতিব আল বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন:

النُّقَبَاءُ ثَلاَثُمِائَةٍ، وَالنُّجَبَاءُ سَبْعُوْنَ، وَالبُدَلاَءُ أَرْبَعُوْنَ، وَالأَخْيَارُ سَبْعَةٌ، وَالعَمَدُ أَرْبَعَةٌ، وَالغَوْثُ وَاحِدٌ، فَمَسْكَنُ النُّقَبَاءِ المغْرِبُ، وَمَسْكَنُ النُّجَبَاءِ مِصْرُ، وَمَسْكَنُ الأَبْدَالِ الشَّامُ، والأَخْيَارُ سَيَاحُوْنَ فِيْ الأَرْضِ، وَالعَمَدُ فِيْ زَوَايَا الأَرْضِ، وَمَسْكَنُ الغَوْثِ مَكَّةُ، فَإِذَا عُرِضَتَ الحَاجَةُ مِنْ أَمْرِ العَامَّةِ ابْتَهَلَ فَيْهَا النُّقَبَاء، ثُمَّ النُّجَبَاء، ثُمَّ الأَبْدَال، ثُمَّ الأَخْيَارْ، ثُمَّ العَمَدَ، ثُمَّ أُجِيْبُوا وَإِلَّا ابْتَهَلَ الغَوْث؛ فَلَا يَتِمُّ مَسْأَلَتَهُ حَتَّى تُجَابُ دَعْوَته.

–নুক্বাবা হচ্ছেন তিন'শ মানুষ, নুজাবা সত্তুর জন, আবদাল চল্লিশ জন, আখইয়ার সাত এবং আমাদ হচ্ছেন চারজন; গাউস হচ্ছেন একজন। যখন মানুষের কোনো কিছুর প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন নুক্বাবা দোয়া করেন। যদি তা কবুল না করা হয় [আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক], তবে নুজাবা দোয়া করেন। তাও যদি কবুল না করা হয়, তাহলে একে একে আবদাল, আখইয়ার ও আমাদ দোয়া করেন। যদি এঁদের দোয়াও কবুল না করা

[১]. প্রাগুক্ত : ৪/১৭২।

হয়, তাহলে গাউস যাঁর দোয়া অবশ্যই কবুল করা হবে, তিনি দোয়া করেন।[১]

অতত্রব, এটা পরিস্ফুট যে হাদীসের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাসাউফের শিক্ষাকে ওয়াহাবীরা অস্বীকার করে এবং নিজেদেরকে হাদীসের অনুগামী হিসেবে দাবি করে তারা মুসলিমদেরকে প্রতারিত করে থাকে। তাদের দ্বারা কারামত অস্বীকার করাটা স্পষ্টই প্রতীয়মান করে যে তারা ইসলামী আকিদা-বিশ্বাস সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারে নি এবং তারা একেবারেই অজ্ঞ। সাহাবাগণ হতে কোনো কারামত পরিদৃষ্ট হয়নি মর্মে ওয়াহাবীদের ধারণাটি আরেকটি ডাহা মিথ্যা। বহু মহামূল্যবান পুস্তকে সাহাবীদের কারামতের বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। চুয়ান্ন জন সাহাবীর কারামত প্রত্যক্ষদর্শীদের উদ্ধৃতিসহ লিপিবদ্ধ আছে আল্লামা ইউসুফ নাবহানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর 'জামিউল কারামত' গ্রন্থে। ওয়াহাবীদেরকে ভ্রান্ত প্রমাণার্থে আমরা এখানে ওই কারামতের কয়েকটি উদ্ধৃত করলাম:

নাহাওয়ান্দ- এর সন্নিকটস্থ সমভূমিতে মুসলমান সেনাবাহিনী তাঁদের সেনাপতি সারিয়ার নেতৃত্বে ২৩ হিজরী সালে পারসিক বাহিনীর সঙ্গে এক ভয়াবহ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। পারসিক বাহিনী মুসলিমদেরকে ঘিরে ফেলার উপক্রম হয়। এমন সময় খলীফা হযরত উমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যিনি মদীনার মসজিদে নববীতে মিম্বরে আরোহণ করে খুৎবা পাঠ করছিলেন, তিনি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে মুসলিম বাহিনীর ঘেরাও হওয়া অবস্থা দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দেখতে পান। দেখামাত্রই তিনি খুতবার মধ্যখানে বলে ওঠেন: "হে সারিয়া, পাহাড়ে যেয়ে ওঠো পাহাড়ে যাও" সারিয়া এবং তাঁর সৈন্যদল খলীফার কণ্ঠস্বর শুনতে পান। তাঁরা পিছু হটে গিয়ে পাহাড়ে অবস্থান নেন এবং পুনরায় সুসংহত হয়ে পারসিক বাহিনীকে আক্রমণ করে বিজয় লাভ করেন।[২]

খলিফা উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফত আমলে হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। পথে তিনি এক মহিলার দর্শন লাভ করেন। হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে দেখে বলেন, "আমি তোমার চোখে যিনার চিহ্ন (চোখ সংক্রান্ত যিনা) দেখতে পাচ্ছি" (ইমাম মা'সুম

---

[১]. ক. খতীব বাগদাদ / তারিখে বাগদাদ, ৩/২৮৯।
খ. কুসতুলানী / আল মাওয়াহিব আল লাদুন্নিয়া ৫১২।

[২]. ইউছুপ নাবহানী : জামিউল কারামত পৃষ্ঠা ৩৩।
ক. ক্বাসাসুল আম্বিয়া : পৃষ্ঠা ৫৮৯।
খ.শওয়াহিদুন নুবুওয়াত।
গ.ইরশাদ আত্ তালেবীন বায়হাক্বী সূত্রে।

ফারুকীঃ 'মকতুবাত', ৩য় খন্ড, ১৯তম চিঠি; 'জামিউল কারামত'-এ বিস্তারিত বিবরণ)

নিম্নোক্ত কারামতগুলো 'শাওয়াহিদুন নুবুওয়া' গ্রন্থটি হতে ভাষান্তরিত করা হয়েছেঃ

"হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, 'সাহাবাগণকে তাঁদের পরবর্তীদের মতো এতো বেশি কারামত প্রদর্শন করতে প্রত্যক্ষ করা হয় নি; এর কারণ কী?' হযরত ইমাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উত্তর দিলেন, 'সাহাবাদেরকে তাঁদের ঈমান দৃঢ় হওয়ার জন্যে কারামত প্রদর্শনের প্রয়োজন হয়নি, কারণ তাঁদের ঈমান অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল। তবে পরবর্তীদের ঈমান ততোটুকু দৃঢ় না হওয়ার জন্যে তাঁদের ঈমান শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে কারামত প্রদান করা হয়েছিল।

"হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এই পৃথিবী ত্যাগ করার সময় ওসিয়ত (উইল) করেন যে তাঁর সন্তানদেরকে হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু লালন-পালন করবেন। তিনি হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে বলেন, 'আমার পুত্র এবং দুই কন্যা তোমার কাছে রেখে গেলাম।' অথচ তখন পর্যন্ত হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া তাঁর আসমা নামের একমাত্র কন্যা সন্তানই ছিলেন। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমার শুধু একটি বোনই আছে। অপর বোনটি কে?' হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দেন, 'আমার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা আমার মনে হয় বাচ্চাটি একটি মেয়ে হবে।' তাঁর বেসালের পরে ওই কথানুসারে তাঁর এক কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন।

"বেসালপ্রাপ্তির সময় হযরত আলী (কঃ) হযরত হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে ডেকে বলেন, 'আমার খাটিয়াকে আরনাঈন নামক স্থানে নিয়ে যাবে। সেখানে তুমি একটা সাদা ঝকঝকে পাথর দেখবে। সেখানেই আমাকে দাফন করবে।' তাঁর কথানুযায়ী তাঁরা তা-ই করেছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে ভ্রমণকালে হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একটা খেজুর গাছের বাগানে বিশ্রাম নেবার জন্যে প্রবেশ করেন। খেজুর গাছগুলো সব শুকিয়ে গিয়েছিল। হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'কতো ভালই না হতো যদি খেজুর গাছে খেজুর থাকতো' তখন হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দোয়া করেন। তৎক্ষণাৎ একটা গাছে অজস্র খেজুর জন্ম নেয়। আশপাশের মানুষেরা এটা দেখে বলে, 'এটা যাদু' হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঘোষণা করেন, 'না, যাদু নয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পৌত্রের দোয়ার বরকতে এটা সৃষ্টি করেছেন।'

"এক দিন হযরত আলী ইবনে হুসাইন (ইমাম যাইনুল আবেদীন ) তাঁর পরিবারবর্গসহ গ্রামাঞ্চলে আহার করছিলেন। একটি হরিণ শাবক তাঁদের কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। ইমাম যাইনুল আবেদীন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'হে হরিণ শাবক আমি হচ্ছি আলি ইবেন হুসাইন ইবনে আলী এবং আমার মাতা হচ্ছেন ফাতেমা বিনতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এসো, আমাদের সঙ্গে আহার করো।' হরিণ শাবকটি আহার করে চলে যায়। বাচ্চারা আবার হরিণটিকে ডাকবার অনুরোধ জানায়। তিনি বলেন, 'আমি ডাকতে পারি, তবে তোমরা সেটাকে বিরক্ত করতে পারবেনা'। বাচ্চারা বলে, 'আমরা কিছুই করবো না'। ইমাম যাইনুল আবেদীন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পুনরায় হরিণ শাবককে ডাকেন। সেটা এসে আবারও খাবার গ্রহণ করে, কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে কেউ একজন সেটার পিঠে হাত দিতেই সেটা লজ্জা পেয়ে পালিয়ে যায়।

"হযরত আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া বলেন, 'আমি আপনার চাচা এবং আপনার থেকে বয়সে বড়। আমাকে খলীফা হতে দিন'। তখন হযরত আলী ইবনে হুসাইন ( ইমাম যাইনুল আবেদীন) তাঁকে 'হাজর আল আস্ওয়াদ' পাথরের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে উপদেশ দেন। তাঁরা 'হাজর আল আসওয়াদ' পাথরের সামনে যান। ইমাম যাইনুল আবেদীন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর চাচাকে প্রশ্ন রাখতে অনুরোধ করেন। ইবনুল হানাফিয়া জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু পাথরটি নিশ্চুপ থাকে। ইমাম যাইনুল আবেদীন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর হাত দুটো তুলে দোয়া করেন; এরপর বলেন, 'হে (কালো) পাথর আল্লাহর ওয়াস্তে বলো, খিলাফত কার হক্ক (অধিকার)?' হাজর আল আসওয়াদ উত্তর দেয়, 'খিলাফত হযরত আলী বিন হুসেইনের'

"একদিন হযরত ইমাম আলী রেযা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন একটি দেয়ালের পাশে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন একটি পাখি তাঁর কাছে উড়ে আসে এবং তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে গান গাইতে থাকে। হযরত ইমাম তাঁর পাশে উপবিষ্ট এক লোককে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'পাখীটি কী বলছে তা কি জানো?' লোকটি উত্তর দেয়, 'না, তবে আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পৌত্র তা জানেন।' এরপর হযরত ইমাম আলী রেযা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: 'পাখীটি অভিযোগ করছে যে একটি সাপ তার বাচ্চাগুলোকে খাবার জন্যে খুব কাছে চলে এসেছে। তাই সে আমাদেরকে শত্রু হতে রক্ষা করবার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছে। তুমি পাখীটিকে অনুসরণ করে যেয়ে সাপটিকে হত্যা করো।' ওই ব্যক্তি পাখীটিকে অনুসরণ করে হযরত ইমামের কথামতো সাপটিকে দেখতে পায় এবং সেটাকে হত্যা করে।

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কোনো এক সফরকালে রাস্তার পার্শ্বে অপেক্ষমান এক মুসাফির দলের সাক্ষাৎ পান। তিনি তাদেরকে তাদের থামার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তাদের একজন উত্তর দেয়: 'আমরা শুনেছি যে এ পথের ওপর একটা সিংহ আছে। এ কারণেই আমাদের কেউই আর এগোতে পারছিনা।' হযরত ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সিংহের কাছে যান এবং ওর পিঠের ওপর হাত বুলিয়ে বুলিয়ে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেন।

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাবেক সেবিকা হযরত সাফিনা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যাঁকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুক্ত করে দিয়েছিলেন, তিনি বলেছেন: 'একবার আমি একটা জাহাজে করে ভ্রমণ করছিলাম। এমন সময় সমুদ্রে ঝড় ওঠে এবং জাহাজটি ডুবে যায়। আমি একটি কাঠের টুকরো আঁকড়ে ধরে থাকি। স্রোতের সাথে আমি তীরে যেয়ে উঠি। স্থলভাগের অভ্যন্তরে প্রবেশের পথে আমাকে একটি জঙ্গল পেরোতে হয়। এই সময় একটি সিংহ আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। আমি সিংহটাকে বলি, আমি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন সাহাবী।' এ কথা শুনেই সেটা অবনত মস্তকে আমাকে জঙ্গলের বাইরে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে। এরপর বিড়বিড় করে কী যেন বলে সিংহটা। আমি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারি যে সেটা আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছে।'

"হযরত আইয়ুব সাহতিয়ানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একবার মরুভূমিতে তাঁর বন্ধুর সাথে সফরকালে মারাত্মক পানি সংকটে পড়েন। তাঁর বন্ধু এতোই তৃষ্ণার্ত ছিলেন যে তার জিহ্বা বেরিয়ে গিয়েছিল। হযরত ইমাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার কি কোনো কষ্ট হচ্ছে?' তার বন্ধু উত্তর দেন, 'আমি তৃষ্ণায় মারা যাবার উপক্রম।' হযরত আইয়ুব সাহতিয়ানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এরপর বলেন, 'তুমি যদি কাউকে না বলো, তবে আমি হয়তো তোমাকে পানির সন্ধান দিতে পারি।' তাঁর বন্ধু কসম করার পর তিনি মাটিতে জোরে পা দিয়ে আঘাত করার পর সেখানে পানির ঝর্ণা সৃষ্টি হয়। তাঁরা দু'জনই পানি পান করেন। তাঁর বন্ধু হযরত আইয়ুব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বেসালের আগ পর্যান্ত কাউকেই ঘটনাটা বলেননি। এতে প্রতিভাত হয় যে আল্লাহতা'আলা আউলিয়াকে কারামত দ্বারা ধন্য করেছেন এবং তাঁরা তা ঢেকে রাখতে চেষ্টা করেন। তাঁরা কাউকেই এটা সম্পর্কে জানতে দিতে চান না।

"হামিদ আত্ তাওয়ীল বর্ণণা করেন: 'হযরত সালিম আল বানানীর দাফনের পরে তাঁর মাযার শরীফ বন্ধ করার মুহূর্তে একটি ইঁট খুলে পড়ে যায়। আমরা সালিম

আল বানানীকে তাঁর মাযারের ভেতরে নামায পড়তে দেখি। আমরা তাঁর গৃহে যেয়ে তাঁর কন্যাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন যে তাঁর পিতা প্রত্যেক রাতের শেষ ভাগে নামায পড়তেন এবং এই সালাত তিনি পঞ্চাশ বছর ধরে নিয়মিতভাবে আদায় করতেন; আর তিনি ফজরে অভ্যাসবশতঃ দোয়া করতেন: ”হে আল্লাহ নবী ছাড়া যদি আর কাউকে তুমি কবরে নামায পড়ার তাওফিক দাও, তাহলে আমার ভাগ্যেও অনুরূপ নেয়ামত দিও”।’

”হযরত হাবিব আল আজামীকে বহুবার ’তারাউইয়ীয়্যা দিবসে’ বসরায় দেখা গিয়েছে এবং পরবর্তী দিবসে, অর্থাৎ, ‘আরাফা দিবসে’ আরাফাতের ময়দানে দেখা গিয়েছে। হযরত ফুযাইল ইবনে আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সাক্ষ্য দেন: ‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কাছে একবার এক অন্ধ মুসলিম আগমন করেন এবং অন্ধত্ব থেকে মুক্তি কামনা করেন তাঁর কাছে। ওই ব্যক্তি বারংবার অনুরোধ করায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দীর্ঘক্ষণ দোয়া করেন। সহসা ওই ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান এবং বহু মানুষ তাঁর দৃষ্টিশক্তি পাওয়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন।”[১]

’শাওয়াহিদুন নুবুওয়া’ গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনগণের উপরোক্ত কারামতগুলো পরিস্ফুট করে যে ওয়াহাবীরা মুসলিমদেরকে মিথ্যা কথা বলে ধোকা দিতে অপতৎপর। সাহাবা ও তাবেয়ীনগণের কারামত নেই মর্মে তাদের মিথ্যা দাবি তাদেরকেই হেয় প্রতিপন্ন করে।

১৯/ ওহাবী পুস্তক ফাতহুল মাজীদ-এর ২৯৯ পৃষ্ঠায় লেখা আছে:

وَقَدْ وَرَثَ هَذِهِ العُلُوْمِ عَنْهُمْ أَقْوَام فَادْعُوْا بِهَا عَلِمَ الغَيْبِ الَّذِيْ اسْتَأْثَرَ اللهُ بِعِلْمِهِ، وَادْعُوا أَنَّهُمْ أَوْلِيَاءُ وَأَنَّ ذَلِكَ كَرَامَةٌ.وَلاَ رَيْبَ أَنَّ مِنْ ادَّعَى الوِلَايَة، وَاسْتَدِلُّ بِإِخْبَارِهِ بِبَعْضِ المغِيْبَاتِ فَهُوَ مِنْ أَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ لَا مِنْ أَوْلِيَاءِ الرَّحْمَنْ-

–যে সকল ঈমানদার (বিশ্বাসী) আল্লাহকে ভয় করেন, তাঁদেরকে আল্লাহতা’আলা নেয়ামতস্বরূপ কারামত দান করে থাকেন। যখন কেউ দোয়া বা এবাদত করে, তখন তিনি কারামত মঞ্জুর করেন। সেটা কোনো ওলীর ইচ্ছা বা ক্ষমতার আয়ত্বাধীন নয়। যে ব্যক্তি বলে সে একজন ওলী

[১]. শাওয়াহিদুন্ নুবুওয়া।

এবং গায়েবের খবরাখবর জানে, সে প্রকৃক্ষপক্ষে ওলী নয়, বরং একজন শয়তান।[১]

এখানে ওয়াহাবী পুস্তকটি সত্য অস্বীকার করার দুঃসাহস দেখায়নি, তবে আউলিয়া কেরাম কারামতের প্রদর্শনী দেন বলাটা ডাহা মিথ্যা কথা বৈ কিছু নয়। সে কিছু অজ্ঞ এবং ভন্ড লোকদের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে মুতাসাওয়ীফ ও পীর-মাশায়েখদেরকে আক্রমণ করেছে। ওয়াহাবীটি বেলায়াত এবং কারামত সম্পর্কে কিছুই জানেনা। এখন আমরা মহান মুতাসাওয়ীফগণের ব্যাখ্যাসমূহ উপস্থাপন করবো। ইমাম মা'সুম ফারুকী সিরহিন্দি লিখেছেন, "কাশফ ও কারামতের অধিকারী হওয়ার চেয়ে আল্লাহকে জানা অনেক বেশি মূলবান। আ'রিফ হওয়ার অর্থ হচ্ছে তাঁর সত্তা ও সিফাত (গুণাবলী)-সম্পর্কিত গুপ্ত জ্ঞান উপলব্ধি করা। আর কারামত ও অলৌকিকত্ব হচ্ছে সৃষ্টি (মাখলুকাত) সম্পর্কে গুপ্ত জ্ঞান। আল্লাহকে জেনে মা'রেফত অর্জন করা এবং কারামত ও অলৌকিকত্বের মধ্যে পার্থক্যে হচ্ছে স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্যের মতো। মা'রেফত হচ্ছে আল্লাহকে জানা; অথচ কারামত ও অলৌকিকত্ব হচ্ছে সৃষ্টিকে বোঝা। প্রকৃত 'মা'আরিফ' ঈমানকে দৃঢ় এবং পরিপক্ব করে। কারামত ও অলৌকিকত্ব (খারিকা) তা করতে পারে না। কোনো ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতি কারামতের ওপর নির্ভরশীল নয়; তবুও আল্লাহতা'আলার প্রিয় বান্দাদের অধিকাংশের কাছ থেকেই কারামত পরিদৃষ্ট হয়েছে।

"আউলিয়ার একে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব কারামত দ্বারা পরিমাপ করা হয় না, বরং কুরব ও মা'আরিফ দ্বারা পরিমাপ করা হয়। যদি কারামত ও অত্যাশ্চর্য ঘটনা (খারিকা) মা'আরিফ হতে অধিক মূল্যবান হতো, তাহলে যোগী নামক হিন্দু ঋষীরা এবং ব্রাক্ষ্মণরাও আউলিয়া কেরাম থেকে শ্রেষ্ঠ হতো। কেননা, তারা কৃচ্ছ্বতা সাধন এবং নফস দমন করে থাকে। তারা অত্যাশ্চর্য শক্তি অর্জন করতে সমর্থ হয়; কিন্তু আউলিয়া কুরব ও মা'আরিফ মঞ্জুর হওয়াতে খারিকা কামনা করেন না। তাঁরা আল্লাহকে জানার মাহাত্ম্য বর্তমান থাকতে সৃষ্টি সংক্রান্ত জ্ঞান জানতে চাননা। ক্ষুধাসম্পন্ন এবং কৃচ্ছ্বতা সাধনকারী যে কোনো ব্যক্তির দ্বারাই খারিকা ও অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হতে পারে। সেগুলোর সঙ্গে আল্লাহকে জানার বা আল্লাহর কারিব (সন্নিকটস্থ) হওয়ার কোনো সম্পর্কই নেই। কাশফ ও কারামতের আকাঙ্খা হচ্ছে সৃষ্টিকে নিয়ে মত্ত হওয়ার একটা আকাঙ্খা বিশেষ।

কবিতা:

---

[১]. ফাত্হ আল মজিদ : ১/২৯৯।

চির অভিশপ্ত শয়তান হতে খারিকা প্রতিটি মুহূর্তেনিঃসৃত হয়,
দরজা ও ঘরের চিমনীর ভেতর দিয়ে এসে তার রক্ত মাংসে স্থায়িত্বলয়,
তাসাউফ সম্পর্কে কথাবলার সময় সাবধান হও,
নূর কিংবা কারামত সম্পর্কে করোনা দম্ভ ,
কারামত কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহর দাসে রূপান্তরিত করা উচিৎ,
একজন আহাম্মক মুনাফেকে নচেৎ।।

"কোনো ব্যক্তি ফানা অর্জন করে এবং সব কিছু থেকে নিজের কলবকে বিচ্ছেদ ঘটিয়েই পূর্ণতা ও মাহাত্ম্য অর্জন করে থাকে। এবাদত পালন, তাসাউফের পথের অনুসরণ এবং নফসকে কৃচ্ছ্বতায় নিমগ্ন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে তার নিজ সত্তার গুরুত্বহীনতা সম্পর্কে তাকে উপলব্ধি করানো; আরও উপলব্ধি করানো যে অস্তিত্ত ও অস্তিত্বের সিফাতসমূহ একমাত্র আল্লাহরই অধিকারে। যদি কেউ অন্যান্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে চায় এবং খারিকা ও অলৌকিক কর্ম সংঘটন করে এবং ফলস্বরূপ মানুষদেরকেও নিজের চারপাশে সমবেত করতে সমর্থ হয়, তাহলে (বুঝতে হবে) সে একজন দাম্ভিক ও উদ্ধত ব্যক্তি এবং তার এবাদত, সায়ের, সুলুক ও রিয়াযাত-এর প্রাপ্য হতে সে বঞ্চিত হবে। সে আল্লাহ তা'আলার মা'আরিফত অর্জন করতে পারবে না। মহান মুতাসাউয়ীফ সুলতানুল আরেফীন হযরত শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ান্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'আওয়ারিফ আল মাআরিফ' গ্রন্থে লিখেছেন, 'কলব কর্তৃক আল্লাহর যিকিরের তুলনায় কারামত ও খারিকার কোনো মূল্যই নেই।'

"শায়খুল ইসলাম আবদুল্লাহ হিরাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, 'মারেফাতসম্পন্ন ব্যক্তির ফিরাসাত (ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়) অথবা কারামত হচ্ছে এমন এক ক্ষমতা যা দ্বারা তিনি আল্লাহ তা'আলার মারেফত অর্জন করতে সক্ষম হৃদয়গুলোকে অক্ষম হৃদয়গুলো থেকে পৃথকভাবে চিনতে পারেন। আর যারা ক্ষুধা ও কৃচ্ছ্বতা সাধন করে, তাদের ফিরাসাত শুধু সৃষ্টিকে ঘিরেই পরিব্যাপ্ত; আল্লাহ্ পাকের মারেফত তারা অর্জন করতে পারেনা। আউলিয়া যাঁরা মারেফতের অধিকারী, তাঁরা শুধু আল্লাহ সম্পর্কেই কথা বলেন। তবে যেহেতু মানুষেরা আল্লাহ-সম্পর্কিত জ্ঞান বিষয়ে বুঝতে পারে না এবং যেহেতু তারা দুনিয়ার মোহাচ্ছন্ন, সেহেতু তারা সৃষ্টি সংক্রান্ত গোপন তত্ত্বের খুব দাম দেয় এবং মনে করে, যে ব্যক্তি গোপন তত্ত্ব সম্পর্কে কথা বলে সে বুঝি উঁচু দরের কোনো ওলী (ওহাবীটিও ওই ধরণের লোকদেরকে ওলী মনে করে তাদেরকে খারাপ দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখিয়ে সত্যিকার মুতাসাওয়ীফদেরকে গালমন্দ করেছে) আল্লাহ তায়ালার মা'আরিফ সম্পর্কে আউলিয়ার কথাবার্তাকে লোকেরা বিশ্বাস করে না। তারা মনে

মনে বলে, যদি আউলিয়া সত্যি সত্যিই আউলিয়া হতেন, তবে তাঁরা সৃষ্টি সম্পর্কে গোপনতত্ত্ব জানতেন এবং যাঁরা সৃষ্টির গোপনতত্ত্ব জানেন না, তাঁরা আল্লাহকে জানতে পারেন না। এ সকল লোকেরা এই ভ্রান্ত ধারণায় আবদ্ধ হয়ে আউলিয়াকে বিশ্বাস করে না। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাঁর আউলিয়াকে অত্যন্ত ভালোবাসেন, সেহেতু তিনি তাঁদেরকে সৃষ্টি নিয়ে ব্যস্ত হতে দেন না। এমন কি তিনি তাঁদেরকে সৃষ্টির স্মরণ হতেও দূরে সরিয়ে রাখেন। আল্লাহ-ওয়ালা বুযূর্গবৃন্দ দুনিয়ার মোহাচ্ছন্ন লোকদেরকে পছন্দ করেন না; অনুরূপভাবে, দুনিয়ার মোহাচ্ছন্ন লোকেরাও আল্লাহ-ওয়ালাদেরকে চেনতে এবং পছন্দ করতে পারে না। তবে আল্লাহ-ওয়ালাগণ সৃষ্টির গোপনতত্ত্ব বুঝতে এবং প্রকাশ করতে পারেন, যদি তাঁরা সে সম্পর্কে চিন্তা করেন। যেহেতু ক্ষুধা ও কৃচ্ছ্রতা সাধনকারীর ফিরাসাতের কোনো মূল্যই নেই, সেহেতু সেগুলো (ফিরাসাতসমূহ) মুসলিম, খ্রীষ্টান, ইহুদী কিংবা যে কোনো ব্যক্তির ওপর সংঘটিত হতে পারে; ফিরাসত শুধু আল্লাহর ওলীদের জন্যে খাস (নির্দিষ্ট) নয়।'

"প্রয়োজনের সময় আল্লাহতা'আলা তাঁর ওলীকে কারামত প্রদর্শনে তাওফিক দিয়ে থাকেন। ওলীর ভাণ করে যদি কোনো বদমায়েশ লোক তার শ্রুত কোনো মা'আরিফ ব্যক্ত করে থাকে, তাহলেও এ সকল মা'আরিফ কলুষিত হবে না। এক টুকরো হীরা ময়লার মধ্যে পড়ে গেলেও তার মূল্য সেটা হারাবে না।

"তাসাউফের পথে একজন রাহবার/মুরশিদ অত্যাবশ্যকীয়, যাঁর মাধ্যমে ফায়েয আগমন করে। যদি সে প্রকৃত মুরশিদ না হয়, তবে তাসাউফের পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না। সাহাবায়ে কেরাম তাসাউফের অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ে উন্নতি করেছিলেন হযরত রাসূল-এ-করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সোহবতের তথা সান্নিধ্যের নেয়ামতের মাধ্যমে।"[১]

"একটি আয়াতে ঘোষিত হয়েছে,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

–আমি জ্বিন ও ইনসানকে একমাত্র আমার এবাদতের জন্যেই সৃষ্টি করেছি।[২]

তাসাউফের কিছু ইমাম এ আয়াতটিকে নিম্নোক্ত অর্থে বুঝে থাকেন 'আমাকে জানার জন্যেই আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি।' যদি এ ব্যাপারে একটু গভীর চিন্তা

---

১. মা'সুম ফারুকী : মকতুবাত, ১ম খন্ড, ৫০ নং চিঠি।

২. আল কুর'আন : ২২/৫৬।

করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে দুটো বাক্য একই অর্থ বহন করছে; কারণ সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত হচ্ছে যিকর পালন। যিকরকারী যাঁকে স্মরণ করেন তাঁর সম্পর্কে গভীর চিন্তায় নিজেকে ভুলে যান। আর এটাই হলো মা'রেফত। এটা পরিস্ফুট যে এবাদতের সর্বোচ্চ পর্যায়ে মা'রেফত অর্জিত হয়। আয়াতের আদেশটি হচ্ছে এই যে, এখলাসের (নিষ্ঠার) সঙ্গে যেন এবাদত পালিত হয় এবং নফস অথবা শয়তান যেন কোনো রকম ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে। আর মা'রেফত অর্জন ব্যতিরেকে এটা অর্জন করা যায় না। অতএব, মারেফত ছাড়া এবাদত পালন খালেস হতে পারে না।[১]

ইমাম-এ-রব্বানী আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী মোজাদ্দেদে আলফে সানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'মকতুবাত' গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডের ৯২তম চিঠিতে বলেন, "কারামত প্রদর্শন করা কোনো ওলীর জন্যে শর্ত নয়। উলামায়ে হক্কানী-রব্বানীর পক্ষে যেমন কারামত ও খারিক্বা প্রদর্শন করা প্রয়োজনীয় নয়, তেমনি আউলিয়ার জন্যেও কারামত এবং খারিকার প্রদর্শনী দেয়া জরুরি নয়। কেননা, বেলায়াত মানে কুরব-এ-ইলাহী (আল্লাহর নৈকট্য)।[২]

"কোনো ব্যক্তিকে কুরব-এ-ইলাহী প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু কারামত মন্‌জুর করা হয় নি; উদাহরণস্বরূপ, তিনি গায়েবের জিনিসগুলো সম্পর্কে জানেন না; অপর এক ব্যক্তিকে কুরব (নৈকট্য) এবং কারামত দুটোই মন্‌জুর করা হয়েছে; তৃতীয় একজনকে কুরব্ দেয়া হয় নি, কিন্তু খারিক্বা সমূহ এবং গায়েবের খবরাখবর পরিবেশন করার সামর্থ্য দেয়া হয়েছে। এই অবস্থায় তৃতীয় জন কোনো ওলী নয়। সে ইসতিদরাজ (অলৌকিক শক্তি যা আল্লাহর তরফ থেকে আগত নয়)-এর অধিকারী। তার নফসের পরিচ্ছন্নতার জন্যে সে গায়েবের খবরাখবর জানে, যার অব্যবহিত ফল হলো সে গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়েছে এবং সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় জন কুরব্ দ্বারা ধন্য হয়েছেন; তাঁরা আউলিয়া হয়েছেন। আউলিয়া কেরামের পরস্পরের মধ্যে বিরাজমান শ্রেষ্ঠত্ব তাঁদের কুরব্-এর পর্যায় দ্বারাই পরিমাপ করা হয়।"[৩]

'মকতুবাত' গ্রন্থের ১৪০তম চিঠিতে হযরত মা'সুম ফারুকী সিরহিন্দী লিখেছেন, "একটি হাদিস-এ-কুদসী ইরশাদ ফরমায়: '

---

[১]. প্রাগুক্ত ইমাম মা'সুম ফারুকী : মকতুবাত, ৫১ নং চিঠি।

[২]. প্রাগুক্ত ২ : ৯২তম চিঠি।

[৩]. ইমাম-এ রব্বানী : মকতুবাত।

مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ المُؤْمِنِ، يَكْرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ.

–যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর বিরুদ্ধে শত্রুতাভাব পোষণ করে, তার প্রতি আমি যুদ্ধের আহ্বান জানাই। আমার বান্দা আর এমন কোনো কিছুর মাধ্যমে আমার নৈকট্য পায় না, যেমনটি পায় ফরয এবাদতের মাধ্যমে। যখন আমার বান্দা নফল এবাদত পালন করে, তখন সে আমার খুবই সন্নিকটবর্তী হয়; এতোই সন্নিকটবর্তী হয় যে, আমি তাকে অত্যন্ত ভালোবাসি। এতো ভালোবাসি যে আমি তার (কুদরতী) কান হই, যেটা দিয়ে সে শোনে; তার (কুদরতী) চোখ হই যা দ্বারা সে দেখে; তার (কুদরতী) হাত ও পা হই, যেগুলোর দ্বারা সে কাজকর্ম ও চলাফেরা করে। সে যা চায় তা-ই আমি তাকে দেই। যখন সে আমার কাছে সাহায্য চায়, তখনি আমি তাকে তা দিয়ে থাকি' ।[১]

এই হাদিস-এ-কুদসী অনুযায়ী মানুষকে কুরব-এর নেয়ামত লাভে সহায়ক জিনিসগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ফরয, যা আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন। ফরযসমূহ থেকে সৃষ্ট কুরব্ অধিক পূর্ণাঙ্গ এবং নেয়ামতসম্পন্ন। কুরব্ ও উন্নতি সৃষ্টিকারী ফরযসমূহকে আমল-এ-মুকাররাবীনের অন্তর্গত হতে হবে। আর এর জন্যে দরকার তাসাউফের ও তরীকৃতের নফল এবাদতসমূহ পালন করা। নামাযে যেমন প্রথমে ওযু করতে হয়, ঠিক তেমনি কুরব্ সৃষ্টিকারী ফরযসমূহের জন্যে প্রথমে দরকার তাসাউফের পথে উন্নতি করা। যতক্ষণ পর্যন্ত না কৃলব ও রূহকে তাসাউফ দ্বারা নির্মল করা হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি

---

[১]. বুখারী : আস সহীহ, বাবুত তাওয়াদ্বুউ, ৮/ ১০৫ হাদীস নং ৬৫০২।
ক. বাগাবী : শরহু সুন্নাহ, বাবুত তাক্বাররুবু ইলাল্লাহি তা'য়ালা, ৫/১৯ হাদীস নং ১২৪৭।

ফরয হতে নিঃসৃত কুরব অথবা একজন ওলীর সম্মান অর্জন করতে পারবে না।”[১] ১

“তরিকত-এ-আলীয়া-এ-নক্বশবন্দিয়ার সারবস্তু হচ্ছে সুন্নাতকে আকড়ে ধরা এবং বেদআত হতে দূরে থাকা। একটি হাদিস শরীফ ঘোষণা করেঃ ’আমার একটি বিস্মৃত সুন্নাত যে ব্যক্তি পুনরুজ্জীবিত করবে, সে এক’শ জন শহীদের সওয়াব অর্জন করবে’ (হাদিস)। একটি বিস্মৃত সুন্নাতের পুনরুজ্জীবনের অর্থ, হয় তা পালন করা, নয়তো পালন করে অন্যদেরকে শিক্ষা দেয়া যাতে তারাও পালন করতে পারে। শরিয়তের পুনরুজ্জীবনের এই দ্বিতীয় পন্থাটি হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। এটা প্রথম পন্থার চেয়েও মূল্যবান, কারণ প্রথমটি হচ্ছে সার্বিক।

“আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন এবং কুরব-এর এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে উন্নতি একমাত্র সুন্নাতকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমেই সম্ভব। সুরা আল-ই-ইমরানের ৩১ আয়াতে ঘোষিত ’বলুন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

> যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, তাহলে আমাকে (রাসূল-দঃ) অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন[২]- খোদায়ী এই আদেশটি আমাদের কথাকে সত্য প্রমাণ করে।

“আমাদের উচিত বিদয়াত বর্জন করা। বিদয়াতীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা আমাদের উচিৎ নয়। এমন কি তাদের সঙ্গে কথা বলাও আমাদের উচিৎ নয়। একটি হাদিস শরীফ ঘোষণা করেঃ ’বিদয়াতীরা জাহান্নামীদের কুকুর’ (হাদিস)।”[৩]

“তরীকত-এ-নকশবন্দিয়াতে পাঁচটি কর্তব্য আছে যা ক্বলব দ্বারা পালন করতে হয়; প্রথমটি আল্লাহ তা’আলার নামের ’যিকির’(স্মরণ)। মানবের অন্তরে ক্বলব নামে একটি লতিফা আছে (লতিফা এমন এক জিনিস যার মধ্যে কোনো বস্তু নেই এবং যেটা কোনো পদার্থ নয়; রূহ একটি লতিফা)। কোনো আওয়াজ বা স্পন্দন ছাড়াই তুমি তোমার কল্পনাকে তোমার অন্তরে ‘আল্লাহ, আল্লাহ’ বলতে উদ্বুদ্ধ করবে। দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে আবারও কল্পনার মাধ্যমে কলেমা-এ-তাওহিদের যিকর করা। দুটো (উপরোক্ত) যিকরেই কোনো আওয়াজ সৃষ্টি হবে না। তৃতীয় কর্তব্যটি হচ্ছে ’উকুফ-এ-কালবী’। এতেও সর্বদা অন্তরে ধ্যানমগ্ন হতে হবে এবং

---

[১]. মাসুম ফারুকী : মকতুবাত।

[২]. আল কুর‘আন : সূরা আলে ইমরান ৩/৩১।

[৩]. মাসুম ফরুকী : মকতুবাত, ৩/১৭ নং চিঠি।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর চিন্তা না করার ব্যাপারে সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে। কলব্ নামক লতিফাটি কোনো সময়ই খালি থাকতে পারে না। যে অন্তরকে সৃষ্টির চিন্তা হতে পরিশুদ্ধ করা হয়েছে, তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহর দিকে ফিরবে। 'তোমার শত্রুকে অন্তর থেকে বহিষ্কার করো, তাহলে তোমার প্রিয়জনকে আর কলবে আমন্ত্রণ জানানোর প্রয়োজন হবে না' এ কথা বলেছেন পূর্ববর্তী মুতাসাওয়ীফগণ। চতুর্থ কর্তব্যটি হচ্ছে 'মুরাকাবা' যাকে 'জাম'ইয়্যাত' এবং 'আগাহী'-ও বলা হয়। এটা হচ্ছে এ কথা চিন্তা করা যে আল্লাহ পাক প্রতিটি মুহূর্তে সব কিছু জানেন এবং দেখেন। পঞ্চম কর্তব্যটি হচ্ছে 'রাবিতা'। এটা হচ্ছে নিজেকে একজন শরিয়তের মান্যকারী কামেল মুর্শিদের মুখোমুখি চিন্তা করা, যাঁর পবিত্র চেহারার দিকে চেয়ে রয়েছ তুমি। এধরণের চিন্তা তোমাকে তাঁর প্রতি সব সময় আদব প্রদর্শন করার নিশ্চয়তা দেবে। আদব ও ভালোবাসা একে অপরের হৃদয়কে সংযুক্ত করে দেবে। এর ফলে মুরশীদের অন্তর হতে ফায়েয ও বরকত তোমার অন্তরে প্রবাহিত হবে। এই পাঁচটি কর্তব্যের মধ্যে সবচেয়ে সহজ ও দরকারী হচ্ছে রাবিতা।"[১]

হযরত ইমাম-এ-রব্বানী আহমদ আল ফারুকী আস-সিরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর মকতুবাত গ্রন্থের ১ম খন্ডের ২৮৬ নং চিঠিতে বলেন, "তাসাউফের পথে অগ্রসর হতে হলে একজন মুরশিদের তাওয়াজ্জুহ এবং পথপ্রদর্শন দরকার যিনি কামিল (নিজে পূর্ণ) ও মুকাম্মিল (অপরকে পূর্ণতা দিতে সক্ষম) এবং যিনি পথ সম্পর্কে জানেন। ওই ধরণের মুর্শিদ পাওয়াটা একটা বড় নেয়ামত। মুর্শিদ আপনাকে গুণাগুণ অনুযায়ী কর্তব্য প্রদান করবেন। উপরন্তু, তাঁর জন্যে জায়েয হবে আপনার গুণানুযায়ী কোনো দায়িত্ব না দিয়েই তাঁর সোহবতে বা সান্নিধ্যে রাখা। আহওয়ালের (আত্মিক অবস্থাসমূহের) সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে তিনি যা মনে করবেন, তাই তিনি আপনাকে আদেশ দেবেন। অন্যান্য কর্তব্যগুলো থেকে মুর্শিদের সোহবত ও তাওয়াজ্জুহ অনেক বেশি লাভজনক।

"তরীক্বতের পাঁচটি কর্তব্য এবং মুর্শিদের সোহবতের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামের সঙ্গে শরীয়াতের তাবেদারীকে সুবিধাজনক করা। যতক্ষণ পর্যন্ত না শরিয়তকে মান্য করা হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত এই কর্তব্যগুলো এবং সোহবত কোনো কাজে আসবে না।"[২]

---

[১]. মাসুম ফারুকী : মকতুবাত, ২/ ৩১৩ নং চিঠি।

[২]. ইমাম-এ-রব্বানী আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী মোজাদ্দেদে আলফে সানী : মকতুবাত।

উপরোক্ত চিঠিগুলো থেকে এ কথা বোধগম্য যে মানুষের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার কুরব্ অর্জন করা, অর্থাৎ মা'রেফাত, রেযা (সন্তুষ্টি) ও ভালোবাসা অর্জন করা। আর এর একমাত্র পথ হচ্ছে শরিয়াতের অনুসরণ এবং বিদয়াত বর্জন । শরিয়াতকে সহজ ও সঠিকভাবে অনুসরণ করার জন্যে দরকার এখলাসের (নিষ্ঠার)। এখলাসবিহীন এবাদত কোনো কাজেই আসবে না। সেগুলো গৃহীত হবে না। সেগুলো কোনো ব্যক্তিকে কুরব-এর নেয়ামত অর্জন করবার ব্যাপারে সাহায্য করবেনা। আর ইখলাস্ একমাত্র তরীকতের পথে পদচারণার মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। অতএব, এটা পরিস্ফুট যে তরীক্বতের নিন্দেশিত কর্তব্যসমূহের উদ্দেশ্য হচ্ছে এখলাস সহকারে এবাদতসমূহ পালন, যাতে সেগুলো কবুল হতে পারে। যে এবাদত গৃহীত হয় তা কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহতা'আলার কুরব, মা'রেফাত ও ভালোবাসা অর্জনে সহায়তা করবে। সকল সাহাবী-ই তরীকতের কর্তব্যসমূহ এবং এখলাসের সর্বোচ্চ পর্যায় অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের দ্বারা এক মুঠো বার্লি ভিক্ষা প্রদান অন্যান্যদের পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ ভিক্ষা দেয়ার চেয়েও শ্রেয়। অতত্রব, এটা প্রতিভাত হয় যে তাসাউফের পথ, অর্থাৎ, তরীকত বিদআত নয়। এটা দ্বীন ইসলামের মূলনীতিগুলোর মধ্যে একটা।

২০/ ওহাবীটি তার পুস্তকের ৩৫৪ পৃষ্ঠায় বলেঃ

"সুরা আনফালের ৬৪ নং আয়াতের يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ অর্থ 'আল্লাহ-ই আপনার জন্যে যথেষ্ট এবং তাদের জন্যেও যারা আপনাকে অনুসরণ করে'।[১] أَيْ اللهُ وَحْدَه كَافِيْكَ وَكَافِيْ أَتْبَاعِكَ، فَلاَ تَحْتَاجُوْنَ مَعَهُ إِلَىٰ أَحَدٍ". وَهَذَا اِخْتِيَارُ شَيْخِ الإِسْلاَمِ اِبْنِ تَيْمِيَةْ তাঁকে ছাড়া আর কাউকেই আমাদের দরকার নেই। ইবনে তাইমিয়া এবং ইবনে কাইয়েম আল জওযিয়া এই আয়াতটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। وَهَذَا خَطَأٌ مَحْضٌ لاَ يَجُوْزُ حَمْلُ الآيَةِ عَلَيْهِ তাঁরা বলেছেন যে আয়াতটিকে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করা ভুলঃ 'আল্লাহ এবং যারা আপনাকে অনুসরণ করে (তারা) আপনার জন্যে যথেষ্ট'। আল্লাহ ছাড়া আর কেউই যথেষ্ট হতে পারেনা। এই আয়াতের দুই আয়াত পূর্বে ইরশাদ হয়েছে,

**وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ**

---

[১]. আল কুর'আন : সূরা আনফাল, ৬০।

'যখন তারা আপনাকে ধোকা দিতে চেষ্টা করবে, তখন আল্লাহ-ই আপনার জন্যে যথেষ্ট হবেন। তিনি আপনাকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর এবং মু'মিনগণের সাহায্য দ্বারা।'

فَفَرَّقَ بَيْنَ الحَسْبُ وَالتَّأيِيْدُ، فَجَعَلَ الحَسْبَ لَهُ وَحْدَهُ، وَجَعَلَ التَّأْيِيْدَ لَهُ بِنَصْرِهِ وَبِعِبَادِهِ، وَأَثْنَى عَلَىٰ أَهْلِ التَّوْحِيْدِ مِنْ عِبَادِهِ حَيْثُ أَفْرَدُوْهُ بِالحَسْبِ وَلَمْ يَقُوْلُوْا: حَسْبُنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ بَلْ جَعَلَهُ خَالِصُ حَقَّهُ–

আল্লাহ 'যথেষ্ট' এবং 'শক্তিশালী' শব্দ দুটোর মধ্যে একটি পার্থক্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তিনি 'যথেষ্ট' শব্দটি শুধু নিজের জন্যে ব্যবহার করেছেন, আর 'শক্তিশালী' শব্দটি নিজের এবং তাঁর বান্দাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। আর বিশ্বাসীরা বলেন, 'আল্লাহ-ই আমাদের জন্যে যথেষ্ট; তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ।' কেউই একথা বলেননি, 'আল্লাহ ও তাঁর নবীগণ আলাইহিস্ সালাম আমাদের জন্যে যথেষ্ট। আল্লাহ একাই যথেষ্ট এবং ভরসার যোগ্য।"[১]

মহান তাফসীরকার আলেম ইমাম ক্বাযী বায়দাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন,

وَالآيَةُ نُزِّلَتْ بِالبَيْدَاءِ فِيْ غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَقِيْلَ أَسْلَمَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَةٌ وَثَلاثُوْنَ رَجُلاً وَسِتُّ نِسْوَةً، ثُمَّ أَسْلَمَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَنُزِّلَتْ. وَلِذَلِكَ قَالَ اِبْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا نُزِّلَتْ فِيْ إِسلامِهِ–

–এ আয়াতটি বদরের জিহাদ সংঘটিত হবার সময় 'বিদা' নামক স্থানে নাযিল হয়। অথবা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর মতানুযায়ী তেত্রিশজন পুরুষ ও ছয়জন নারী এবং সবশেষে হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর মক্কাতে ইসলাম গ্রহণের পর এটা অবতীর্ণ হয়। এর অর্থ, 'আল্লাহ তা'আলা এবং মু'মিনগণ আপনার জন্যে যথেষ্ট'।[২]

---

[১]. ফাত্হ আল মাজিদ : ১/ ৩৫৪-৩৫৫।
[২]. ইমাম বায়দাবী : তাফসীর-এ-বায়দাবী, ৩/৬৬।

এ ছাড়া তাফসীরে-এ-হুসেইনী, তাফসীর-এ-জালালাইন-ও একই কথা লিখেছে। ইমাম-এ-রব্বানী আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী মুজাদ্দেদে আলফে সানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহতা'আলাকে অনুরোধ করেছিলেন যাতে হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর সাহায্যের মাধ্যমে ইসলাম শক্তিশালী ও প্রসারিত হয়। হক্ব সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর প্রিয় নবীকে হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর মাধ্যমে সাহায্য করেন এবং সূরা আনফাল-এর ৬৪ আয়াতে ঘোষণা করেন, 'হে নবী আল্লাহ এবং আপনাকে যারা অনুসরণ করে তারা আপনার জন্যে সাহায্যকারী হিসেবে যথেষ্ট।' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রওয়ায়াত করেন যে এই আয়াতটি হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর ইসলাম গ্রহণের পর অবতীর্ণ হয়।"[১]

আল হাদিমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, "ইমাম মুহাম্মদ শায়বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'জামিউস্ সাগীর'পুস্তকে ঘোষণা করেছেন যে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওয়াস্তে, কিংবা অমুক ওলীর ওয়াস্তে এই ভাবে দোয়া করা মকরূহ তাহরিমা। এই মন্তব্যের ওপর 'আল হিদায়া' গ্রন্থটি মন্তব্য করে, 'যেহেতু সৃষ্টির কোনো হক [অধিকার] নেই আল্লাহ তা'আলার ওপর। তবে এ কথাও বিবৃত হয়েছে যে ওই বান্দার প্রতি আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত অধিকারের ওয়াস্তে [তা প্রার্থনা করা হচ্ছে]। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করার সময় বলতেন, 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্-আলুকা বি হাক্কিস্ সা-ইলিনা আলাইকা;' অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ, আমার ওয়াস্তে এবং পূর্ববর্তী নবীগণের ওয়াস্তে (কবুল করুন)।' [উদাহরণস্বরূপ, হযরত আলী (ক:)-এর মাতা ফাতেমা বিনতে আসাদকে সমাহিত করার সময় হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেন, 'ইগফির লি উম্মী ফাতেমা বিনতি আসাদ ওয়া ওয়াসসি আলাইহা মাদ্ খালাহা বিহাক্কী নাবীই-ইকা ওয়াল আম্বিয়া-ই-ল্লাযিনা মিন ক্বাবলি; ইন্নাকা আরহামুর রাহিমীন] আর ফাতওয়া-এ-বাযাযিয়াও ব্যক্ত করেছে যে এভাবে দোয়া করা অনুমতিপ্রাপ্ত।[২] অনুরূপভাবে, হাকিকী বা প্রকৃত অর্থে আল্লাহ তা'আলা একাই সকল স্থানে সকল সময়ে সবার জন্যে যথেষ্ট। তিনি ছাড়া আর কেউই সাহায্যকারী নন এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যদের সাহায্য কামনা করা পথভ্রষ্টতা। কিন্তু তবুও এ সব কথা বলে দোয়া করা অনুমতিপ্রাপ্ত তখনই, যখন চিন্তা করা হয় যে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত অধিকারের ওয়াস্তে তা প্রার্থনা করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম, আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, বস্তুসমূহ,

[১]. ইমাম-এ-রব্বানী : মকতুবাত ২/ ৯৯নং চিঠি।
[২]. বারিক্বা : ১০৫৩।

ধনী-গরিব মানুষ, ব্যবসা-বাণিজ্য, উচ্চপদসমূহকে তাঁর সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় মাধ্যম বা কারণস্বরূপ ব্যবহার করে থাকেন। এ সব মাধ্যমকে আঁকড়ে ধরার অনুমতি আছে, যদি সেগুলোকে মাধ্যম বানিয়ে আল্লাহর কাছ থেকে আশা করা হয়। এ কথা বল্লে ভাল হয়, 'আল্লাহর সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় তারা কারণ হিসেবে যথেষ্ট।' এই কারণেই উলামাগণ উপরোক্ত আয়াতটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: 'আল্লাহ তা'আলা এবং আপনার অনুসারী মু'মিনরা আপনার জন্যে যথেষ্ট'।"

আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণিত হাদিস, যেটা ওয়াহাবী পুস্তকটার ৩৮১ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে, সেটা ঘোষণা করে, رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ অর্থাৎ, 'তোমরা এমন বহু মানুষ দেখবে যাদের দরজা থেকে দূর করে দেয়া হয় (তাদের চুল ও দাড়ি এলোমেলো এবং কাপড় জোড়াতালি হওয়ার কারণে)। কিন্তু তারা যখন আল্লাহর নামে কসম করেন, আল্লাহ তা'আলা তৎক্ষণাৎ তাঁর এ সকল প্রিয় বান্দার ওয়াস্তে সৃষ্টি করে দেন এবং তাঁদের আবেদন মঞ্জুর করেন।[১] তাসাউফ যে সঠিক এবং একজন মুর্শিদে কামেলের তালাশ করা ও তাঁর মন জয় করার চেষ্টা করা যে সঠিক, তার প্রমাণসমূহের একটি হচ্ছে উপরোক্ত হাদিস। এ হাদিসের ওপর ভিত্তি করে ৬০টি নিষিদ্ধ বাক্যের ২৩তমটিতে 'আল বারিক্বা' ও 'আল হাদিক্বা' গ্রন্থ দু'টি বলে: "ফাতওয়া-এ-বাযাযিয়াতে লেখা আছে যে, 'এয়া আল্লাহ আপনার অমুক নবী অথবা ওলীর প্রতি আপনারই প্রদত্ত অধিকার ও উচ্চমর্যাদার ওয়াস্তে আমি আপনার কাছ থেকে কামনা করি'-এই ধরণের দোয়াসমূহ জায়েয, অর্থাৎ, হালাল। 'মুনইয়া' এবং আরও বহু কিতাব থেকে বোঝা যায় যে এইভাবে দোয়া করা মুস্তাহাব। মহামূল্যবান গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে যে বহু আ'রিফ (খোদা-জ্ঞানী বুযূর্গ) তাঁদের মুরিদদেরকে বলেছেন, 'যখন তোমরা আল্লাহর কাছ থেকে কোনো কিছু কামনা করো, তখন আমার কাছে চাইবে এখন আল্লাহ তা'আলা এবং তোমাদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হচ্ছি আমি।' হযরত আবুল আব্বাস আল মুরসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর মুরিদদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'আল্লাহর কাছ থেকে যদি তোমাদের কোনো কিছু চাওয়ার থাকে, তবে ইমাম গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ওয়াস্তে তা প্রার্থনা করবে'।

---

[১]. মুসলিম : আস সহীহ, বাবুন নারি ইদখুলুহাল জাব্বারুন, ৪/২১৯১ হাদীস নং ২৮৫৪, হাদীস নং ২৬২২।
ক. বায়হাক্বী : শু'য়াবুল ঈমান, ১৩/৮৮ হাদীস নং ৯৯৯৯।
খ. বাগাবী : শরহুস সুন্নাহ, বাবু ফদ্বলিল ফুক্বারা, ১৪/ ২৬৯ হাদীস নং ৪০৬৯।

এগুলো বহু কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে, উদাহরণস্বরূপ, 'আল হিসন আল হাসিন' গ্রন্থে।"[১]

২১/ ৩৮৫ পৃষ্ঠায় ওয়াহাবী পুস্তকটি লিখে:

وَعَلَىٰ هَذَا فَيَجِبُ الإِنْكَارَ عَلَىٰ مَنْ تَرَكَ الدَلِيْلَ لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ العُلَمَاءِ كَائنا مَنْ كَانَ، وَنُصُوْصُ الأَئِمَّةِ عَلَىٰ هَذَا، وَأَنَّهُ لَا يَسُوْغُ التَّقْلِيْدَ إِلَّا فِيْ مَسَائِلِ الاِجْتِهَادِ الَّتِيْ لَا دَلِيْلَ فِيْهَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مِنْ كِتَابٍ وَلاَ سُنَّةٍ، فَهَذَا هُوَ الَّذِيْ عَنَّاهُ بَعْضُ العُلَمَاءِ بِقَوْلِهِ: لاَ إِنْكَارُ فِيْ مَسَائِلِ الاِجْتِهَادِ. وَأَمَّا مَنْ خَالَفَ الكِتَابَ وَالسُّنَةَ فَيَجِبُ الرَدُّ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسَ وَالشَّافِعِي وَمَالِك وَأَحْمَد، وَذَلِكَ مُجْمَعُ عَلَيْه، كَمَا تَقَدَّمَ فِيْ كَلَامِ الشَّافِعِيْ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ-

-দ্বীনের মুজতাহিদ ইমামগণের জন্যে ইজতেহাদ প্রয়োগ করা অনুমতিপ্রাপ্ত ছিল। তাঁরা তাঁদের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের দলিলগুলো লিপিবদ্ধ করেছিলেন। যদি কেউ তার মযহাবের ইমামের প্রদর্শিত পন্থায় কোনো কাজ করে এবং নিজের খুঁজে বের করা দলিল বা কোনো আয়াত বা কোনো হাদিস যা আদেশ করে সে অনুযায়ী কাজটি না করে, তাহলে সেই ব্যক্তি গোমরাহ হয়ে যাবে। ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাই বলেছেন।"[২]

আহল্ আস্ সুন্নাতের ওই তিন মহান ইমাম এবং ইমামুল আযম হযরত আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উক্ত কথাটি মুজতাহিদ নামক মহান উলামার ক্ষেত্রে-ই বলেছিলেন। একজন মুজতাহিদকে তাঁর পাওয়া আয়াত বা হাদীসকে অনুসরণ করতে হয়। তিনি অন্য কোনো মুজতাহিদের ইজতেহাদ কিংবা নিজের ইজতেহাদকেও অনুসরণ করতে পারেন না। কারণ কোনো আয়াত অথবা হাদিসে সুস্পষ্টভাবে বিবৃত বিষয়ের ওপর ইজতেহাদ প্রয়োগ করার কোনো অনুমতি নেই।

"আমরা মুজতাহিদ নই, বরং মুকাল্লিদ (অনুসারী)। আমাদের মতো মুক্বাল্লিদদের জন্যে মুজতাহিদ নামক ফিক্বাহবিদ উলামার কথাই দলিলস্বরূপ। যদি কোনো

---

[১]. আল বারিক্বা। ক. আল হাদিক্বা।

[২].ফাতহ আল মাজিদ : ৩৮৫।

আয়াত অথবা হাদিস যা আমাদের জ্ঞাত তা তাঁদের কথার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে আমাদের মনে হয়, তবে উক্ত আয়াত অথবা হাদিস হতে আমরা যা বুঝি তা অনুসরণ না করাই জরুরি, বরং মুজতাহিদদের কথাকে অনুসরণ করতে হবে। তাঁরা এসব দলিল দেখেননি কিংবা তাঁরা দেখেছিলেন কিন্তু বুঝতে পারেননি, এ ধরণের কথা বলার অনুমতি নেই"।[১] ইবনে তাইমিয়া ও তার আনাড়ী শিষ্য ইবনুল কাইয়েম আল জাওযিয়াকে ওয়াহাবীরা মুজতাহিদ মনে করে থাকে। ওহাবীরা তাদের কথার অনুসরণ করে এবং আমাদের দ্বীনের চার মযহাবের ইমামগণের ইজতেহাদকে অপছন্দ করে। অথচ ওহাবীটি-ই স্বীকার করেছে, 'আমাদের ইমামগণ তাঁদের ইজতেহাদের ভিত্তিস্বরূপ গৃহীত আয়াত ও হাদিসগুলো উদ্ধৃত করে তাঁদের সিদ্ধান্তগুলোও সেগুলোর সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন। ওয়াহাবীটি আহল্ আস্ সুন্নাত কর্তৃক তাঁদের ইমামগণের অনুসরণকে আল্লাহর কিতাব প্রত্যাখ্যানকারী খৃষ্টান ও ইহুদীদের দ্বারা তাদের পাদ্রী ও দেবতাদের অনুসরণের সমতুল্য করতে চায়। সে এতোই রূঢ় যে মুসলমানদের সে মুশরিক আখ্যা দিয়েছে। এটা খুবই ভাল হতো যদি ওয়াহাবীরা বুঝতে পারতো যে তারা নিজেরাই মুশরিকে রূপান্তরিত হয়েছে তাদের অজ্ঞ অ-মুজতাহিদ নেতাদেরকে অনুসরণ করে, যারা আহল্ আস্ সুন্নাতের উলামার মাহাত্ম্য একেবারেই বুঝতে পারে নি।

মুজতাহিদদের দলিলসমূহ মুক্বাল্লিদদের পক্ষে তালাশ করা এবং দেখা জরুরি নয়। ওয়াহাবীটি এতেও বিশ্বাস করেনা। সে হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে উদ্দেশ্য করে বলা হাদিসটি উদ্ধৃত করে, যেটা তারই ভ্রান্ত ধারণাকে সমূলে উৎপাটিত করেছে। যেহেতু ওহাবিটির মাতৃভাষা আরবীতে তার বেশ দখল আছে, সেহেতু তার প্রত্যেকটি কথাকে সঠিক প্রমাণ করার জন্যে সে একই অর্থবোধক বহু আয়াত ও হাদিস উদ্ধৃত করেছে। কিন্তু যেহেতু তার যুক্তি ও বিচার-বিবেচনা অত্যন্ত দুর্বল, সেহেতু সে দেখতে পায়নি যে তারই পেশকৃত আয়াত এবং হাদিসসমূহ তার বক্তব্যকেই ভ্রান্ত প্রমাণ করেছে। হযরত ইমামুল আযম হযরত আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর শিষ্যদেরকে উদ্দেশ্য করে যা বলেছেন তা ওহাবীটি উদ্ধৃত করে: 'আমার কথাকে ফেলে কুরআন-হাদীসের অনুসরণ করবে' ইমামুল আযম তাঁর শিষ্যদেরকে ওই আদেশ দিয়েছিলেন। ওহাবীটি ধরে নিয়েছে যে সেটা বুঝি আমাদের মতো এবং ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়েম, মুহাম্মদ আবদুহ, সাইদ কুতুব, রশিদ রেযা এবং মওদূদীর মতো

[১]. আল হাদিমী : বারিক্বা, ৩৭৬।

মুক্বাল্লিদদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। অথচ মুক্বাল্লিদদের উচিৎ ইমাম আল মযহাবের বইপত্র পাঠ করে তার অনুগামী হওয়া এবং নাজাতপ্রাপ্ত হওয়া।

'ফাতহুল মাজীদ' বইয়ের ৩৯৩ পৃষ্ঠায় ওহাবীটি وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودا "যদি আপনি মুনাফেকদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করেন, তাহলে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা (আহ্বানে সাড়া দিতে) অগ্রসর হয়না- আয়াতটি[১] পেশ করে আহলে সুন্নাতকে মুনাফেকদের সমতুল্য করতে অপচেষ্টা চালায়। সে বলে, إِنَّهُمْ صَدُّوْا عَمَّا تَوْجِبَهُ الأَدِلَّةُ مِنْ كِتَابِ اللهِ وُسُنَّةِ رَسُوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ أَقْوَالِ مَنْ يُخْطِئُ كَثِيْرًا مِمَّنْ يَنْتَسِبُ إِلَىٰ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ فِيْ تَقْلِيْدِهِمْ مَنْ لاَ يَجُوْزُ تَقْلِيْدَهُ، وَاعْتِمَادُهُمْ عَلَىْ قَوْلِ مَنْ لَا يَجُوْزُ الاِعْتِمَادَ عَلَىْ قَوْلِهِ، وَيَجْعَلُوْنَ– "আহল্ আস্ সুন্নাত আয়াত ও হাদিসমূহ হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাদের মযহাবের ইমামগণের তাক্বলিদ (অনুসরণ) করে। ফলসরূপ তারা মুশরিক হয়ে গিয়েছে"।[২]

এখানেও ওহাবীটি আহল্ আস্ সুন্নাতের মুসলিমদের গালমন্দ করেছে। যেহেতু আমরা তাদের ভ্রান্তি, মিথ্যা ও বিকৃত কুরআন-হাদিসের তফসীরে বিশ্বাস করিনা, সেহেতু ওহাবীরা দোষারোপ করে যে আমরা সুন্নীরা সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হয়েছি। আমরা তাদেরকে বলি: আমরা আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেই না। আমরা সেগুলোকে মান্য করতে পছন্দ করি। কুরআন ও হাদীসের জন্যে আমাদের জীবন কুরবান হোক আমরা সেগুলোকে অমান্য করি না, বরং তোমাদের দ্বারা সেগুলোর বিকৃত ব্যাখ্যাকে অমান্য করি। তোমরা সেগুলোকে ভুল বুঝেছ এবং গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়েছো। সেগুলোর অর্থসমূহ আহলে সুন্নতের উলামাবৃন্দ সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাঁরা যা বুঝেছিলেন তা তাঁদের বইপত্রে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাঁরা তা প্রকাশ্যভাবে লিখেছিলেন যা প্রকাশ্যভাবে বিবৃত হয়েছিল; তাঁরা দ্ব্যর্থবোধক মন্তব্যগুলোর ক্ষেত্রে ইজতেহাদের মাধ্যমে যা বুঝেছিলেন তা তাঁরা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। আমরা এ সকল মহান উলামা যা উপলব্ধি ও লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাই অনুসরণ করে আসছি। আমরা

---

[১]. আল কুর'আন, ৮/৬১।
[২]. ফাতহ্ আল মাজিদ : ১/৩৯৩।

তোমদের ভ্রান্ত ব্যাখ্যাগুলো অনুসরণ করে বিচ্যুত হতে চাইনা। আমরা সুন্নীরা নই, বরং তোমরা ওয়াহাবীরা-ই কুরআন ও সুন্নাহ হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ।

হযরত খাজা হাসান জান ফারুকী সিরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর পারসিক কিতাব 'আল উসুল আল আরবায়া ফী তারদিদ-ইল ওয়াহাবীয়া'-এর ৪র্থ খন্ডে লিখেছেন:

"শরিয়তের আহকাম (আইন-কানুন) আমাদের মতো সাধারণ মুসলমানদেরকে জানানো হয়েছে উলামা ও সালেহীনদের মাধ্যমে; অর্থাৎ মুহাদ্দেসীন বা হাদীসবিদ উলামা এবং মুজতাহিদগণের মাধ্যমে। মুহাদ্দীসগণ হাদিসসমূহ অধ্যয়ন করে প্রকৃত হাদিসগুলো বেছে নিয়েছেন। আর মুজতাহিদগণ আয়াত ও হাদিসসমূহ থেকে আইন-কানুন বের করেছেন। এ সকল আইন অনুসারেই আমরা আমাদের সকল এবাদত ও আমল (কর্ম) পালন করে থাকি। যেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় হতে বহু পরের একটি সময়ে আমরা দুনিয়াতে জীবন লাভ করেছি, এবং যেহেতু আমরা 'নাসিখ' ও 'মানসুখ', 'মুহকাম', 'মু'আওয়াল' এবং পূর্ববর্তী 'নস' বা দলিলসমূহের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারিনা, এবং যেহেতু সেই সব 'নস'-কে আমরা চেনতে পারিনা যেগুলো পরস্পরবিরোধী মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেহেতু আমাদেরকে একজন মুজতাহিদ ইমামের অনুসরণ করতে হবে। কারণ, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় হতে খুব একটা দূরে নয় এমন সময়ের কোনো মুজতাহিদ যিনি তাকওয়াসম্পন্ন বা খোদাভীরু আলেম এবং আইন-কানুন বের করায় পারদর্শী এবং আমাদের চেয়ে হাদিসের অর্থসমূহ ভাল বুঝেছেন, তাঁকে অনুসরণ করা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই। এমন কি লা-মযহাবীদের ধারণাকৃত 'মহান মুজতাহিদ' ইবনুল কাইয়েম আল জাওযিয়া পর্যন্ত তার 'ইলাম আল মক্কিন' গ্রন্থে লিখেছে যে মুজতাহিদের গুণাবলীসম্পন্ন নয় এমন ব্যক্তিদের জন্যে কুরআন-হাদিস থেকে সিদ্ধান্ত নেয়ার কোনো অনুমতি নেই। 'কেফায়া' কিতাবটি বলে: 'সাধারণ মুসলমান যখন কোনো হাদিস শিক্ষা করে, তখন সে এ হাদিসটি হতে যা বুঝে তার অনুসরণ সে করতে পারেনা; এর কোনো অনুমতি নেই। যে অর্থ উপলব্ধি করা হয়েছে হয়তো সেটা ভিন্ন অপর কোনো অর্থ আরোপ করতে হতে পারে। অথবা এটা মনসুখ (রহিত)-ও হতে পারে। অথচ, মুজতাহিদগণের ফতোওয়া এ রকম ছিল না।' 'তাহরির' গ্রন্থের শরাহ (ব্যাখ্যা) 'তাকরির'-এও একই কথা লেখা হয়েছে, যেটা মনসুখও হতে পারে বলার পর সিদ্ধান্ত নেয় 'ফিক্বাহবিদ উলামা যা বলেছেন মুসলমানটিকে তা অনুসরণ করতে হবে।' 'আল ইক্বদ আল ফারিদ' গ্রন্থে ইমাম সৈয়দ আস্ সামহুদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হানাফী মযহাবের পূর্ববর্তী

আলেম ইবনুল হুমাম হতে ইমাম আবু বকর আ´রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কথা রওয়ায়াত করেন, যিনি বলেন, 'মহান উলামায়ে হক্কানী সর্বসম্মতভাবে ঘোষণা করেছেন যে সাধারণ মুসলমানদেরকে (সরাসরি) হুযূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাগণের অনুসরণ করা হতে বাধা দিতে হবে এবং সাধারণ মুসলমানগণের উচিৎ পরবর্তী প্রজন্মের সেই সকল উলামাবৃন্দের কথার অনুসরণ করা যাঁরা বিশদ ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁদের বইপত্রে। মুহিববুল্লাহ আল বিহারী আল্ হিন্দুস্তানীর 'মুসাল্লাম আস্ সুবুত' গ্রন্থে এবং তার শরাহ/ব্যাখ্যামূলক 'ফাওয়াতিহ-উর-রাহামুত' পুস্তকে লেখা আছে, 'মহান উলামা সর্বসম্মতভাবে ঘোষণা করেছেন যে সাধারণ মুসলমানদেরকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আসহাবে কেরামের (সরাসরি) অনুগমন হতে বাধা দেয়া উচিৎ এবং তাদের উচিৎ শরিয়তের বিশদ ব্যাখ্যা প্রদানকারী উলামার অনুসরণ করা।' তাকিই-উদ-দ্বীন উসমান ইবনে আস্ সালাহ আশ্ শাহর আয্ যুরী (৫৭৭-৬৪৩ হিজরী) এই বিষয় থেকে সিদ্ধান্ত টেনেছেন যে চার ইমাম ছাড়া আর কারও তাকলিদ মানা অনুমতিপ্রাপ্ত নয়। 'শরহে মিনহাজ আল উসুল' কিতাবে লেখা হয়েছে: 'ইমামুল হারামাইন তাঁর বুরহান পুস্তকে লিখেছেন যে সাধারণ মুসলমানগণের বেলায় নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাগণের মযহাবের অনুগমন করা উচিৎ নয়। তাদের উচিৎ চার মযহাবের আয়েম্মা-এ-মযাহীবের অনুসরণ করা।

"এটা বোঝা গেল যে যারা উপরোক্ত উলামাগণের ইজমা (ঐকমত্য) মান্য করবে না, তারা গোমরাহ। কারণ, সাহাবা-এ-কেরাম জিহাদ ও ইসলাম প্রচার-প্রসারের কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন তাফসীর এবং হাদীস বই লেখার সময় পান নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নূর (জ্যোতি) তাঁদের ক্বলবে এমনই বিচ্ছুরিত হয়েছিল যে তাঁদের আর বইপত্রের মাধ্যমে শিক্ষা করতে হয়নি। ওই নূরের ক্ষমতাবলে তাঁদের প্রত্যেকেই সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ শতাব্দীর (অর্থাৎ, ১ম হিজরী শতকের) পর জ্ঞান ও মতামতের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা দেয়। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনগণ হতে রওয়ায়াতকৃত খবরসমূহ (বর্ণনা) এলোমেলো এবং অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে পড়ে। যাঁরা সঠিক পথের তালাশ করছিলেন তাঁরা বিচলিত হন। রহমতস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা এই নেয়ামতপূর্ণ উম্মতদের মধ্য থেকে চারজন সালেহ (পুণ্যবান) এবং তাকওয়াসম্পন্ন ইমামকে মনোনীত করেন। তিনি তাঁদেরকে নস হতে আইন-কানুন বের করার গুণাবলী ও যোগ্যতা তাঁরই নেয়ামতস্বরূপ দান

করেন। তিনি ঐশীভাবে এরাদা করেন যে উক্ত চার ইমামকে অনুসরণ করেই মুসলিম উম্মাহ নাজাত (ইহ ও পারলৌকিক মুক্তি) পেতে পারবে। আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে আদেশ করেছেন আয়েম্মা-এ-মযাহীবকে অনুসরণ করতে। এই আদেশটি সূরা নিসার ৫৮ আয়াতে প্রদান করা হয়েছে: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ 'হে ঈমানদারেরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং উলিল আমর-দেরকে অনুসরণ করো।'[১] এখানে 'উলুল আমর'-এর অর্থ হচ্ছে উলামা যাঁরা মুজতাহিদের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন; আর এ সকল উলামাই হলেন আমাদের প্রখ্যাত চার আয়েম্মা-এ-মযাহীব। সূরা নিসার ৮২ নং আয়াত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে যে উপরোক্ত আয়াতে চিহ্নিত মহান 'উলুল আমর'-বৃন্দ হচ্ছেন মুজতাহিদ ইমাম: وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ 'উলুল আমর হচ্ছেন সেই সকল উলামা, যাঁরা নস হতে আইন-কানুন বের করতে পারেন'।[২] কেউ কেউ বলেছে যে, 'উলুল আমর' হচ্ছে শাসক বা গভর্নর। যদি তারা বুঝিয়ে থাকে সেই সকল শাসক যাঁরা নস হতে [ইজতেহাদের মাধ্যমে] আইন-কানুন বের করতে পারেন, তাহলে তারা সঠিক। শাসকবর্গ হয়তো উলুল আমর হতে পারেন যদি তাঁরা উলামা হন। কিন্তু মুধুমাত্র শাসক হবার কারণে তাঁরা তা হতে পারেন না [মওদূদী জামাত মনে করে শাসকদেরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে অনুবাদক]। খুলাফায়ে রাশেদীন এবং খলিফা ২য় উমর আলেম শাসক ছিলেন। অজ্ঞ, ফাসিক অথবা কাফের শাসকরা তাঁদের মতো হতে পারে না; ওই ধরনের শাসকদের শরিয়ত অসম্মত আদেশগুলো মানা ওয়াজিব নয়। কারণ, একটা হাদিস ইরশাদ ফরমায়: 'কোনো ব্যক্তির উচিৎ নয় অন্য কারও পাপ সৃষ্টিকারী কথা/আদেশ মান্য করা।' সূরা লুকমানের ১৫নং আয়াত ঘোষণা করে, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا 'যদি তারা তোমার ওপর আমার সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক স্থাপনে শক্তি প্রয়োগ করে যা তুমি জানো না, তবে তাদের এই আদেশ তুমি মান্য করবে না'।[৩]অতএব, এটা নিশ্চিতভাবে বোঝা গেল যে ওই ধরণের লোকেরা কোনোক্রমেই 'উলুল আমর' হতে পারে না। একটা হাদীসে সুস্পষ্টভাবে

---

[১]. আল কুর'আন : সূরা নিসা, ৮/৫৮।
[২]. প্রাগুক্ত : আয়াত ৮৩।
[৩]. প্রাগুক্ত : সূরা লুকমান, আয়াত ১৩।

'উলুল আমর' সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে; আবদুল্লাহ আদ্ দারিমী রওয়ায়তকৃত হাদীসটি ঘোষণা করে: 'ফক্বীহ উলামাই হচ্ছেন উলুল আমর' (হাদিস)। ইমাম সুয়ুতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'ইতক্বান' শীর্ষক তফসীর পুস্তকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর কথা উদ্ধৃত করেন, যিনি বলেন: 'উলুল আমর হচ্ছেন ফিক্বাহ ও দ্বীনের আলেমগণ।' 'তাফসীর-এ-কবীর' শীর্ষক গ্রন্থের ৩য় খন্ডের ৩৭৫ পৃষ্ঠায়, 'শরহে মুসলিম'-এর ২য় খন্ডের ১২৪ পৃষ্ঠায় এবং তফসীর কিতাব 'মা'আলিম' ও 'নিশাপুর'-এও একই কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। আয়াত, হাদীস এবং তফসীরসমূহে প্রদত্ত ব্যাখ্যাসমূহ স্পষ্টই প্রতীয়মান করে যে মুজতাহিদদেরকে অনুসরণ করা অত্যন্ত জরুরি এবং সেগুলো আরও পরিস্ফুট করে যে লা-মযহাবীদের কথা 'আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিন্ন অন্য কাউকেই মান্য করা শির্ক ও বিদয়াত' সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এ বিষয়ে আরও বহু হাদীস এবং রওয়ায়াত আছে:

(٢)"أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: أَقْضِي بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي لاَ آلُو، قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللهِ.

–ইয়েমেনে বিচারক হিসেবে নিয়োগ করার পর নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞাসা করেন কীভাবে তিনি বিচারকার্য পরিচলানা করবেন। হযরত মুয়ায রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দেন, 'আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী'। হুজূর (দ) এরপর জিজ্ঞাসা করেন, 'যদি তুমি আল্লাহর কিতাবে (সমাধান) না পাও?' 'তবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতে খুঁজে দেখবো' এই ছিল হযরত মুয়ায রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর উত্তর। 'যদি আমার সুন্নতেও তা না পাও?'- আবার জিজ্ঞাসা করেন নবী-এ-আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তখন হযরত মুয়ায বিন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দেন, 'আমি আমার ইজতেহাদের মাধ্যমে

যা উপলব্ধি করবো তাই অনুসরণ করবো।' অতঃপর নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিত্র হাতখানি হযরত মুয়াযের বুকের ওপর রেখে বলেন, 'আল হামদু লিল্লাহ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের রসূলকে (সহকারীকে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সিদ্ধান্তের (কিংবা স্বীকৃতির) সঙ্গে একমত করে দিয়েছেন।[১]'

আত্ তিরমিযী, আবু দাউদ ও আদ্ দারিমী তাঁদের কিতাবসমূহে এই হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। এটা সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে উলুল আমরের অর্থ হচ্ছে মুজতাহিদ এবং আরও ব্যক্ত করে যে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আছেন যারা মুজতাহিদদের মান্য করে।

"(২) আবু দাউদ ইবনে মাজা রওয়ায়াতকৃত একটা হাদিস ইরশাদ ফরমায়:

الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ، مَا سِوَاهُنَّ فَضْلٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ

–এলম তিনটি অংশ দ্বারা গঠিত; আল্ আয়াত আল্ মুহকামা, আস্ সুন্নাত আল্ ক্বাইমা এবং আল্ ফারিদাত আল্ আদিলা।

মহান মুহাদ্দিস আবদুল হক দেহলভী তাঁর 'আশিয়াতু লোমআত' গ্রন্থে এ হাদিসটি ব্যাখ্যাকালে বলেন, 'আল ফারিদাত আল আদিলা হচ্ছে সেই জ্ঞান যা কুরআন ও সুন্নাতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এটা ইজমা ও কিয়াসের দিকে ইঙ্গিত করে; কারণ, ইজমা ও কিয়াস কুরআন এবং সুন্নাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেগুলো কুরআন ও সুন্নাত হতে নিঃসৃত হয়েছে। অতএব, ইজমা ও কিয়াসকে কিতাব এবং সুন্নাহর পাশাপাশি অনুরূপ উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং নাম দেয়া হয়েছে আল ফারিদাত আল আদিলা। ফলে, উভয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আমল পালন করাটা

[১]. ইব্‌ন আবূ শায়বা : আল মুসান্নাফ, ফিল কাদ্বী আঁই ইয়ানবাগী ৪/৫৪৩ হাদীস নং ২২৯৮৮।
ক. আহ্‌মদ : আল মুস্‌নাদ, হাদীসু মু'য়ায বিন জাবাল, ৫/২৩০ হাদীস নং ২২০৬০।
খ. দারেমী : আস সুনান, ১/২৬৭ হাদীস নং ১৭০।
গ. মুসলিম : আস সহীহ, বাবুত তাহরীজ আলাল ক্বতলিল খাওয়ারিজ, ২/৭৪৬ হাদীস নং ১০৬৬।
ঘ. আবূ দাঊদ : আস সুনান, বাবু ইজতিহাদির রায়ি, ৩/৩০৩ হাদীস নং ৩৫৯২।
ঙ. তিরমিযী : আস সুনান, বাবু মা জা'য়া ফিল কাদ্বি, ৩/৯ হাদীস নং ১৩২৭।
চ. ত্ববরানী : আল মু'জামুল কাবীর, ২০/১৭০ হাদীস নং ১৭১১৯।
ছ. বাগাবী : শরহুস সুন্নাহ, বাবু ইজতিহাদিল হাকিম, ১০/১১৬।
জ. মুশকিলুল আছার : আশ শরাহ, ২/২১২ হাদীস নং ৩৫৮২।

প্রত্যেকের জন্যে ওয়াজিব হিসেবে আদিষ্ট হয়েছে। উপরোক্ত হাদিসটি বোঝায় যে ইসলামের উৎস চারটি, যথা কুরআন, সুন্নাত, ইজমা ও কিয়াস।[১]

"(৩) হযরত উমর ইবনে আল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু শূরাইহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে ক্বাযী (বিচারক) হিসেবে নিযুক্ত করে তাঁকে বলেন: 'কুরআনে যা কিছু সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে তার দিকে লক্ষ্য করবে। ওই ধরণের বিষয়ে অন্যান্যদেরকে জিজ্ঞাসা করবে না। যদি তুমি কুরআনে [সমাধান] না পাও, তবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতে খুঁজবে। যদি তাতেও না পাও, তাহলে ইজতেহাদ প্রয়োগ করে যা উপলব্ধি করবে তাই উত্তরে বলবে।'

"(৪) বাদীরা অভিযোগ নিয়ে এলে খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর কিতাবে দৃষ্টিপাত করে লব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দিতেন। যদি এর ভেতর তিনি উত্তর খুঁজে না পেতেন, তখন তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে শ্রুত তথ্য দ্বারা সমাধান করতেন। যদি সুন্নাতেও না পেতেন, তবে তিনি সাহাবাগণকে জিজ্ঞাসা করতেন এবং তাদের ইজমা বা ঐকমত্যের ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান করতেন।

"(৫) যখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে বিচারকার্য পরিচালনার জন্যে অনুরোধ করা হতো, তখন তিনি কুরআনে যা পেতেন তার আলোকে সিদ্ধান্ত নিতেন। তিনি তা কুরআনে না পেলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে যা শুনেছিলেন তার উদ্ধৃতি দিতেন। যদি তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে কিছুই না পেতেন, তখন হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞাসা করতেন। যখন তাঁরাও কোনো উত্তর দিতে অক্ষম হতেন, তখন তিনি নিজেই তাঁর রায় [পর্যবেক্ষণলব্ধ মত] অনুযায়ী সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

"এখন আমরা ব্যাখ্যা করবো যে মুজতাহিদ উলামাকে জিজ্ঞাসা করার মানে হচ্ছে চার আয়েম্মা আল মাযাহীবকে জিজ্ঞাসা করা। সাহাবাদের সময় হতে পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত সকল মুসলিম এই চার ইমামকে অনুসরণ (তাক্বলিদ) করে আসছেন। তাঁদেরকে অনুসরণ করার ব্যাপারে ইজমা হয়ে গিয়েছে। এই এজমা যে সহীহ (সঠিক) তা প্রতিভাত করে নিম্নোক্ত হাদিসসমূহ لاَ يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى

[১]. শরহে মিশকাত বা আশিয়াতুল লুম'আত।

ضَلَالَةٍ ‘আমার উম্মাত দালালাত তথা গোমরাহীর ওপর ইজমা করবে না’;[১] ’আল্লাহ তা’আলার সন্তষ্টি হচ্ছে (তোমাদের) ইজমায়;’ এবং ’যে ব্যক্তি জামাআত হতে বিচ্যুত হয় সে জাহান্নামী।’

”চার ইমামকে অনুসরণ করা যে ওয়াজিব তা প্রমাণকারী দ্বিতীয় দলিলটি হচ্ছে সূরা ইসরা-এর ৭১ নং আয়াত যা ঘোষণা করে: يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ’সেই দিন (মাহশর) আমরা (আল্লাহ পাক) প্রত্যেক দলকে তাদের ইমাম বা প্রধানসহ ডাকবো।[২] কাযী আল বায়দাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে এর অর্থ হচ্ছে, بِمَنْ ائْتَمُّوْا بِهِ مِنَ نَبِيٍّ أَوْ مُقَدَّمٍ فِيْ الدِّيْنِ أَوْ كِتَابِ أَوْ دِيْنِ– ’আমরা প্রত্যেক উম্মাতকে তাদের নবীসহ ডাকবো যাঁকে তারা ইমাম হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং তাদের সঙ্গেও ডাকবো যাদেরকে তারা দ্বীনের ব্যাপারে অনুসরণ করেছিল।[৩] ’মাদারিক’ তফসীর বইতেও একই কথা লেখা হয়েছে। ইমাম আল বাগাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর ’মা’আলিমুত তানযিল’ তফসীর কিতাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর কথা উদ্ধৃত করেন, যিনি বলেন: ‘তাদেরকে ডাকা হবে তাদের শাসকদের সঙ্গে যারা তাদেরকে নাজাত অথবা গোমরাহীর দিকে নিয়ে গিয়েছিল’। ইমাম বাগাবী একই গ্রন্থে সাইদ ইবনে মুসাইয়াব-এর কথাও উদ্ধৃত করেন, যিনি বলেন: ’প্রত্যেক কৃওম (জাতি) তাদের নেতাদের আশপাশে জড়ো হবে, যারা তাদেরকে ভালোর দিকে কিংবা খারাপের দিকে নিয়ে গিয়েছিল।’ ’তাফসীর-এ-হুসাইনী’তে লিপিবদ্ধ আছে যে তাদেরকে তাদের ইমাম আল মযহাবের নামে ডাকা হবে; উদাহরণস্বরূপ, ’এয়া হানাফী’, ’এয়া হাম্বলী’ ইত্যাদি। এর থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, যে সকল ইমাম কামেল এবং মুকাম্মিল তাঁরা তাঁদের অনুসারীদের জন্যে শাফায়াত (সুপারিশ) করবেন। ’আল মিযানুল কুবরা’ পুস্তকে ইমাম শারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন যে শাইখুল ইসলাম ইব্রাহিম লাক্বানী বেসালপ্রাপ্ত হওয়ার পর কিছু সালেহ মুসলমান তাঁকে স্বপ্নে দেখেন এবং তাঁর প্রতি আল্লাহ কী রকম আচরণ করেছেন তা তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা

---

[১].আহ্‌মদ :আল মুসন্‌াদ, হাদীসু আবী বসরা ৬/৩৯৬ হাদীস নং ২৭২৬৭।

ক. ত্ববরানী : আল মু‘জামুল কাবীর, জামীল বিন বসরা, ২/২৮০ হাদীস নং ২১৭২।

[২]. আল কুর‘আন : সূরা আল ইসরা ১৭/৭১।

[৩]. বায়দ্বাবী : আত তাফসীর, সূরা ইসরা ১৭ /৭১।

করেন; শাইখুল ইসলাম বলেন যে প্রশ্নকারী ফেরেশতাগণ তাঁকে প্রশ্ন করবার জন্যে যখন বসান, তখন ইমাম মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সেখানে আগমন করেন এবং বলেন, ‘এই ধরণের ব্যক্তিকে তিনি আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ বিশ্বাস করেন কিনা, এ প্রশ্ন করা কি উচিৎ হবে? তাঁকে একা থাকতে দাও।’ আর সাথে সাথেই ফেরেশতারা তাঁকে ছেড়ে চলে যান। ’আল মিযান’ গ্রন্থে আরও লেখা আছে: ’তাসাউফের ইমামগণ ও ফিক্বাহর উলামায়ে কেরাম তাঁদের মান্যকারীদের জন্যে শাফায়াত করবেন। অনুসারীরা যখন তাঁদের রূহগুলো আল্লাহর কাছে সমর্পণ করবেন এবং যখন তাঁরা মুনকার-নাকির ফেরেশতা দু’জন কর্তৃক সওয়ালকৃত হবেন এবং যখন পুনরুত্থান ও বিচারকাজ সংঘটিত হবে এবং যখন অনুসারীরা পুল-সিরাতের ওপর থাকবেন, তখন উক্ত ইমামবৃন্দ ও উলামাগণ তাঁদের সঙ্গে থাকবেন। তাঁরা নিজেদের অনুসারীদেরকে ভুলে যাবেন না। যখন তাসাউফের ইমামগণ তাঁদের মুরিদদেরকে বিভিন্ন ভীতিকর স্থানে রক্ষা করবেন, তখন মুজতাহিদ ইমামগণ কি তাঁদের অনুসারীদের রক্ষা করবেন না? এই মুজতাহিদগণ হচ্ছেন আয়েম্মা-এ-মযাহিব। তাঁরা দুনিয়া (পৃথিবী) ও দ্বীনের জন্যে স্তম্ভস্বরূপ। তাঁরা এই উম্মতের রক্ষাকারী। হে ভ্রাতা, তুমি কতো সৌভাগ্যবান চার আয়েম্মা-এ-মযাহিবের মধ্যে যাঁকে ইচ্ছা অনুসরণ করো এবং সুখ অর্জন করো’(হযরত আবদুল ওয়াহহাব আশ্ শারানী:’আল মিযানুল কুবরা’)। এটা প্রতীয়মান হলো যে শেষ বিচারের দিবসে প্রত্যেককে তার মযহাবের ইমামের নামে ডাকা হবে। সেই ইমাম যিনি একজন মুজতাহিদ এবং তাকওয়া ও ওয়ারাসম্পন্ন আলেম, তিনি তাঁর অনুসারীদের জন্যে অবশ্যই সুপারিশ করবেন। চার আয়েম্মায়ে মযাহীবের সকলেরই এই মহৎ গুণাবলী বর্তমান। সূরা লুক্বমানের ১৫নং আয়াতে আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ ফরমান: وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ‘আমার দিকে যারা ফিরেছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে, তাদের পদাংক অনুসরণ কর।’[১] এই নেয়ামতপূর্ণ উম্মতের সার্বিক সাক্ষ্য অনুযায়ী, চার মযহাবের ইমামবৃন্দ ’ইনাবাত’-এর গুণাবলীসম্পন্ন ছিলেন; অর্থাৎ, তাঁরা ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে আল্লাহর দিকে ফিরেছিলেন এবং তাই তাঁদেরকে অনুসরণ করা আমাদের জন্যে ওয়াজিব।

[১]. আল কুর‘আন : সূরা লুক্বমান, ২০/১৫।

“চার মযহাবের ইমামদেরকে অনুসরণ করার তৃতীয় প্রামাণ্য দলিল হচ্ছে সূরা নিসার ১১৫ নং আয়াত যা’তে ঘোষিত হয়েছে: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا হেদায়েতের পথের দিক-নির্দেশনাপ্রাপ্ত যে ব্যক্তি রসূলকে বাধা দিতে উদ্যত হয় এবং ঈমানদারদের পথ হতে বিচ্যুত হয়, তাকে আমরা তার বিচ্যুতির দিকে টানবো এবং ভয়ংকর জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো’।[১]হযরত ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে কোন্ আয়াতে প্রমাণ পাওয়া যায় ইজমা একটা উৎস। তিনি প্রামাণ্য দলিলের তালাশে তিন’শ বার কুরআন খতম করেন এবং অবশেষে এ আয়াতটি প্রশ্নের জবাব হিসেবে খুঁজে পান। যেহেতু আয়াতটি ঈমানদারদের পথ হতে প্রত্যেককে বিচ্যুত হতে নিষেধ করেছে, সেহেতু এই পথটি অনুসরণ করা ওয়াজিব। তফসীর বই ’মাদারিক’ এই আয়াতের ব্যাখ্যাশেষে লিখেছে: ’এই আয়াতটি প্রতিভাত করে যে ইজমা একটি উৎস এবং ইজমাকে অবজ্ঞা করার কোনো অনুমতি নেই, যেমনটি নেই কোরআন-হাদীসের বেলায়।’ আর তফসীর বই ’আল বায়দাবী’ আয়াতটির ব্যাখ্যাশেষে লিখে: وَالْآيَةُ تَدُلُّ عَلَىٰ حُرْمَةِ مُخَالَفَةِ الإِجْمَاعِ، لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ رَتَّبَ الوَعِيدَ الشَدِيدَ عَلَىٰ المُشَاقَةِ وَاِتِّبَاعِ غَيْرِ سَبِيلِ المُؤمِنِيْنَ– ‘আয়াতটি পরিস্ফুট করে যে ইজমাকে অবজ্ঞা (ইনকার) করা হারাম। যেহেতু ঈমানদারগণের পথ অনুসরণ করা ওয়াজেব।[২] এই উম্মতের সুলাহা (পুণ্যবান) ও উলামা বলেছেন যে একটি মযহাবের অনুগমন করা ওয়াজিব এবং লা-মযহাবী হওয়া মহাপাপ। উলামার এই সর্বসম্মতির বিরোধিতা করার অর্থ হচ্ছে আয়াতটি অমান্য করা; কারণ, সুরা আল-ই-ইমরানের ১১০ নং আয়াতে আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ ফরমান: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ’তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত যারা মানুষের জন্যে উপকারী হয়ে এসেছ। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দেবে, অসৎ কাজে নিষেধ করবে’।[৩] এই উম্মাতের ওলামাবৃন্দ বলেছেন যে লা-মযহাবী হওয়া মারাত্মক ভুল এবং মুসলিমগণের লা-

---

[১]. আল কুর’আন : সূরা নিসা,৪/১১৫।
[২]. বায়দ্বাবী : আত তাফসীর, সূরা নিসা, ৪/১১৫।
[৩]. আল কুর’আন : সূরা আলে ইমরান, ৩/১০৯।

মযহাবী হওয়া উচিৎ নয়। অতএব, যে ব্যক্তি লা-মযহাবী হওয়াকে অনুমতিপ্রাপ্ত মনে করে উলামার আদেশের বরখেলাপ করবে, সে প্রকৃতপক্ষে আয়াতটির-ই অস্বীকার করবে।

"প্রশ্ন: ওয়াহহাবী, ক্বাদিয়ানী ও নিচারীদের মতো লামযহাবীরা কি ঈমানদার? তাদেরকে অনুসরণ করা কি ঈমানদারদের পথকে অনসুরণ করা বোঝায় না?

"উত্তর: এই সকল লা-মযহাবীদের আলেমরা 'আল্ আদিল্লাত্ আশ্ শরীয়াত-এর চারটি উৎসের মাত্র দু'টি অনুসরণ করে থাকে, যা তারা নিজেরা বলেও থাকে। তারা অপর দু'টি উৎসকে প্রত্যাখ্যান করে এবং ফলস্বরূপ অধিকাংশ মুসলিমদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে আহল্ আস্ সুন্নাত ওয়াল জামাআত হতে বিচ্যুত হয়। তাদেরকে অনুসরণ করে কেউ জাহান্নাম হতে রক্ষা পাবে না। রাফেদী, খারেজী, মু'তাযিলা, জাবারিয়্যা ও ক্বাদারিয়্যা সম্প্রদায়গুলোও দাবি করে যে তারা তাদের আলেমদেরকে অনুসরণ করে থাকে। আমরা লা-মযহাবীদেরকে ভ্রান্ত প্রমাণ করি একই জবাব দিয়ে, যে জবাব তারা উপরোক্ত সম্প্রদায়গুলোকে দিয়ে থাকে।

"মাযহাবের অনুসরণ যে ওয়াজিব তার চতুর্থ দালিলিক প্রমাণ হচ্ছে সূরা আন্ নহল-এর ৪৩তম এবং সূরা আল্ আম্বিয়ার ৭ম আয়াত, যেখানে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 'যদি তোমরা না জানো, তাহলে আহল্ আয্ যিকর (যিকর-এর মানুষদের)-কে জিজ্ঞাসা করো'।[১] যারা তাদের এবাদত ও আমল পালনের পদ্ধতি জানে না তাদেরকে এই আয়াতটি আদেশ দেয় তাঁদের শরণাপন্ন হতে যাঁরা তা জানেন। এই আয়াতে আদেশ দেয়া হয়েছে: (১) জিজ্ঞাসা করে শিখতে; (২) দ্বীনি ব্যাপারে অজ্ঞ অথবা যাকে তাকে নয়, বরং উলামাকে জিজ্ঞাসা করতে; এবং (৩) যা অজ্ঞাত তা জিজ্ঞাসা করতে। অতএব, যখন কেউ কুরআন-হাদীস হতে তার সমস্যার সমাধান খুঁজে না পায়, তখন তার উচিৎ নিজ মযহাবের মুজতাহিদকে জিজ্ঞাসা করে (কিংবা তাঁর অনুসারী কোনো আলেমের বইপত্র পড়ে) শিক্ষা করা। যদি কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করে এবং তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষানুযায়ী আমল করে, তাহলে সে তাঁকেই অনুসরণ (তাক্বলিদ) করবে। যদি সে ওই মুজতাহিদের কাছে জিজ্ঞাসা না করে অথবা তাঁর কথা অমান্য কিংবা অস্বীকার করে, তবে সে লা-মযহাবী হয়ে যাবে।

"আয়াতে উল্লেখিত 'আহল আয যিকর' কারা? তাঁরা কি আয়েম্মা আল মাযাহীব নাকি ধর্মীয় পদে সমাসীন অজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ? এর উত্তর রয়েছে একটা হাদীসে, যেটা

---

[১]. আল কুর'আন : সূরা আন নাহল, ১৬ /৪৩।

রওয়ায়াত করেছেন ইবনে মারদাওয়াই আবু বকর আহমদ, হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে গ্রহণ করে। হুজূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: 'একজন লোক নামায, রোযা, হজ্জ, গযওয়া (জেহাদ) সবই পালন করতে পারে, কিন্তু সে হয়তো মুনাফেকও হতে পারে।' তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'এয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথা থেকে এই মুনাফেকী আসতে পারে?' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান: 'সে মুনাফেক্ব, কারণ সে তার ইমামকে ঘৃণা ও অপছন্দ করে। তার ইমাম একজন আহল্ আয্ যিকর' (আল হাদীস)। এর থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে আহল্ আয্ যিকর অর্থ উলুল আমর, যা উপরোক্ত দলিলে খোলাসাভাবে বয়ান করা হয়েছে। সহিহ তাফসীরসমূহ অনুসারে উলুল আমর হচ্ছেন উলামা আর রাসিখিন (সূফী-বুযূর্গবৃন্দ) এবং চার আয়েম্মা-এ-মযাহীব। নিম্নোক্ত আয়াতগুলো চার ইমাম আল মযহাবের মাহাত্ম্য সম্পর্কে ধারণা দেয়: 'শুধুমাত্র আক্বল-এর অধিকারীরাই বুঝতে পারে' এবং 'হে আক্বলের অধিকারীরা, শিক্ষা গ্রহণ করো।' অজ্ঞ ও গোমরাহ ধর্মীয় পদে সমাসীন ব্যক্তিবর্গ যারা যুহদ ও তাক্বওয়াসম্পন্ন আল্লাহ-ওয়ালাদের কাছ থেকে ফায়েয অর্জন করতে পারে নি এবং যারা কিছু আরবী ও ফারসী শিখেই নিজেদের সংকীর্ণ মস্তিষ্ক দ্বারা কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট, তারা আয়েম্মা আল মযাহীবের গুণাবলী অর্জন করা হতে বহু দূরে অবস্থান করছে। এই সব লা-মযহাবীরা-ই হচ্ছে সেই সকল গোমরাহ, যাদেরকে হাদীসসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে: 'যারা তাফসীরের জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও মনগড়া তফসীর করবে, তারা জাহান্নামকে নিজেদের ঠিকানা বানিয়ে নেবে'; এবং 'এমন একটি সময় আসবে যখন (পৃথিবীতে) কোনো ইসলামী আলেম আর বিরাজ করবেন না; ওই সময় অজ্ঞরা ধর্মীয় পদে সমাসীন হবে এবং না জেনেই ফতোওয়া জারি করবে। তারা সঠিক পথের ওপর থাকবে না, ফলে সবাইকে সঠিক পথ হতে বিচ্যুত করবে' (হাদিস)। মিশকাত শরীফে লিপিবদ্ধ আছে, হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রওয়ায়াত করেছেন যে একবার তাঁর বন্ধুদের মধ্যে একজন একটি সফরকালে মাথায় আঘাত পেয়ে গুরুতর আহত হন। তিনি তাঁর সহচরদেরকে জিজ্ঞাসা করেন একটি তাবিজ লাগানো জায়েয হবে কিনা [কুরআনের আয়াতসম্বলিত তাবিজ]। তাঁকে বলা হয় তা জায়েয হবে না, বরং তাঁর মাথা ধুয়ে ফেলা উচিৎ হবে; তাঁর বন্ধুরা তাঁর মাথা ধুয়ে দেয় এবং তিনি মারা যান। মদীনা আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নবী-এ-মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সম্পূর্ণ ঘটনা জানানো হয়, যিনি ঘোষণা করেন: 'তারা তার মৃত্যু ঘটিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যেন তাদের মৃত্যু ঘটান। যা তারা জানে না, তা কেন

তারা জিজ্ঞাসা করে নি? অজ্ঞতার ওষুধ জিজ্ঞাসা করে জ্ঞান অর্জনের মধ্যে নিহিত' (হাদীস)। ওই সকল সাহাবী যাঁরা আরও অধিক জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা না করে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তাদেরকে যখন ভর্ৎসনা করা হয়েছে এই বলে 'আল্লাহ তা'আলা যেন তাদের মৃত্যু ঘটান', তখন ওই সকল সমসাময়িককালের লোকদের সম্পর্কে কী বলা উচিৎ যারা ধর্মীয় পদে আসীন এবং যারা ইসলামী উলামার বইপত্র না পড়েই নিজেদের শূন্য মস্তিষ্ক ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট এবং ফলস্বরূপ মুসলিমদের দ্বীন ও ঈমান ধ্বংস করতে উদ্যত? তাদেরকে দ্বীন ও ঈমানের তস্কর বলা-ই সঠিক হবে। আল্লাহ তা'আলা ওই ধরনের দ্বীনের চোরদের থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন, আমিন ইবনে সিরিন বলেন, 'তোমরা দ্বীন সম্পর্কে যার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো, তার ব্যাপারে সর্তক হও' হযরত আবু মুসা আল্ আশআরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, যদিও তিনি সাহাবাগণের মধ্যে বিশিষ্ট একজন সাহাবী ছিলেন, তবুও যখন তাঁকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর উপস্থিতিতে ফতোওয়া জারি করার জন্যে বলা হতো, তখন তিনি ইতস্ততঃ করতেন এবং বলতেন: 'এই জ্ঞানের সাগরের সামনে আমাকে অনুরোধ করা তোমাদের উচিৎ নয়।' এর কারণ হচ্ছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত মুসা আশআরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে অধিক জ্ঞানী এবং ফিক্বাহ শাস্ত্রে আরও বড় আলেম ছিলেন। ইমাম আশ্ শাফেয়ী একজন মহান আলেম হওয়া সত্ত্বেও ফজরের নামাযে সব সময়ই কুনুত দোয়াটি বর্জন করতেন এবং ইমামুল আযম হজরত আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মাযার শরীফ যিয়ারতকালে সর্বদা রুকুর পর হাত উত্তোলন করা হতে বিরত থাকতেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তর দেন, 'এই মহান ইমামের প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ আমাকে তাঁর উপস্থিতিতে তাঁরই ইজতেহাদের পরিপন্থী কোনো কাজ করায় বাধা দেয়'। আল ইমামুল আযম কতো বড় আলেম ছিলেন। তাঁর মাহাত্ম্য বুঝতে হলে প্রত্যেককে মহান আলেম ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতো হতে হবে। তিনি জানতেন, ইমামুল আযম তাঁর মাযার শরীফে জীবিতাবস্থায় আছেন এবং তাই তাঁর মযহাবের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কোনো কাজ তিনি করেন নি। সত্যি এ সকল মহান ইমাম-ই ইসলামী ফিক্বাহের বিশারদ ছিলেন। তাঁরা ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসে ঘোষিত শুভফলের ভোগকারী হয়েছেন:

مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

'যদি আল্লাহ তাঁর কোনো বান্দার কল্যাণ চান, তবে তিনি তাকে একজন ফক্বীহ বানিয়ে দেন।[১]'

"সংক্ষেপে, শরীয়তের আইন-কানুন ফিক্বাহবিদ উলামা অথবা মযহাবের ইমামবৃন্দ হতে শিক্ষা করা উচিৎ। হাদীস অথবা তাফসীরসমূহ থেকে কারোরই সরাসরি শেখা উচিত নয়। 'প্রত্যেক ব্যক্তিকেই একটি (বিশেষ) কাজ করার জন্যে সৃষ্টি করার হয়েছে'- হাদিসটি আমাদের কথার সপক্ষে প্রামাণ্য দলিলস্বরূপ। মুহাদ্দীস উলামাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়ন করে সহিহ হাদীসগুলোকে বেছে নেবার জন্যে, আর তাফসীরবিদ উলামাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল কোরআনের অর্থ অবহিত করানোর জন্যে। তাঁদের সবাই দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে কঠোর পরিশ্রম করেন এবং লক্ষ্য অর্জন করেন। ফেক্বাহবিদ উলামাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল কুরআন-হাদীসের নস-সমূহ থেকে আইন-কানুন বের করার জন্যে। এই সকল মহান উলামা ধর্মীয় জ্ঞান-পর্বতের চূড়ায় আরোহণ করেন এবং আমাদের মতো অজ্ঞদের দায়িত্বকে সহজ করে দেন। আল্লাহ-প্রদত্ত সুগভীর জ্ঞান ও তাকওয়া-পরহেযগারী দ্বারা তাঁরা সেই সব 'নস'-কে সঙ্গতিপূর্ণ করেন, যেগুলো ছিল দৃশ্যতঃ অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তাঁরা 'মুআওয়াল' থেকে 'মোহকাম'গুলো এবং পূর্ববর্তীগুলো হতে পরবর্তীগুলোকে এবং 'নাসিখ' হতে 'মনসুখ'গুলোকে পৃথক করে দেন। ফলে এই নেয়ামতপ্রাপ্ত উম্মাতের সকলেই এ সকল মহান ইমামের অনুগামী হওয়ার ব্যাপারে একতাবদ্ধ হয়েছেন, আর এই মর্মে বিশ্বাস পোষণ করেছেন যে তাঁদের পদাংক অনুসরণ করাটাই হচ্ছে শরিয়তের চাবিকাঠি। সকল আলেম, ফাজিল, সুলাহা, মুত্তাকী (আল্লাহর ভয়ে ভীত তথা পরহেযগার ব্যক্তি), আউলিয়া, কুতুব, আওতাদ এবং যাঁরা আল্লাহর পথে ছিলেন ও নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভালোবেসেছিলেন, তাঁরা সকলেই শরিয়তের এ মহান ইমামগণের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। মুহাদ্দীস-উলামা, তফসীর-বিশেষজ্ঞ ও ফিক্বাহের মহান মুজতাহিদ ইমামগণের লেখনীসমূহের সামগ্রিক সংকলনেই গঠিত হয়েছে 'শরিয়ত আল্ মুহাম্মদীয়্যা'। ইসলামের এ সকল মহান উলামার অনুসারী হওয়া আমাদের মতো অজ্ঞ এবং অ-নেয়ামতপ্রাপ্ত লোকদের জন্যে ওয়াজিব। এই মহান ইমামগণ যে পথ দেখিয়েছেন, সেটাই হলো মুক্তির একমাত্র

[১]. বুখারী : আস সহীহ, বাবুল ইলমি ক্বাবলাল ক্বাওলি ওয়াল আমলি, ১/১১৯।

পথ। যারা এ পথ অনুসরণ করবে একমাত্র তারাই মুক্তি অর্জন করবে। আর যে লোকেরা নিজেদের নফসের অনুগামী হয়ে নিজেদের উপলব্ধি অনুযায়ী কুরআন হতে অর্থ বের করবে এবং নিজেদের কু-মতলবযুক্ত অর্থসমূহ হাদীসসমূহের প্রতি আরোপ করবে, তাদেরকে যারা অনুসরণ করবে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। সূরা আনআমের ৯০ আয়াত ইরশাদ করে: أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ 'আল্লাহ তাদেরকে সঠিক পথের দিকে হেদায়াত করেছেন, তাই তাদের পথপ্রদর্শন অনুসরণ করো'।[১] যাঁরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছেন তাঁরা লা-মযহাবী ছিলেন না, বরং মযহাবের মহান ইমাম ছিলেন।

"প্রশ্ন: 'আমি এখন বিশ্বাস করি যে উলুল আমর যাঁদেরকে মান্য করতে আমরা আদিষ্ট হয়েছি, তাঁরা সবাই মুজতাহিদ ইমাম এবং আহল্ আয্ যিকরও তাঁরাই এবং তাঁদেরকে অনুসরণ করা ওয়াজিব। তাঁদের একজনকে নাকি সকলকেই কোনো ব্যক্তির অনুসরণ করা উচিৎ তা একটু ব্যাখ্যা করবেন কি? চারজনের যে কারও মযহাব অনুযায়ী একটি কাজ করা কি যথেষ্ট নয়?'

"উত্তর: যেহেতু বহু বিষয়ে চার ইমামের ইজতেহাদসমূহ পরস্পরবিরোধী, সেহেতু একই সময়ে দুই, তিন কিংবা চার ইমামকে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। যে বিষয়টি একজন ইমাম ওয়াজিব মনে করেছেন, অপর একজন হয়তো তা হারাম মনে করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ইমামুল আযমের মতে চামড়াতে রক্তক্ষরণ ওযু ভেঙ্গে দেয়, আর ইমাম শাফেয়ীর মতে ভাঙ্গে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন যে যদি কোনো পুরুষের চামড়া কোনো মহিলার চামড়াকে স্পর্শ করে, তবে উভয়েরই ওযু ভেঙ্গে যাবে; কিন্তু ইমাম আল আযমের মতে তা ভাঙ্গবে না। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মধ্যেও অনুরূপ বহু মতানৈক্য রয়েছে। ধরা যাক, যদি কেউ ওই ধরনের বিতর্কিত বিষয়ে ইমামে আযমকে অনুসরণ করে, তাহলে অপর কোনো ইমামকে অনুসরণ করতে সক্ষম হবে না। যদি সে অন্য কোনো ইমামের অনুগামী হয়, তবে সে ইমামুল আযমকে অনুসরণ করতে পারছেনা। ওই ধরণের বিষয়ে চারজন ইমামকে একযোগে অনুসরণ করা অসম্ভব। তাছাড়া, আরও বহু বিষয় আছে যেগুলোতে একই সময়ে তিনজন কিংবা দইুজন ইমামকে অনুসরণ করাও সম্ভব নয়; একজন ইমামকে অনুসরণ করেই শুধুমাত্র ওই সব বিষয় সমাধা করা উচিৎ।

[১]. আল কুর'আন : সূরা আল আন'আম, ৬/৯০।

“প্রশ্ন: ’যদি আমরা কিছু আমল একজন ইমামের অনুসরণে পালন করি, কিছু আমল দ্বিতীয় এবং কিছু আমল তৃতীয় এবং আরও কিছু আমল চতুর্থ ইমামের অনুসরণে পালন করি, তবে তো আমরা চার ইমামের সবারই অনুগামী হলাম। এই ধরণের আচরণের ব্যাপারে আপনার মতামত কী ?’

“উত্তর: এই ধরণের আচরণ ইসলামের সঙ্গে তামাশা করারই নামান্তর, যা একেবারেই নিষিদ্ধ (হারাম)। সহিহ মূসলিম শরীফে লিপিবদ্ধ একটি হাদিস ঘোষণা করে: مَثَلُ الْمُنَافِقِ، كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً‘একজন মুনাফেক্ব হচ্ছে দুইটি মদ্দা ভেড়ার মধ্যে একটি মাদী ভেড়ার মতো। সে এক ভেড়া থেকে অপর ভেড়ার দিকে বারবার ঘুরাফেরা করে।[১] সহিহ বুখারী শরীফে লিপিবদ্ধ অপর এক হাদিস ঘোষণা করে: إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ’বদমায়েশ মানুষেরা হচ্ছে তারা যারা দু’মুখো। তারা একটি মুখ কিছু লোককে প্রদর্শন করে এবং অপর মুখটি অন্যদেরকে দেখায়’।[২] এ সকল লোকদের সম্পর্কে উদ্ধৃতি দেয়া আছে সূরা তাওবার ৩৮ আয়াতে, যেটা ঘোষণা করে: ’নাসি (একটি পবিত্র মাস উদযাপনকে স্থগিতকরণ) মাত্রাতিরিক্ত কুফরের জন্ম দেয় যার ফলে কাফেররা বিচ্যুত হয়। তারা কোনো এক বছরে এক মাস অনুমতি দেয়, অন্য বছরে নিষেধ করে’ (আয়াত)।

“ইবনে হুমামের ‘তাহরির উল-উসুল’, ইবনুল হাজিবের ’মুখতাসার আল উসুল’ এবং ‘দুররোল মুখতার’ কিতাবে লেখা আছে যে একটি কাজ কোনো মযহাব

---

[১]. মুসলিম : আস সহীহ, কিতাবু সিফাতিল মুনাফিকীন, ৪/২১৪৬ হাদীস নং ২৭৮৪।
ক. আহ্মদ : আল মুস্নাদ, ৯/৯৯ হাদীস নং ৫০৭৯।
খ. বাগাবী : শরহুস সুন্নাহ, বাবুল গুলূল, ১১/১১৭ হাদীস নং ২৭২৯।
[২]. বুখারী : আস সহীহ, বাবু ইকরাহু মিন ছানায়িস সুলত্বান, ৯/৭১ হাদীস নং ৭১৭৯।
ক. মুসলিম : আস সহীহ, বাবু যম্মি যিল ওজহাঈন, ৪/২১১।
খ. ইব্ন হিব্বান : আস সহীহ,যিকরুয যুজরি, ১৩/৬৬ হাদীস নং ৫৭৫৪।
গ. আবূ দাউদ : আস সুনান, বাবু ফি যিল ওজহাঈন, ৪ /২৬৮ হাদীস নং ৪৮৭২।
ঘ. মালেক : মুয়াত্ত্বা , বাবু মা জা‘আ ফি ইদ্বায়াতিল মাল, ২;৯১১ হাদীস নং ২১।
ঙ. আহ্মদ : আল মুস্নাদ, মুসনাদু আবী হুরায়রা, ২/৩০৭ হাদীস নং ৮০৫৫।
চ. ত্ববরানী : আল মু‘জামুল আওসাত্ব, মিন ইসমিহি; আহ্মদ, ৫/২০৩ হাদীস নং ৫০৮৫।
ছ. বায়হাক্বী : শু‘য়াবুল ঈমান, ১০/ ৪১৬ হাদীস নং ২১১৫৪।
জ. বাগাবী : শরুহস সুন্নাহ, বাবু ওয়াঈদিন যিল ওজহাঈন, ১৩/১৪৫ হাদীস নং ৩৫৬৬।
ঝ. ইব্ন আসাকীর : আল মু‘জাম, মুহাম্মদ ইব্ন আম্র ইবন মুহাম্মদ, ২/১০০৮ হাদীস নং ১২৯৫।

অনুসারে সমাধা করে সেই মযহাবের তক্বলিদ বন্ধ করে দেয়া সর্বসম্মত ঘোষণানুযায়ী নিষিদ্ধ। 'বাহর উর-রাইক্ব' গ্রন্থটি বলে: 'যে ব্যক্তি ইমামুল আযমকে অনুসরণ করে, তার জন্যে হানাফী মযহাবের অনুগামী হওয়া ওয়াজিব। অন্য মযহাব অনুযায়ী আমল করার অনুমতি তার নেই। মহান আলেম কাসিমের কথানুসারে এটা সর্বসম্মত মত যে, কোনো ব্যক্তি যে মযহাবের অনুগামী, সেই মযহাব পরিত্যাগ করার অনুমতি তার নেই।' 'মুসাল্লাম উস্ সুবুত' পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে: 'যে ব্যক্তি মুতলাক্ব (স্বয়ংসম্পূর্ণ) মুজতাহিদ নয়, সে যদি একজন আলেমও হয়, তবুও তাকে একজন মতলাক মুজতাহিদের (ইমামুল মযহাবের) অনুগামী হতে হবে।'

"ইমাম আবদুল ওয়াহহাব শারানী তাঁর 'আল মিযানুল কুবরা' গ্রন্থের ২৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'যে আলেম আইনুল উলা অর্জন করে নি, তার জন্যে চার মযহাবের যে কোনো একটির অনুগামী হওয়া ওয়াজিব। যদি সে তা না করে, তবে সে নিজে সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হবে এবং অন্যদেরকেও বিচ্যুত করবে।'

"ইবনে আবেদীন তাঁর 'রাদ্দুল মুখতার'পুস্তকের ২৮৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: 'আমী (সাধারণ লোক) তার নিজের মযহাব পরিবর্তন করার ব্যাপারে অনুমতিপ্রাপ্ত নয়। তাকে (চার মযহাবের মধ্যে) পছন্দনীয় কোনো একটি মযহাবের পায়রবী/আনুগত্য করতে হবে।' আমী হচ্ছেন একজন মুসলিম যিনি মুজতাহিদ নন (অর্থাৎ, তিনি একজন মুক্বাল্লিদ)।

"শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলাভী নিজ 'আল ইক্বদ আল জাইয়েদ' পুস্তকে লিখেছেন: 'যে ব্যক্তি কোনো ধর্মীয় পদে অধিষ্ঠিত আছে, অথচ যে নাকি ইজতেহাদের পর্যায়ে উপনীত হয় নি, তার পক্ষে একটি হাদীস হতে সে যা বোঝে সেই অনুযায়ী আমল করা অনুমতিপ্রাপ্ত নয় যেহেতু সে মানসুখ, মু'আওয়াল কিংবা মুহকাম হাদীসকে পৃথকভবে চেনতে অক্ষম।' ইবনে হাজিবের 'মুখতাসার' কিতাবেও একই কথা লেখা আছে। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর 'ফুইউদ-উল-হারামাইন' গ্রন্থে আবারও লিখেছেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে জ্ঞাত করেন যে হানাফী মযহাবই সবচেয়ে মূল্যবান। সহিহ বুখারীতে বিবৃত নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের সঙ্গে সবচেয়ে ভাল খাপ খায় এই মযহাবটি।'

"হযরত দাতা গনজে বখশ-এ-লাহোরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'আল কাশফুল মাহজুব' কিতাবে লিখেছেন যে ইয়াহইয়া মু'য়ায আ´রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বপ্নে হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখে তাঁকে

জিজ্ঞাসা করেন, 'এয়া রাসূলাল্লাহ আপনাকে কোথায় পাবো?' রাসূলে-এ-করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আবু হানিফার মযহাবে'

"ইবনে হুমানের 'তাহরির' পুস্তকটি লিখে: 'এটা সর্বসম্মত যে একজন ব্যক্তি যে মযহাব অনুসরণ করে অথবা যে মযহাব অনুযায়ী সে আমল করা শুরু করেছে, সেই মযহাব পরিত্যাগের অনুমতি তার নেই।'

"মাওলানা আবদুস সালাম তাঁর কৃত 'শরহে জাওহারা' গ্রন্থে লিখেন, 'যে ব্যক্তি ইজতেহাদ দ্বারা বের করা কোনো এবাদতে এবং আমলে চার মযহাবের যে কোনো একটির তাক্বলিদ (অনুসরন) করে, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আদেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণতা রক্ষা করেই তা পালন করে থাকে।'

"ইমামে রব্বানী আহমদ আল্ ফারুকী আস্ সিরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর প্রণীত 'মাবদা'ওয়া মা'আদ' কিতাবে ইরশাদ করেন: 'আল্লাহ তা'আলা এই ফকিরকে জ্ঞাত করেছেন যে হানাফী মযহাব অনুযায়ী জামাআত কর্তৃক ইমামের পেছনে ক্বেরআত না পড়াই সঠিক।'

"শাহ আবদুল আযীয দেহেলভী 'আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না'-আয়াতটি ব্যাখ্যাকালে ঘোষণা করেন, 'মানুষের উচিৎ ছয় ধরনের ব্যক্তিকে মান্য করা: এলম-এ-শরিয়তের মুজতাহিদগণ, মাশায়েখ আল তুরুক্ব আল্ আলীয়্যা।'

"হযরত ইমাম আল গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'কিমইয়া আস্ সায়াদা' গ্রন্থে 'আল আমর বিল মারূফ' সম্পর্কে আলোচনাকালে ইরশাদ ফরমান, 'কোনো আলেমই কাউকে তার মান্যকৃত মযহাবের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ কোনো কাজ করবার অনুমতি দেননি।'

"শাহ আবদুল হক্ব দেহেলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর কৃত 'সফর আস্ সায়াদা' গ্রন্থে ইরশাদ ফরমান, 'দ্বীন ইসলামের ইমারতটি এই চার স্তম্ভের (চার মযহাব) ওপর প্রতিষ্ঠিত। যে ব্যক্তি এ সব পথের (মযহাবের) একটিকে অনুসরণ করেছে এবং এসব দরজার একটিকে খুলেছে, সে যদি অন্য পথে সরে যেতে চায় এবং অন্য আরেকটি দরজা খুলবার আশা করে (অর্থাৎ, মযহাব পরিবর্তন), তাহলে সে একটি অবাস্তব খেলায় নিজেকে জড়াতে উপক্রম হবে। সে তার বিষয়সমূহের সামঞ্জ্যতা উলট-পালট করে দেবে এবং সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হবে।' একই কিতাবে আরো লেখা আছে: 'চার মযহাবের যে কোনো একটার অনুসরণ করাটা উলামাগণের একটা ইজমা বিশেষ এবং এটা শেষ জমানার (বর্তমানকালের) মুসলিমদের (নাজাতের) জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পথ। এর ফলেই দ্বীনী ও দুনিয়াবী রীতি-

নীতি বজায় রাখা যায়। প্রত্যেকেই তার পছন্দনুযায়ী মযহাবের অনুসরণ করে; একটি মযহাবকে কিছুকাল অনুসরণ করে কোনো ব্যক্তি যদি মযহাব পরিবর্তন করে, তবে এই কাজের দরুণ প্রতিভাত হবে যে সে তার পূর্ববর্তী মযহাবের ওপর আস্থা রাখতো না, এবং এটা আমলসমূহ ও কথাকে বরবাদ এবং অসঙ্গতিপূর্ণ করে দেয়। পরবর্তীকালের ইসলামী উলামা এর ওপর একমত হয়েছেন। এটাই সত্য। ফায়দা এর মধ্যেই নিহিত।' (সফর আস্ সায়াদা)

"ইমাম আল কুহিস্তানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'শরহে মুখতাসার আল উইক্বায়া' গ্রন্থে লিখেছেন (কিতাবুল আশরিবা-এর পূর্বে) 'মু'তাযিলাদের মতো যারা বিশ্বাস করেছে যে হাক্ক (বাস্তব) বিভিন্ন রকম হতে পারে (অর্থাৎ, বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী ইজতেহাদ আল্লাহর দৃষ্টিতে মক্বুল), তারা বলেছে যে সর্বসাধারণ তার পছন্দ অনুযায়ী মযহাবসমূহের তালফিক্ব (সংমিশ্রণ) করতে পারে (অনুমতি প্রাপ্ত)। আহল্ আস্ সুন্নাতের উলামা বলেছেন যে সত্য কখনো বিভিন্ন রকম হতে পারে না এবং তাই আমীকে শুধু একজন ইমামের অনুগামী হতে হবে। এ বিষয়টির বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে আল কাশফ পুস্তকে। যে ব্যক্তি সবগুলো মযহাবের অনুমতিপ্রাপ্ত সকল বিষয়গুলো পালন করে, সে একজন ফাসিক (পাপিষ্ঠ); এটা খোলাসাভাবে বয়ান করা হয়েছে সাইদ ইবনে মাসউদ-এর শরহে তাহাবী গ্রন্থে' (ইমাম কুহিস্তানী)।

"প্রশ্ন: 'একজন মুসলিম যিনি বিশ্বাস করেন যে মযহাবসমূহের তালফিক্ব করাটা ইসলামের সঙ্গে ঠাট্টা করার মতোই ব্যাপার এবং মযহাব পরিবর্তনের কোনো অনুমতি নেই, তাঁর কি এ কথা বলা উচিৎ হবে যে তিনিই সঠিক মহযাবের অনুসারী?'

"উত্তর: প্রত্যেক মযহাবের অনুসারীদের জন্যে এই ধরণের কথা বলার সপক্ষে প্রামাণ্য দলিল আছে। আমরা নিম্নোক্ত প্রমাণসমূহ পেশ করে দেখাবো যে আমাদের হানাফী মযহাব অনুসরণ করাই সর্বোত্তম

"চার আয়েম্মা আল মাযাহীবদের মধ্যে হযরত ইমামুল আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-ই সাহাবাগণের যুগের নিকটবর্তী সময়ের এবং তিনিই সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ফিক্বাহবিদ ও অধিক তাকওয়াসম্পন্ন ছিলেন। শাফেয়ী হওয়া সত্ত্বেও ইমাম শারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সম্পর্কে সত্যটি লিখেছেন: 'কারও উচিৎ নয় তাঁর কুৎসা রটনা করা, কারণ চারজন ইমামের মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তিনিই সর্বপ্রথম মযহাবের স্থপতি; তাঁর দলিলসমূহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দলিলগুলোর সর্বাপেক্ষা অনুরূপ এবং তিনিই

সাহাবা-এ-কেরাম ও তাবেয়ীনগণের জীবনধারণ পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি দেখেছিলেন। তাঁর প্রত্যেক কথাই কোরআন-হাদীসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি নিজের মতামত অনুযায়ী কোনো কথাই বলেন নি।' এই মহান ইমাম ও তাঁর অনুগামীদের প্রতি কিছু আলেম কর্তৃক 'আসহাব-ই-রায়' (মতামত প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গ) নামক সংজ্ঞা আরোপ সত্যি অযৌক্তিক; অথচ এই মহান ইমামকে মহান আলেম আবদুল ওয়াহহাব আশ্ শারানী খেতাব দিয়েছেন 'রাব্বানী আলেম' এবং লিখেছেন যে ইমামুল আযম নিজের অভিমত হতে কোনো কথাই বলেন নি। আল্লাহতা'আলা ওই ফিক্বাহবিদদেরকে ক্ষমা করে দিন যারা না জেনে এ ধরণের উক্তি করেছেন।

"শাফেয়ী মযহাবের স্বনামধন্য আলেম ইমাম ইবনে হাজর আল মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমামুল আযম সম্পর্কে একটি বিশেষ কিতাব রচনা করেন, যার নাম 'আল খাইরাতুল হিসান ফী মানাক্বিবিন নুমান'। এই বইটি দ্বীনী ব্যক্তিদের কাছে অত্যন্ত সুখ্যাত।

"হানাফী আলেম সাইয়েদ ইবনে আবেদীন শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর বিখ্যাত 'রাদ্দুল মুখতার'গ্রন্থে লিখেছেন: '

وَحَسْبُكَ مِنْ مَنَاقِبِهِ اشْتِهَارُ مَذْهَبِهِ مَا قَالَ قَوْلًا إِلَّا أَخَذَ بِهِ إِمَامٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْأَعْلَامِ.

–ইমামুল আযমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতীয়মানকারী সবচেয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে এই যে, তাঁর মযহাবই সবচেয়ে বেশি প্রসার লাভ করেছে।[১]

অন্যান্য মযহাবের ইমামগণ তাঁর প্রত্যেকটি কথাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মযহাবের আলেমগণ পরবর্তীকালে প্রত্যেক জায়গায় তাঁরই কথার ওপর ভিত্তি করে ফতোওয়া জারি করেছেন। অধিকাংশ আউলিয়া তাঁর মযহাব অনুযায়ী আমল করে পূর্ণতা অর্জন করেছেন। আনাতোলিয়া, বলকান উপদ্বীপ, হিন্দুস্থান (এবং বাংলাদেশ) সিন্দু (পাকিস্তান) ও ট্রান্স অক্সিনিয়ার মুসলিমগণ শুধু তাঁর মযহাবকেই চেনেন। যদিও আব্বাসীয় বংশ তাঁদের পূর্বপুরুষের {হযরত আব্বাস- রাহমাতুল্লাহি আলাইহি} মযহাবের অনুসরণ করেছিলেন, তবুও তাঁদের সময়কার অধিকাংশ কাযী, বিচারক ও উলামা হানাফী ছিলেন। তাঁরা এই মযহাব

১. ইব্ন আবেদীন শামী : আদ্দুররুল মুখতার, মুকাদ্দামা ১/৫৬।

অনুযায়ী পাঁচ'শ বছর ধরে ইসলামী জিন্দেগী ধারণ করেন। তাঁদের পরে সেলযুক্বী এবং আরও পরে হারাযমী শাসকবর্গ হানাফী মযহাবের অনুসরণ করেন।'

"মহান আলেম মুহাম্মদ তাহির আস্ সিদ্দিক আল্ হানাফী তাঁর 'মজমাউল বিহার ফি গ্বারাইব-ইত-তানযিল ওয়া লাতাইফ-ইল-আখবার' গ্রন্থে লিখেন, 'আল্লাহ তা'আলা যে ইমামুল আযমের প্রতি সন্তুষ্ট তার প্রমাণ হচ্ছে এই যে, তিনি ইমাম সাহেবের মযহাবকে সর্বত্র প্রসার লাভের কাজটি সহজ করে দিয়েছেন। যদি এই প্রসার লাভে কোনো খোদায়ী ইচ্ছা না থাকতো, তাহলে অধিকাংশ মুসলিম তাঁর মযহাব অনুসরণ করতেন না।'[১]

"হযরত ইমাম-এ-রব্বনী আহমদ আল্ ফারুকী আস্ সিরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর পারসিক 'মকতুবাত' গ্রন্থের ২য় খন্ডের ৫৫ নং চিঠিতে লিখেছেন, 'ইমামুল আযম আবু হানিফা (-এর অবস্থা) হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর মতো। যেহেতু ওয়ারা ও তাকওয়া-এর নেয়ামত তাঁর প্রতি মন্‌ঞ্জুর করা হয়েছিল এবং যেহেতু তিনি সুন্নাতুস্ সানিয়্যা অনুসারে জীবন যাপন করেছিলেন, সেহেতু তিনি নসসমূহ হতে ইজতেহাদের মাধ্যমে আইন-কানুন বের করাতে একটি অত্যন্ত উচ্চ পর্যায় (মাকাম) অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিছু উলামা তাঁর এই যোগ্যতা বুঝতে পারেন নি এবং যেহেতু ইজতেহাদের মাধ্যমে তাঁর উপলুব্ধ আইনগুলো খুবই সূক্ষ্ম ছিল, সেহেতু তারা মনে করেছিলেন যে তিনি কুরআন ও হাদীস অমান্য করেছিলেন, আর তাই তারা তাঁকে অভিমতসম্পন্ন ব্যক্তি (আসহাব-ই-রায়) আখ্যায়িত করেছিলেন। তিনি যা উপলব্ধি করেছিলেন তারা তা বুঝতে পারেন নি। ফলে তারা ভুল বুঝেছিলেন। অথচ ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর উপলুব্ধ কিছু জ্ঞান উপলব্ধি করতে পেরে বলেছেন যে ফিক্বাহর সকল উলামা-ই ফিক্বাহ শাস্ত্রে ইমামুল আযমের শিষ্য। ফুসুল-এ-সিত্তা গ্রন্থে বোখারার মহান আলেম-এ-হাক্কানী মুহাম্মদ পারিসা লিখেন যে হযরত ঈসা (আঃ) যখন অবতরণ করবেন, তখন তিনি ইমামুল আযমের মযহাব অনুযায়ী আমল করবেন এবং অন্যদেরকে তা করতে আদেশ দেবেন। হয়তো এই মন্তব্যটি সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম এবং হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর সাযুজ্যের দিকে ইঙ্গিত করে।'[২]

"এই উম্মতের অধিকাংশ উলামা ও সুলাহা (পুণ্যবান মুসলমান) হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। লা-মযহাবীরা তাদের বহু কিতাবে, উদাহরণস্বরূপ, 'আল জারহু

---

১. মজমাউল বিহার ফি গ্বারাইব-ইত-তানযিল ওয়া লাতাইফ-ইল-আখবার।
২. ফুসূলে সিত্তা।

আ'লা আবু হানিফা'-তে এই ধরনের জ্ঞানী একজন আলেমের কুৎসা রটনা করেছে এবং তাঁর মাযহাবের অনুসারীদেরকে কাফের আখ্যায়িত করেছে। এমন কি উপরোক্ত বইটি আরও লিখেছে, 'যে ব্যক্তি ফিক্বাহ কিতাবাদি পাঠ করবে, সে কাফের হয়ে যাবে।' এই মহান ও রহমতপ্রাপ্ত ইমামকে এ সকল হতভাগা এভাবে কেন আক্রমণ করেছে আমি তাই ভাবছি তারা বুঝতে পারে না যে তাঁর প্রতি বৈরিতা এই নেয়ামতপূর্ণ উম্মতের প্রতি বৈরিতারই নামান্তর। আমরা 'আল উসুল আল আরবায়া'-এর চতুর্থ খন্ডের আরম্ভ থেকে এ পর্যন্ত যা লিখেছি, তা মাওলানা মাহবুব আহমদ নকশবন্দী অমৃতসরী সাহেবের প্রনীত 'আল্ কিতাবুল মাজীদ ফী উজুব-ইত-তাক্বলিদ' গ্রন্থ হতে নেয়া হয়েছে।

"আল্ মুসনাদ আল্ কাবীর আল্ ইমাম আবু হানিফা' গ্রন্থটি দশ খন্ডে সংগ্রহ করেন আবুল মু'আই-ইয়্যাদ মুহাম্মদ ইবনে মাহমুদ আল হারাযমী (ওফাত ৬৬৫ হি:)। প্রথম খন্ডে ইমামুল আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর প্রশংসাসূচক আখবার (হাদীস-সমূহ) এবং আসার (সাহাবাগণের বাণী) সমূহ উদ্ধৃত হয়েছে। প্রথম খন্ডে তিনি একটা হাদীস বর্ণনা করেন, যেটা হারাযম-এ তিনি সাদর আল্ কবীর শারাফ আদ্ দ্বীন আহমদ ইবনে মুআই-ইয়্যাদ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রেওয়ায়াতকৃত এই হাদীসটি ইরশাদ ফরমায়: 'আমার উম্মাতের মধ্যে এমন একজন ব্যক্তি আগমন করবেন যার নাম হবে আবু হানিফা। পুনরুত্থান দিবসে তিনি আমার ক্বওমের (জাতির) জন্যে আলোস্বরূপ।' একই রওয়ায়াতকারী বর্ণিত অপর একটি হাদীস ঘোষণা করে: 'আমার উম্মাতের মধ্যে একজন ব্যক্তি আসবেন। তাঁর নাম হবে নুমান এবং তাকে ডাকা হবে আবু হানিফা নামে। তিনি আমার উম্মতের জন্যে আলোস্বরূপ।' আবারও একই বর্ণনাকারীদের সনদে (মাধ্যমে) হযরত আনাস বিন মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর রওয়ায়াতকৃত একটি হাদীস ইরশাদ করে: 'আমার পরে একজন ব্যক্তি আসবেন যার নাম হবে নু'মান বিন সাবিত এবং যাকে ডাকা হবে আবু হানিফা নামে। আল্লাহ্ তাঁর দ্বীনকে এবং আমার সুন্নাতকে তাঁর হাতের মাধ্যমে সুদৃঢ় করবেন' (হাদীস)। পুনরায় একই রওয়ায়াতকারীগণের মাধ্যমে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর কথা উদ্ধৃত হয়েছে, যিনি বলেন: 'আমি তোমাদেরকে একজন ব্যক্তি সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছি যার নাম হবে আবু হানিফা এবং তিনি কুফাতে বসবাস করবেন। তাঁর ক্বলব জ্ঞান ও হিকমতে পরিপূর্ণ থাকবে। পৃথিবীর শেষ জমানায় বানানীয়্যা নামের সম্প্রদায়টি আবু হানিফার প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।' লা-মাযহাবীরা এই সব হাদীসের বিরোধিতা করে এই কথা বলে যে, হাদীসগুলোর রাবী (বর্ণনাকারীদের) কয়েকজনের কর্তৃত্ব

অজ্ঞাত। আমরা উত্তরে বলি, উত্তরসূরীদের না জানার দরুণ পূর্বসূরীরা ত্রুটিপূর্ণ, এ কথা প্রমাণিত হয় না। লা-মাযহাবীরা হয়তো বলতে পারে যে এসব হাদীস কুতুব আস্ সিত্তা তথা ছয়টি হাদীস গ্রন্থে নেই; কিন্তু হাদীসের সংখ্যা তো ওই ছয়টি হাদীস গ্রন্থেই সীমাবদ্ধ নয়। (উলামা কর্তৃক) সর্বসম্মতভাবে জানানো হয়েছে যে অন্যান্য হাদীস বইয়েও বহু সহিহ হাদীস আছে। আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত এবং তিরমিযী শরীফে লিপিবদ্ধ একটি হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

لَوْ كَانَ الدِّينُ عِنْدَ الثُّرَيَّا، لَذَهَبَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ فَارِسَ – أَوْ قَالَ – مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ حَتَّى يَتَنَاوَلَهُ.

–আমি আল্লাহর কসম করে বলছি যে, যদি ঈমান (ধর্ম) শুক্র গ্রহে গমন করে, তাহলে ফারিস (পারসিক) বংশোদ্ভূত এক ব্যক্তি তা ফিরিয়ে আনবেন'।[১] এ হাদীসটি ইমামুল আযমের দিকে ইশারা করে।[২]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে গ্রহণ করে হাকিম একটা হাদীস বর্ণনা করেন,

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كَانَ الْكِتَابُ الأَوَّلُ يُنَزَّلُ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ عَلَىٰ حَرْفٍ وَاحِدٍ، فَنُزِّلَ الْقُرْآنَ مِنْ سَبْعَةِ أَبْوَابٍ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ: زُجَرْ، وَأُمَر، وَحَلَال، وَحَرَام، وَمُحْكَمْ، وَمُتَشَابِه، وَأَمْثَال. فَأَحَلُّوْا حَلاَلَهُ، وَحَرَّمُوْا حَرَامَهُ، وَافْعَلُوْا مَا أَمَرْتُمْ بِهٖ، وَانْتَهُوْا عَمَّا نَهَيْتُمْ عَنْهُ، وَاَعْتَبِرُوا بِأَمْثَالِهِ وَاعْمَلُوْا بِمُحَكَمِهِ وَآمِنُوْا بُمُتَشَابِهِهِ، وَقُوْلُوْا آمِنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا –

যেটা 'দুররুল মনসুর' কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং যেটা ঘোষণা করে, "(কুরআনের) পূর্বে নাযিলকৃত সব কিতাবগুলোর প্রত্যেকটাই এক ধরণের হরফ্ বা শব্দের দ্বারা গঠিত ছিল, যা শুধুমাত্র একটা বিষয়েরই খবর দিতো। কুরআন নাযিল হয়েছে সাতটি হরফে, যেগুলো সাতটি বিষয়ের বর্ণনা দেয়; যথা যাজর

---

[১]. মুসলিম / আস সহীহ, কিতাবু ফাযায়িলিস সাহাবা, বাবু ফদ্বলি ফারিস ৪/১৯৭২, হাদিস / ২৫৪৬।
[২]. খাজা হাসান জান ফারুকী সেরহিন্দী/ আল উসুল আল আরবায়া ফী তারদিদিল ওয়াহাবীয়্যা, ৪র্থ খন্ড।

(সংযম), আমর (আদেশ), হালাল, হারাম, মুহকাম (সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত), মুতাশাবেহ (অন্তর্নিহিত অর্থসম্বলিত) এবং মিসাল (উপমা ও ঐতিহাসিক খবর)।

এগুলোর মধ্যে হালালকে হালাল জানো এবং হারামকে হারাম। যা আদিষ্ট হয়েছে তা পালন করো। যা নিষিদ্ধ হয়েছে তা থেকে দূর সরে থাকো। মিসালগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। মুহ্কামকে মান্য করো মুতাশাবেহ-তে বিশ্বাস রাখো বলো: আমরা ওগুলোর সবটাতেই বিশ্বাসী। আমাদের আল্লাহ ওগুলোর সবই প্রকাশ করেছেন'।[১] আমাদের আয়েম্মা-এ-মযাহীব ওগুলোর সবই সাহাবা-এ-কেরামের কাছ থেকে শিক্ষা করে তা আমাদের কাছে হস্তান্তর করেছেন; ফলে আমরা সেই অনুযায়ী ইসলামী জিন্দেগী যাপন করে থাকি। [মযহাববিষয়ক আরও বিস্তারিত তথ্য আছে লেখকের বইটিতে যা অনলাইন]

٣٣٠المُوْجِبُ لِلْخُلُوْدِ فِيْ النَّارِ كَدَعْوَةِ غَيْرِ اللهِ وَالِاسْتِغَاثَةُ بِهِ، وَالرُّغْبَةُ إِلَيْهِ، وَإِنْزَالُ حَوَائِجِهِ بِهِ; كَمَا هُوَ حَالُ الأَكْثَرِ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ فِيْ هَذِهِ الأَزْمَانِ وَمَا قَبْلِهَا: مِنْ تَعْظِيْمِ القُبُوْرِ، وَاتِّخَاذِهَا أَوْثَانًا، وَالبِنَاءُ عَلَيْهَا، وَاتِّخَاذُهَا مَسَاجِدَ، وَبِنَاءُ المَشَاهِدِ بِاِسْمِ المَيِّتِ لِعِبَادَةِ مَنْ بَنِيَتْ بِاِسْمِهِ وَتَعْظِيْمِهِ، وَالإِقْبَالُ عَلَيْهِ بِالقُلُوْبِ وَالأَقْوَالِ وَالأَعْمَالِ. وَقَدْ عَظُمَتْ البَلْوىُ بِهَذَا الشِّرْكِ الأَكْبَرِ الَّذِيْ لاَ يَغْفِرُهُ اللهُ فَأَقْسَمَ بِالله ثَلَاثُ مَرَاتٍ بِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْهَا وَلَمْ يَرَهَا فَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ شَيّء. فَاسْتَحْلِفُهُ بِأَحْمَد البَدَوِيُّ فَمَا كَادَ يلَفِّظُ الِاسْمَ حَتَّى سَبَقَتْ السَّمَكَةُ مِنْ بَطَنِهِ وَلَفَظَها. وَذَلِكَ مِنْهُمْ اِعْتَقَادُ أَنَّ البَدَوِيُّ أَغَيْرُ وَأَعَزُّ وَأَقْدَرُ مِنَ اَللهِ.

ওহাবী পুস্তক 'ফাতহুল মাজীদ'-এর ৪১৪ পৃষ্ঠায় লেখা আছে: "আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারও কাছে প্রার্থনা করা, বিপদ মুক্তি কামনা করা অথবা অভাব মোচনের জন্যে ফরিয়াদ করা মহা-শির্ক; কবরকে মহান মনে করা

[১]. ফাতহুল মাজীদ : ১/৪০৬।

(অর্থাৎ,তা'যিম করা), সেগুলোর ওপর গুম্বজ নির্মাণ করা, মাযারে সালাত/নামায পড়া, কবরস্থদের উপাসনা করা অথবা তাঁদের কাছে মনে মনে কিংবা প্রকাশ্যে কিংবা এবাদতের মাধ্যমে কোনো কিছু চাওয়াও মহা-শির্ক। এসব কাজ কোনো ব্যক্তিকে চিরস্থায়ীভাবে দোযখী বানাবে। যারা আল্লাহর নামে কসম করে মিথ্যা বলতে ভয় পায়না, তারাই যখন আহমদ বাদাওয়ীর নামে কসম করে তখন আর মিথ্যা বলতে সাহস করে না। এতে প্রতিভাত হয় যে তারা তাঁকে আল্লাহর চেয়েও অনেক বড় এবং শক্তিশালী মনে করে থাকে।”[১]

ওহাবীটি সঠিক এবং ভ্রান্তের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে। সে দোষীর সঙ্গে নির্দোষকেও পুড়িয়ে মারতে চায়। আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোনো জীবিত কিংবা বেসালপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছ থেকে (হাকিকী অর্থে) কোনো কিছু আশা করা অথবা সত্য কিংবা মিথ্যা কথা বলার সময় অন্য কারও নামে কসম করা নিঃসন্দেহে কুফর ও শির্ক। কিন্তু মুসলিমদের দ্বারা মাযার যিয়ারত করা এবং কাবার দিকে মুখ করে আল্লাহর ওয়াস্তে নামায পড়ে সেখানকার বেসালপ্রাপ্ত বুযূর্গের রূহের ওপর সওয়াব বখশিয়ে দেয়া এবং আল্লাহর সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় তাঁদেরকে মধ্যস্থতাকারী বানানো এবং মাযার নির্মাণ করাকে শির্ক বলে দাবি করাটা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা বৈ আর কিছু নয়। আর এই কারণে মাযার ধ্বংস করার যুক্তিটি একেবারেই খোঁড়া যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমকে কাফের বলে সে-ই কাফেরে পরিণত হবে। ওহাবী পুস্তকটির উপরোক্ত কথাগুলো এ রকম শোনায়: “মসজিদসমূহে বহু চুরি হয়। আর কিছু লোক মসজিদে যায় ওয়াহাবী ও শিয়া-রাফেযী মতবাদ প্রচারের জন্যে। অপর কিছু লোক ইমামদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা এবং পরহেযগারীর প্রদর্শনী দিতে যায়। অতএব, মসজিদসমূহ ধ্বংস করা জরুরি”। কিন্তু আদতে মসজিদসমূহ তো ওই ধরনের খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে নির্মাণ করা হয় না, বরং নামায, ওয়ায, এতেকাফ, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি সওয়াবদায়ক কাজের জন্যে নির্মাণ করা হয়। ওই ধরনের বদ-কাজের অজুহাত দেখিয়ে মসজিদ ধ্বংস করার প্রচেষ্টা হতে বিরত থেকে ওই সব বদ-কাজ সংঘটনকারীদেরকে মসজিদে প্রবেশ করা হতে বাধা দেয়া উচিৎ। ওয়াহাবীদের এই ছুতাটি তাদের মনের কথা ব্যক্ত করে। তারা আসলে আউলিয়াকে পছন্দ করে না। ফলস্বরূপ, তারা ইসলামকেও পছন্দ করে না।

[১] . প্রাগুক্ত : ১/৪১৩-৪১৪।

এখন আমরা এ বিষয়ে আহল্ আস্ সুন্নাতের বিভিন্ন কিতাবের উদ্ধৃতি দেবো। মহান আলেম মওলানা আবদুল গণী নাবলুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন

“আল আদিল্লাতুশ্ শরিয়াত চারটি: কুরআন, সুন্নাত, ইজমা ও ক্বিয়াস। কেয়াস ও ইজমা কুরআন এবং সুন্নাত হতে নিঃসৃত হয়েছে। অতএব, দ্বীনী জ্ঞানের প্রধান উৎস হচ্ছে কুরআন এবং সুন্নাহ। অন্য কোনো জায়গা হতে কোনো ধারণা বা কাজ গৃহীত হলে তা নিঃসন্দেহে বিদয়াত (ধর্মে নতুন সংযোজন)। বিদয়াত বিশ্বাসেই হোক কিংবা আমলেই হোক, সব-ই গোমরাহী এবং সেটা মানুষকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, কিছু সুফী ও দরবেশ হিসেবে দাবিদার ব্যক্তি কোনো মুনকার (ইজমার জ্ঞানের পরিপন্থী) সংঘটন করে বলে, ‘আমরা আধ্যাত্মিক গোপন জ্ঞান জানি। এই কাজ আমাদের জন্যে হালাল। তোমরা বই পড়ে জানতে পারো, আর আমরা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সরাসরি কথা বলে সত্যটি জানতে পারি। যদি তাঁর কথায় আমরা আস্থা না রাখতে পারি, তবে আমরা আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করি এবং তাঁর কাছ থেকে সত্যটি জেনে নেই। আমাদের শায়খগণ আমাদেরকে আল্লাহর মা’রিফাত অর্জনে সহায়তা করেন। আমাদেরকে কোনো পুস্তক অথবা শিক্ষক হতে শেখার প্রয়োজন হয় না। আল্লাহর মা’রেফত জ্ঞান অর্জন করতে হলে বইপত্র পড়া কিংবা স্কুলে যাওয়া জরুরি নয়। যদি আমাদের পথ গোমরাহীপূর্ণ হতো, তাহলে আধ্যাত্মিক জ্যোতি, নবী কিংবা রূহগণ কেউই আমাদেরকে দেখা দিতেন না। যখন আমরা কোনো ভুল করি অথবা হারাম সংঘটন করি, তখন তা আমাদের জানানো হয় এবং স্বপ্নে সংশোধন করা হয়। শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বিবেচিত খারাপ জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের স্বপ্নে খারাপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় না। আমরা সেগুলো পালন করি, যেহেতু আমরা সেগুলোকে ভাল হিসেবেই জানি।’ যে সব লোকেরা এই ধরনের বাজে কথাবার্তা বলে, তারা আসলে শরিয়তের প্রতি বিদ্রূপ করে এবং কুরআন-হাদীসের প্রতি আস্থা রাখে না; তারা ইঙ্গিতে এ কথা বলতে চায় যে কুরআন ও হাদীসের মধ্যে ভ্রান্তি এবং অপর্যাপ্ত শিক্ষা রয়েছে। তারা প্রকৃতপক্ষে গোমরাহ-যিনদিক তাদের নিফাক্ব (কপটতা)-পূর্ণ কথাবার্তায় আমাদের বিশ্বাস করা উচিত নয়।

“আহলে সুন্নাতের উলামা কেরাম ঘোষণা করেছেন যে আহ্কাম (আদেশ-নিষেধ)-সমূহ ’ইলহাম’ তথা ঐশী প্রত্যাদেশের মাধ্যমে নির্ধারণ করা যায় না। আরেক কথায়, আল্লাহ তা’আলা কর্তৃক আউলিয়ার কলবে (অন্তরে) প্রকাশিত জ্ঞানসমূহ হালাল কিংবা হারাম নির্ধারণের দলিল হতে পারে না। তবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র ক্বলবে প্রকাশিত ’এলম’সমূহ প্রত্যেক মুসলমানের

জন্যে দলিলস্বরূপ এবং তা মান্য করা একান্ত অপরিহার্য। যদি কোনো ওলীর 'এলহাম' শরিয়তের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, তবে সেটা শুধু তাঁর জন্যেই দলিল হবে, অন্যান্য মুসলমানদের জন্যে নয়। কুরআন ও হাদীসের অর্থ বুঝতে এলহাম অত্যন্ত সহায়ক এবং এটা শরিয়ত মান্যকারী সালেহ (পুণ্যবান) ঈমানদারদের কাছেই প্রেরণাস্বরূপ আসে। যারা শরিয়ত মান্য করে না তাদের ক্বলবে শয়তানের ওয়াস্ওয়াসা দেখা দেয়। ক্বলবে যে জ্ঞান দেখা দেয়, তাকে বলা হয় এলম আল লাদুন্নী; এটা হয় আধ্যাত্মিক, নয়তো কুমন্ত্রণাদায়ক। এর আধ্যাত্মিক ধরনকে বলা হয় এলহাম, আর অপরটিকে ওয়াস্ওয়াসা। এলহাম কুরআন-হাদীসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে দৃশ্যমান হয়, কিন্তু ওয়াস্ওয়াসার ক্ষেত্রে তা হয় না। এলম আল লাদুন্নীর মতো স্বপ্নও হয় আধ্যাত্মিক, নয়তো কুমন্ত্রণাদায়ক। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়্যত পাওয়ার আগে ছয় মাস ধরে স্বপ্নানুযায়ী আমল করেছিলেন। মহান ওলী ও মুতাসাওয়ীফ হযরত জুনাইদ আল বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইরশাদ ফরমান, 'একমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথই মানুষদেরকে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা প্রাপ্তিতে পথপ্রদর্শন করে। অন্যান্য পথ ও ধর্মসমূহ হচ্ছে অন্ধকার অলি-গলি এবং সেগুলো মানুষকে নেয়ামতের দিকে নেয় না। যে ব্যক্তি কুরআনের আদেশসমূহ শিক্ষা করে না এবং হাদীস মান্য করে না, সে অজ্ঞ ও অচেতন। ওই ধরনের লোকদেরকে মান্য করা উচিৎ নয়। আমাদের জ্ঞান ও মযহাব হচ্ছে কুরআন এবং হাদীসের ওপর প্রতিষ্ঠিত।' হযরত মুহিউদ্দীন ইবনে আরবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ঘোষণা করেন, 'একজন ওলী যদি শরিয়ত মান্য করেন, তবে তাঁর উন্নতি হয় এবং তাঁর এলহামও বৃদ্ধি পায়। তবুও একজন ওলীর এলহাম কখনোই কুরআন ও হাদীসকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না।'

"হযরত জুনাইদ আল বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মুর্শিদ এবং মামা হযরত সিররী সাক্বাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইরশাদ করেছেন, 'তাসাউফের তিনটি অর্থ আছে। প্রথমটিতে, একজন সূফীর ক্বলবে বিরাজমান আল্লাহর মা'রিফাত তাঁর ওয়ারা-এর আলোকে নিভিয়ে দেবে না। তাঁর কলবে অবস্থিত মা'রেফতের আলো দ্বারা তিনি বস্তুসমূহের এবং তাদের ক্ষমতাসমূহের সারমর্ম ও সত্য সম্পর্কে বুঝতে পারেন এবং আল্লাহতা'আলার নাম ও সিফাতসমূহের তাজাল্লীগুলো অর্জন করতে পারেন। আর তাঁর দেহের মধ্যে অবস্থিত মারেফতের আলো দ্বারা তিনি শরীয়তের সূক্ষ্ম জ্ঞানসমূহ উপলব্ধি করেন। তাঁর কাজ-কর্ম সবসময়েই শরীয়তের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। দ্বিতীয় অর্থটিতে সূফীর ক্বলব কুরআন-হাদীসের বিরোধী কোনো জ্ঞান বহন করে না। বিরোধিতার অস্তিত্ব একমাত্র

যাহেরী ও বাতেনী এলমে (জ্ঞানে) জ্ঞানী উলামা-ই নির্ণয় করতে পারবেন, যাঁরা তাসাউফের ইমামগণের কথাবার্তা বুঝতে সক্ষম। তাসাউফের তৃতীয় অর্থটিতে সূফীর কারামত শরীয়তের জ্ঞানের পরিপন্থী হবে না, অথবা শরীয়তকে কলুষিত করবে না। শরীয়তের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ জিনিসগুলোকে কারামত বলা হয় না, বরং ইসতিদরাজ বলা হয়।' আউলিয়ার কথা ও কাজকর্ম শরীয়তের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা প্রত্যেক শিক্ষিত লোকই যে বুঝতে পারেন তা নয়; এর জন্যে দরকার শরীয়ত ও তাসাউফকে ভালভাবে জানা এবং তাসাউফের মহান ইমামদের কথা সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখা। উদাহরণস্বরূপ, হযরত বায়েযীদ বোস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, 'সুবহানী মা আযামা শানী' যেটাকে শুধুমাত্র যাহেরী জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা এভাবে ব্যাখ্যা করবেন, 'সৃষ্টিসমূহের যে সব ত্রুটি আছে তা থেকে আমি মুক্ত; আমার মর্যাদা অতি উচ্চে।' কিন্তু হযরত মহিউদ্দিন ইবনে আরবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই বক্তব্যের ব্যাপারে মন্তব্য করতে যেয়ে বলেন যে আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠত্ব এবং ত্রুটিহীনতা এই বাক্যে সবচেয়ে ভালভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন: 'এটা অত্যন্ত উচ্চপর্যায়ের তানযিহ্ (আল্লাহর প্রশংসা করা এ কথা বলে যে তিনি সকল নিকৃষ্ট দোষ হতে মুক্ত)। আরেক কথায়, তিনি (হযরত বায়েজীদ) দেখলেন যে তিনি পুরোপুরিভাবে আল্লাহ পাকের প্রশংসা করতে অক্ষম। আল্লাহ তা'আলা যেমনভাবে একটি সম্পূর্ণ মুনাযযাহ অবস্থা (ত্রুটিমুক্ত অবস্থা) থেকে তাঁর তাজাল্লী প্রকাশ (আত্মপ্রকাশ) করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে হযরত বায়েযীদ বোস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ক্ষমতা অনুসারে কৃত তানযিহ ও তসবিহ-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ওই তাজাল্লীসমূহেরও উদ্ভব হয়েছে। তিনি এই তাজাল্লীসমূহের তসবিহকে নিজের ক্ষমতার তসবিহ হিসেবে গণ্য করে নিলেন এবং বল্লেন যে তিনি নিজেকে প্রশংসা করেছেন (সোবহানী)। এরপর অন্যান্য লোকদের সাথে সম্পৃক্ত তাজাল্লীগুলো লক্ষ্য করে তাদের তসবিহকে নিকৃষ্ট এবং নিজেরটাকে উৎকৃষ্ট জেনে তিনি ঘোষণা করেন যে তাঁর ক্ষমতাই শ্রেষ্ঠ।' অতএব, এটা পরিস্ফুট যে এই বাক্যে তিনি (বায়েজীদ) শরীয়তের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কোনো জিনিসকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। যেহেতু তিনি 'সাকর'-এর (ভাবের সাগরে তন্ময়) একটি অবস্থায় ছিলেন, সেহেতু তিনি আর অন্য কোনো অভিব্যক্তি খুঁজে পাননি এই সূক্ষ্ম বিষয়টিকে ব্যক্ত করার জন্যে; তিনি এই কথায় তা ব্যক্ত করেছেন যা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে না। এই মহান ওলী একবার তাঁর শিষ্যদেরকে নিয়ে বোস্তামের অপর এক ওলীকে দেখতে যান। সেই ওলী যাঁর তাকওয়া ও বৈরাগ্য সেই যুগে সর্বজনবিদিত ছিল, তাকে হযরত বায়েযীদ বোস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ক্বিবলার দিকে মুখ করে থুথু

ফেলতে দেখেন। ফলে তিনি তাঁর সঙ্গে সালাম-কালাম না করেই প্রত্যোবর্তন করেন। তাঁর ভাষ্য হলো: "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি যে সব আদব দেখানো জরুরি, তার মধ্যে একটা আদবের খেলাফ করেছে ওই লোক। তাই সে ওলী হওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় পূর্বশর্তেরও খেলাফ করেছে।" ক্বিবলার প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হওয়া একটি বাজে আচরণ। ক্বিবলার দিকে ফিরে মলত্যাগ করাটা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এমন কি শোয়া অথবা বসা অবস্থায় ক্বিবলার দিকে পা লম্বা করাটাও মকরূহ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের আদেশ করেছেন যেন আমরা কাবা শরীফ গমন করি এবং সেই সময় যেন আমরা পাক-পবিত্র থাকি। হযরত মুহিউদ্দীন ইবনে আরবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইরশাদ ফরমান, 'যে ব্যক্তি শরীয়তের একটি আদব-কায়দা পালনে ব্যর্থ হয়, সে যদি বলে যে তার দোয়াসমূহ ক্বুবুল হয়ে থাকে, তবুও তার কথা বিশ্বাস করা উচিৎ নয়, এমন কি যদি তার থেকে বহু কারামতও দেখা যায়।' হযরত বায়েযীদ বোস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'যে ব্যক্তি নিজেকে ওলী দাবি করে, সে যদি আকাশে উড়তেও সক্ষম হয়, তবুও তার এবাদত, হারাম বর্জন ও শরীয়ত মান্য না দেখে তাকে বিশ্বাস করবে না।'

"হযরত আবদুর রাউফ আল মানাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'শরহে জামিউস্ সাগির' গ্রন্থে লিখেছেন: 'উলামা-এ-ইসলাম সর্বসম্মতভাবে বর্ণনা করেন যে আওয়াম বা অ-মুজতাহিদদের জন্যে তাদের উপলব্ধি অনুসারে সাহাবা-এ-কেরামকে অনুসরণ করা অনুমতিপ্রাপ্ত (জায়েয) নয়। হযরত ইমাম আবু বকর রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই ইজমার কথা ব্যক্ত করেছেন। তবে মুজতাহিদদের জন্যে আহলে সুন্নাতের চার মযহাবের ইজতেহাদ ভিন্ন অন্যান্য ইজতেহাদের অনুসরণ করা জায়েয। কিন্তু তাঁদেরকে সংশ্লিষ্ট শর্তসমূহ পালন করতে হবে।' হযরত আবু সুলাইমান দায়ানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইরশাদ ফরমান, 'আমার ক্বলবে বহু সময় চিন্তাসমূহের আবির্ভাব ঘটে। আমি সেগুলো সম্পর্কে চিন্তা করি। কুরআন এবং সুন্নাতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পেলেই আমি সেগুলোকে গ্রহণ করে থাকি।' হযরত যুন্নুন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, 'আল্লাহকে ভালোবাসার চিহ্ন হচ্ছে তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সকল নীতিতে এবং কাজে অনুসরণ করা'।" [১]

মাওলানা আবদুল গণী নাবলুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত ইমাম কসতালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে তাঁর প্রণীত 'আল মাওয়াহিব আল

[১]. হাদিক্বাতুন্ নদীয়্যা : মওলানা আবদুল গনী নাবলুসী, ১/ ১৫৩, ইস্তাম্বুল, ১২৯০ সংস্করণ।

লাদুন্নিয়া' গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত করেন, "আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা দুই ধরনের: ফরয এবং অ-ফরয। ফরয ভালোবাসায় কোনো ব্যক্তি তাঁর আদেশ মান্য করে, নিষেধ হতে দূরে থাকে এবং নিজেকে তাঁর ক্বাযা এবং ক্বদরে (তকদীরে) আত্মসমর্পণ করে। হারাম সংঘটন এবং ফরয পালন না করা এই ভালোবাসায় শিথিলতার ইঙ্গিত বহন করে। অ-ফরয ভালোবাসা কোনো ব্যক্তিকে নফল এবাদত পালন ও মুশতাবিহাত (সন্দেহজনক বস্তু) বর্জন করতে অনুপ্রাণিত করে। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি হাদীসে কুদসী রওয়ায়াত করেন:

' وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ

–আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান, আমার বান্দা আর কোনো কিছুর মাধ্যমে আমার নৈকট্য এমনভাবে পান না যেমনি পান ফরযের মাধ্যমে। যদি আমার বান্দা নফল এবাদত পালন করেন, তবে আমি তাঁকে এতোই ভালোবাসি যে আমি তাঁর (কুদরতী) কান হই যা দ্বারা তিনি শোনেন; তাঁর (কুদরতী) চোখ হই দ্বারা তিনি দেখেন; তাঁর (কুদরতী) হাত হই যা দ্বারা তিনি কাজ-কর্ম করেন এবং (কুদরতী) পা হই যা দ্বারা তিনি চলাফেরা করেন।[১]

তিনি যা কিছু আমার কাছ থেকে চান, তা-ই তাঁকে মন্‌জুর করি। তিনি আমার ওপর আস্থা রাখলে তাঁকে আমি রক্ষা করি।' এই হাদীসে কুদসী পরিস্ফুট করে যে আল্লাহতা'আলা ফরযকেই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন। এখানে উল্লেখিত 'নফল' এবাদত যেগুলো ফরযের সাথে পালন করা হয়,

---

[১]. বুখারী : আস সহীহ, বাবুত তাওয়াদ্বুউ, ৮/১০৫ হাদীস নং ৬৫০২।
ক. বায্যার : আল মুস্নাদ, মুসনাদু আবূ হামযা আনাস, ১৫/২৭০ হাদীস নং ৮৭৫০।
খ. ইবন হিব্বান : আস সহীহ, ২/৫৮ হাদীস নং ৩৪৭।
গ. বায়হাক্বী : আস সুনান আল কুবরা, ৩/৪৮২ হাদীস নং ৬৩৯৫।
ঘ. বাগাবী : শরহুস সুন্নাহ, ৫/২০।
ঙ.ইবন আসাকীর : আল মু'জাম, ২/১১০৮ হাদীস নং ১৪৩৮।

তাতে ফরযের মধ্যে সংঘটিত ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়। আল ফাক্বেহানী বলেন,'হাদীসে কুদসীটি প্রতীয়মান করে, যে ব্যক্তি ফরযের সঙ্গে নফল পালন করেন, তিনি আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করতে পারেন।' আবু সোলাইমান খাত্তাবী বলেন, 'এই হাদীসে কুদসীতে প্রতিভাত হয় যে ওতে উল্লেখিত পুণ্যাত্মাগণের দোয়া কবুল/গ্রহণ করা হবে। যাদের জন্যে তাঁরা দোয়া করবেন, তাদের হাজত (প্রয়োজন) পূরণ হবে'।"[১]

মওলানা আবদুল গণী নাবলুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'হাদিকাতুন্ নাদিয়া' গ্রন্থে আরও লিখেছেন, "হযরত জুনাইদ আল বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত আমি মহান সূফী আবদুল করীম আল কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর 'রিসালা'-এর উদ্ধৃতি দিয়েছি। আমার বিজ্ঞ ভ্রাতৃবৃন্দ পূর্ববর্তী লেখনীকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করুন। দেখুন কীভাবে উপরোক্ত তাসাউফের ইমাম ও আউলিয়া কেরাম শরিয়তকে আকড়ে ধরেছিলেন তাঁরা সব সময়েই তাঁদের কাশফ, কারামত, ক্বলবের মা'রিফতকে কুরআন ও সুন্নাতের কষ্টিপাথরে যাচাই করেছেন। কিছু অজ্ঞ ও শরিয়ত হতে বিচ্যুত লোকের বদ কাজ এবং কথাকে অজুহাত হিসেবে দেখিয়ে আহলে সুন্নতের ওই সকল মহান উলামার কুৎসা রটনা করা কি কোনো মুসলমানদের পক্ষে সাজে? তাকে (এবং ওহাবীদেরকে) কি বিশ্বাস করা উচিৎ যখন সে ওই সকল ওলী এবং তাঁদের প্রতি মহব্বত পোষণকারী মুসলিমদেরকে মুশরিক আখ্যা দেয়? আউলিয়ার কারামত সত্য। আহলে সুন্নাতে বিশ্বাসী এবং শরিয়ত মান্যকারী ব্যক্তিদের কাছে আল্লাহতা'আলা তাঁর নীতি-বহির্ভূত যে সব নেয়ামত মঞ্জুর করেন, তা-ই হচ্ছে কারামত। একজন ওলী কখনও বলেন না যে তাঁর কাছে কারামত আছে। সেটার মালিকানাও তিনি কামনা করেন না। ওলীর কারামত তাঁর জীবিতাবস্থায় কিংবা বেসালের পরও দৃশ্যমান হয়। ওলীদের বেসালের পর তাঁদের বেলায়াত (ওলীত্ব) অবলুপ্ত হয় না, ঠিক যেমনি নবীদের নবুয়্যত অবলুপ্ত হয় না। ওলীগণ আল্লাহকে এবং তাঁর সিফাতগুলোকে (গুণাবলী) চেনেন। কুরআনে বহু ওলীর কারামত বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, হযরত মরিয়মের কারামতকে উল্লেখ করা যায়, যখন তিনি হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম-কে পিতা ছাড়াই জন্ম দেন। হযরত যাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম হযরত মরিয়মের ঘরে প্রবেশ করে সব সময়ই খাদ্য দেখতে পেতেন। তিনি জানতেন যে তিনি ছাড়া আর কেউই মরিয়মের গৃহে প্রবেশ করতো না। তাই

---

১. প্রাগুক্ত : ১/১৮২।

তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, 'এগুলো তুমি কোত্থেকে পেয়েছ?' মরিয়ম উত্তর দিতেন, 'আল্লাহ্ এগুলো সৃষ্টি করেছেন।' কুরআন আরও বর্ণনা করে আসহাব আল কাহাফের কারামত সম্পর্কে, যাঁরা পানাহার না করেই একটি গুহায় বহু বছর অতিবাহিত করেছিলেন। আসীফ বিন বারখিয়া কর্তৃক চোখের পলকে রানি বিলক্বিসের সিংহাসন হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম-এর সামনে উপস্থিত করার কারামতটাও কুরআনে বিবৃত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনগণের সহস্র সহস্র কারামত কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং মুখে মুখে প্রচলিত হয়েছে। তাহলে কিছু মানুষ কারামতকে বিশ্বাস করে না কেন তাই নিয়ে প্রত্যেকের চিন্তা করা উচিৎ। কারণটা স্পষ্ট; তাদের কাছ থেকে কোনো কারামতই দেখা যায় না; তাদের মরুব্বীদের থেকে তারা এ ধরনের কোনো কিছু দেখেও নি, অথবা শুনেও নি, কিংবা তাদের শ্রদ্ধেয় প্রভুদের কাছ থেকে তারা কোনো কারামত-ই দেখে নি। কারামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে ইমাম নাসাফী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আহলে সুন্নাতের মতানুযায়ী এটা অনুমতিপ্রাপ্ত যে আল্লাহ্ পাক তাঁর রীতি-নীতি পরিবর্তন করে তাঁরই আউলিয়া ও প্রিয় বান্দাদেরকে নেয়ামত দান করতে পারেন।'

"ইবনে আবেদীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর 'রাদ্দুল মুহতার' গ্রন্থের 'সুবুত-উন নাসাব' অধ্যায়ের শেষদিকে লেখা আছে যে,

خَرْقُ الْعَادَةِ عَلَى سَبِيلِ الْكَرَامَةِ لِأَهْلِ الْوِلَايَةِ جَائِزٌ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ.

–কিছু আউলিয়া অল্প সময়ে বহু দূর যেতে পারতেন।[১]

বস্তুত হানাফী ও শাফেয়ী মযহাবের ফিক্বাহ কিতাবগুলোতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। ইমাম ইবনে হাজর আল হায়াতামী মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'ফাতাওয়া' পুস্তকে লিখেছেন, 'বহু উলামা বলেছেন যে যদি কোন ওলী কারামতস্বরূপ অতি অল্প সময়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গমন করেন এবং যদি তিনি পূববর্তী জায়গায় আসরের নামায পড়ে নেন, অথচ পরবর্তী জায়গায় তখনও আসরের ওয়াক্ত থাকে, তবে তাঁকে আর সেখানে দ্বিতীয়বার নামায পড়তে হবে না।' কিন্তু শামসুদ্দিন রামলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন যে তাঁকে দ্বিতীয়বার নামায পড়তে হবে। এটাও ঘন ঘন পরিদৃষ্ট হয়েছে যে খাদ্য, পানীয়, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি চাওয়ামাত্র অস্তিত্ব পেয়েছে। এমন কি ইতিহাস বইগুলোতেও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে হুজূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[১]. ইব্‌ন আবেদীন : আদ্দুর্‌রুল মুখতার, ফাসলু ফি সাবিতিন নাস্‌ব ৩/৫৫১।

ওয়াসাল্লাম-এর চাচাত ভাই জাফর তাইয়ার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আকাশে উড়তে পারতেন। এটাও সর্বজনবিদিত যে লুক্‌মান সারাহসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং আরও বহু আউলিয়া আকাশে উড়তে পারতেন। পানিতে হাঁটা, গাছ, পাথর ও পশু-পাখির সাথে কথা বলার মতো অসাধারণ ঘটনাও বহুবার প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। আল্লাহতা'আলা কর্তৃক তাঁর রীতি-নীতিবহির্ভূত উপায়ে সৃষ্ট এই ধরনের ঘটনা যদি একজন নবী আলাইহিস্ সালাম-এর দ্বারা সংঘটিত হয়, তবে তাকে বলা হয় মু'জেযা। আম্বিয়াগণ বেসাল হলেও তাঁদের প্রতি আল্লাহতা'আলা মু'জেযা মঞ্জুর করে থাকেন। অনুরূপভাবে, ওলীদের প্রতিও তাঁদের বেসালের পর কারামত মঞ্জুর করা হয়ে থাকে। কোনো ওলী-ই একজন নবীর মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারেন না। প্রত্যেক ওলী যতো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন-ই হোন না কেন, তিনি কোনোক্রমেই শরিয়ত ত্যাগ করতে পারবেন না; অর্থাৎ, তাঁকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মান্য করে চলতে হবে।

"আউলিয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু; তাঁর পরে হচ্ছেন হযরত উমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মুসল্লিদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৯ জন। তাঁরা গোপনে এবাদত করতেন। যখন হযরত উমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম হলেন, তখন তিনি ঘোষণা করলেন, 'এখন থেকে আমরা আর গোপনে এবাদত করবো না।' তিনি-ই প্রথম মুসলিম যিনি প্রকাশ্যে এবাদত করেন। এই দু'জনের পরে শ্রেষ্ঠ ওলী হচ্ছেন হযরত উসমান যিন্নুরাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। তাঁকে 'যিন্নুরাইন' উপাধি দেয়া হয় এই কারণে যে তিনি একের পর এক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুইজন কন্যা রুকিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও উম্মে কুলসুম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে বিয়ে করেন। যিননুরাইন মানে দু'টো আলোর মালিক। হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, 'আমার যদি তৃতীয় কোনো অবিবাহিতা কন্যা থাকতো, তাহলে তাকেও আমি উসমানের সঙ্গে বিয়ে দিতাম'।[১] এটা তিনি উম্মে কুলসুম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এন্তেকাল করার পর বলেন। এরপর হচ্ছেন হযরত আলী মুরতযা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। যেহেতু নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকের জ্বেহাদের সময় মদীনাতে আহলে বায়তকে রক্ষা করবার জন্যে তাঁকে সহকারী নিযুক্ত করে বলেছিলেন,

১. সুয়ূতী : তারিখুল খোলাফা, পৃ. ১০৪।

أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي .

–তুমি আমার সঙ্গে সম্পর্কিত, যেমনিভাবে হারুন আলাইহিস্ সালাম ছিলেন মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর সঙ্গে; কিন্তু আমার পরে আর কোনো নবী আসবেন না।[১]

সেহেতু তাঁকে 'মুরতযা' আখ্যায়িত করা হয়েছিল। এই চার জনের খিলাফত তাঁদের মর্যাদার ক্রমানুসারেই নির্ধারিত হয়েছিল। তাঁদের পরে শ্রেষ্ঠ আউলিয়া হচ্ছেন সকল আসহাব-এ-কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। তাঁদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণ হচ্ছে তাঁদের ইজতেহাদের পার্থক্য। তাঁদেরকে এর জন্যে সওয়াব দেয়া হবে। যাঁরা ভুল করেছিলেন তাঁদেরকে একটি এবং যাঁরা সঠিক ছিলেন তাঁদেরকে দুইটি সওয়াব দেয়া হবে। আমরা বিশ্বাস করি যে 'আশআরাত আল্ মুবাশশারা' নামের দশজন সাহাবী সরাসরি বেহেশতী। তাঁরা হলেন চার খলিফা, তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, সাদ্ বিন আবি ওয়াককাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, সাইদ ইবনে যায়দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, আবু উবাইদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, ইবনে জাররাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রহমতপ্রাপ্ত কন্যা ফাতিমাতুয্ যাহরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর দুই পুত্র ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও ইমাম হুসেইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং মা খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সবাই সরাসরি বেহেশতী। এছাড়া অন্য কারও নাম আমরা এখানে আর উল্লেখ করতে না পারলেও মোটামুটি এই নিশ্চিত ধারণা আমরা রাখতে পারি যে আউলিয়া ও

---

[১] . বুখারী : আস সহীহ, বাবু মানাক্বিবি আলী  ৫/১৯ হাদীস নং ৩৭০৬, ৬/৩ হাদীস নং ৪৪১৬।
ক. মুসলিম : আস সহীহ, বাবু মিন ফাদ্বায়িলি আলী, ৪/১৮৭০ হাদীস নং ২৪০৪।
খ. ইব্ন মাজাহ : আস সুনান, ফদ্বলু আলী ইব্ন আবী তালিব, ১/৪২ হাদীস নং ১১৫।
গ. তিরমিযী : আল জামিউ, বাবু মানাক্বিবি আলী ৬/৮৩ হাদীস  নং ৩৭২৪।
ঘ. নাসায়ী : আস সুনান, ফাদ্বায়িলু আলী, ৭/৩০৭ হাদী স নং ৮০৮২।
ঙ. ইব্ন হিব্বান : আস সহীহ, ১৫/৩৬৯ হাদীস নং ৬৯২৬।
চ. ত্ববরানী : আল মু'জাম, ২/১২৬ হাদীস নং ১৪৬৫।
ছ. আবূ দাঊদ : আস সুনান,  ১/১৬৭ হাদীস নং ২০২।
জ. ইব্ন আবী  শায়বা : আল মুসান্নাফ, ৬/৩৬৬ হাদীস নং ৩২০৭৪।
ঝ. আহ্মদ : আল মুস্নাদ, ১/১৭০ হাদীস নং ১৪৬৩।
ঞ. বায্যার : আল মুস্নাদ, ৩/৩৬৮।

উলামায়ে হাক্কানী-রাব্বানী জান্নাতে যাবেন: সাহাবাগণের পরে তাবেয়ীন এবং তারপরে তাবে তাবেয়বীনগণই শ্রেষ্ঠ আউলিয়া।"[১]

ওয়াহাবী পুস্তক 'ফাতহুল মজীদ' বলে, "আল্লাহকে দশটি জিনিসের জন্যে মানুষ ভালোবেসে থাকে। নবম জিনিসটি হচ্ছে আল্লাহর আশেক (খোদাপ্রেমিক)-দের সঙ্গে মেলামেশা করা এবং তাঁদের উচ্চারিত মধুর ফল (উপদেশ)-গুলো সংগ্রহ করা এবং তাঁদের উপস্থিতিতে শুধুমাত্র প্রয়োজনে কথা বলা। ভালোবাসার পর্যায়গুলো একের পর এক অর্জন করা যেতে পারে ওই দশটি জিনিসকে আঁকড়ে ধরে; আর মাশুকের (প্রেমাস্পদ খোদাতা'আলার)-ও নৈকট্য পাওয়া যেতে পারে।"[২]

আমরা মুসলিমরাও তা-ই বিশ্বাস করি। আমরা এই কারণেই তাসাউফের ইমামদেরকে ভালোবাসি; ওলীদের সোহবত (সান্নিধ্য) তালাশ করি। মুসলিমগণ যাঁরা এ কাজ করেন, তাঁদেরকে ওহাবীরা কেন মুশরিক আখ্যায়িত করে থাকে তা আমরা বুঝতে পারিনা।

٣٤٠فَانْظُرْ إِلَىْ هَذَا الجَهْلُ العَظِيْمُ حَيْثُ اِعْتِقَدَ أَنَّهُ لَا نَجَاةً لَهُ إِلاَّ بِعِيَاذِهِ وَلِيَاذِهِ بِغَيْرِ الله، وَانْظُرْ إِلَىْ هَذَا الإِطَّرَاءِ العَظِيْمِ الَّذِيْ تَجَاوَزُ الحَدَّ فِيْ الإِطِّرَاءِ الَّذِيْ نَهى عَنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ البُوْصِيْرِيْ فِيْ قَصِيْدَتِهِ المَشْهُوْرَة بِالبُرْدَةِ الَّتِيْ هِيَ عِنْدَ النَّاس بِمَنْزِلَةِ القُرآنِ، وَرُبَمَا عَظَمُهَا بَعْضُهُم أَكْثَرُ–

৪১৫ পৃষ্ঠায় ওয়াহহাবী পুস্তকটি লিখে: "ক্বাসিদা-এ-বুরদা' হচ্ছে একটি অজ্ঞতায় পরিপূর্ণ বই। এটা বলে যে একমাত্র নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুরক্ষা দ্বারা-ই কোনো ব্যক্তি মুক্তি অর্জন করতে পারে। এই গুণকীর্তন কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী। তারা এটাকে কুরআনের চেয়েও উচ্চপর্যায়ের মনে করে থাকে।" [৩]

ওহাবী বইটির মুখবন্ধে লেখা আছে, "সাউদের পৌত্র আবদুল আযীয তাওহিদকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তিনি আরবীয় উপদ্বীপে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। আর

[১]. আবদুল গনি নাবলুসী : আল হাদিকাতুন্ নাদিয়া।
[২]. ফাত্হ আল মাজিদ।
[৩]. ফাত্হ আল মাজিদ।

তাঁর পুত্র সাদ তাঁর পূর্বপুরুষদের আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তিনি খুলাফা আর রাশেদীনের পথকে পুনরোন্মুক্ত করেন।”[১]

ওহাবীটি সউদের পুত্রদের তলোয়ারকে আরও ধারালো হবার জন্যে দোয়া করছে। তার মতে, ‘পুনরুজ্জীবিত’, ‘পুনরোন্মুক্ত’ ইত্যাদি বলাটা সৌদের ক্ষেত্রে মোটেই অত্যুক্তি এবং অপরাধ নয়, যাতে ওয়াহহাবীটি সৌদের মতো একজন নিচ ও হীন মদ্যপায়ীর কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারে। এই সেই সউদ, যে নাকি এথেন্স ও গ্রীসের হোটেলগুলোতে মদ ও নারী নিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছিল; যার জীবন অতিবাহিত হয়েছে মুসলমানদের স্বর্ণ বিধর্মীদের হাতে অর্পণ করে করে। অথচ এই ওয়াহহাবীর দৃষ্টিতেই আবার ইমাম বুসীরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক আল্লাহতা’আলার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা এবং তাঁর কাছে শাফায়াত কামনা ও সাহায্য প্রার্থনা মহা-শির্ক এবং জঘন্য অপরাধ যে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আল্লাহ তা’আলা শুভসংবাদ দিয়েছেন, ’আপনি যা চান, আমি তাই দেবো’ (আল আয়াত)। সে তার উদ্ভট ও মিথ্যা লেখনীকে মুসলিমদের সামনে ধর্মীয় কিতাব হিসেবে চালাতে মোটেও লজ্জিত নয়। ওয়াহাবীটি উলামা-এ-ইসলামকে মুশরিক আখ্যা দিয়ে যুব সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করে ওহাবী মতবাদে দীক্ষা দিতে অপতৎপর। ওয়াহাবীটি সেই সব হাদীস সম্পর্কে কী উত্তর দেবে যেগুলোতে হুযূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই নিজের প্রশংসা করেছেন [ইমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আলফে সানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ‘মকতুবাত’ গ্রন্থের প্রথম খন্ডের ৪৪ নং চিঠিতে হাদীসগুলো উদ্ধৃত হয়েছে]। এক্ষেত্রে লা-জওয়াব হওয়া ছাড়া ওহাবীটির আর কোনো উপায় নেই।

২৪/ ’ফাতহুল মাজীদ’ পুস্তকের ৪১৬ পৃষ্ঠায় ওয়াহহাবীটি লিখেছে,

وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيْ "أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَقُوْلَ الرَّجُلُ: أَعُوْذُ بِاللهِ وَبِكَ. وَيَجُوْزُ أَنْ يَقُوْلَ: بِاللهِ ثُمَّ بِكَ. قَالَ: وَيَقُوْلُ: لَوْلَا اللهُ ثُمَّ فَلَانٌ، وَلَا تَقُوْلُوْا: لَوْلَا اللهُ وَفُلَانٌ".وَقَدْ تَقَدَّمُ الفَرْقِ بَيْنَ مَا يَجُوْزُ وَمَا لَا يَجُوْزُ مَنْ ذَلَكَ. هَذَا إِنَّمَا هُوَ فِيْ الحَيِّ-

[১]. প্রাগুক্ত।

"যদিও ইব্রাহীম আন্ নাখঈ বলেছিলেন যে 'আমি আল্লাহর ওপর আস্থা রাখি এবং তারপর আপনার ওপর'- এ কথা বলাটা অনুমতিপ্রাপ্ত, তবুও এই ধরনের কথা শুধু তাদেরকেই বলা যায় যাঁরা জীবিত এবং উপস্থিত এবং যাঁদের কোনো কিছু করার ক্ষমতা থাকার দরুণ তাঁরা (সৃষ্টি প্রক্রিয়ায়) কারণস্বরূপ। মৃতজন অনুভব করেন না, শ্রবণও করতে পারেন না; তাঁরা উপকার কিংবা ক্ষতি করতে অক্ষম। মৃতজন কিংবা অনুপস্থিতজনের কাছে কথা বলা বৈধ নয়। মৃতদের সঙ্গে এভাবে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া অনুমতিপ্রাপ্ত নয়। এটা কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে। মৃতদের কাছে কোনো জিনিস চাওয়া অথবা তাঁদের শানে প্রশংসাসূচক কথা বলা তাঁদেরকে তা'যিম করা অথবা অন্তর কিংবা কর্ম দ্বারা তাঁদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার অর্থ হচ্ছে তাঁদেরকে দেবতাতুল্য বিবেচনা করা।[১]"

ওয়াহাবী পুস্তকটি উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে কুরআনের কুৎসা রটনা করেছে। উলামা-এ-ইসলাম ওয়াহহাবীদের এই ধরনের গোমরাহীপূর্ণ কথাকে দলিলসহ খন্ডন করেছেন। উলামাদের বইগুলোর মধ্যে হযরত মওলানা দাউদ ইবনে সুলাইমান আল বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রণীত 'আল মিনহাতুল ওয়াহবীয়া ফী রাদ্দীল ওয়াহাবীয়া' (ওহাবী মতবাদ খন্ডনে ঐশী অবদান) পুস্তকটি অন্যতম। সম্পূর্ণ কিতাবটি এখানে ভাষান্তরিত করা হলো:

## ওহাবী মতবাদ খন্ডনে ঐশী অবদান

বর্তমানকালে আহলে সুন্নাতের আদর্শ হতে বিচ্যুত গোমরাহদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব গোমারাহ্ লোকেরা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতকে মুশরিক আখ্যায়িত করছে। তারা বলে যে এই নেয়ামতপূর্ণ উম্মতকে তারা হত্যা করবে এবং তাঁদের মালামাল লুঠ করবে। ফলে তারা অধঃপতিত হয়েছে। মহান আল্লাহতা'আলার রহমতে ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওসীলায় আমার এ বইটিতে আমি এসব গোমরাহ লোককে ভ্রান্ত প্রমাণ করবো এবং তাদের যুক্তিগুলোর অসারতা প্রমাণ করবো। হয়তো তারা এ বই পড়ে তাদের ভুল বুঝতে পারবে এবং মুক্তি অর্জন করতে সক্ষম হবে। আর আমিও একটি মহান খেদমত করতে পারবো।

ওয়াহাবীরা এ ব্যাপারটি বিশ্বাস করে না যে কেউ আল্লাহর কাছে তাঁর আম্বিয়াবৃন্দ আলাইহিস্ সালাম ও পুণ্যবান আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-গণের মাধ্যমে

[১].প্রাগুক্ত : ১/৪১৬।

(ওসীলায়) শাফায়াত (সুপারিশ) প্রার্থনা করতে পারে এবং তাঁদের কাছে আল্লাহ্ যে ক্ষমতা কারামতস্বরূপ দিয়েছেন, সেই ক্ষমতাবলে তাঁদের কাছে বিপদমুক্তি কামনা করতে পারে; তারা আরও বিশ্বাস করে না যে কোনো ব্যক্তি নবী-ওলীদের মাযার-রওযা যিয়ারত করে তাঁদের শাফায়াত কামনা করতে পারে, যাতে তার ইচ্ছা আল্লাহ পাক পূরণ করে দেন, অথবা তার বিপদ দূর করে দেন। ওয়াহাবীদের মতে, বেসালের পরে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের আর শ্রবণ ও দর্শনক্ষমতা থাকে না; তাঁরা মাটিতে পরিণত হন। তারা বলে যে কবর জীবন বলতে কিছুই নেই। পৃথিবীতে কোনো জিনিস অর্জনের জন্যে জীবিতদের মধ্যস্থতার মতোই বেসালপ্রাপ্ত আম্বিয়া-আউলিয়ার যে ওসীলা (মাধ্যম) করা যায় তা ওয়াহাবীরা অবিশ্বাস করে থাকে। তারা এভাবে অস্বীকার করতো না যদি তারা বিশ্বাস করতো যে বেসালপ্রাপ্তজন 'কবর-জীবন' নামের একটি জীবনে বর্তমান রয়েছেন এবং তাঁরা জানেন, শোনেন, দেখেন, যিয়ারতকারীর প্রতি প্রত্যুত্তর দেন, আর নিজেদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ করেন; এবং তাঁরা পুরস্কার অথবা শাস্তির মধ্যে অবস্থান করেন, আর এই পুরস্কার অথবা শাস্তি রূহ (আত্মা) ও দেহের ওপর আসে; এবং তাঁদের জীবদ্দশায় পরিচিত লোকদের কাজ-কর্ম (আমল) সম্পর্কে তাঁদেরকে জানানো হয়, আর তাঁরা (এ জন্যে) আল্লাহ পাককে ধন্যবাদ জ্ঞাপণ করেন ও নিজেদের মধ্যে শুভ সংবাদ আদান-প্রদান করেন এবং জীবিতদের জন্যে দোয়া করেন যখনই তাঁরা জীবিতদের নেক আমল সম্পর্কে অবহিত হন; আর বদ আমল সম্পর্কে অবগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা দোয়া করেন 'হে আমার আল্লাহ্ পাক আপনি তাদেরকে সৎকাজ করতে সাহায্য করুন। আপনি তাদেরকে মুক্তি অর্জন করতে সহায়তা করুন যেভাবে আমাদেরকে করেছেন।' যেহেতু ইন্তেকাল হচ্ছে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে স্থানান্তর, সেহেতু কুরআন, হাদীস, ইজমা আল্ উন্মত এসব তথ্য শিক্ষা দেয়। যে ব্যক্তি এগুলোতে বিশ্বাস করে না, সে বিশ্বাস স্থাপনের ওয়াজিব বিষয়গুলোতে অবিশ্বাস করে বিদয়াতীতে রূপান্তরিত হবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত থেকে বিচ্যুত হবে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের একজন ব্যক্তিকে কাফের বিবেচনা করা যায়, কারণ পুনরুত্থান দিবসে মানুষজন তাঁদের কবর থেকে জীবিতাবস্থায় উঠে আসবেন এটা ঈমানের ছয়টি মূলনীতির একটি। যে ব্যক্তি এতে অবিশ্বাস করবে সে কাফেরে পরিণত হবে। বেসালপ্রাপ্ত জন কবরে জীবিত এবং তাঁরা শান্তি লাভ অথবা শাস্তি ভোগ করবার বিষয়টা, যার ওপর ইজমা-এ-উন্মত-এ-মোহাম্মদীয়া হয়েছে, তাতে অবিশ্বাস ক্ষুদ্র পুনরুত্থানে অবিশ্বাসেরই নামান্তর যে ক্ষুদ্র পুনরুত্থান রোজ হাশরেরই একটা উদাহরণমাত্র।

ওয়াহহাবীরা বলে, 'কবরে দেহ পচে যায় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অদৃশ্য হয়ে যায়। তারা আর তখন শুনতে অথবা দেখতে পায় না। দেহের জন্যে কোনো শাস্তি কিংবা পুরস্কার নেই।'

আমরা তাদেরকে বলি, 'তোমরাও তো বিশ্বাস করো যে রূহ্ মৃত্যুবরণ করে না। অতএব, তোমাদেরও বিশ্বাস করা উচিৎ যে সেটা অনুভব করে, দেখে এবং শুনে। তাই তোমাদের উচিৎ নয় সেই সকল মুসলমানদেরকে বাধা দেয়া যাঁরা আল্লাহর সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় রূহসমূহের মধ্যস্থতার ওপর আস্থা রেখে শাফায়াত ও সাহায্যের আকাঙ্খী হন। যেহেতু সকল ধর্ম-ই প্রচার করে যে ইন্তেকালের পরও রূহসমূহের অস্তিত্ব থাকে, সেহেতু আল্লাহর সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় জীবিত রূহসমূহের মধ্যস্থতাকে তোমাদের অস্বীকার করা উচিৎ নয়, যেমনি তোমরা অবিশ্বাস করো না জীবিত মানুষদের মধ্যস্থতাকে। খোলা মন নিয়ে এ বিষয়ের ওপর চিন্তা করার অক্ষমতার দরুণ ওয়াহহাবীরা বলে, 'মৃত-জনের কাছ থেকে কোনো সাহায্য-ই আশা করা যায় না। যে ব্যক্তি আল্লাহতা'আলার প্রিয় বান্দাদের রূহ্ মোবারক থেকে শাফায়াত ও সাহায্য আশা করে, সে কাফের এবং মুশরিকে পরিণত হয়।' অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, বর্তমানকালে বহু মানুষ এমন কি ওয়াহহাবীদের দ্বারা ধোকাপ্রাপ্ত ধর্মীর পদে সমাসীন ব্যক্তিবর্গও আহলে সুন্নতের ওই সকল গোমরাহ্ শত্রুদের গুণকীর্তন করছে এবং তাদের ভ্রান্ত ও বিষাক্ত বইপত্র অনুবাদ করে যুব সম্প্রদায়কে প্রতারিত করতে অপতৎপর হচ্ছে। প্রত্যেকেই জানেন যে সউদী আরবীয় সরকার ওয়াহহাবীবাদ সারা বিশ্বে প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে চলেছে এবং একটা দপ্তর স্থাপন করেছে এই কাজ চালিয়ে যাবার জন্যে। কিছু বুদ্ধিহীন লোক তাদের দ্বীনকে বিক্রি করে ওয়াহহাবী মতবাদে দীক্ষা নিয়ে শুধুমাত্র অর্থের জন্যে যুব সম্প্রদায়কে বিপথে পরিচালিত করছে। এই ধরনের নিচু জাতের বুদ্ধি-বিবর্জিত মানুষ প্রত্যেক জাতিতেই রয়েছে। আরও কিছু লোক আছে যারা ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হয়েই ওয়াহহাবীদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে এবং তাদের মতাদর্শ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছে; আর ইসলামের মধ্যে সংস্কার সাধনে তারা তৎপর হয়েছে। এ সকল অজ্ঞ লোকেরা, যারা নিজেদেরকে আলেম হিসেবে পরিচয় দিচ্ছে, তারা কুরআনের আয়াত এবং হাদীসও চেনে না। তারা সাহাবা-এ-কেরাম ও তাবেয়ীনগণের বাণী সম্পর্কেও বে-খবর, একেবারেই অজ্ঞ অল্প-স্বল্প আরবী শিখেই নিজেদেরকে জ্ঞানী মনে করছে তারা। জ্ঞান অর্জন করে আলেম হওয়ার আকাংখা তাদের মধ্যে নেই। সউদী আরব থেকে প্রাপ্ত স্বর্ণ দ্বারা ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়েছে এ সকল লোকেরা। দ্বীন এবং দুনিয়া সম্পর্কে তারা অচেতন। হতভাগ্য যুবকেরা তাদেরকে ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব

হিসেবে গণ্য করে থাকে। এ সকল লোকেরাই ইসলামের ধ্বংসকারী। তথাকথিত এ সকল 'আলেম' মুসলমানদের নেতা হয়ে বসছে। তারা রাজনৈতিক আসন দখল করতে সমর্থ হচ্ছে। তাদের উর্বর মস্তিষ্কজাত কল্পনাসমূহকে তারা ধর্মীয় শিক্ষা হিসেবে পেশ করে থাকে। আর নিজেদের মতো অন্যদেরকেও বিচ্যুত করে সঠিক পথ হতে। সহিহ্ বুখারী শরীফে লিখিত হাদিসটি এদের আগমনী বার্তা দিয়েছে বহু আগেই। এই ক্ষতিকর বিচ্যুতি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল প্রত্যেক ব্যক্তিরই উচিৎ মানুষকে জাগ্রত করা। যদি এই ধারাকে বাধা না দেয়া হয়, তবে এটা প্রাক-ইসলামী পর্যায়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে মুসলমানদেরকে। কেননা, কবর আযাবে অবিশ্বাস শেষ বিচারের দিনের ওপর অবিশ্বাসের জন্ম দেবে।

কবরে আশীর্বাদ/শান্তি কিংবা শাস্তি রূহ্ (আত্মা) এবং দেহ উভয়ের ওপরই প্রয়োগ করা হয়। বিবৃত এই বিষয়টির ওপর বিশ্বাস স্থাপন একান্ত অপরিহার্য। ইমাম মুহাম্মদ শায়বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'আল আক্বাইদ আশ্ শায়বানীয়া' শীর্ষক পদ্যে এটা ব্যক্ত করেন: 'কবরে আযাব আছে; সেটা রূহ্ এবং আত্মা উভয়ের ওপরই পতিত হয়।' অর্থাৎ, দেহ এবং আত্মা উভয়ই পুরস্কার কিংবা শাস্তি ভোগ করবে কবর-জীবনে। যদিও জীবিত মানুষেরা তা দেখে না, তবুও এর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করাটা তাদের জন্যে জরুরি। এ গোপন বিষয়টিতে বিশ্বাস করা অপরিহার্য। এতে অবিশ্বাস 'বাআস' বা কবর থেকে পুনরুত্থানে অবিশ্বাসের জন্ম দেবে। অথচ দুটোই আল্লাহতা'আলার ক্ষমতাবলে সংঘটিত হবে। যে ব্যক্তি পরবর্তী বিষয়টিতে বিশ্বাস করে, তার জন্যে পূর্ববর্তীটিতে বিশ্বাস করা যুক্তিসঙ্গত। যদিও জীবদ্দশায় মানুষেরা কবর আযাব সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারে না, তবুও আয়াত-হাদীসসমূহ এবং এ উম্মাতের সালেহ (পুণ্যবান) উত্তরসূরীগণ ব্যক্ত করেন যে কবর আযাব বিদ্যমান। নিম্নে আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো এবং হাদীসসমূহ পেশ করে দেখাবো যে আল্লাহ্ পাকের কবরস্থ প্রিয় বান্দাদেরকে ওসীলা করে তাঁদের শাফায়াত কামনা করা অনুমতিপ্রাপ্ত, যাতে কোনো ব্যক্তির কাম্য বস্তু আল্লাহতা'আলা সৃষ্টি করে দেন। এ সব দলিল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বেসালপ্রাপ্ত বুযূর্গানে দ্বীন নিজেদের ক্ষমতাবলে কিছুই করতে পারেন না এবং তাঁদের থেকে প্রার্থনার আক্ষরিক অর্থে কোনো কিছুই চাওয়া হয় না যা ওয়াহহাবীরা রটিয়ে বেড়ায়। জীবিত লোকদেরকে চলাফেরা এবং কাজ করতে (তাসাররূফ) দেখে ওয়াহহাবীরা মনে করে যে তাদের কাছে সাহায্য ও সুপারিশ প্রার্থনাকারী বুঝি তাদের কাছেই আবেদন করে থাকে। অথচ জীবিতদের কাছে প্রার্থনা করা আর কিছুই নয় শুধু তাদেরকে আল্লাহতা'আলার সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় মধ্যস্থতাকারী বানানো ছাড়া। একমাত্র আল্লাহ্ পাকই সকল বস্তু সৃষ্টি করে থাকেন

এবং সব কিছু পরিচালনা করে থাকেন। জীবিত ও বেসালপ্রাপ্ত সকলেই তাঁর সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় 'ওয়াসিতা' বা বাহনস্বরূপ। তিনি নিজেই এ ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন যে সৃষ্টি জগত তাঁর সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় মাধ্যম বা বাহন হবে। আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এই যে অনেক বস্তুর মধ্যস্থতায় তিনি সৃষ্টি করবেন, যাতে পৃথিবী নিয়মানুযায়ী পরিচালিত হতে পারে। তবুও বহু জিনিস তিনি মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে সৃষ্টি করে থাকেন।

আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম এবং আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁদের মাযার-রওযায় 'কবর জীবন' নামের একটা জীবনে বর্তমান রয়েছেন, যা আমরা জানি না। তাঁরা নিজ হতে কিছুই করতে পারেন না। আল্লাহ্ পাকই তাঁদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্ষমতা ও মর্যাদা দিয়েছেন মধ্যস্থতাকারী হবার জন্যে। যেহেতু তিনি তাঁদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসেন, সেহেতু তিনি তাঁদেরকে উচ্চমর্যাদা প্রদান করে থাকেন। তাঁদের ওয়াস্তে মহান আল্লাহতা'আলা মনোবাসনা পূর্ণ করেন। এই হাজত (প্রয়োজন) ও মকসুদ (মনোবাসনা) পূরণের উদ্দেশ্যেই তাঁদেরকে মধ্যস্থতাকারী হবার জন্যে অনুবোধ করা হয়। ওয়াহহাবীদের এটা একটা মিথ্যা কাহিনী যে আহলে সুন্নত কবর পূজা করে মুশরিকে রূপান্তরিত হয়েছে। মুসনলমানদের বিরুদ্ধে এটা জঘন্য কুৎসা রটনা বৈ কিছু নয় কিছু অজ্ঞ লোক অথবা অধার্মিক লোক নির্দোষ গ্রামবাসীকে ধোকা দিয়ে দুনিয়াবী স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে শরিয়তের সঙ্গে অসঙ্গিপূর্ণ কাজ-কারবারে লিপ্ত করতে পারে। আর এটা নিশ্চিত যে ইসলামী জ্ঞান ও মূল্যবোধ যে দেশে বিলুপ্তপ্রায়, সে-ই দেশে এসব 'যিন্দিক'-রা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। তাদের ছুতা দেখিয়ে ওয়াহহাবী মতবাদকে আত্মরক্ষা না করে ওই সব বিচ্যুতিকে সংশোধন করার চেষ্টায় নিয়োজিত হওয়া বেশি জরুরি। নেতিবাচক মনোভাবের পরিবর্তে ইতিবাচক মনোভাব গ্রহণ করা উচিৎ। মুসলমানদের মধ্যে আবার কিছু লোক আছে যারা কবর জীবন এবং তার পুরস্কার অথবা শাস্তিতে বিশ্বাস করে, কিন্তু বেসালের পর আল্লাহর সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম ও আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-বৃন্দের মধ্যস্থতাতে বিশ্বাস করে না। আরও কিছু লোক বলে, 'আল্লাহ পাকের সৃষ্টি ক্ষমতা বিবেচনা না করে কেন শুধুমাত্র বেসালপ্রাপ্ত জনদের কাছে প্রার্থনা করা হয়? তাঁদের কাছে শাফায়াত প্রার্থনা এবং তাঁদের মাধ্যমে হাজত-মকসূদ পূরণ শরীয়তে বিবৃত হয় নি।' এ কথা যারা বলে তারা কবর জীবনে অবিশ্বাসী ওয়াহহাবীদের মতো ক্ষতিকর নয়। তারা কুরআন-হাদীস না জেনেই ওই ধরনের কথা বলে অথবা তারা নিছক একগুঁয়েমির খাতিরে ওই রকম আচরণ করে। মুসলমানদের উচিত একগুঁয়ে না হয়ে সঠিক কথাকে স্বীকার করে নেয়া। আমি আমার জওয়াবকে আটটি অধ্যায়ে পেশ করবো।

## প্রথম অধ্যায়

আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম-গণ তাঁদের মাযার-রওযায় জীবিতাবস্থায় আছেন। তাঁরা রূপকার্থে (মাজাযী) জীবিত নন, বরং বাস্তবক্ষেত্রেই জীবিত। কুরআনে করীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.

"আল্লাহ তা'আলার পথে শহীদদেরকে কখনো মৃত মনে করবে না। তাঁরা আল্লাহ পাকের দৃষ্টিতে জীবিত। তারা রিযকপ্রাপ্ত"।[১]

এই আয়াতটি ব্যক্ত করে যে শহীদগণ জীবিত। তাঁরা অন্যান্য মুসলমানদের মতোই মর্যাদাসম্পন্ন এবং অন্যান্যদের ওপরে তাঁদের মর্যাদা নেই। কিন্ত আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম-গণ শহীদদের চেয়েও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। ইসলামী উলামায়ে কেরাম বলেছেন যে প্রত্যেক নবী আলাইহিস্ সালাম-ই শহীদ হিসেবে বেসালপ্রাপ্ত হয়েছেন। এ বিষয়টি প্রত্যেকেই জানেন ভালভাবে। যদিও আল হালাবী তাঁর পুস্তক 'সিয়্যার'-এ লিখেছেন, "উচ্চ পর্যায়ের কোনো ব্যক্তির চাইতে নিম্ন পর্যায়ের কোনো ব্যক্তির হয়তো একটি মাহাত্ম্য বেশি থাকতে পারে," তবুও এ কথাটি এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। কারণ এ কথাটা এমন একটা মাহাত্ম্যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেটা কোনো আয়াত কিংবা হাদীসে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয় নি। কিন্তু যেহেতু হাদিসসমূহে ঘোষিত হয়েছে যে আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম-গণ সবাই শহীদ, সেহেতু এই বিষয়ে আল হালাবীর কথা প্রযোজ্য নয়। আল্ বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণিত একটি হাদীস ঘোষণা করে,

مَرَرْتُ بِمُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ.

–মিরাজের রজনীতে আমি মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর রওযার পাশ দিয়ে গমন করি। তিনি তাঁর রওযা শরীফে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন।[২]

---

[১]. আল কুর'আন : সূরা আল-ই-ইমরান, ১/১৬৯।
[২]. মুসলিম : আস সহীহ, বাবু মিন ফাদ্বায়িলি মুসা আ., ৪/১৮৪৫ হাদীস নং ২৩৭৫।
ক. আব্দুর রায্যাক্ব : আল মুসান্নাফ, ৩/৫৭৭ হাদীস নং ৬৭২৭।
খ. ইবন আবী শায়বা : আল মুসান্নাফ, ৭/৩৩৫ হাদীস নং ৩৬৫৭৫।
গ. আহ্মদ : আল মুস্নাদ, মুসনাদু আনাস, ৩/১২০ হাদীস নং ১২২৩১।
ঘ. বায্যার : আল মুস্নাদ, মুস্নাদু আবী হামযা আনাস রা., ১৩/৬২ হাদীস নং ৬৩৯১।
ঙ. নাসায়ী : আস সুনান, যিকরু সালাতিন নবী দ., ২/১২৮ হাদীস নং ১৩৩০।
চ. আবূ ইয়ালা : আল মুস্নাদ, ৬/৭১ হাদীস নং ৩৩২৫।
ছ. ইব্ন হিব্বান : আস সহীহ, ১/২৪১ হাদীস নং ৪৯।
জ. তৃবরানী : আল মু'জামুল কাবীর, ১১/১১১ হাদীস নং ১১২২৯।
ঝ. বায়হাক্বী : শু'য়াবুল ঈমান, ৪/৫১৯।
ঞ. বাগাবী : শরহুস সুন্নাহ, বাবুল মি'রাজ, ১৩/৩৫১ হাদীস নং ৩৭৫৯।

আল বায়হাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং আরও বহু রওয়ায়াতকারী বর্ণিত একটি হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

الأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ يُصَلُّونَ فِي قُبُورِهِمْ.

–আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম-গণ তাঁদের মাযার-রওযায় জীবিত। তাঁরা সালাত আদায় করেন।[১]

অপর একটি হাদীস ঘোষণা করে,

إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ.

–আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীদের (দেহ মোবারক)-কে মাটির জন্যে হারাম করে দিয়েছেন।[২]

এ বিষয়টি ইজমা-এ-উলামা-এ-উম্মাত (ইসলামী জ্ঞান বিশারদদের ঐকমত্য) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। আল বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সহীহ এবং মুসলিম শরীফে লিপিবদ্ধ আছে: فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَمْتُهُمْ[৩] "আল্লাহ পাক মেরাজ রজনীতে সকল নবী আলাইহিস্ সালাম-কে আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রেরণ করেন। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমাম হন এবং তাঁরা সকলে দুই রাকআত নামায পড়েন।" রুকু এবং সাজদা সালাতের অন্তর্ভুক্ত। এতে প্রতিভাত হয় যে তাঁরা স্বশরীরে সালাত আদায় করেন। রওযা মোবারকে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর নামায পড়াও এ বিষয়কে প্রমাণ করে। মিশকাত শরীফে লিপিবদ্ধ এবং আল বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রওয়ায়াতকৃত একটি হাদীস ইরশাদ করে,

---

[১].আহ্মদ : আল মুসনাদ, ২৬/৮৬ হাদীস নং ১৬১৬৩।
ক. বায্যার : আল মুসনাদ, মুসনাদে আবূ হামযা আনাস বিন মালেক, ১৩/৬২ হাদীস নং ৬৩৯১।
খ. আবূ ইয়ালা : আল মুসনাদ, ৬/১৪৭ হাদীস নং ৩৪২৫।
[২]. ইব্ন আবূ শায়বা : আল মুসান্নাফ, ফি ছাওয়াবিস সালাতি আলান নবী ২/২৫৩ হাদীস নং ৮৬৯৭।
ক. দারেমী : আস সুনান,ফি ফদ্বলি ইওমিল জুম'য়াতি, ২/৯৮১।
খ. ইব্ন মাজাহ : আস সুনান, বাবু যিকরি ওফাতিহি, ১/৫২৪ হাদীস নং ১৬৩৬।
গ. নাসায়ী : আস সুনান,আল আমরু বি ইকছারি সালাতি আলান নবী, ২/২৬২ হাদীস নং ১৬৭৮।
ঘ. বায়হাক্বী : আল মু'জামুল আওসাত, ৫/৯৭ হাদীস নং ৪৭৮০।
ঙ. বায্যার : আল মুসনাদ, ৮/৪১১।
[৩]. মুসলিম : আস সহীহ, বাবু যিকরিল মসীহ, ১/২৫৬ হাদীস নং ১৭২।
ক. নাসায়ী : আস সুনান, ১০/২৫১ হাদীস নং ১১৪১৬।

وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي، فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ، جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ

–আমি আম্বিয়াবৃন্দের সমাবেশে উপস্থিত ছিলাম। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। তিনি কালো বর্ণের ছিলেন। তাঁর চুল ময়লা অথবা এলোমেলো ছিল না, বরং তাঁকে দেখতে লাগছিল 'যাত' গোত্রের একজন সাহসী যুবকের মতো।[১]

এ সকল হাদীস প্রতীয়মান করে যে আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম-গণ আল্লাহতা'আলার হুযুরে (উপস্থিতিতে) জীবিত। তাঁদের রূহের মতো তাঁদের দেহও অশরীরী হয়ে গিয়েছে। তাঁদের দেহ মোবারক ঘনও নয়, আবার শক্তও নয়। তাঁরা পার্থিব কিংবা অপার্থিব (আত্মা) উভয় জগতেই দৃশ্যমান হতে পারেন। এই কারণেই আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম-দেরকে রূহানীভাবে এবং স্বশরীরে দেখা যায়; হাদীসটি ঘোষণা করে যে মূসা আলাইহিস্ সালাম নামায পড়ছিলেন; সালাত শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়ে থাকে, রূহানী বা আত্মিকভাবে নয়। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদত্ত হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর শারীরিক বিবরণ পরিস্ফুট করে যে তিনি মূসা আলাইহিস্ সালাম-কে রূহানীভাবে নয়, বরং শরীরসমেত দেখেছিলেন। অন্যান্য মানুষের মতো আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম-বৃন্দ মৃত্যুবরণ করেন না। তাঁরা নিজেদেরকে এ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী থেকে চিরস্থায়ী জগতে স্থানান্তর করেন। ইমাম আল বায়হাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'এ'তেক্বাদ' গ্রন্থে লিখেছেন,

وَالْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بَعْدَمَا قُبِضُوا رُدَّتْ إِلَيْهِمْ أَرْوَاحُهُمْ فَهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ كَالشُّهَدَاءِ

–মাযারে রাখার পর নবীদেরকে তাঁদের রূহ মোবারক ফিরিয়ে দেয়া হয়। আমরা তাঁদেরকে দেখতে পাই না। তাঁরা ফেরেস্তাদের মতোই অদৃশ্য হয়ে যান। আল্লাহ্ পাক যে সকল মনোনীত

[১]. নাসায়ী : আস সুনান, সূরাতুস শু'য়ারা, ৬/৪৫৫ হাদীস নং ১১৪৮০।
ক. আবূ উয়ানা : আল মুস্নাদ, কিতাবুল ঈমান, ১/১১৭।
খ. বুখারী : আস সহীহ, ৪/১৫২ হাদীস নং ৩৩৯৪।

বুযূর্গদেরকে কারামতস্বরূপ দর্শনক্ষমতা মন্‌ঞ্জুর করেছেন, শুধুমাত্র তাঁরাই আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম-দেরকে দেখতে পান।[১]

ইমাম আস সুয়ূতী-ও তাই বলেছেন। ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম সুবকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম কুরতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁদের গুরুজনদের কাছ থেকে একই কথা রওয়ায়াত করেছেন। হাম্বলী মাযহাবের ইবনুল কাইয়েম আল জওযিয়া তার 'কিতাবুর রূহ' পুস্তকে হুবহু তা-ই লিখেছে। শাফেয়ী উলামা-এ-কেরাম হযরত ইবনে হাজর আল হায়তামী মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম খায়রুদ্দীন রামলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম কাজী যাকারিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং হানাফী উলামা-এ-কেরাম ইমাম ইবনে আবি হামজা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম ইবনুল হাজ্জ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'মাদখাল' গ্রন্থে এবং শায়েখ ইব্রাহীম লাক্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'জাওহরাতুত্ তওহীদ' কিতাবে এবং আরও বহু উলামা-এ-কেরাম একই বর্ণনা দিয়েছেন। সাইয়েদ ইবনে মুসাইয়াব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "হুজরাহ্ আন্ নববীয়াতে আযান ও ইক্বামত দিতে শোনা গিয়েছিল ঐতিহাসিক হাররা-এর ঘটনার দিন, যে দিন মসজিদে নববীতে আযান দেয়া যায়নি এবং নামাযও পড়া যায় নি।" এটা ঘটে ৬১ হিজরীতে, যে ঘটনাবহুল দিবসে ইয়াযিদ মদীনাবাসীদের ওপর অত্যাচার চালিয়েছিল। ইবনে তাইমিয়াও তার 'এ'তেক্বাদ-উস-সিরাতীল মুসতাক্বিম' পুস্তকে ঘটনাটি উদ্ধৃত করে। বহু মানুষ রওদাতুস্ সায়াদা-এর ভেতর থেকে তাঁদের সালামের প্রত্যুত্তর শুনেছেন। অন্যান্য মাযার-রওযা থেকেও বহুবার সালামের প্রত্যুত্তর শোনা গিয়েছে। আমরা এ ব্যাপারে পরে আলোচনা করবো। উলামায়ে ইসলামের ঐকমত্য অনুসারে বোঝা গিয়েছে যে নবীগণ তাঁদের মাযার-রওযায় জীবিতাবস্থায় রয়েছেন। একটি সহীহ হাদীসে ঘোষিত হয়েছে,

مَا مِنْ أَحَدٍ سَلَّمَ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللهُ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

"যখন কোনো ব্যক্তি আমাকে সালাম দেয়, তখন আল্লাহতা'আলা আমার রূহকে আমার দেহে ফিরিয়ে দেন এবং আমি সালাম দানকারীর সালামের উত্তর দেই।[২]

---

[১] . বায়হাক্বী : আল ই'তিক্বাদ, ফদ্বলুল আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম, ১/৩০৫।

[২]. ইসহাক্ব : আল মুস্‌নাদ, মা ইরবিয়া মিন মুহাম্মদ ইব্‌ন কায়স, ১/৪৫২ হাদীস নং ৫২৬।

এ কথা বলা যাবে না যে এই হাদীসটি উপরোল্লেখিত বিষয়ের সঙ্গে মতভেদ সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ, কেউ বলতে পারবে না যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রূহ মোবারক তাঁর দেহ মোবারককে ত্যাগ করেছিল, আর সালাম দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা তাঁকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। যারা এ রকম কথা বলেছে তাদেরকে যথোচিৎ জবাব দিয়েছেন উলামা-এ-ইসলাম। ইমাম আস সুয়ুতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ ধরনের সতেরোটি ব্যাখ্যামূলক উত্তর লিপিবদ্ধ করেছেন। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর উত্তর হচ্ছে এই যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামাল-আল্লাহ (খোদাতা'আলার সৌন্দর্য ) দেখার ফলে আনন্দে আত্মহারা অবস্থায় আছেন এবং তাঁর দেহের চেতনা লুপ্ত হয়েছে; যখন কোনো মুসলমান তাঁকে সালাম দেন, তখন তাঁর রুহ্ মোবারক এই অবস্থা থেকে জাগ্রত হন, আর দৈহিক চেতনা ফিরে পান। এ পৃথিবীতেও এই ধরনের অবস্থা কম নয়। দুনিয়াবী কিংবা অপার্থিব বিষয় সম্পর্কে চিন্তামগ্ন কোনো ব্যক্তি মানুষের কথাবার্তা শুনতে পায় না। তাহলে যিনি জামাল-আল্লাহ দর্শনে আত্মহারা, তিনি কীভাবে (সালামের) আওয়াজ শুনবেন?

ঘুমে কিংবা জাগ্রতাবস্থায় কি কেউ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখতে পারে? যদি তাঁকে দেখা যায়, তবে সেটা কি তিনি? নাকি তাঁরই অনুরূপ কোনো দৃশ্য? উলামাবৃন্দ এ প্রশ্নের উত্তর বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা শরীফে তাঁর জীবিত থাকার ওপর ইজমা ছাড়াও অধিকাংশ উলামা বলেছেন যে প্রকৃত প্রস্তাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কেই দেখা যায়। হাদীসসমূহ থেকেও তা বোঝা যায়। একটি হাদীস ঘোষণা করে,

مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ.

–যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখলো, সে যেন জাগ্রত অবস্থাতেই আমাকে দেখলো।[১]

---

১. আবূ দাঊদ : আস সুনান, ৪/১৭০ হাদীস নং ২৫৪২।
ক. আহ্মদ : আল মুস্নাদ, ১/৪০০ হাদীস নং ৩৭৯৮।
খ. ইব্ন মাজাহ : আস সুনান, বাবু রুইয়্যাতিন নবী, ২/১২৮০ হাদীস নং ৩৯০০।
গ. বায্যার : আল মুস্নাদ, ৭/২০১।
ঘ. আবূ উয়ানা : আল মুস্নাদ, ১/১৪৬।

এ কারণেই ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “স্বপ্নে তাঁকে দেখা যেন বাস্তবেই তাঁর দর্শন লাভ।” বস্তুতঃ ইমাম মানাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর ‘কানযুদ্ দাকাইক’ পুস্তকে একটা হাদীস রওয়ায়াত করেন যেটা ঘোষণা করে-

مَنْ رَآنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي.

–যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখবে, সে বাস্তবিকই আমাকে দেখবে, কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।[১]

যদি আমরা তাঁর অনুরূপ কিছু দেখে থাকি আমাদের স্বপ্নে, তাহলে তো আর আমরা তাঁকে বাস্তবিকই দেখবো না ইব্রাহীম লাক্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'জওহারাতুত্ তওহীদ' গ্রন্থে লিখেছেন, “মুহাদ্দেসীন উলামা সর্বসম্মতভাবে জানিয়েছেন যে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জাগ্রত কিংবা স্বপ্নে উভয় অবস্থাতেই দেখা যেতে পারে।” তবে হুযূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখা গেল, নাকি তাঁর মতো অন্য কাউকে দেখা গেল তা নিয়ে মতভেদ আছে; এর ওপর সর্বসম্মতি হয়নি। ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম কুরাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং আরও কয়েকজন উলামা বলেছেন যে তাঁর অনূরূপ অন্য কাউকে দেখা যায়। আর যাঁরা বলেছেন যে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কেই দেখা যায়, তাঁরাই হচ্ছেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। এঁদের মধ্যে রয়েছেন ত্রিশের অধিক মুহাদ্দীস ইমাম এবং মহান উলামা। আমি তাঁদের প্রত্যেকের দলিল-প্রমাণ একটা আলাদা পুস্তকে ব্যাখ্যা করেছি।

[১]. মুসলিম : আস সহীহ, বাবু ক্বাওলিন নবী, ৪/১৭৭৬ হাদীস নং ২২৬৮।
ক. আহ্মদ : আল মুস্নাদ, ৫/২২২০ হাদীস নং ১৫০০৭।
খ. ইব্ন আবী শায়বা : আল মুসান্নাফ, ৬/১৭৪ হাদীস নং ৩০৪৬৯।
গ.আবূ ইয়ালা : আল মুস্নাদ, মুসনাদু জাবের, ৪/১৮০ হাদীস নং ২২৬২।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

বেসালপ্রাপ্ত আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম ও আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর শ্রবণ ও দর্শনক্ষমতা প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে যে শহীদগণ তাঁদের মাযার-রওযায় জীবিত অবস্থায় রয়েছেন। আর আউলিয়া-এ-কেরাম আল্লাহ পাকের কারমতরূপ নেয়ামতের মাধ্যমে শ্রবণ ও দর্শন করে থাকেন; আল্লাহতা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের ওয়াস্তে তাঁর স্বাভাবিক রীতি-নীতিবহির্ভূত পদ্ধতিতে সৃষ্টি করে থাকেন। যে সব অজ্ঞ লোকেরা বিশ্বাস করে না যে আম্বিয়া-এ-কেরাম, বিশেষ করে তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হযরত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আউলিয়া-এ-কেরাম ও শহীদগণ তাঁদের মাযার-রওযায় শ্রবণ এবং দর্শন করতে পারেন, তাদেরকে স্তব্ধ করে দেবার জন্যে আমি সর্বপ্রথম ব্যাখ্যা করবো যে এমন কি মৃত কাফেররাও শুনতে ও দেখতে পায়। আল বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রওয়ায়াতকৃত একটি হাদীস ঘোষণা করে, “দাফনের পরে মৃতরা প্রস্থানকারী লোকদের পায়ের শব্দ শোনতে পায়” (হাদীস)। আল বুখারী ও মুসলিম শরীফে লিপিবদ্ধ একটি হাদীস বর্ণনা করে যে বদরের জিহাদে নিহত কাফেরদের লাশগুলোকে যুদ্ধের কিছু দিন পরে একটি গর্তে ফেলে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়; এর কিছুদিন পরে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে গমন করে প্রত্যেক কাফেরের নাম তার পিতার নামসহ উচ্চারণ করে বলেন, ”তোমাদের প্রতি ওয়াদাকৃত বস্তু কি তোমরা অর্জন করতে পেরেছ? আমি তো আমার রব (প্রভু)-এর ওয়াদাকৃত বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি।” এ কথা শুনে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করেন, ”এয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি কি এসব লোকদেরকে বলছেন, যারা লাশে রূপান্তরিত হয়েছে?” অতঃপর নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেন, “আমি আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের নামে বলছি যিনি আমাকে সত্য নবীস্বরপ প্রেরণ করেছেন যে, তুমিও আমাকে তাদের মতো এতো ভালভাবে শ্রবণ করতে পারো না। কিন্তু তারা উত্তর প্রদানে অক্ষম” (হাদীস)। আল বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণিত আরেকটি হাদীস ঘোষণা করে, “মৃত ব্যক্তি তার আত্মীয়বর্গের উচ্চস্বরে ক্রন্দনের জন্যে শাস্তি পায়”(হাদীস)। ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সহীহ মুসলিম শরীফের শরাহ বা ব্যাখ্যায় বলেন, ”বেসালপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাঁর আত্মীয়-পরিজনের উচ্চস্বরে ক্রন্দন দ্বারা আযাবপ্রাপ্ত হন।” মুহাম্মদ ইবনে জারির আত্ তাবারীও একই কথা বলেছেন। ইমাম কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা এবং উল্লেখ করেন

যে হুজূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মহিলাকে তার বেসালপ্রাপ্ত পুত্রের জন্যে উচ্চস্বরে কাঁদতে বারণ করেছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দেন, "ওহে মুসলমানরা। তোমরা কবরে শায়িত তোমাদের ভ্রাতাদেরকে উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করে আযাবযোগ্য করো না" (হাদীস)। হাদীসটি প্রতীয়মান করে যে বেসালপ্রাপ্তজন শ্রবণ করেন এবং আত্মীয়দের কান্নায় আযাব অনুভব করেন। নবীয়ে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, "কবরে বেসালপ্রাপ্তজনকে সম্ভাষণ জানানোর সময় সালাম দেবে" (হাদীস)। এ কারণেই মুসলমানগণ বলেন,'আস সালামু আলাইকুম এয়া আহলা দারিল কওমীল মুমিনীন'। নিশ্চয়ই এ ধরনের সম্ভাষণ একমাত্র শ্রবণ ও উপলব্ধি ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকেই দেয়া যায়। যদি তাঁরা না শুনতেন, তাহলে সালাম জানানো হতো অস্তিত্বহীনতাকে কিংবা পাথরকে। সালাফ আস্ সালেহীন, অর্থাৎ, মহান উলামা-এ-ইসলাম সর্বসম্মতভাবে বলেছেন যে বেসালপ্রাপ্তদের এভাবেই সম্ভাষণ জানাতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

বেসালপ্রাপ্তজন যিয়ারতকারীদেরকে চেনতে পারেন। 'কিতাবুল কুবুর' গ্রন্থে আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে আবিদ্ দুনইয়া লিখেছেন, "হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা রওয়ায়াত করেন, যিনি বলেন: 'যখন কোনো মুসলমান তার অপর কোনো মুসলমান ভ্রাতার কবর যিয়ারত করে কবরের পাশে বসে, তখন বেসালপ্রাপ্ত মুসলমানটি তাকে (যেয়ারতকারীকে) চেনতে পারে এবং তার সালামের জওয়াব দেয়' (হাদীস)। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রওয়ায়াতকৃত একটি হাদীস ঘোষণা করে: 'যদি কেউ তার কোনো পরিচিত মানুষের কবর যিয়ারত করে সালাম দেয়, তবে বেসালপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাকে চেনতে পারে এবং সালামের প্রত্যুত্তর দেয়। আর যদি সে অপরিচিত কোনো বেসালপ্রাপ্ত মুসলমানকে সালাম দেয়, তাহলে বেসালপ্রাপ্ত ব্যক্তি আনন্দিত হয় এবং সালামের জওয়াব দেয়' (কিতাবুল কুবুর)। ইউসুফ ইবনে আবদুল বর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং 'আহকাম' কিতাবের লেখক আবদুল হক বলেছেন যে হাদীসটি সহীহ্। ইবনুল কাইয়েম আল্ জওযিয়া তার 'কিতাবুর্ রূহ' গ্রন্থে হাদীসটি উদ্ধৃত করে বহু খবর দেয় এবং জানায় যে এ বিষয়ে আরও বহু খবর লেখার আছে। হাদীসটিতে ব্যবহৃত 'যিয়ারত' শব্দটি ব্যবহার করা হতো না, যদি বেসালপ্রাপ্তজন যিয়ারতকারীকে চেনতে না পারতেন। সকল ভাষায় এবং সকল অভিধানে এই শব্দটিকে পরিচিত মানুষদের মধ্যে পরস্পরের সাক্ষাৎ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে সাক্ষাৎকারীগণ একে অপরকে

বুঝতে সক্ষম। আর 'সালামুন আলাইকুম' শব্দটি তো সেই ব্যক্তিকেই বলা যায়, যিনি তা বুঝতে পারেন। যদি কোনো ব্যক্তি কবরের কাছে সালাত আদায় করেন, তাহলে বেসালপ্রাপ্তজন তা বুঝতে পারেন এবং তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। ইয়াযিদ ইবনে হারুন রওয়ায়াত করেন, "ইবনে সাসাব একটি দাফন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তাঁর পরণে হালকা বস্ত্র ছিল। একটি কবরের পাশে তিনি দুই রাকআত (নফল) নামায পড়েন। এরপর তিনি কবরটির ওপর হেলান দিয়ে দাঁড়ান। তিনি আল্লাহ পাকের নামে শপথ করে বলেন যে, তিনি জাগ্রত অবস্থায় কবরটির ভেতর থেকে একটি কণ্ঠস্বরকে বলতে শোনেন, 'আমাকে ব্যথা দেবেন না। আপনি এবাদত করেন কিন্তু শুনতে পান না। আপনি জানেনও না। আমরা জানি, কিন্তু নড়াচড়া করতে পারি না। আমার দৃষ্টিতে ওই দুই রাকআত সালাতের মতো মূল্যবান জিনিস আর নেই।' কবরে শায়িত বেসালপ্রাপ্তজন বুঝতে পেরেছিলেন যে ইবনে সাসাব সামায পড়েছিলেন এবং কবরের ওপর হেলান দিয়েছিলেন।" উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর ইবনুল কাইয়েম আল জওযিয়া সাহাবা-এ-কেরামের কাছ থেকে বর্ণিত আরও অনেক ঘটনার বর্ণনা দেয়, যেগুলোতে প্রমাণিত হয় যে বেসালপ্রাপ্তজন শ্রবণ করতে সক্ষম। ওয়াহহাবীরা ইবনুল কাইয়েম আল জওযিয়াকে একজন মুজতাহিদ মনে করে থাকে, অথচ তার উপরোক্ত লেখনীতে বিশ্বাস করে না এবং আরও দাবি করে যে এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী মুসলমান সর্বসাধারণ মুশরিক। ওহাবীদের এই ধরনের আচরণ থেকে পরিস্ফুট হয় যে তারা উলামায়ে ইসলামকে শ্রদ্ধা করে না; কিন্তু তাদের স্বার্থের সঙ্গে খাপ খেলে তারা তাঁদের প্রশংসা করে থাকে। আরও প্রতিভাত হয় যে তারা ইসলামী উলামাদের পছন্দও করে না।

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে বদরের জিহাদে নিহত কাফেররা, যাদেরকে একটি গর্তের মধ্যে ফেলে দেয়া হয়েছিল, তারা শুনতে পায়নি। এই কারণেই কিছু লোক মনে করেছিল যে মৃতজন, এমন কি বিশ্বাসীগণও কবরে শুনতে পান না। আর কিছু অজ্ঞ লোকে বলেছিল যে শহীদগণ, এমন কি হুযূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও শুনতে পান না। যারা মনে করেছিল যে বেসালপ্রাপ্তজন শুনতে পান না, তারা ভুল করেছিল; কারণ হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন যে গর্তে সমাহিত কাফেররা-ই শুধু শ্রবণ করতে অক্ষম। তারা মনে করেছিল এই 'শ্রবণ' বুঝি সেই অর্থে, যেভাবে সূরা আল ফাতির-এর ২২নং আয়াতে ঘোষিত হয়েছে,

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ.

–আপনি মৃতদের শোনাতে পারবেন না।[১]

অথচ এটা সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। 'শ্রবণ' শব্দটিকে মহান উলামা-এ-কেরাম ব্যাখ্যা করেছেন শ্রবণ ও বিশ্বাসের মাধ্যমে স্বীকার (কবুল) করে নেয়ার অর্থে। এই ধরনের আয়াতগুলোতে আল্লাহতা'আলা কর্ণ, চক্ষু ও মস্তিষ্কসম্পন্ন কাফেরদেরকে কবরে অবস্থিত মৃতদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই তুলনাটা কিন্তু শ্রবণ ও উপলব্ধির ক্ষেত্রে নয়, বরং গোঁড়ামি ও নির্লিপ্ত মনোভাবের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ, অনিচ্ছা ও অবিশ্বাসের ক্ষেত্রে। মৃত্যুর ব্যাধির সময় পরবর্তী জগতে নিজের স্থান দর্শনের পর কোনো কাফের যদি বিশ্বাস করার ইচ্ছা পোষণ করে, তাতে তার কোনো লাভ হবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন, "পরকালে যারা বদকার হিসেবে চিহ্নিত, তাদের প্রতি আপনার বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান তাদের জন্যে কোনো সুফলই বয়ে আনবে না" (আয়াত)। এই ধরণের লোকদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান তাদের কোনো কাজে আসবে না, ঠিক যে রকম কাজে আসবে না সেই ধরনের কবরবাসীর বিশ্বাস যারা কবরে যেয়ে প্রত্যক্ষ করে বিশ্বাস করেছে, অথচ যাদের প্রত্যক্ষ না করেই বিশ্বাস করা উচিৎ ছিল। মৃতদের এ রকম বিশ্বাস গ্রহণযোগ্য হবে না। আয়াতে উল্লেখিত 'শ্রবণ'-এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে 'স্বীকৃতি'। উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ বলে 'এ নারী এমনই মেয়েলোক যে সে কোনো কথা-ই শোনে না', তখন সে বোঝায় যে মহিলাটি শুনেও কথায় মনোনিবেশ করে না। কাফেরদের প্রতি অবতীর্ণ দুটো আয়াতেই 'শ্রবণ' শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কাফেররা জীবিত এবং তাদের কর্ণ ও চক্ষু আছে, কিন্তু যেহেতু আল্লাহ পাক তাদেরকে পাপিষ্ঠ বানিয়েছেন এবং অন্তরগুলোকে মোহর মেরে দিয়েছেন, সেহেতু তিনি তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলেছেন, "আপনি তাদেরকে শোনাতে পারবেন না"; অর্থাৎ, "আপনি যখন তাদেরকে বলবেন তখন তারা বিশ্বাস করবে না। তাদের বিশ্বাসকে গ্রহণ করা হবে না, ঠিক যে রকম কবরস্থ কাফেরদের বিশ্বাসকে গ্রহণ করা হবে না।" হাদীসসমূহে বিবৃত হয়েছে যে বেসালপ্রাপ্তজন শ্রবণ করতে পারেন। যে অর্থ ওই হাদীসগুলোতে বিবৃত হয়েছে, তাতে প্রতিভাত হয় যে বেসালপ্রাপ্তজন কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করে থাকেন। তবে উপরোক্ত দুটো আয়াতেই 'শ্রবণ'-এর অর্থ হচ্ছে 'গ্রহণ'

[১]. আল কুর'আন : ফাতির, ৩৫/২২।

(স্বীকার)। যুক্তিসঙ্গত চিন্তাধারার অধিকারী যে কোনো ব্যক্তিই শ্রবণের এই দুটির অর্থের পার্থক্য স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন। “আপনি তাদেরকে শোনাতে পারবেন না”-আয়াতটির পর আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ.

আপনি শুধু তাদেরকেই শোনাতে পারবেন যারা ঈমান এনেছে।[১]

আল্লাহ তা'আলা জ্ঞাত করেন যে ঈমানদার (বিশ্বাসী)-গণ শ্রবণ করতে সক্ষম। এই বিবৃতি থেকেও বোঝা যায় যে শ্রবণের অর্থ 'স্বীকার' বা 'গ্রহণ' করে নেয়া। যদি কেউ বলে যে 'আপনি মৃতদের শোনাতে পারবেন না,' বাক্যটির অর্থ তারা কান দ্বারা শুনতে পারে না, তাহলে আল্লাহ তা'আলা বোঝাচ্ছেন যে কবরস্থ বিশ্বাসীগণ শ্রবণ করতে পারেন (অর্থাৎ, আয়াতের অবশিষ্টাংশকেও একই অর্থে গ্রহণ করতে হবে ওই ব্যক্তিকে)। যেহেতু কোরআন-এ-করীমে স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে যে বেসালপ্রাপ্ত ঈমানদারগণ শুনতে পান, সেহেতু কেউই একে অস্বীকার করতে পারবে না, যদি সেই ব্যক্তি কুরআনের পর মুসলমানগণের কাছে গৃহীত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল হাদীসসমূহের অস্বীকার করেও।

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে শুধুমাত্র মৃত কাফেররা-ই শুনতে পায় নি। কারণ তাঁর রওয়ায়াতকৃত একটি হাদীস ঘোষণা করে: ”যখন কোনো মুসলমান তার কোনো মুসলমান ভ্রাতার কবর যিয়ারত করে এবং কবরের পাশে বসে, তখন কবরস্থ মুসলমানটি তাকে চেনতে পারে এবং তার সালামের প্রত্যুত্তর দিয়ে থাকে।” হাদীসটি আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বেসালপ্রাপ্ত ব্যক্তির এই চেনার এবং সাড়া দেবার ক্ষমতা প্রতীয়মান করে যে তিনি যিয়ারতকারীকে দেখতে এবং তার সালাম শুনতে পান। যদিও হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন যে মৃত কাফেররা শুনতে পায় না, তবুও তিনি আরও বলেছিলেন যে তারা জানতে সক্ষম; তাঁর রওয়ায়াতকৃত একটি হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, “তারা (কাফেররা) এখন জানে যে আমি সত্য বলেছিলাম” (হাদীস)। উলামাগণ ঘোষণা করেছেন যে, কোনো ব্যক্তি 'শ্রবণের' মাধ্যমেই জানতে পারে। অতএব, এই দুটো শব্দের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়েম আল জওযিয়া, ইবনে রাজাব ও ইমাম আস্ সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং আরও বহু উলামা বলেছেন যে উপরোক্ত ব্যাখ্যাটি-ই সত্য, সঠিক। যদি কিছু অজ্ঞ

১. আল কুর'আন/ আন নমল, ২৭/৮১ ।

লোকের কথানুযায়ী মৃত্যুর অর্থ হতো অনস্তিত্ব, তাহলে বেসালপ্রাপ্তজনের সকল ইন্দ্রিয়ই অস্তিত্ববিহীন হয়ে পড়তো। কিন্তু হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণিত এবং বুখারী শরীফে লিপিবদ্ধ হাদীসটি ব্যক্ত করে যে বেসালপ্রাপ্তজন জানতে সক্ষম। অতএব, হাদীসটি থেকে প্রতিভাত হয় যে বেসালপ্রাপ্তজনের ইন্দ্রিয় চেতনা লুপ্ত হয় না। অন্যান্য সাহাবী কর্তৃক রওয়ায়াতকৃত হাদীসসমূহ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে যে বেসালপ্রাপ্তজন শুনতে পান। 'শ্রবণ' অর্থ 'স্বীকার ও বিশ্বাস করে নেয়া'- হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর এই ধারণাটি উলামাগণের এজমার সঙ্গে মতভেদ সৃষ্টি করেছে। তাঁর কথার সঙ্গে সাহাবা-এ-কেরামের কথার সর্বোত্তম সঙ্গতি আনতে সক্ষম একমাত্র সেই হাদীসটি যেটা মাযার যিয়ারত সংক্রান্ত, আর যেটা হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-ই রওয়ায়াত করেছেন।

'আল হিদায়া' গ্রন্থের শরাহ-এ (ব্যাখ্যায়) ইবনুল হুমাম লিখেছেন, "শপথ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে হানাফী উলামা-এ-কেরাম বলেন: 'বেসালপ্রাপ্তজন শ্রবণ করতে পারেন না'।" অপর পক্ষে, মিশকাত শরীফের শরাহ-তে (ব্যাখ্যায়) বদরের জিহাদে নিহত কাফেরদের সম্পর্কে হাদীসটি ব্যাখ্যাকালে মোল্লা আলী ক্বারী লিখেন: "শপথ সংক্রান্ত বিষয়ে হানাফী উলামার মন্তব্যসমূহ (ভাষাগত) প্রথার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ সব কথা পরিস্ফুট করে না যে বেসালপ্রাপ্তজন শ্রবণ করতে পারেন না। 'শপথ' সংক্রান্ত জ্ঞান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে যেয়ে হানাফী উলামা-এ-কেরাম বলেন, 'যদি কোনো ব্যক্তি গোস্ত/মাংস না খাওয়ার শপথ করে থাকেন এবং এরপর মাছ ভক্ষণ করেন, তবে তাঁর শপথ ভাঙ্গবে না।' অথচ আল্লাহ তা'আলা মাছকে 'সুস্বাদু' গোস্তস্বরূপ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু মাছের গোস্ত প্রথানুযায়ী (সাধারণ) গোস্ত থেকে পৃথক। অনুরূপভাবে, যদি কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির সঙ্গে কথা না বলার শপথ করেন এবং অপর ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সঙ্গে কথা বলেন, তবে তার শপথ ভাঙ্গবে না। কারণ 'আলাপের'- এর অর্থ প্রথানুযায়ী মুখোমুখি হয়ে কথা বলা। একজন বেসালপ্রাপ্ত ব্যক্তি শ্রবণ করতে পারেন, কিন্তু যেহেতু তিনি স্বাভাবিক শ্রবণ উপযোগী পদ্ধতিতে কথা বলেন না, সেহেতু প্রথানুসারে উভয়ের মধ্যে আলাপ হতে পারে না। এ কারণেই তার (জীবিত ব্যক্তির) শপথ ভঙ্গ হবে না; বেসালপ্রাপ্ত ব্যক্তির শ্রবণ না করার কারণে নয়" (মোল্লা আলী ক্বারী)। ইবনুল হুমাম হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর কথা উদ্ধৃত করেন, যিনি বলেন যে বদরের জিহাদে নিহত কাফেরদের সঙ্গে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথপোকথন বর্ণনাকারী হাদীসটি অ-সহীহ। ইবনুল হুমাম আরও লিখেছেন, হযরত আয়েশা (র:) বলেছিলেন যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের কোনো কথা-ই বলতে পারেন না,

যেহেতু আল্লাহতা'আলা ইরশাদ করেছেন, "আপনি মৃতদের শোনাতে পারবেন না। আপনি কবরের মধ্যে অবস্থিতদের শোনাতে পারবেন না" (আয়াত); কিন্তু হাদীসটি সর্বসম্মতিক্রমে রওয়ায়াত করা হয়েছে। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এতে বিশ্বাস করেননি এ কথাটা আমরা গ্রহণ করতে পারিনা। তাছাড়া, উক্ত আয়াত এবং হাদীসের মধ্যে কোনো বিরোধ-ই নেই। আয়াতের মধ্যে 'মৃত' শব্দটি কাফেরদের প্রতি আরোপিত, আর শ্রবণের নেতিবাচক অর্থ হচ্ছে এটা তাদের কোনো কাজে আসবে না। কাফেররা শ্রবণে অক্ষম এই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি শব্দটি। "কাফেররা মূক, বধির, অন্ধ; তারা বুঝতে অক্ষম"- আয়াতটাও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, তাদের চোখ, কান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহতা'আলা ঘোষণা করেন যে তারা অন্ধ ও বধিরের মতো, যেহেতু তারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইসলাম এবং সঠিক পথের দিকে আহ্বানকে উপেক্ষা করেছিল। কুরআনের আয়াত "আপনি মৃতদের শোনাতে পারবেন না" ব্যাখ্যাকালে ইমাম বায়দাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "তারা (কাফেররা) ঠিক সেই সকল লোকের মতো যারা সত্য, সঠিক কথা শ্রবণকালে কানে তালা দেয়। আল্লাহ পাক তাদেরকেই শ্রবণ করার ক্ষমতা প্রদান করে থাকেন, যাঁদেরকে তিনি ইচ্ছা করেন, আর তাঁরাই হলেন নাজাতপ্রাপ্ত।" অবিশ্বাসের মধ্যে একগুঁয়েদেরকে আল্লাহতা'আলা মৃতদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। উপরোক্ত আয়াতটি নিম্নোক্ত আয়াতের মতোই "যাদেরকে আপনি ভালোবাসেন তাদেরকে চাইলেই বিশ্বাস করাতে পারবেন না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাকে চান তাকে ঈমানদার বানাতে পারেন।" ইবনুল হুমাম বলেন, 'মৃতদেরকে শোনানো একমাত্র হুযূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্যেই খাস্।" কিন্তু আমাদের কাছে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্যে কোনো বিষয়কে খাস্ বলার পক্ষপাতী ব্যক্তিকে প্রামাণ্য দলিল দেখাতে হবে। এই ধরনের কোনো দলিল এ বিষয়ে নেই। হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রশ্নটি অথবা তাঁর প্রতি দেয়া উত্তরটি কোনোটি-ই এই ধরনের ইঙ্গিত বহন করে না। যদিও ইবনুল হুমাম বলেছেন, "বদরের জিহাদে নিহত কাফেরদের সঙ্গে আলাপ আসলে একটা প্রবাদ বাক্য উচ্চারণের মতোই", তবুও হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি প্রদত্ত উত্তরটি পরিস্ফুটু করে যে এ কথা সত্য নয়। ইবনুল হুমাম বলেন, "মুসলিম শরীফে লিপিবদ্ধ হাদীসটা, যেটাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে বেসালপ্রাপ্তজন দাফনের পরবর্তী সময়ে দাফনকারীদের প্রস্থানকালীন পদ-শব্দ শুনতে পান, সেটাতে প্রতিভাত হয় যে বেসালপ্রাপ্তজন ফেরেশতাদের প্রশ্নসমূহ শুধুমাত্র প্রশ্ন পেশকালীন সময়েই শুনতে পান। আরো প্রতিভাত হয় যে তাঁরা প্রশ্ন-পর্ব শেষ হওয়ার পর

আর কখনো শুনতে পান না। কারণ , আয়াতটিতে পরিস্ফুট হয়েছে যে বেসালপ্রাপ্তজন শ্রবণ করতে অক্ষম। কাফেররা যে শ্রবণ করতে অক্ষম, তা বোঝাতে যেয়ে আল্লাহতা'আলা তাদেরকে মৃতদের সঙ্গে তুলনা করেছেন।" আমাদের উত্তর হচ্ছে, এই যুক্তিটি নিজেকেই নিজে ভুল প্রমাণ করে। কারণ যে ব্যক্তি বলে যে বেসালপ্রাপ্তজন দাফনের পরপরই শুনতে সক্ষম, তাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে তাঁরা সবসময়ই শুনতে সক্ষম। কোনো আলেমই বলেননি যে বেসালপ্রাপ্তজন প্রশ্ন-পর্বের পর আর শ্রবণ করবেন না। উপরন্ত, 'তাঁরা দাফনের পর কিছুকাল শ্রবণ করবে পারবেন'- এই ধারণাটিকেও তাহলে আয়াতের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বিবেচনা করতে হবে।

আহলে সুন্নতের উলামা-এ-কেরামের সর্বসম্মত মতানুযায়ী বেসালপ্রাপ্তজনকে সালাম দেয়া সুন্নত। 'মাসাবিহ'-এর শরাহ-তে মহান আলেম ইবনে মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কবরস্থ বেসালপ্রাপ্তজনকে সালাম দেয়ার হাদীসটি ব্যাখ্যাকালে বলেন, "যারা বলে যে বেসালপ্রাপ্তজন শ্রবণ করতে অক্ষম, তাদেরকে এই হাদীসটি ভ্রান্ত প্রমাণ করে। পরবর্তী হাদীস, যেটা লিপিবদ্ধ আছে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর 'সুনান' এবং আবু দাউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর গ্রন্থে, হাকিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর 'মুসতাদরাক', ইবনে আবি শায়বা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর 'আল মুসান্নাফ', ইমাম বায়হাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর 'আযাবুল কুবূর', আত্ তায়ালিসী ও আব্দু ইবনে হামিদের 'মুসনাদ' গ্রন্থ দুটোতে, হামাদ ইবনে আস্ সিররীর 'আয যুহদ' গ্রন্থে, যার মধ্যে ইবনে জারির তাবারী এবং ইবনে আবি হাতেম ও বাররা ইবনে আযিব কর্তৃক লিপিবদ্ধ সহীহ সনদ-এর উল্লেখ আছে, সেই হাদীসটাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'বেসালপ্রাপ্ত মুসলমানের সপক্ষে এটা কণ্ঠস্বরকে বলতে শোনা যাবে, "আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে।" একটা বেহেশতী পন্দা কবরের ওপরে বিছিয়ে দেয়া হবে এরপর। ওই মুসলমানকে বেহেশতী পোষাক পরিধাণ করানো হবে। বেহেশতের একটা দরজা তার জন্যে খুলে দেয়া হবে। ফলে বেহেশতী সুগন্ধ কবরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। তার দৃষ্টি যতো দূর যাবে ততো দূর কবরের আকৃতি প্রসারিত হবে। এরপর কবরের মধ্যে প্রবেশ করবে এক সুদর্শন ও সুন্দর পরিচ্ছদাবৃত ব্যক্তি। তার শরীর থেকে সুগন্ধ বের হতে থাকবে। ওই বেসালপ্রাপ্ত মুসলমান তাকে জিজ্ঞাসা করবে,

مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ وَجْهٌ يُبَشِّرُ بِالْخَيْرِ؟ قَالَ: فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ،

قَالَ: فَهُوَ يَقُولُ: رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ كَيْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي.

–আপনি কে? আপনার মুখমন্ডল কেন এতো জ্যোতির্ময়?" ওই ব্যক্তি উত্তর দেবে, "আমি হলাম আপনার নেক আমল।" তখন বেসালপ্রাপ্ত মুসলমান বলবে, "হে আমার আল্লাহ পুনরুত্থান অতি সহসা সংঘটিত হোক, যাতে আমি আমার গৃহস্থালী ও সম্পত্তির সাক্ষাৎ শিগগির পেতে পারি।[১]

এর বিপরীত আযাব পতিত হয় মৃত কাফেরদের ওপর। এই হাদীসটি প্রতীয়মান করে যে বেসালপ্রাপ্তজন শোনেন, দেখেন, কথা বলেন, ঘ্রাণ নেন, উপলব্ধি করেন, চিন্তা করেন এবং উত্তর দেন। এগুলোর সবই প্রশ্ন-পর্বের পর কবরের মধ্যে সংঘটিত হয়। উলামা-এ-কেরাম সর্বসম্মতভাবে জানিয়েছেন যে এটাই সত্য। ইমাম সৈয়ুতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতো হাদীসবিদ ইমামগণ বলেছেন যে এই হাদীসটি 'মুতাওয়াতির'- অর্থাৎ, নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলোর মধ্যে অন্যতম। হাদীসটি পরিস্ফুট করে যে বেসালপ্রাপ্ত জনকে সালাম জানানো জীবিতদেরকে সালাম জানানোর মতোই ব্যাপার; আর এও প্রতিভাত হয় যে বেসালপ্রাপ্তজন শ্রবণ করতে সক্ষম"।[২]

'ফতোওয়া-এ-হিন্দীয়া' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, "ইমাম আল আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ঘোষণা করেছেন যে কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ নয়। ইমাম মুহাম্মদ শায়বানীর কথা থেকে আরও বোঝা যায় যে মহিলাদের জন্যেও কবর যিয়ারত করা অনুমতিপ্রাপ্ত।" 'তাহযিব' গ্রন্থে লেখা আছে, "কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব। বেসালপ্রাপ্তদের যিয়ারত করা যেন তাদের সঙ্গে তাদের জীবদ্দশায় সাক্ষাৎ করার মতোই ব্যাপার, তবে তা সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার ওপর নির্ভরশীল।" 'খাযানাতুল মুফতীন' কিতাবেও একই মত ব্যক্ত হয়েছে। কবর যিয়ারতকালে প্রত্যেকের উচিৎ পায়ের জুতা খুলে ফেলা। কবরস্থ বেসালপ্রাপ্ত ব্যক্তির মুখের দিকে মুখ করে কাবার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যেককে বলতে হবে, "আস্ সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর। আল্লাহতা'আলা আপনাদের এবং

---

[১]. আবূ দাঊদ : আস সুনান, ২/১১৭।
ক. হাকিম : আল মুস্তাদরাক, ১/৯৩ হাদীস নং ১০৭।
[২]. ইব্ন মালেক : শরহে মাসাবিহ্।

আমাদের ক্ষমা করুন। আপনারা আমাদের পূর্বসূরী এবং আমরা আপনাদের অনুগামী।” ‘গারাইব’ পুস্তকটাও একই বক্তব্য প্রদান করে। কবরস্থানে নিম্ন স্বরে অথবা উচ্চস্বরে সুরা-এ-মুলক তেলাওয়াত করা যেতে পারে। ‘যাহিরা’ গ্রন্থের ’কবরের পার্শ্বে কুরআন তেলাওয়াতের ফযীলত’ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে যে অন্যান্য সুরাও পাঠ করা যেতে পারে। কাযী খানের ফতোওয়াসমূহে লিপিবদ্ধ আছে, যে ব্যক্তি কবরস্থ বেসালপ্রাপ্ত ব্যক্তির মনে আনন্দ দেয়ার জন্যে কুরআন মজীদ উচ্চস্বরে পড়ার ইচ্ছা রাখে, সে তা করতে পারে। আর যে ব্যক্তি নিঃশব্দে পড়তে চায়, সেও তা করতে পারে। কারণ, আল্লাহতা’আলা কুরআন তেলাওয়াত শুনতে পান যেভাবেই তা পড়া হোক না কেন। ‘বিযাযিয়্যা’ গ্রন্থটা বলে, ”কবরস্থানে সবুজ ঘাস তুলে নেয়া মকরূহ; যেহেতু প্রতিটি ঘাসের পাতা-ই আল্লাহ পাকের তসবিহ পাঠে রত। এই তসবিহটি বেসালপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কবর আযাব থেকে নিষ্কৃতি দেয়। বেসালপ্রাপ্তজন এ সকল তসবীহ দ্বারা স্বস্তি অনুভব করেন।” আশ্ শার্নবলালীর ’ইমদাদুল ফিতাহ’ গ্রন্থে এবং অন্যান্য হানাফী উলামার গ্রন্থেও একই কথা লেখা রয়েছে। যদি বেসালপ্রাপ্তজন ঘাসের তসবিহ পাঠ শুনতে পান যা জীবিতরা শুনতে পায় না, যে ব্যাপারটি ফতোওয়া প্রদানের ক্ষমতাসম্পন্ন মহান উলামা-এ-কেরাম ঘোষণা করেছেন সত্য হিসেবে, তাহলে এ কথা কীভাবে ধারণা করা যায় যে বেসালপ্রাপ্তজন তাঁদের প্রতি সম্ভাষণ দানকারী ব্যক্তিদের কথা শুনবেন না? যাঁরা বলেছেন যে বেসালপ্রাপ্তজন শ্রবণ করতে পারেন না, তাঁরা সম্ভবতঃ বুঝিয়েছেন যে জীবিতদের মতো কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করতে তাঁরা অক্ষম। এই মাপকাঠিতে ফিকাহ কিতাবগুলোর মধ্যে ‘শপথ’ অধ্যায়ে বর্ণিত বক্তব্যগুলোর পারস্পরিক সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসও বিশ্বাস করা যায়; আর ফলস্বরূপ এর ওপর উলামাগণের মতৈক্যও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। যদি কেউ বলে যে “ইমাম আল মযহাব হযরত আবু হানিফা এটা বিশ্বাস করেন নি”, তবে আমাদের উত্তর হচ্ছে এই মহান ইমামও অন্যান্য ইমাম আল মযহাবের মতো ঘোষণা করেছেন, “আমার মযহাব সহীহ্ হাদীসের ওপর প্রতিষ্ঠিত।” বস্তুতঃ তিনি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অনুসরণ করতে যেয়ে ‘মুরসাল’, এমন কি ‘যয়ীফ’ হাদীসও তাঁর মযহাবের জন্যে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাহলে এ কথা কীভাবে ধারণা করা যায় যে তিনি সহীহ হাদীস অমান্য করবেন? এখানে বোঝা যায় যে কিছু উলামা ’বেসালপ্রাপ্তজন শ্রবণে অক্ষম’ এ কথাটি বলে বুঝিয়েছেন যে তাঁরা পৃথিবীতে জীবিতদের শ্রবণ করার পদ্ধতি অনুযায়ী শ্রবণ করেন না। কারণ, সহীহ

হাদীসকে অমান্য করে অন্য কারও কথার অনুগামী হওয়ার অনুমতি কোনো আলেমেরই নেই।

হানাফী উলামাগণের এজমা অনুযায়ী হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গে সমাধিস্থ দুইজন সাহাবীর মাযার যিয়ারত করা, সালাম জানানো এবং তাঁদের শাফায়াত প্রার্থনা করা সুন্নাত। যদি তাঁরা বিশ্বাস না করতেন যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাগণ শুনবেন, তবে তাঁদের কথা পরস্পরবিরোধী হতো, এমন কি 'মাযার যিয়ারত করা সুন্নত' এই ফতোয়াতেও তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিতো। 'শপথ' সংক্রান্ত বিষয়ে হানাফী উলামার কথাগুলোকেও যদি পৃথিবীতে জীবিতদের শ্রবণের অর্থে নেয়া হয়, তাহলেও আর কোনো মতপার্থক্য বিরাজ করবে না।

<u>**সম্পূরণ**</u>

ইবনে তাইমিয়া তার প্রণীত 'কিতাবুল ইনতিসার ফীল ইমামিল আহমদ' পুস্তকে লিখেছে, "বদরের জ্বিহাদে নিহত কাফেররা যে হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা শুনেছিল এ কথা বিশ্বাস না করাটা হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্যে দোষযুক্ত নয়, কেননা তিনি হাদীসটি শোনেন নি। কিন্তু অন্যদের জন্যে এতে বিশ্বাস না করা দূষণীয় হবে, যেহেতু এই হাদীসটি বিপুল প্রসার লাভ করে এবং ওই সকল ইসলামী বিশ্বাসের একটিতে পরিণত হয় যার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা একান্ত অপরিহার্য। ইবনে তাইমিয়া বোঝাতে চেয়েছে যে বদরের জ্বিহাদে নিহত কাফেরদের শ্রবণ করার ব্যাপারটির ওপর অবিশ্বাসকারীরা কাফেরে রূপান্তরিত হবে। কারণ, মযহাবের কিতাবসমূহে লিখা রয়েছে, যে ব্যক্তি ইসলামের কোনো বিষয়, যেটার ওপর পরিপূর্ণ ঈমান আনা অপরিহার্য, সেটা যদি সে অবিশ্বাস করে, তবে সে কাফেরে পরিণত হবে। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং স্বল্প সংখ্যক উলামা যাঁরা বলেছিলেন যে বেসালপ্রাপ্তজন শ্রবণ করতে অক্ষম, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে মৃত কাফেররা-ই শ্রবণ করতে অক্ষম। কিন্তু হযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আউলিয়া-এ-কেরাম ও শহীদগণ শুনতে না পাওয়ার ব্যাপারটিতে কোনো আলেম-ই বিশ্বাস করেন নি। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্যান্যরাও তাঁদের শ্রবণ ক্ষমতায় বিশ্বাস করতেন। বেসালপ্রাপ্তজন, এমন কি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও শ্রবণ করতে অক্ষম ওয়াহহাবীদের এই অভিযোগটি কী রকম জঘন্য পর্যায়ের তা সহজেই অনুমেয়। মহান

আল্লাহতা'আলা যিনি 'কাহহার', তিনি এসব গোমরাহদেরকে চরম শাস্তি দেবেন নিঃসন্দেহে। মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করার ওপর প্রদত্ত ফতোওয়াসমূহে ইবনে তাইমিয়া জিজ্ঞাসা করে, "বেসালপ্রাপ্তজন কি তাঁদের যিয়ারতকারীদেরকে চেনতে পারেন? তাঁদের পরিচিত কিংবা অপরিচিত এমন কোনো ব্যক্তি যদি তাঁদের কবর যিয়ারত করে, তাহলে কি তাঁরা বুঝতে পারেন যে একজন যিয়ারতকারী এসেছিল?" এরপর ইবনে তাইমিয়া উত্তর লিখেছে, "হ্যাঁ, তাঁরা চেনতে এবং বুঝতে পারেন।" সে আরও সেই সব রওয়ায়াতের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে, যেগুলোতে বেসালপ্রাপ্তজনের একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ, কুশলাদি বিনিময় এবং জীবিতদের কর্মফল তাঁদের কাছে প্রদর্শিত হওয়ার পর তাঁদের মধ্যকার আলাপ-আলোচনা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

إِذَا قُبِضَتْ نَفْسُ الْعَبْدِ تَلَقَّاهُ أَهْلُ الرَّحْمَةِ مِنْ عِبَادِ اللهِ كَمَا يَلْقَوْنَ الْبَشِيرَ فِي الدُّنْيَا، فَيُقْبِلُونَ عَلَيْهِ لِيَسْأَلُوهُ، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَنْظِرُوا أَخَاكُمْ حَتَّى يَسْتَرِيحَ، فَإِنَّهُ كَانَ فِي كَرْبٍ، فَيُقْبِلُونَ عَلَيْهِ فَيَسْأَلُونَهُ مَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ مَا فَعَلَتْ فُلَانَةٌ؟ هَلْ تَزَوَّجَتْ.

–হযরত খালিদ ইবনে যাইদ আবু আইয়ুব আল আনসারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রওয়ায়াত করেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস: "ঈমানদার ব্যক্তির রূহকে তার বেসালের সময় একজন নেয়ামতের ফেরশতা গ্রহণ করেন। অন্যান্য বেসালপ্রাপ্তজন তাকে ঘিরে ধরে রাখে ঠিক পৃথিবীতে শুভ-সংবাদ শ্রবণের আকাংখী ব্যক্তিবর্গের মতো। তারা তাকে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করে, আর কিছু বেসালপ্রাপ্তজন তখন বলে, 'তোমাদের ভাইকে একা থাকতে দাও যাতে সে বিশ্রাম নিতে পারে। সে একটা অস্বস্তিকর স্থান থেকে এসেছে।' তবুও তারা তাকে ঘিরে ধরে থাকে। বেসালপ্রাপ্তজন এ পৃথিবীতে তাদের পরিচিতদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, "অমুক কী কাজ করে? অমুক কি বিয়ে-শাদী করেছে?"[১]

---

১. আবূ দাউদ : আস সুনান, আবূল জাওয়া, ৪/১৪২ হাদীস নং ২৫১১।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন যে, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ শহীদগণ তাঁদের কবরে জীবিতাবস্থায় আছেন এবং তাঁরা সেখানে রিযকও পেয়ে থাকেন।[১] একটি হাদীসে বিবৃত হয়েছে أَنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي الْجَنَّةِ যে শহীদগণের রূহসমূহ বেহেশতী হবেন।[২]যদিও কিছু (উলামা) বলেছেন যে এ সব রহমত শুধু শহীদগণের জন্যেই নিন্দিষ্ট, সিদ্দিকগণের জন্যে নয়, তবুও আহলে সুন্নতের ইমামগণ যা বলেছেন তা-ই সত্য ও সঠিক। জীবন, রহমত এবং রূহ্সমূহের বেহেশতে গমন শুধুমাত্র শহীদগণের জন্যে খাস (নির্দিষ্ট) নয়। ইমামগণ ঘোষণা করেন যে, এ তথ্যটি কুরআন ও হাদীস থেকে বের করা হয়েছে। এ বিষয়টি শহীদগণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, মুসলমানগণ মৃত্যুর ফলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন মনে করে জ্বিহাদে অংশগ্রহণ করা হতে বিরত থাকার সম্ভাবনা ছিল। মুসলমানদের মন থেকে সন্দেহ দূর করে জ্বিহাদে অংশগ্রহণ করে শহীদ হওয়ায় অনুপ্রাণিত করা-ই ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য। وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ "দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না[৩]" -কুরআন মজীদের এই আয়াতটিও একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও দারিদ্র্যের ভীতি যেখানে নেই সেখানেও হত্যা করার অনুমতি নেই, তথাপি আয়াতটি এমন কতোগুলো ঘটনা সংঘটনকালে নাযিল হয়েছিল, যখন বহু মানুষ দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করতো।

এতোক্ষণ আমরা হাররানের আহমদ ইবনে তাইমিয়ার দলিল পেশ করলাম। ওয়াহহাবীরা বলে যে তারা ইবনে তাইমিয়ার অনুসরণ করে থাকে; অথচ তার বই-পুস্তক ও ধ্যান-ধারণা বুঝতেই অজ্ঞতার পরিচয় দেয় ওয়াহাবীরা। ইবনে তাইমিয়া বলে যে বেসাপ্রাপ্তজন শহীদগণের মতোই জীবিত এবং তাঁরা সেখানে নেয়ামত পান। ওয়াহহাবীরা তার অনুগামী হওয়ার কথাটায় কীভাবে মানুষেরা বিশ্বাস করবে, যখন তারা তারই কথা অমান্য করে কথা মান্যকারী মানুষদেরকে কাফের ও মুশরিক আখ্যা দেয়? এ সব আহাম্মকেরা, যারা বলে যে রাসূলে মকবুল

---

ক. ইব্ন মুবারক : আয যুহদ, বাবু বুশরাল মু'মীন, ১/১৪৯।

[১]. আল কুর'আন : আলে ইমরান, ৩/১৬৯।

[২]. মুসলিম : আস সহীহ, বাবু বয়ানি আরওয়াহিশ শুহাদায়ি ফিল জান্নাতি, ৩/১৫০২।

ক. সাঈদ ইব্ন মানসূর : আত তাফসীর, সূরা আলে ইম্‌রান ৩/১৬৯।

[৩]. আল কুর'আন : আল ইসরা, ১৭/৩১।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্রবণ, দর্শন, উপলব্ধি এবং যিয়ারতকারী ও তার শাফায়াত প্রার্থনাকে বুঝতে অক্ষম, তারা প্রকৃতপক্ষে কাউকেই অনুসরণ করে না একমাত্র তাদের নফসানীয়াতকে ছাড়া। আল্লাহ তা'আলা ওয়াহাবীদেরকে প্রকৃত এলম দান করুন, আমিন।

বেসালপ্রাপ্ত জন যে জীবিতদের দেখতে পান তার প্রামাণ্য দলিলগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে নিম্নোক্ত হাদীস "প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিকেই পরবর্তী জগতে তার (ভবিষ্যৎ) স্থান প্রদর্শন করা হয় প্রতিদিন সকালে এবং বিকেলে বেহেশতপ্রাপ্তকে তার স্থান দেখানো হয়, আর দোযখীকেও তার স্থান দেখানো হয়।" হাদীসটির রওয়ায়াতকারী হচ্ছেন আল বুখারী। 'প্রদর্শন' শব্দটির অর্থ তারা দেখতে পান। ফেরাউনের লোকজন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন "তাদেরকে প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্যায় জাহান্নামের আগুন প্রদর্শন করা হয়" (আয়াত)। যদি মৃতরা দর্শন না করতো, তবে 'প্রদর্শন'-এর কোনো অর্থ হতো না। আমর ইবনে দীনারের উদ্ধৃতি দিয়ে আবু নুয়াইম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি হাদীস রওয়ায়াত করেন, "যখন একজন মানুষ মৃত্যু বরণ করে, তখন একজন ফেরেশতা তার রূহকে ধরে রাখে। রূহ দেহের গোসল দান ও কাফনের কাপড় পরিধাণ-পর্ব দর্শন করে। তাকে বলা হয়: 'মানুষেরা কীভাবে তোমরা প্রশংসা করে তা শ্রবণ করো'।" আমর বিন দীনার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে নকল করে ইবনে আবিদ দুনিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রওয়ায়াত করেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস: "মৃত ব্যক্তি তার মৃত্যুর পর নিজ স্ত্রী এবং সন্তানদের জীবনে সংঘটিত ঘটনাবলী সম্পর্কে জানে। তাকে গোসল ও কাফনের কাপড় পরিয়ে দেয় যারা, তাদেরকেও সে দেখে" (হাদীস)। আল বুখারীর উদ্ধৃত একটি সহীহ হাদীস ঘোষণা করে, "প্রশ্ন-পর্ব শেষ হওয়ার পর মুনকির-নকির ফেরেশতাগণ মৃত ব্যক্তিকে বলেন, 'দোযখে তোমার স্থানটি দর্শন করো। আল্লাহতা'আলা তা পরিবর্তন করে বেহেশতে তোমাকে একটি স্থান মন্‌জুর করেছেন।' সে উভয় স্থান দর্শন করে" (হাদীস)।

হযরত আবু হোরায়রা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে আবিদ দুনিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও আল্ বায়হাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'শুয়াব আল ঈমান' গ্রন্থে একটি হাদীস রওয়ায়াত করেন: "যখন কোনো ব্যক্তি তার পরিচিত কোনো ইন্তেকালপ্রাপ্ত ব্যক্তির কবর যিয়ারত করে সালাম জানায়, তখন ইন্তেকালপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাকে চেনতে পারে এবং সালামের প্রত্যুত্তর দেয়। যদি ওই জীবিত ব্যক্তি অপরচিত কোনো ইন্তেকালপ্রাপ্ত ব্যক্তির কবরের পাশে যেয়ে সালাম জানায়, তবে ইন্তেকালপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার প্রত্যুত্তর দেয়" (হাদীস)। এ

হাদীসে প্রতিভাত হয় যে, বেসালপ্রাপ্তজন তাঁদের কবরের পাশে আগমনকারী ব্যক্তিদেরকে দেখতে পান। যদি তাঁরা না দেখতেন, তাহলে হাদীসটিতে উল্লেখ করা হতো না যে বেসালপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাঁর দুনিয়াবী জীবনে অপরিচিত কোনো ব্যক্তির সালাম কবরস্থ হওয়ার পর গ্রহণ করবেন এবং প্রত্যুত্তর দেবেন। প্রথমোক্ত ব্যক্তি চেনতে পেরে সালামের প্রত্যুত্তর দেন। দ্বিতীয় জন না চেনেও সালামের উত্তর দেন।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং হাকিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর কথাকে উদ্ধৃত করেন, যিনি বলেন: "আমার স্বামী (হুযূর-দ:) এবং আমার পিতা (হযরত আবু বকর রা:)-কে দাফন করার পর আমি যখন আমার ঘরে যেতাম, তখন বুরখা খুলে রাখতাম। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে সেখানে দাফন করার পর আর আমি কখনো বুরখা খুলিনি। কারণ তিনি আমার নিকটাত্মীয় ছিলেন না। আমার লজ্জার কারণেই আমি তা করতাম, যেহেতু তিনি সেখানে ছিলেন।" 'আরবাইনুত তাইয়্যা' কিতাবে লিপিবদ্ধ একটি হাদীস ঘোষণা করে, "মৃত ব্যক্তির ইহ-জীবনে স্নেহ-ভালোবাসাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি যদি তার যিয়ারত করে, তবে সে আনন্দিত হয়।" হাদীসটি প্রমাণ করে যে ইন্তেকালপ্রাপ্ত ব্যক্তি যিয়ারতকারীকে দেখতে পান। যদি তিনি না দেখতে পেতেন, তাহলে তো আনন্দিত হওয়ার কথাই ওঠতো না। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যু-পূর্বকালীন কথা উদ্ধৃত হয়েছে, যিনি বলেন: "যখন তোমরা আমাকে দাফন করবে, তখন আমার ওপর মাটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেবে। তারপর ততোটুকু সময় আমার কবরের পাশে অবস্থান করবে, যতোটুকু সময় একটি জন্তুকে জবেহ করে টুকরো টুকরো করতে লাগে। তোমাদের আশপাশে দেখলে হয়তো আমি আমার কবরের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবো এবং আমার আল্লাহ তা'আলা প্রেরিত ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তর অতি সহজেই দিতে পারবো।" এ ধরনের বহু রওয়ায়াত আছে বেসালপ্রাপ্তজণের শ্রবণ ও দর্শন ক্ষমতা সম্পর্কে। প্রয়োজন অনুযায়ী যতোগুলো দরকার, ততোগুলো আমি উদ্ধৃত করেছি। আমি মনে করি, এর বেশি লেখার আর প্রয়োজন নেই।

আমরা ওপরে লিখেছি যে, জীবিতদের আমলনামা বেসালপ্রাপ্তজনকে দেখানো হয়ে থাকে। তাঁদেরকে জীবিতদের আমলনামা দেখানো হতো না, যদি তাঁরা দর্শনক্ষমতাসম্পন্ন না হতেন। কারণ এটা পরিস্ফুট, 'তাঁদেরকে আমলনামা প্রদর্শন করা হয়'-এর অর্থ হচ্ছে কাঁধে অবস্থিত কিরামান কাতেবীন ফেরেশতাগণ যে স্থানে নথিভুক্ত করেন সেই স্থান তাঁদেরকে প্রদর্শন করা হয়। আর এটাই প্রতীয়মান করে

যে বেসালপ্রাপ্তজন দেখতে পান। বেসালপ্রাপ্তজন দর্শন করতে পারেন এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করার পর আমার এখন সেই সব হাদীস উদ্ধৃত করা যথার্থ মনে করি, যেগুলোতে প্রমাণিত হয় যে জীবিত মানুষদের আমলনামা বেসালপ্রাপ্তজনদের দেখানো হয়।

ওয়াহাবীরা এসব ব্যাখ্যা উপলব্ধি করতে অক্ষম। এর কারণ হচ্ছে তারা এ বিষয়ে নবীয়ে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত ও হাদীসসমূহ শোনেনি। এ সকল লোকেরা যারা নিজেদেরকে আলেম মনে করে থাকে, তারা এতোই অজ্ঞ আহাম্মক যে তারা প্রশ্ন করে থাকে: 'তাঁদের মাযার যিয়ারত করে শাফায়াত ও সাহায্য প্রার্থনাকারীদেরকে কীভাবে নবী-ওলীগণ চেনতে পারেন?' আমরা বলি: "ওই সকল মহান ব্যক্তিকে বহু বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত করানো হয়েছে। তাঁদের বেসালপ্রাপ্তির পর কেন তাঁদেরকে জানানো হবে না?" অথবা আমরা তাদেরকে বলতে পারি, "আল্লাহতা'আলার স্বাভাবিক রীতি-বহির্ভূত দয়া ও নেয়ামতে নবী-ওলীগণ শ্রবণ এবং দর্শন করতে পারেন।" হাদীসসমূহে ব্যক্ত হয়েছে যে জীবিত ব্যক্তিদের আমল-নামা বেসালপ্রাপ্তজনদের দেখানো হয়। আমরা সে সব হাদীস বিষয়টিতে অবিশ্বাসকারীদের জ্ঞাতার্থে পেশ করেছি। যদি কোনো ব্যক্তি হাদীসগুলো পড়ার পর না বুঝে বলে ফেলে, "বেসালপ্রাপ্তজন শুধুমাত্র তাদের পরিচিত মানুষদেরই চেনতে পারেন এবং তাদের কথা শোনতে পান," তবে আমরা বলবো, "হাদীসগুলো পরিচিত ও অপরিচিতদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে না।" ওয়াহাবীরা একগুঁয়ে আচরণ করে থাকে। মৃত্যুর পর এ সত্যটি তাদের সামনে প্রকাশ হওয়ার পরই তারা বিশ্বাস করবে।

এমন বহু হাদীস আছে যেগুলোতে ব্যক্ত হয় যে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উম্মতের আমলনামা দেখানো হয়। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বাযায একটি হাদীস রওয়ায়াত করেন: "আমার (যাহেরী/প্রকাশ্য) জীবন তোমাদের জন্যে উপকারী; তোমরা তা বলবে এবং তোমাদেরকে তা বলা হবে। আমার বেসালও তোমাদের জন্যে উপকারী; তোমাদের আমলগুলো আমাকে দেখানো হবে। তোমাদের নেক আমল দেখলে আমি আল্লাহ পাকের প্রশংসা করবো। আর বদ আমল দেখলে গুনাহ মাফ এবং সম্পূর্ণ ক্ষমা প্রার্থনা করবো" (হাদীস)। হাদীসটির রওয়ায়াত হয়েছে "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি"- বাক্য দ্বারা সমর্থনের পর। আরও বহু আস্থাশীল ব্যক্তি এ হাদীসটিকে 'মুরসাল' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর যে হাদীসটি জীবিত ব্যক্তির আমলনামা

তার পরিচিত বেসালপ্রাপ্তজনের কাছে প্রদর্শন সম্পর্কে বর্ণনা দেয়, সেটা ঘোষণা করে,

إِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَى أَقَارِبِكُمْ وَعَشَائِرِكُمْ مِنَ الأَمْوَاتِ فَإِنْ كَانَ خَيْرًا اسْتَبْشَرُوا بِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ قَالُوا اللهُمَّ لاَ تُمِتْهُمْ حَتَّى تَهْدِيَهُمْ كَمَا هَدَيْتَنَا

–তোমাদের আমলগুলোকে তোমাদের আত্মীয় ও পরিচিতদের কাছে দেখানো হয়। তারা তোমাদের নেক আমল দেখলে আনন্দিত হয়। আর বদ আমল দেখলে তারা বলে: 'এয়া আল্লাহ তাদেরকে সঠিক পথপ্রাপ্তিতে সাহায্য করুন, যেমনিভাবে সাহায্য করেছিলেন আমাদেরকে। এরপর তাদের রুহ কবজ করুন'।[১]

এ হাদীসটি রওয়ায়াত করেছেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, হাকিম আত্ তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'নওয়াদিরুল উসূল' পুস্তকে, এবং প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন মানদা। মহান মুহাদ্দীস সুলাইমান আবু দাউদ তায়ালিসী হযরত জাবির ইবনে আব্দিল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন হুযূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস:

إِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَى عَشَائِرِكُمْ وَأَقْرِبَائِكُمْ فِي قُبُورِهِمْ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا اسْتَبْشَرُوا بِهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ قَالُوا: اللَّهُمَّ أَلْهِمْهُمْ أَنْ يَعْمَلُوا بِطَاعَتِكَ.

–তোমাদের আমলকে তোমাদের ইন্তেকালপ্রাপ্ত আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতদের কাছে দেখানো হয়। আমল নেক হলে তারা খুশি হয়। না হলে তারা বলে, 'এয়া আল্লাহ তাদের অন্তরগুলোকে ভাল কাজের দিকে অনুপ্রাণিত করুন।[২]

ইবনে আবি শায়বা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'আল মুসান্নাফ' গ্রন্থে, হাকিম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং ইবনে আবিদ্ দুনইয়া

---

১. আহমদ : আল মুসনাদ, ২০/১১৪ হাদীস নং ১২৬৮৩।

২. আবূ দাউদ: আল মুসনাদ, আল ইফরাদ আন জাবির, ৩/৩৪০ হাদীস নং ১৯০৩।

ক. শাফেয়ী : আল মুসনাদ, ফি সালাতিল জুম'য়া, ১/১৪৮ হাদীস নং ৪২৯।

খ. আহমদ : আল মুসনাদ, মুসনাদু আনাস বিন মালিক, ৩/১৬৪ হাদীস নং ১২৭০৬।

গ. তবরানী : আল মু'জাম আল আওসাত্, ১/৫৩ হাদীস নং ১৪৮।

ঘ. তিরমিযী : নাওয়াদিরুল উসূল, ১/৮০৭।

রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত ইবরাহীম ইবনে মায়সারা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জেহাদ উপলক্ষে কনস্টানটিনোপল (ইস্তাম্বুল) গেলে জনৈক পথচারীকে বলতে শোনেন, "দুপুরে কৃত কর্ম বেসালপ্রাপ্তদের রাতে দেখানো হয়; আর রাতে সংঘটিত কর্ম দেখানো হয় (পরের দিন) সকালে।" হযরত আবু আইয়ুব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে প্রশ্ন করেন, "আপনি কী বলছেন?" জবাবে ওই পথচারী বলেন, " আল্লাহর নামে বলছি, এ কথা আপনার জন্যেই বলেছি।" অতঃপর হযরত আবু আইয়ুব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রার্থনা করেন, "এয়া আল্লাহ আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। উবাদা বিন সামিত এবং সায়াদ ইবনে উবাদার (কবরের) কাছে তাঁদের বেসালের পরে যা করেছি তার জন্যে আমাকে অভিশপ্ত করবেন না।" এমতাবস্থায় ওই পথচারী বলেন, "আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের দোষত্রুটি গোপন করেন; তিনি তাদের নেক আমল প্রদর্শিত হবার সুযোগ দেন।" হাকিম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর 'নওয়াদিরুল উসূল' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ একটি হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান:

تُعْرَضُ أَعْمَالُ بَنِي آدَمَ فِي كُلِّ يَوْمِ اثْنَيْنِ، وَفِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ فَيَرْحَمُ الْمُتَرَاحِمِينَ، وَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ، وَيَذَرُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِغِلِّهِمْ.

–আদম সন্তানদের আমলনামা আল্লাহতা'আলার সামনে পেশ করা হয় প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার। আর আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম, আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং অভিভাবকদের সামনে পেশ করা হয় প্রতি শুক্রবার। নেক আমল দর্শনে তাঁরা আনন্দিত হন। তাঁদের মুখমন্ডল আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আল্লাহকে ভয় করো বেসালপ্রাপ্তদের মনে আঘাত দিও না।

মনুষ্য জাতির আমলনামা তাদের অপরিচিত বেসালপ্রাপ্তজনকেও দেখানো হয়। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে গ্রহণ করে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইবনে আবিদ্ দুনইয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রওয়ায়াত করেন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস:

إِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَى مَوْتَاكُمْ، فَيُسَرُّونَ وَيُسَاءُونَ.

–তোমাদের আমল বেসালপ্রাপ্তদের কাছে জ্ঞাত করানো হয়। নেক আমল দেখে তাঁরা আনন্দিত হন। আর ব্যথিত হন বদ আমল দর্শনে” (হাদীস)।

আরেকটি হাদীস ঘোষণা করে, “তোমাদের কবরস্থ ভ্রাতাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। তাদেরকে তোমাদের আমলনামা দেখানো হয়।” হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম হাকিম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইবনে আবিদ্ দুনইয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং নুমান ইবনে বশীর থেকে গ্রহণ করে ইমাম বায়হাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর প্রণীত ‘শুআবুল ঈমান’ গ্রন্থে। এই দুটো হাদীস সকল বেসালপ্রাপ্তজনকে বুঝিয়েছে। হযরত আবু দারদা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “তোমাদের আমল সকল বেসালপ্রাপ্তজনের সামনে প্রদর্শন করা হয়। তা দেখে তাঁরা আনন্দিত অথবা ব্যথিত হন।” ইবনুল কাইয়েম আল জওযিয়া তার ‘কিতাবুর রূহ’ পুস্তকে ইবনে আবিদ্ দুনইয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে উদ্ধৃত করেন সাদাকাত বিন সুলাইমান আল জাফরীকে, যিনি বলেন: “আমি একজন বদ-অভ্যাসী লোক ছিলাম। পিতার ইন্তেকালের পরে আমি নিজেকে সংশোধন করি। উচ্ছৃঙ্খলতাকে পুরোপুরিভাবে বর্জন করি। কিন্তু একবার আমি একটা দোষ করি। অতঃপর আমার পিতাকে স্বপ্নে দেখি যিনি আমায় বলেন, ‘হে পুত্র তোমার নেক আমল দেখে আমি কবরে শান্তিতে ছিলাম। তুমি যা করো তা আমাদের দেখানো হয়। তোমার আমল সুলাহা (পুণ্যবান)-দের আমলের মতোই ছিল। কিন্তু সম্প্রতি তুমি যা করেছ তার জন্যে আমি ব্যথিত ও লজ্জিত। আশপাশের বেসালপ্রাপ্তজনের কাছে আর আমাকে লজ্জিত করো না।” এই খবর প্রমাণ করে যে অপরিচিত বেসালপ্রাপ্তজনও দুনিয়াতে সংঘটিত ঘটনাবলী সম্পর্কে ওয়াকেফহাল। কারণ, পিতার কাছে প্রদর্শিত পুত্রের আমলনামা সম্পর্কে উল্লেখ করে পিতা বলেন, “আশপাশে অবস্থিত বেসালপ্রাপ্তজনের কাছে আর আমাকে লজ্জিত করো না”। তিনি এ কথা বলতেন না যদি অপরিচিত বেসালপ্রাপ্তজন তাঁর সম্মুখে তাঁরই পুত্রের আমলনামা প্রদর্শন সম্পর্কে বুঝতে না পারতেন। আমরা ওপরে হযরত খালিদ ইবনে যাইদ আবু আইয়ুব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রওয়ায়াতকৃত হাসীদটাও বর্ণনা করেছি, যেটাতে ব্যক্ত হয়েছে যে দুনিয়াতে সংঘটিত সমস্ত আমল পরিচিত কিংবা অপরিচিত সকল বেসালপ্রাপ্তজনকে দেখানো হয়।

## চর্তুথ অধ্যায়

নির্ভরযোগ্য রওয়ায়াতসমূহে বিবৃত হয়েছে যে বেসালপ্রাপ্তজন একে অপরের সাক্ষাৎ লাভ করেন, অর্থাৎ, যিয়ারত করেন। হারিস ইবনে আবি উসামা, উবায়দ-আল্লাহ ইবনে সাইদ আল ওয়ায়িলী তাঁর ‘ইবানা’ গ্রন্থে এবং জাবির ইবনে আব্দিল্লাহ হতে আল উকাইলী একটা হাদীস বর্ণনা করেন, যেটা ঘোষণা করে: “তোমাদের বেসালপ্রাপ্তজনের জন্যে নিখুঁত কাফনের কাপড় ব্যবহার করবে। তারা তাদের কবরসমূহে একে অপরের যিয়ারত করে এবং একে অপরের প্রশংসা করে” (হাদীস)। সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদীস ঘোষণা করে: “যারা তাদের ভাইদের দাফনের ব্যবস্থা করার দায়িত্বভার গ্রহণ করে, তারা যেন তাদের (বেসালপ্রাপ্তজনদের) কাফনের কাপড় ভালভাবে তৈরি করে” (হাদীস)। যেহেতু বেসালপ্রাপ্তজন একে অপরের যিয়ারত করে আত্মপ্রশংসা করেন, সেহেতু একটি হাদীস ঘোষণা করে, “তোমাদের বেসালপ্রাপ্তদের কাফনের কাপড় সুন্দরভাবে তৈরি করবে। কারণ তারা কাফনের কাপড় পরে একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে” (আল্ হাদীস)। হাদীসটি রওয়ায়াত করেছেন আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। আত্ তিরমিযী, ইবনে মাজা, মুহাম্মদ ইবনে ইহইয়া আল হামদানী তাঁর ‘সহীহ’ গ্রন্থে এবং ইবনে আবিদ দুন্ইয়া ও আবু কাতাদা হতে আল বায়হাকী তাঁর ’শুআবুল ঈমান’ পুস্তকে একটি হাদীস রওয়ায়াত করেন: “যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের দাফনকার্য সমাধা করে, তার উচিৎ উত্তম কাপড় দ্বারা কাফনবস্ত্র তৈরি করা। কারণ কবরে তারা একে অপরের যিয়ারত করে” (হাদীস)।

ইবনে তাইমিয়া তার ফতোওয়াসমূহের বিভিন্ন অংশে বলে, ”বেসালপ্রাপ্তজন একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করেন; তাঁদের সমাধি যে শহরগুলোতে অবস্থিত, সেগুলোর দূরত্ব যতোটুকুই হোক না কেন, তাতে কিছু এসে যায় না। দূরবর্তী শহরসমূহে কবরস্থ বেসালপ্রাপ্তজন একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।” হানাফী উলামা-এ-কেরাম ফেকাহর কিতাবসমূহে লিখেছেন যে কাফনের বস্ত্র সুন্দর হওয়া বাঞ্ছনীয়, যেহেতু বেসালপ্রাপ্তজন তাঁদের যা আছে তা নিয়ে গর্ব অনুভব করেন এবং যেহেতু তাঁরা একে অপরের যিয়ারত করেন। বস্তুতঃ সকল মযহাবের উলামা-ই এ কথা লিখেছেন তাঁদের ফেকাহ পুস্তকসমূহে। এ বিষয়টার সমর্থনে বহু অত্যাশ্চর্য ঘটনা এবং খবর বর্ণনা করা হয়েছে। যাঁরা এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে চান, তাঁরা দয়া করে মহান মুহাদ্দীস হযরত আস সুয়ুতীর গ্রন্থ ‘শরহে সুদুর’ পড়তে পারেন। ওয়াহহাবীরা বলে যে তারা মুহাদ্দীস উলামাদেরকে বিশ্বাস করে। তারা হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে বহু হাদীস প্রামাণ্য দলিলস্বরূপ উদ্ধৃত করে এবং দাবি করে যে ইবনে তাইমিয়া হচ্ছে (সর্বযুগের) সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম-এ-ইসলাম। তারা সেই সমস্ত

হাদীসগ্রন্থকে সম্মান করে যেগুলোতে লেখা আছে যে আমাদের অজ্ঞাত এবং উপলব্ধি-বহির্ভূত পদ্ধতিতে বেসালপ্রাপ্তজন দর্শন ও শ্রবণ করতে পারেন। অথচ তারাই আবার সেই সকল ব্যক্তিকে মুশরিক আখ্যায়িত করে যাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আউলিয়াবৃন্দকে দর্শন ও শ্রবণ ক্ষমতাসম্পন্ন মনে করেন। ওয়াহাবীরা দাবি করে যে সেই সকল হাজী মুশরিক যাঁরা হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা শরীফের সামনে গিয়ে বলেন "এয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্যে শাফায়াত করুন।" তারা বলে যে মিনাতে শত-সহস্র হাজী কর্তৃক কুরবানীকৃত শত-সহস্র জন্তু-জানোয়ারের সবই নাজস (অপবিত্র), আর তাই তারা সেগুলোকে না খেয়ে 'বুলডজার' দিয়ে মাটিচাপা দেয়। তারা বলে, "মুশরিক ()-দের দ্বারা জবেহকৃত জন্তু খাওয়া কিংবা বিক্রি করা জায়েয নয়।"

## পঞ্চম অধ্যায়

বেসালপ্রাপ্তজন প্রদর্শন ব্যতিরেকেই পৃথিবীতে জীবিতদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে জানতে পারেন। ইবনুল কাইয়েম আল জওযিয়া যাকে ওয়াহহাবীরা একজন ’আল্লামা’ নামে সম্বোধন করে এবং যাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখে, সে তার ‘কিতাবুর রূহ’ গ্রন্থে লিখেছে: ”(মুহাদ্দীস) হাকেম আবু মুহাম্মদ আবদুল হাক্ব আশবিলী এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। জীবিত লোকদের আমল সম্পর্কে বেসালপ্রাপ্তজন প্রশ্ন করেন এবং জীবিতদের কথা ও কাজ সম্পর্কে বুঝতে পারেন।” পরবর্তী পৃষ্ঠায়ই সে আমর ইবনে দিনারের কথা উদ্ধৃত করে: “কোনো ব্যক্তি তাঁর ইন্তেকালের পরবর্তী সময়ে সংঘটিত পরিবর্তন সম্পর্কে সম্যক অবহিত। তিনি তাদেরকে দেখেন যারা তাঁর লাশকে গোসল দেয় এবং কাফনের কাপড় পরায়।” পরবর্তী পৃষ্ঠায় ইবনুল কাইয়েম আল জওযিয়া আরও লিখে, ”সাব ইবনে জুসামা এবং আউফ ইবনে মালিক পরবর্তী জগতে একে অপরকে ভ্রাতা হিসেবে সাব্যস্ত করেন। তাঁরা একমত হন যে, যিনি আগে ইন্তেকাল করবেন তিনি অপরজনকে স্বপ্নে দেখা দেবেন। সাব আগে মারা যান এবং আউফকে স্বপ্নে দেখা দেন। আউফ জিজ্ঞাসা করেন, ‘আল্লাহতা’আলা তোমার ব্যাপারে কী করেছেন?’ সাব উত্তর দেন, ‘তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।’ আলাপের শেষে সাব বলেন, ‘আমার পরিচিতদের আমল সম্পর্কে আমাকে এমনই সম্যক অবহিত করানো হচ্ছে যে, উদাহরণস্বরূপ, আমি এখন জানি যে তোমার বিড়ালটা মারা গিয়েছে কিছুদিন আগে। আমার কন্যা ছয় দিন পর মারা যাবে। তারপরে তুমি-ই জিম্মাদার হয়ো।’ তিনি যেভাবে স্বপ্নে বলেছিলেন, ঠিক সেভাবে ঘটনাটি ঘটে।” এরপর ইবনুল কাইয়েম বর্ণনা দেয় হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের সৈন্যদের মধ্যে একজনের স্বপ্নে সাবিত বিন কায়েস-এর আগমন এবং সম্ভাষণ: ‘খালিদ বিন ওয়ালিদের কাছে গিয়ে বলো যে আমার শাহাদাৎপ্রাপ্তির পর একজন মুসলিম সৈন্য আমার দেহ থেকে লৌহবর্মটি খুলে নিয়ে যায়। তার তাঁবুটি শিবিরের অপর প্রান্তে অবস্থিত। সেটার কাছে একটা লম্বা রশি বাঁধা ঘোড়া চরে বেড়াচ্ছে। তিনি (খালিদ) যেন লৌহবর্মটি ওই সৈন্যের কাছ থেকে নিয়ে নেন’।” ইবনে কাইয়েম বলে, ”সৈন্যটি হযরত খালিদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে তার স্বপ্ন সম্পর্কে জানায়। তাঁরা উক্ত তাঁবুতে গমন করেন এবং লৌহবর্মটি পান” (কিতাবুব রূহ)।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

ইমাম আস্ সুয়ুতী তাঁর 'শরহে সুদূর' কিতাবে হযরত আদ্ দায়লামী বর্ণিত একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দেন, যিনি হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছ থেকে তা রওয়ায়াত করেন। হাদীসটির বিষয়বস্তু হচ্ছে ইন্তেকালপ্রাপ্ত ব্যক্তি জীবিতদের (অশুভ) খবরাখবর জেনে ব্যথি হন: "ইন্তেকালপ্রাপ্ত ব্যক্তি (জীবিতাবস্থায়) তার ঘরে থাকাকালীন যে জিনিস দ্বারা ব্যথিত হতো, কবরেও তা দ্বারা সে ব্যথিত বা মর্মাহত হবে" (হাদীস)। 'আত্ তাযকিরা' কিতাবে ইমাম আল কুরতুবী বলেন, "আল্লাহ তা'আলা জীবিত লোকদের আমল কোনো ফেরেশতা কিংবা ইঙ্গিত অথবা অন্য কোনো কিছুর মাধ্যমে বেসালপ্রাপ্তজনদের কাছে জ্ঞাত করান।" ইবনুল কাইয়েম আল জওযিয়া তার 'কিতাবুর রূহ' পুস্তকে বলে, "বেসালপ্রাপ্তজনের রূহ যে জীবিতদের রূহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার একটি প্রমাণ হচ্ছে এই যে, জীবিত ব্যক্তিগণ বেসালপ্রাপ্তজনকে স্বপ্নে দেখেন এবং তাঁদেরকে প্রশ্ন করেন। বেসালপ্রাপ্তজন তাদেরকে এমন জিনিস জানাতে পারেন যা তারা (জীবিতরা) জানতেন না। অতীত এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁদের উত্তরগুলো সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাঁদের জীবদ্দশায় তাঁরা যেসব জায়গায় তাঁদের কোনো জিনিসপত্র পুঁতে রেখে কাউকে যে কথা জানান নি, সে কথা তাঁরা অনেক সময় বলে থাকেন। এটা অহরহ পরিদৃষ্ট হয়েছে যে বেসালপ্রাপ্তজন জীবিত থাকাকালীন তাঁদের কাছে দেনাগ্রস্ত ব্যক্তিদের দেনা সম্পর্কে বিবরণ দিয়েছেন এবং উক্ত দেনা-পাওনার সাক্ষীদের সম্পর্কেও বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁরা বহুবার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁদের জীবদ্দশায় সংঘটিত গোপনীয় কাজ সম্পর্কে যেগুলো ছিল সকলের অজ্ঞাত এবং যেগুলো তাঁদের কথানুযায়ী পরবর্তীকালে সত্যে পরিণত হয়েছে। আরেকটি অলৌকিক বিষয় হচ্ছে এই যে, বেসালপ্রাপ্তজন যখন কোনো ব্যক্তির ভবিষ্যতে মৃত্যুর দিন-ক্ষণ সম্পর্কে ঘোষণা দিয়েছেন, তখন সেই ব্যক্তির মৃত্যু ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী উক্ত নির্দ্দিষ্ট দিনেই সংঘটিত হয়েছে। আর এটাও বহুবার পরিদৃষ্ট হয়েছে যে বেসালপ্রাপ্তজন জীবিত কোনো ব্যক্তির গোপন কাজ সম্পর্কে অন্য কোনো জীবিত ব্যক্তির কাছে জানিয়েছেন। সাব এবং সাবিত যাঁদের সম্পর্কে ওপরে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তাঁরা ইন্তেকাল করার পরও জীবিতদের সঙ্গে স্বপ্নে আলাপ করেছেন।" ইমাম সুয়ুতী তাঁর 'শরহে সুদূর' গ্রন্থে মুহাম্মদ বিন সিরিনের কথা উদ্ধৃত করেন, যিনি বলেন: "বেসালপ্রাপ্তজন যা জ্ঞাত করান (স্বপ্নের মাধ্যমে)

তার সবটুকুই সত্য; কারণ, তাঁরা এমন এক জগতে আছেন, যেখানে কোনো মিথ্যা অথবা ভ্রান্তি নেই। সেই আলমের (জগতের) মানুষ সব সময়েই সত্য কথা বলেন। আমাদের পর্যবেক্ষণ এবং উপলব্ধি আমাদের এই কথাকে সমর্থন দেয়।" ইবনুল কাইয়েম এবং আরও অনেকে একই কথা বলেছেন। যেহেতু রূহ 'লতিফ' (বায়বীয়, অদৃশ্য) সেহেতু সেটা এমন বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ এবং উপলব্ধি করতে সক্ষম, যেগুলো দেহের ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষ এবং উপলব্ধি করা যায় না। হাকিম এবং আল বায়হাকী তাঁর 'দালাইল' গ্রন্থে রওয়ায়াত করেন যে,

وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ الدَّلَائِلِ عَنْ سَلْمَى قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَىَّ أُمُّ سَلمَةَ وَهِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ مَا يَبْكِيْكَ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ الْمَنَامِ يَبْكِي وَعَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التُّرَابُ فَقُلْتُ مَا لَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ شَهِدْتُ قُتِلَ الْحُسَيْنُ آنِفًا.

–সুলাইমান হযরত উম্মে সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে দেখা করেন। এই সময় তিনি (উম্মে সালামা) ক্রন্দনরতা ছিলেন। সুলায়মান তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। উম্মে সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: "আমি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি কাঁদছিলেন। তাঁর মস্তক ও দাড়ি মোবারকে মাটি লেগেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করি: 'আপনার পবিত্র মুখমণ্ডল এ রকম কেন ?' তিনি উত্তর দেন 'আমার (পৌত্র) হুসেইনকে শাহাদাত বরণ করতে দেখলাম'।[১]"

'মিশকাত আল মাসাবিহ' কিতাবে আল খতিব আত তাব্রিযীও এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবিদ্ দুনইয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বণী আসাদ গোত্রের জনৈক কবর খননকারীর কথা রওয়ায়ত করেন, যিনি বলেন: "আমি এক রাতে কবরস্থানে অবস্থান করছিলাম। একটি কবর থেকে একটি কণ্ঠস্বর ঘোষণা করে, 'ওহে আবদুল্লাহ' অপর একটি কণ্ঠস্বর উত্তর দেয়: 'তুমি কী চাও, হে জাবির?' প্রথম কণ্ঠস্বরটি বলে, 'আমাদের ভ্রাতা আগামীকাল আমাদের কাছে আসবে।' অপর কণ্ঠস্বর এরপর উত্তর দেয়, 'সে আমাদের কোনো উপকারে আসবে না।

১. বায়হাক্বী : দালাঈলুন নবুওয়াত, বাবু মা জা'আ ফি রুইয়াতিন নবী, ৭/৪৮।
ক. সুয়ূতি : শরুহস সুদুর, ১/২৬৫।
খ. তিরমিযী : আস সুনান, বাবু মানাক্বিবি আবী মুহাম্মদ আল হাসান, ৬/১২০ হাদীস নং ৩৭৭১।
গ. হাকিম : আল মুস্তাদরাক, ৪/২০ হাদীস নং ৬৭৬৪।

মানুষ আর আমাদের জন্যে দোয়া করবে না (তাকে আমাদের সাথে দাফন করার পর)। আমাদের পিতা তার ওপর রাগান্বিত এবং তার জন্যে দোয়া না করার ব্যাপারে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।' পরের দিন সকালে এক ব্যক্তি এসে আমাকে দুটো কবরের মধ্যখানে আরেকটি কবর খোঁড়ার জন্যে বলে। সে ওই দুটো কবরের দিকে ইশারা করে দেখাচ্ছিল যেখান থেকে আমি আগের রাতে কথাবার্তা শুনেছিলাম। তাকে আমি জিজ্ঞাসা করি: 'এ দুটো কবরের বাসিন্দাদের নাম কী?' সে বলে, 'এটা জাবির, আর এটা আবদুল্লাহ।' আমি এরপর তাকে সমস্ত ঘটনা জানাই। ওই ব্যক্তি উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ, একথা সত্য যে তার জন্যে দোয়া না করতে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। কিন্তু এখন আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে আমি সেটার জন্যে কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) করবো'।"

## সপ্তম অধ্যায়

নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ আছে যে মহান আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে বেসালপ্রাপ্তজন কাজ (তাসাররুফ) করে থাকেন এবং তাঁদের কাছ থেকে বহু অলৌকিক ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। মুহাদ্দীস আলেম আস্ সুয়ুতী তাঁর 'আল মুতাকাদ্দিম' কিতাবে এবং হাফেয ইবনে হাজর তাঁর ফতোওয়াসমূহে বলেন, "বিশ্বাসীদের (মু'মিন) রূহসমূহ 'ইল্লিয়ীন' এবং কাফেরদের (অবিশ্বাসী) রূহসমূহ 'সিজ্জিন' নামক মাকাম (স্থান, পর্যায়)-এ অবস্থান করে। প্রত্যেক রূহ-ই তার দেহের সঙ্গে অজ্ঞাত একটি বন্ধনে আবদ্ধ। এই সংশ্লিষ্টতা দুনিয়াবী কোনো সম্পর্ক নয়। এ সম্পর্ক অনেকটা কোনো ব্যক্তির স্বপ্নে দৃষ্ট বিষয়ের সঙ্গে তার সম্পৃক্ততার মতোই। কিন্তু জীবিত লোকদের স্বপ্নে দৃষ্ট বিষয়ের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততার তীব্রতা অপেক্ষা বেসালপ্রাপ্তজনের নিজেদের দেহ এবং অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার তীব্রতা অনেক বেশি। অতএব, 'রূহসমূহ তাদের কবরের সাথেই বিরাজমান'- ইবনে আব্দুল বারের এই বক্তব্যের সঙ্গে উপরোক্ত ব্যাখ্যাসমূহের একটি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা মোটেও দুষ্কর নয়। রূহসমূহকে তা'সির (প্রভাব বিস্তার, পরিচালনা) করার অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং তাঁদের দেহ তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে, আর তাঁরা তাঁদের কবরে হাযির (উপস্থিত) আছেন। যদি কোনো লাশ কবর থেকে উঠিয়ে অন্য আরেক স্থানে কবর দেয়া হয়, তাতেও দেহের সঙ্গে রূহের সম্পৃক্ততার কোনো বিচ্যুতি ঘটবে না। এই সম্পর্ক ভঙ্গ হবে না, যদি দেহের জৈবিক পদার্থসমূহের ক্ষয় সাধিত হয়ে সম্পূর্ণ দেহ মাটিতে পরিণত হয়ও। ইমাম সুয়ুতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে ইবনে আসাকির যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা পরিস্ফুট করে যে রূহসমূহ ইল্লিয়ীন-এ থেকেও তাঁদের দেহের সঙ্গে সংযুক্ত এবং তাঁরা তাঁদের দেহকে ব্যবহার করার অনুমতিপ্রাপ্ত। হুজূর পূর নুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَرَّ بِيَ اللَّيْلَةَ جَعْفَرَ يَقْتَفِي نَفْرًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ لَهُ جَنَاحَانِ مُتَخَضِّبَةٍ قَوَادُمُهَا بِالدَّمِ يُرِيدُونَ بِيْشَةٍ بَلَدًا بِالْيَمَنِ.

–এক রাতে জাফর তাইয়ার আমার কাছে আসে। তার সাথে একজন ফেরেশতা ছিল। জাফরের দুটো পাখা ছিল যার উভয় প্রান্তভাগ ছিল রক্তাক্ত; তারা ইয়েমেনের বিশা নামক পল্লীতে যাচ্ছিল।

জাফর তাইয়ার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাৎপ্রাপ্তির পর তিনি একথা বলেন। একটি হাদীসে ঘোষিত হয়েছে,

قَالَ عَرَفْتُ جَعْفَرًا فِي رَفْقَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ يَبْشِرُوْنَ أَهْلَ بِيْشَةٍ بِالْمَطَرِ.

'আমি জাফর ইবনে আবি তালিবকে ফেরেশতাদের সঙ্গে দেখলাম। তারা বিশা-এর অধিবাসীদের কাছে সমাগত বৃষ্টির সংবাদ প্রদান করছিল।'

হাদীসটি রওয়ায়াত করেছেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (ক:) হতে ইবনে আদী। মুহাদ্দীস হাকিমের বর্ণনা অনুসারে–

عَن إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا النَّبِي صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالَسَ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَرِيْبَ مِنْهُ إِذْ رَدَّ السَّلَامَ وَقَالَ يَا أَسمَاءَ هَذَا جَعْفَرُ مَعَ جِبْرِيْلُ وَمِيْكَائِيْلُ مَرُوًا فَسَلِّمُوْا عَلَيْنَا وَأَخْبَرْنِيْ أَنَّهُ لَقِيَ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَأَصَبْتِ فِيْ جَسَدِيْ مِنْ مَقَادِيْمِي ثَلَاثًا وَسَبْعِيْنَ مِنْ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ ثُمَّ أُخِذَتِ اللِّوَاءَ بِيَدِيْ الْيُمْنَى فَقَطَعَتْ ثُمَّ أَخَذَتْهُ بِيَدِيْ الْيُسْرَى فَقُطِعَتْ فَعُوْضَنِيَ اللهُ مِنْ يَدِيْ جَنَاحَيْنِ أَطْيَرُ بِهِمَا مَعَ جِبْرِيْلُ وَمِيكَائِيْلُ وَأَنْزَلَ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ وَآكَلَ مِنْ ثَمَارِهَا مَا شِئْتَ قَالَتْ أَسمَاءَ هَنِيئًا لِجَعْفَر مَا رِزْقَهُ اللهِ مِنْ خَيْرِ لَكِنْ أَخَافَ أَنْ لَا يُصْدَقُ النَّاسَ فَأَصْعَدَ الْمِنْبَرَ فَأَخْبَرَ بِهِ النَّاسَ فَصَعْدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِيْ طَالِبِ مَرَّ مَعَ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَلَهُ جَنَاحَانِ عَوْضَهُ اللهُ مِنْ يَدَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ بِمَا أَخْبَرَهُ بِهِ.

–হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে তিনি হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশে বসেছিলেন এবং সেখানে আসমা বিনতে উমাইস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-ও

উপস্থিত ছিলেন; হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আলাইকুম সালাম' বলার পর বলেন, 'হে আসমা কিছুক্ষণ আগে তোমার স্বামী জাফর তাইয়ার ফেরেশতা জিবরীল আলাইহিস্ সালাম ও মিকাইল আলাইহিস্ সালাম-এর সঙ্গে আমার কাছে এসেছিল। তারা আমাকে সালাম জানায়। আমিও তাদের সালামের জবাব দেই। এরপর জাফর বলেঃ "মুতা-এর যুদ্ধে আমি কিছুদিন কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করি। আমার দেহের তিয়াত্তরটি অংশে আমি আহত হই। ডান হাতে পতাকা ধরে রাখি। তখন ডান হাত কেটে ফেলে (কাফেররা)। বাম হাতে পতাকা ধরবার পর সেটাও কেটে ফেলা হয়। আল্লাহ পাক আমাকে দুটো হাতের পরিবর্তে দুটো পাখা দিয়েছেন। জিবরীল আলাইহিস্ সালাম ও মিকাইল আলাইহিস্ সালাম-এর সঙ্গে আমি উড়ি। যখন ইচ্ছা তখনই বেহেশত হতে উড়ে বেরিয়ে যেতে পারি। আবার ভেতরে যেয়ে ওর ফলমূল ভক্ষণ করতে পারি যখন ইচ্ছা তখন।" আসমা বল্লেন, 'আল্লাহ তা'আলা জাফরের মঙ্গল করুন। কিন্তু আমি শংকিত যে মানুষেরা এ কথা শুনে বিশ্বাস করবে না। আপনি কি তাদেরকে মিম্বরে উঠে এ কথা বলবেন? তারা আপনাকে বিশ্বাস করবে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে তশরীফ নিয়ে মিম্বরে আরোহণ করেন এবং আল্লাহ পাক-এর হামদ পাঠ করে বলেনঃ 'জাফর ইবেন আবি তালিব আমার কাছে এসেছিল জিবরীল ও মিকাইলের সঙ্গে। আল্লাহ তা'আলা তাকে দুটো পাখা মঞ্জুর করেছেন। সে আমাকে সালাম দিয়েছিল।'এরপর তিনি আসমাকে তাঁর স্বামী সম্পর্কে পূর্বে যা বলেছিলেন তা-ই আবার দু'বার বর্ণনা করেন" ।[১]

এ সকল হাদীস থেকে প্রতিভাত হয় যে আল্লাহ পাক তাঁর শহীদ ও সালেহ বান্দাদেরকে মানুষের উপকারার্থে কর্ম সংঘটনের অনুমতি প্রদান করেছেন। হাদীসবিদ উলামাগণ এ বিষয়টির সমর্থনে বহু ঘটনা রওয়ায়াত করে অজস্র নিবন্ধ লিখেছেন। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী এ রকম একটি রওয়ায়াত করেছেন যা নিচে দেয়া হলোঃ

عَن أَبِي عبد الله الشَّامي قَالَ غزونا الرّوم فَخرج منا نَاس يطْلبُونَ أَثر الْعَدو فَانْفَرد مِنْهُم رجلَانِ قَالَ أَحدهمَا فَبينا نَحن كَذَلِك إِذْ لَقينَا شيخ من

---

[১]. সুয়ূতি : শরহুস সুদূর, ১/২৩৯।

الرّوم فَقَالَ إبرزوا فحملنا عَلَيْهِ فاقتتلنا سَاعَة فَقتل صَاحِبي فَرَجَعت أُرِيد أَصْحَابِي فَبينا أَنا رَاجع إِذْ قلت لنَفْسِي ثكلتني أُمِّي سبقني صَاحِبي إِلَى الْجنَّة وأرجع أَنا هَارِبا إِلَى أَصْحَابِي فَرَجَعت إِلَيْهِ فضربته وأخطأته فَحَمَلَنِي فَضرب بِي الأَرْض وَجلسَ على صَدْرِي وَتَنَاول شَيْئا مَعَه ليقتلني فجَاء صَاحِبي الْمَقْتُول فَأخذ بِشعر قَفاهُ فَأَلْقَاهُ عني وأعانني على قَتله فقتلناه جَمِيعًا وَجعل صَاحِبي يمشي ويحدثني حَتَّى إنتهينا إِلَى شَجَرَة فاضطجع مقتولا كَمَا كَانَ فَرَجَعت إِلَى أَصْحَابِي فَأَخْبَرتهمْ.

"ইবনে আবিদ দুনইয়া বলেন, 'আবু আব্দিল্লাহ শামী বাইজেনটাইনীয় রোমানদের সঙ্গে জ্বিহাদ করতে যান। তাঁরা শত্রু পক্ষের পিছু ধাওয়া করেন। দুইজন সৈন্য মূল মুসলিম বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। তাঁদের একজন বর্ণনা করেন, "আমরা (উক্ত সৈন্য দু'জন) শত্রু প্রধানকে দেখতে পেয়ে তাকে আক্রমণ করি। দীর্ঘ সময় আমরা যুদ্ধে লিপ্ত হই। আমার বন্ধু শহীদ হন। আমি যুদ্ধ বন্ধ করে পিছটান দেই এবং সহযোদ্ধাদের খোঁজ করি। এরপর নিজ মনে বলি, লজ্জা আমার প্রতি কেন পালাচ্ছি? আমি আবার যুদ্ধে ফিরে যাই এবং শত্রু প্রধানকে আক্রমণ করি। আমার তরবারির আঘাত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। শত্রু প্রধান আমাকে আক্রমণ করে এবং ধরাশায়ী করে। এরপর সে আমার বুকের ওপর চড়ে বসে। আমাকে হত্যা করার জন্যে সে কিছু একটা হাতে নেয়ার চেষ্টা করে। এমন সময় আমার শহীদ বন্ধু লাফিয়ে উঠে শত্রুর চুল ধরে পেছন দিকে টেনে ধরেন। আমরা এক সঙ্গে ওই শত্রুর প্রাণ সংহার করি। কথা বলতে বলতে আমরা দূরবর্তী একটি গাছের কাছে হেঁটে যাই, যেখানে যাওয়ার পর আমার বন্ধু পুনরায় মরে পড়ে থাকেন। আমি আমার মুসলমান ভাইদের কাছে এসে সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বলি।[১]

'রওদাতুল আখইয়ার' গ্রন্থের লেখক হানাফী আলেম যানদুসী এবং 'যুবদাতুল ফুকাহা' পুস্তকের লেখকও এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দীস আল্ মাহামিলি তাঁর 'আল আমালীউল ইসফাহানিয়্যা'-তে আবদুল আযিয ইবনে আব্দুল্লাহের কথা

[১].প্রাগুক্ত : ১/২১৯।

উদ্ধৃত করেন, যিনি বলেনঃ 'আমরা জনৈক বন্ধুর সঙ্গে দামেস্কে অবস্থান করছিলাম। তাঁর স্ত্রীও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। আমি ইতিমধ্যেই জেনে গিয়েছিলাম যে তাঁদের পুত্র শহীদ হয়েছেন। একজন অশ্বারোহী আমাদের কাছে আসেন। আমার বন্ধু তাঁকে স্বাগত জানান। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলেন, "এ আমাদের-ই পুত্র।" তাঁর স্ত্রী তাঁকে বলেন, "শয়তান তোমার থেকে দূর হোক। তুমি কি জানো না যে আমাদের পুত্র বহু আগেই শহীদ হয়েছে?" বন্ধু নিজের উক্তির জন্যে অনুতাপ বোধ করেন। কিন্তু তিনি অশ্বারোহীর কাছে গিয়ে ভাল করে দেখে আবারও বলেন, "আল্লাহর কসম, এ তো আমাদেরই ছেলে" মহিলাও পরখ করে চিৎকার করে ওঠেন, "আল্লাহর কসম, এ তো সে-ই" আমার বন্ধু তাঁর ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন, "তুমি তো শাহাদাৎপ্রাপ্ত হয়েছে, তাই না পুত্র?" অশ্বারোহী উত্তর দেন, "হ্যাঁ, পিতা। কিন্তু (খলীফা) উমর বিন আব্দুল আযিয এইমাত্র ইন্তেকাল করেছেন। আমরা শহীদবৃন্দ আল্লাহ পাকের কাছে তাঁর যিয়ারতের অনুমতি চাই। আমি আপনাদের সালাম জানানোর অনুমতিও প্রার্থনা করি।' এরপর অশ্বারোহী বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে প্রস্থান করেন। সহসা খবর এলো যে খলীফা উমর বিন আব্দুল আযিয ইন্তেকাল করেছেন।" ইমাম সুয়ুতী আরও বলেন, "এসব বর্ণনা সহীহ এবং সত্য। মুহাদ্দীস-উলামা এগুলোকে সমর্থনকারী দলিলাদিসহ লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম আল ইয়াফী-ই সর্বশেষটি লিখেছেন। আমি তাঁর লেখনীকে সমর্থন দেয়ার জন্যে পুনরায় লিখলাম।" আস্ সুয়ুতীর কিতাবে এ ধরনের বহু ঘটনা লিপিবদ্ধ রয়েছে। যাঁরা আরও পড়তে চান, তাঁরা ওই বইটি (শরহুস সুদুর) পড়তে পারেন।

ইমাম আল ইয়াফী-ই রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "বেসালপ্রাপ্তজনকে শুভ অথবা অশুভ পরিস্থিতিতে দেখাটা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের প্রতি প্রদত্ত তাঁরই দান যা কারামত (অলৌকিকত্ব) বা কাশফ (দিব্যদৃষ্টি)-স্বরূপ তাঁরা পেয়ে থাকেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবিতদেরকে শুভ সংবাদ প্রদান, বেসালপ্রাপ্তজনের পক্ষ থেকে উপদেশ বিতরণ এবং বেসালপ্রাপ্তদের দেনা পরিশোধকরণ। বেসালপ্রাপ্তজনকে বেশির ভাগ সময়েই স্বপ্নে দেখা যায়। তবু এমনও অনেকে আছেন যাঁরা তাঁদেরকে জাগ্রতাবস্থায় দেখতে পান। এটা ওলীআল্লাহ এবং 'হাল'সম্পন্ন ব্যক্তিদের কারামত।" পুস্তকের অন্যত্র তিনি লিখেছেন, "আহলে সুন্নতের উলামা বলেন যে ইল্লিয়ীন-এ অবস্থিত বেসালপ্রাপ্তজনের রূহসমূহকে মাঝে-মধ্যে তাঁদের কবরস্থ দেহের কাছে ফেরত পাঠানো হয়। এটা শুক্রবার রাতেই বেশি করা হয়। বেসালপ্রাপ্তজন পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেন। যাঁরা বেহেশত পাওয়ার যোগ্য তাঁরা নেয়ামত লাভ করেন। আর যারা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য তারা শাস্তি পায়। যদিও রূহসমূহের

দেহ তাদের সঙ্গে থাকে না, তবুও তাদের প্রতি ইল্লিয়ীনে শান্তি বর্ষিত হয় এবং সিজ্জিনে শাস্তি পতিত হয়। আর কবরের বিষয়টির ক্ষেত্রে রূহ এবং দেহ উভয়ের ওপরই শাস্তি অথবা শান্তি দেয়া হয়।" 'কিতাবুর রূহ' গ্রন্থে ইবনুল কাইয়েম আল জাওযিয়া বলে, "এ সকল ঘটনার ইতিবৃত্ত থেকে এ সিদ্ধান্তই টানা যায় যে রূহের হাল বা অবস্থা তার শক্তি বা দুর্বলতা, মাহাত্ম্য কিংবা হীনতা দ্বারা প্রভাবিত। মহান আত্মাদের 'হাল' অন্যান্যদের মতো নয়। এটা জ্ঞাত যে এ পৃথিবীতে রূহসমূহের 'হাল' বিভিন্ন, যা তাঁদের শক্তি বা দুর্বলতা অথবা গতির ওপর নির্ভরশীল। যে রূহ দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছেন এবং তাঁর দেহের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ও মালিকানা ছিন্ন করেছেন, সে-ই রূহ দেহের সাথে বন্দী রূহের চাইতে আল্লাহ তা'আলা এবং বস্তুসমূহের ব্যাপারে একটি আলাদা শক্তি, প্রভাব, সাহায্য করার সামর্থ্য, গতি ও সম্পর্ক নিয়ে বিরাজ করে। রূহ নিজেই মহান, নির্মল এবং বিশাল সাহায্যের আধার। দেহত্যাগের পরপরই তিনি তাঁর গন্ডি ছাড়িয়ে যান। তখন তিনি আরও বহু কিছু করতে পারেন। বেসালপ্রাপ্তজনের রূহকে স্বপ্নে দেখা যায় এবং তাঁরা এমন সব অসাধারণ (অলৌকিক) কাজ করতে 'সক্ষম' যেগুলো তাঁদের দেহের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার কারণে জীবদ্দশায় তাঁরা করতে পারতেন না। এক, দুই কিংবা গুটিকয়েক মানুষকে দেখা গিয়েছে বহুবার বিশাল বাহিনীসমূহকে পরাভূত করতে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে বহুবার স্বপ্নে দেখা গিয়েছে। আর তাঁদের রূহ মুবারক অবিশ্বাসী বাতিল সৈন্যবাহিনীকে বিতাড়িত করেছেন বহুবার। আমরা এখানে যা লিখলাম তা সুরা নাযিয়াহর পঞ্চম আয়াতের ওপর কৃত মুফাসসিরগণের তাফসীরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ; উদাহরণস্বরূপ, আল বায়দাবীর তফসীর যা'তে লেখা আছে: 'দেহত্যাগের পর একজন ওলীর রূহ ফেরেশতাদের জগতে গমন করেন। তারপর তিনি বেহেশতের বাগানে বিচরণ করতে যান। তিনি তাঁর দেহের সঙ্গেও সম্পর্ক বজায় রাখেন এবং ওর ওপর প্রভাব বিস্তার করেন'।" (কিতাবুর রূহ)

## অষ্টম অধ্যায়

আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক এ কথা প্রকাশ হয়েছে যে, জীবিতদের দ্বারা কবরের শান্তি অথবা শাস্তি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং তা চর্মচক্ষে দর্শন করা অনুমতিপ্রাপ্ত। আহল্ আস্ সুন্নতের উলামা সর্বসম্মতভাবে রওয়ায়াত করেন যে কবরে শান্তি অথবা শাস্তি আছে এবং সেগুলোর দেহ ও রূহের ওপর জারি হওয়ার ব্যাপারটিতে বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। আকাইদের পুস্তকগুলোতে এ বিষয়টির ওপর বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। শুধুমাত্র মু'তাযিলা এবং খারেজীরা কবর আযাবে বিশ্বাস করে নি। হাদীসসমূহ ও সাহাবা-এ-কেরামের আসার (বাণী)-সমূহ এবং সালাফ আস্ সালেহীনের লেখনী থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে কবর আযাব রয়েছে। কিছু অজ্ঞ লোক এবং ওয়াহহাবীরা এতে বিশ্বাস করে না, কারণ তারা এ সব দলিল সম্পর্কে অজ্ঞ। তাদের ঈমান দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে এ সকল দলিল সম্পর্কে জানা দরকার। আমরা ওপরে উল্লেখ করেছি যে আম্বিয়াগণ তাঁদের মাযার-রওযায় আমাদের অজ্ঞাত একটি জীবনে জীবিত আছেন। আল বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রওয়ায়াত করেন যে তাঁরা বেসালের পর হজ্ব সমাপন করে থাকেন। আর নবী নন এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কে আবু নুয়াইম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত সাবিত আল বানানি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কথা উদ্ধৃত করেন, যিনি বলেন: "আমি হামিদ আত তাওয়ীলকে জিজ্ঞাসা করলাম, নবীগণই কি শুধু তাঁদের মাযার-রওযায় সালাত আদায় করে থাকেন?' তিনি বল্লেন: 'না। অন্যান্য ব্যক্তিও তা আদায় করতে সক্ষম।' এরপর আমি বল্লাম, হে আল্লাহ পাক যদি আপনি কখনো কোনো ব্যক্তিকে তার কবরে সালাত/নামায পড়ার অনুমতি প্রদান করেন, তবে এই সাবিতকেও তা করতে দেবেন।" আবু নওয়াইম আরও বর্ণনা করেন: "যুবাইর বলেছেন, 'আমি একমাত্র সৃষ্টির্কতা আল্লাহ তা'আলার কসম করে বলছি, আমি সাবিত আল বানানিকে কবরে সমাহিত করি। হামিদ তাওয়ীলও আমার সঙ্গে ছিলেন। আমরা তাঁকে (বানানীকে) মাটি দ্বারা দাফন করি। ওই সময় এক প্রান্তের মাটি সরে যায়। আমি কবরের ভেতরে তাকিয়ে তাঁকে সালাত/নামায পড়তে দেখি'।" ইবনে জারির তাবারী তাঁর 'তাহযিব আল আসার' কিতাবে এবং আবু নুয়াইম, ইব্রাহীম বিন সামেত হতে বর্ণনা করেন যে, প্রভাতকালে সাবিত আল বানানির কবরের পাশ দিয়ে যারা চলাচল করেছেন, তারা বলেছেন যে তারা কুরআন শরীফ তেলাওয়াত শুনতে পেয়েছেন। ইবনুল জওযীও তার 'সিফাতুস সাফওয়া' গ্রন্থে এ কথা লিখেছেন। তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, হাকিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও বায়হাকী

রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর কথা রওয়ায়াত করেন, যিনি বলেন, "কয়েকজন সাহাবী একটি জায়গায় তাঁবু খাটিয়েছিলেন, যেখানে একটি অজ্ঞাত কবর ছিল। তাঁরা তাঁবুর অভ্যন্তরে সুরা মূলক-এর তেলাওয়াত শোনেন। তেলাওয়াত সমাপ্ত হবার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁবুর ভেতরে প্রবেশ করেন। যখন সাহাবাগণ তাঁকে ঘটনার বৃত্তান্ত সম্পর্কে অবহিত করেন, তখন হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'এই সম্মানিত সুরাটি মানুষকে কবর আযাব থেকে রক্ষা করে'।" আবুল কাসিম সাদী তাঁর রচিত 'কিতাবুর রূহ' পুস্তকে লিখেছেন, "এ হাদীসটি প্রমাণ করে যে বেসালপ্রাপ্তজন তাঁদের মাযার-রওযায় কুরআন তেলাওয়াত করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-ও একটি তাঁবু কোনো এক জায়গায় স্থাপন করেছিলেন। তিনি তাঁবুর অভ্যন্তরে কুরআন তেলাওয়াত শুনতে পান। এ কথা হুযূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জানানোর পর হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।" 'আহওয়াল আল কুবুর' কিতাবে মুহাদ্দীস যাইনুদ্দীন ইবনে রাজাব লিখেছেন: "আল্লাহ তা'আলা নেয়ামতস্বরূপ তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে তাঁদের মাযার-রওযায় সওয়াবদায়ক কাজ সংঘটনের সামর্থ্য দান করে থাকেন। বেসালের সঙ্গে সঙ্গে কোনো বান্দার এবাদত পালনের দায়িত্ব সমাপ্ত হয়। মাযার-রওযায় পালিত এবাদতের কোনো লাভ নেই (বিনিময়ে পুরস্কার নেই)। কিন্তু বেসালপ্রাপ্তজন আল্লাহতা'আলার যিকির ও এবাদত করতে পারলে আনন্দ অনুভব করেন। ফেরেস্তা ও বেহেশতী ব্যক্তিগণও তা-ই অনুভব করেন। তাঁরা এবাদতে আনন্দ পান, কারণ যিকির এবং এবাদত হচ্ছে সালেহ রূহগণের জন্যে সবচেয়ে মধুর জিনিস। অসুস্থ রূহসম্পন্ন ব্যক্তিরা এ আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না। ইবনুল কইয়েম আল জওযিয়া তার 'কিতাবুর রূহ' গ্রন্থে, ইবনে তাইমিয়াসহ আরো বহু উলামা-এ-কেরাম একই কথা লিখেছেন। আবু হাসান ইবনে বারা তাঁর 'রওদা' পুস্তকে লিখেছেন, "ইব্রাহীম নামক এক কবর খননকারী বলেছেন: 'আমি একটি খবর খনন করি। সেটা থেকে আতরের সুগন্ধির ঘ্রাণ অনুভব করি এবং কয়েক টুকরো ইট দেখতে পাই। আমি কবরের অভ্যন্তরে তাকিয়ে দেখি এক বৃদ্ধ কোরান তেলাওয়াত করছেন। মুহাম্মদ ইসহাক ইবনে মানদা হযরত আসিম আস সাকাতীর কথা উদ্ধৃত করেন: 'আমরা বলখ্ নগরীতে একটি কবর খনন করি। এতে পার্শ্ববর্তী কবরের অভ্যন্তর-ভাগ দৃশ্যমান হয়। একজন সবুজ কাফনের কাপড় পরিহিত বৃদ্ধ কুরআন হাতে নিয়ে তেলাওয়াত করছিলেন।' 'রওদা' গ্রন্থটিতে এ ধরনের বহু ঘটনার বিবরণ দেয়া হয়েছে। মুহাদ্দীস আলেম আবু মুহাম্মদ হালাল তাঁর 'কারামাতুল আউলিয়া'-তে

লিখেছেন যে আবু ইউসুফ গাসুলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, তিনি হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সাক্ষাত লাভ করেন দামেস্কে। হযরত ইব্রাহীম আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'আজ একটি অপূর্ব জিনিস দেখলাম।' আবু ইউসুফ জিজ্ঞাসা করেন, 'কী জিনিস?' উত্তরে তিনি বলেন, 'ওই কবরস্থানের একটি কবরের পাশে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। কবরটি খুলে যায়। সবুজ কাফন পরিহিত এক বৃদ্ধ আগমন করেন। তিনি বল্লেন, "হে ইব্রাহীম তোমার জন্যে আল্লাহতা'আলা আমাকে জীবিত করে দিয়েছেন। তোমার ইচ্ছানুযায়ী তুমি যে কোনো প্রশ্ন আমাকে করতে পারো।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ পাক আপনার সঙ্গে কী রকম আচরণ করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, "আমার বদ আমল আমাকে ঘিরে ফেলেছিল। কিন্তু আল্লাহতা'আলা বলেন যে তিনি ৩টি কারণে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন: ১/ যেহেতু আমি তাঁদের ভালোবেসেছি যাঁদের তিনি ভালোবেসেছেন; ২/ যেহেতু এ পৃথিবীতে আমি কোনো প্রকার মদ্যপান করিনি; এবং ৩/ যেহেতু আমি তাঁর হুজূরে উপস্থিত হয়েছি আমার সাদা দাড়িসহ। তিনি ঘোষণা করেন যে তাঁর হুজূরে এ অবস্থায় আগমনকারী মুসলমানদেরকে শাস্তি দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন।" এরপর ওই বৃদ্ধ কবরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যান।' ইবনুল জওযী তার 'সিফাতুস সাফওয়া'-তে লিখেছেন, "উম্মুল আসওয়াদ তাঁর দুগ্ধ-মাতা হযরত মুয়াযার কথা উদ্ধৃত করেন, যিনি বলেন, 'আবুস সাহবা এবং আমার পুত্র শহীদ হবার পর থেকে পৃথিবীটি আমার জন্যে একটি কারাগার হয়ে গিয়েছে। আমি আর কিছুই উপভোগ করি না। তবুও আমি এই আশা নিয়ে বাঁচতে চাই যে আমি এমন কিছু একটা করতে পারবো যার দরুণ আমি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হবো এবং ফলস্বরূপ আবুস সাহবা ও আমার পুত্রের সঙ্গে জান্নাতে মিলিত হতে পারবো।' মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন বলেন যে ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে মুয়াযা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কাঁদেন। এরপর তিনি হাসেন। এ রকম করার হেতু জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দেন, '(মৃত্যুর ফলে) আমাকে সালাত, রোযা, কুরআন তেলাওয়াত ও আল্লাহর নামের যিকর থেকে নিবৃত্ত করা হবে, এ কথা ভেবে চিন্তিত ছিলাম। এমতাবস্থায় আমি আবুস সাহবাকে দেখি। তিনি সবুজ রংয়ের দুটো চাদর পরেছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে আর এভাবে দেখি নি। এ কারণেই আমি হেসেছি।' মুয়াযা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখেছিলেন এবং তাঁর থেকে হাদীস রওয়ায়াত করেন। হযরত হাসান আল বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, আবু কিলাবা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং ইয়াযিদ আর রাকাশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতো মহান

উলামায়ে হাক্কানী-রব্বানী হযরত মুয়াযা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে হাদীস রওয়ায়াত করেছেন”।[১]

অনেক বুযূর্গ ব্যক্তি কবর আযাব প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ“ফেরাউন ও তার লোকদের গন্তব্যস্থল দোযখের আগুনকে তাদের সামনে প্রত্যেক সকালে এবং সন্ধ্যায় প্রদর্শন করা হয়” ।[২] আল বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সহীহাইনে লিপিবদ্ধ একটি হাদীস ঘোষণা করে: “যদি তোমরা গোপনীয়তা বজায় রাখো, তবে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারি, যাতে তিনি তোমাদেরকে কবর আযাব সম্পর্কে শ্রবণ করান, যেভাবে আমাকে তিনি শ্রবণ করিয়েছেন।” কবর আযাব রূহ এবং শরীর দুটোর ওপরই পতিত হয়, কেননা তারা উভয়ই এক সাথে কুফর ও গুনাহ সংঘটন করে থাকে। শুধুমাত্র রূহকে আযাব দেয়াটা খোদাতা'আলার এলম ও বিচারের সঙ্গে খাপ খায় না। উলামাবৃন্দ ঘোষণা করেন যে যদিও শরীর কবরের মধ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে মনুষ্য চক্ষুর অন্তরালে চলে যেতে পারে, তবুও সেটা আল্লাহর জ্ঞানের পরিসরে বিরাজ করে। বহু সাহাবী প্রত্যক্ষ করে বলেছেন যে মৃতদের রূহ এবং দেহ উভয়কেই আযাব দেয়া হয়। ইবনে কাইয়েম তার ‘কিতাবুর রূহ’, ইমাম সুয়ূতী তাঁর ’শরহে সুদুর’ এবং ইবনে রাজাব তাঁর ‘আহওয়াল আল কুবুর’ গ্রন্থে লিখেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপস্থিতিতে এক ব্যক্তি বলেন, ’আমি এক লোককে মাটি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম। অপর এক লোক তাকে লাঠি দ্বারা আঘাত করার পর সে ভূতলে অদৃশ্য হয়ে যায়। আর এটার পুনরাবৃত্তি হতে থাকলো যতোবার ওই লোকটা মাটি থেকে উঠে আসছিল।’ নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বল্লেন: ‘তুমি যাকে দেখেছ সে আবু জাহল। পুনরুত্থান (দিবস) পর্যন্ত তাকে এভাবে আযাব দেয়া হবে’।”এ খবর এবং অনুরূপ খবরসমূহ প্রমাণ করে যে আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম ও আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতো প্রত্যেকেই কবরের অভ্যন্তরে সংঘটিত ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করতে পারেন। আউলিয়ার দর্শন ক্ষমতাকে

---

১. সিফাতুস সাফওয়া।
২. আল কুর'আন : সূরা মু'মিনুন, ২৩/৪৬।

কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। তাঁরা আল্লাহ পাকের কুদরতে প্রত্যক্ষ করে থাকেন।

আমরা এ পর্যন্ত যা লিখেছি তা প্রমাণ করে যে বেসালপ্রাপ্তজন তাঁদের মাযার-রওযায় আমাদের অজ্ঞাত একটি জীবনে বর্তমান, যাকে আমরা 'কবর জীবন' নামে আখ্যা দিতে পারি। সমস্ত ইসলামী ওলামা বলেন যে মৃত্যু অস্তিত্বের অবসান নয়, বরং এক ঘর থেকে অন্য আরেক ঘরে স্থানান্তর। আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম এবং আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইসলামী বিশ্বাস প্রচার-প্রসারের কাজে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, আর তাই তাঁরা বেসালের পর শহীদের মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। কুরআন-এ-করীমে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে যে শহীদানবৃন্দ জীবিতাবস্থায় আছেন। তাহলে তাঁদের মাধ্যমে তাসাব্বুব ও তাশাফফু এবং তাওয়াসসুল করাটা কেন বিস্ময় উদ্রেককর হবে? 'তাসাব্বুবের' অর্থ নবী-ওলীদেরকে আল্লাহতা'আলার হুজূরে (উপস্থিতিতে) কারণ ()-স্বরূপ সাহায্য করার জন্যে আবেদন জানানো। 'তাওয়াসসুলের' অর্থ তাঁদেরকে আমাদের জন্যে দোয়া করতে আনুরোধ করা, যেহেতু তাঁরা ইহকাল এবং পরকাল উভয় জাহানেই আল্লাহর প্রিয় বান্দা। কুরআন মজিদ ঘোষণা করে যে তাঁরা যা চান তা-ই অর্জন করতে পারেন এবং তাঁদেরকে তা মঞ্জুর করা হয় (আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে)। জীবিত লোকদের কাছ থেকে যা চাওয়া যায় তা যদি আল্লাহ পাকের ওই সকল বেসালপ্রাপ্ত প্রিয় বান্দার কাছে চাওয়া হয়, তাহলে কি প্রার্থনাকারী ব্যক্তিকে দোষারোপ করা উচিত হবে? সেই ব্যক্তিকে কি তিরস্কার করা উচিৎ হবে যিনি বেসালপ্রাপ্ত নবী-ওলীবৃন্দকে ওসীলা করেন এ কথা মনের মধ্যে পোষণ করে যে আল্লাহতা'আলা স্বয়ং প্রার্থিত বস্তু, যা নবী-ওলীর কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে তা সৃষ্টি করে দেবেন এবং আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই? যারা ধারণা করে যে নবী-ওলীবৃন্দ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে মাটি হয়ে গিয়েছেন অথবা অস্তিত্বহীন হয়েছেন, তারাই এগুলোকে অস্বীকার করে। যারা ইসলাম ও শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ এবং যারা এগুলোর মাহাত্ম্য ও উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে বে-খবর, তারাই অবিশ্বাস করে। দ্বীনী পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, যারা আম্বিয়া-আউলিয়ার মাহাত্ম্য ও উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারে না, তারা দ্বীন সম্পর্কে কর্তৃত্বসম্পন্ন নয়, বরং দ্বীন সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। শরীয়তকে তারা বুঝতে পারেনি। যে সকল মুসলমানকে তারা অজ্ঞ মনে করে, বস্তুতঃপক্ষে তাঁরাই অধিক জ্ঞানী এবং বুদ্ধিসম্পন্ন। হাদীসসমূহে বিবৃত এবং মুসলিম উলামার সর্বসম্মত রওয়ায়তানুযায়ী ব্যক্ত হয়েছে যে নবী-ওলীবৃন্দের মাযার-রওযায় গমন করে তাঁদের মধ্যস্থতায় আল্লাহতা'আলার কাছে প্রার্থনা করা এবং রোজ হাশরের দিনে তাঁদের কাছ থেকে

সুপারিশ (শাফায়াত) পাবার আশায় প্রার্থনা করা অনুমতিপ্রাপ্ত। এ কথাও বোঝা উচিৎ যে যারা এসব নির্ভরযোগ্য দলিলাদি অবিশ্বাস করে মুসলমানদেরকে তাঁদের বিশ্বাসের জন্যে দোষারোপ করে, তারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামকেই বিকৃত ও ধ্বংস করার কু-মতলব পোষণ করে। আমাদের হামদ ও শোকরিয়া প্রকাশ মহান আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের প্রতি যিনি মনুষ্য জতির সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস এবং নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসারী প্রিয় ও মনোনীত সালেহীনের বইপত্রের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার নেয়ামত আমাদের ওপর বর্ষণ করেছেন। যদি আমাদের আল্লাহ পাক এ নেয়ামত মঞ্জুর না করতেন, তবে আমরা নিজ সামর্থ্যে এগুলো খুঁজে বের করতে পারতাম না এবং বুঝতেও পারতাম না। ফলস্বরূপ আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম।

এখন আমরা সেই সব আয়াত পেশ করবো যেগুলোতে প্রতিভাত হয় যে আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করার সময় আম্বিয়া-আউলিয়াকে মধ্যস্থতাকারীস্বরূপ স্থাপন করা জায়েয, যাতে তাঁরা আল্লাহ পকের সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় কারণ হিসেবে কাজ করতে পারেন। একটি আয়াতে ঘোষিত হয়েছে: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** "হে ঈমানদারগণ আল্লাহকে ভয় (তাকওয়া অর্জন) করো; তাঁর সান্নিধ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ওসীলার অন্বেষণ করো"।[১] অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: **وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورً** "এমন অনেক লোক আছে যারা এবাদত ও দু'আ করে। তারা একটি অসীলা তথা কারণ বা মাধ্যমের তালাশ করে আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে। তারা চায় যেন মাধ্যমটি তাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়"।[২] আয়াতগুলোতে আল্লাহতা'আলা মুসলমানদেরকে আদেশ করেছেন যেন তাঁরা কারণ এবং মাধ্যমসমূহকে আঁকড়ে ধরেন, যাতে তাঁরা আল্লাহরই ঘোষণানুযায়ী তাঁর নৈকট্য অর্জন করতে পারেন। মাধ্যমসমূহকে নিন্দিষ্ট কোনো বস্তু বলে ঘোষণা করা হয় নি। অতএব, যা কিছু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করতে সাহায্য করে তার সবই ওসীলা বিশেষ। অর্থাৎ,

---

[১]. আল কুর'আন : সূরা আল মায়িদা, ৫/৩৫।
[২].আল কুর'আন : সূরা আল ইসরা, ১৭/৫৭।

খারেজীদের ভ্রান্ত ধারণার ঠিক উল্টো অর্থে, শুধুমাত্র (বেসালপ্রাপ্তজনের) দোয়া-ই নয়, তাঁদের শাফায়াত এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে তাঁদের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য এবং তাঁরা নিজেরাও ওসীলা। আর আহলে সুন্নাতের উলামাগণ বলেন যে নবীগণের এবং তাঁদের অনুসারীগণের শাফায়াত, মর্যাদা, কারামত, দোয়া ইত্যাদি, তাঁদের 'পথ' বা তাঁদের মালিকানাধীন ঈমান, এবাদত ও ইখলাসের মতোই ওসীলা বা মাধ্যম। যে সব ওহাবী বলে যে আম্বিয়া-আউলিয়াবৃন্দ ওসীলা নন, তারা প্রকৃতপক্ষে কোরআন, হাদীস, নবী এবং ওলীগণের কুৎসা রটনায় লিপ্ত। কুরআন এবং হাদীসে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে যে নবী এবং ওলীগণকে ওসীলা বানানো যায়।

সুরা আনফালের ৩৩ নং আয়াত ঘোষণা করে,

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

আমি সেই সব কাফেরদেরকে শাস্তি দেবো না ততোক্ষণ, যতোক্ষণ আপনি (নবী) তাদের মাঝে অবস্থান করবেন।[১]

আল বুখারী ও তফসীর কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ ভাষ্যানুযায়ী, কাফেররা হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে বলতোঃ 'তোমার আল্লাহকে বলো যেন তিনি আমাদের প্রতি আযাব দেন।' উপরোক্ত আয়াতটি এর ফলে নাযিল হয় এই ঘোষণা নিয়ে যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাক শরীর মুবারক কাফেরদের মাঝে অবস্থান করায় আযাব পতিত হচ্ছে না। এ কথা বলা যাবে না যে হুজূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নবুয়্যতের ওয়াস্তে কিংবা তাঁর দোয়া ও শাফায়াত দ্বারা আযাব প্রেরণ বন্ধ করেছিলেন, কারণ কাফেরদের জন্যে কোনো দোয়া অথবা শাফায়াতও করা হবে না, আর নবুয়্যত যার ওপর তারা বিশ্বাস আনে নি, সেটাও তাদের জন্যে কোনো মঙ্গল বয়ে আনবে না।

আল্লাহ পাক একই আয়াতে ঘোষণা করে"

وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ.

---

[১]. আল কুর'আন : সূরা আল আনফাল, ৮/৩৩।

–আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেন না, যেহেতু তারা ক্ষমা চায়।

সালাফ আস্ সালেহীনের অধিকাংশই বলেন যে এ আয়াতটির অর্থ 'আমি তাদেরকে শাস্তি দেই না, কারণ তাদের সন্তান-সন্তুতি হবে যারা ক্ষমা চাইবে।' আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, 'আমি তাদেরকে শাস্তি দেই না', কারণ তিনি অনন্তকালে ডিক্রি করেছিলেন যে কাফিরদের উত্তরস্মরীদেরকে ঈমানদার বানাবেন। সুতরাং যে সকল উলামা উপরোক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁদের মতানুযায়ী কাফেরদের ঔরসে মুসলমানগণই হচ্ছেন ওসীলা যা আযাবকে রহিত করেছিল।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান:

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ –وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ.

–মানব জাতিকে যদি আমি একে অপরের বিরুদ্ধে ছেড়ে দেই, তাহলে পৃথিবী উলট-পালট হয়ে যাবে।[১]

কয়েকজন তফসীরশাস্ত্রের উলামা এ আয়াতটিকে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: 'পৃথিবী সম্পূর্ণভাবে বিশৃঙ্খল হয়ে যেতো যদি আল্লাহ পাক কোনো ঈমানদার না সৃষ্টি করে শুধু কাফের সৃষ্টি করতেন। বিশ্বাসীদের শরীরের অস্তিত্বই পৃথিবীকে বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করছে।' মানবের নিজের সত্তার মধ্যেই পরিত্রাণ নিহিত, যা তার আমলের ফলাফল থেকে অর্জন করা সম্ভব নয়। এ কারণেই একটি হাদীস শরীফে ঘোষিত হয়েছে, "পৃথিবীতে আগমনের পূর্বেই একজন ব্যক্তি হয় 'সাঈদ' (সৎ), নয়তো 'শাকী' (অসৎ)।" বাহ্যিকভাবে নেক আমল হতে 'সাঈদ' হওয়ার অবস্থা হলেও বাস্তবিকভাবে তা সত্য নয়। এ কারণেই একটি হাদীসে ঘোষিত হয়েছে, "কোনো ব্যক্তি বদ কাজ করে, যা তাকে জাহান্নামে নেবে। সে জাহান্নামের নিকটবর্তী হয়। যদি সে উম্মুল কিতাবে, অর্থাৎ, আল্লাহর জ্ঞানে 'সাঈদ' হয়, তাহলে সে এমন কোনো কাজ করে তার শেষ দিনগুলোতে যা তাকে বেহেশতে দাখিল করে দেয়। ফলস্বরূপ সে জান্নাতে গমন করে।" মানুষের আমল তাকে জান্নাতে নেয় না, বরং তা তাকে বেহেশতে নেবার কারণস্বরূপ কাজ করে। আর এ কারণেই হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "কোনো ব্যক্তি-ই তার এবাদত ও নেক আমলের জন্যে বেহেশতী হবে না।" তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, "আপনার জন্যেও কি একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে?" তিনি উত্তর দেন,

[১]. আল কুর'আন : সূরা বাকারা ২/২৫১ আয়াত, সূরা হজ্ব ২২/৪০।

"হ্যাঁ, আমার ক্ষেত্রেও তা-ই প্রযোজ্য হবে। আমি একমাত্র আল্লাহতা'আলার দয়া ও রহমতের মাধ্যমে মুক্তি অর্জন করবো।" কেউ বলতে পারবে না যে কোনো ব্যক্তি তার এবাদত ও নেক আমলের জন্যে বেহেশতী হবে। কিন্তু মানুষ তাঁকেই নিশ্চিতভাবে বেহেশতী বলতে পারে যিনি অনন্তকালে 'সাঈদ' হিসেবে চিহ্নিত ছিলেন। সাঈদ কিংবা শাকী হওয়াটা কোনো ব্যক্তির আমলের ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং তার নিজের সত্তার (যাত) ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তা'আলা হযরত রাসূল-এ-করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অন্যান্য মানুষের মাঝ থেকে বেছে নিয়েছেন এবং তাঁর অন্যান্য নবীগণের চেয়ে অধিক মর্যাদাবান বানিয়েছেন একমাত্র হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যাত-এ-পাক তথা পবিত্র সত্তার জন্যেই। প্রত্যেক ঈমাননদার-ই এটা ব্যক্ত করেন। নবী-রাসূল আলাইহিস্ সালাম এবং আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মাহাত্ম্যের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। মর্যাদা এবং প্রত্যেকটা মাহাত্ম্যই কোনো ব্যক্তির সত্তার ওপর নির্ভরশীল, যেটা কিন্তু আবার উচ্চ মর্যাদার ওপর নির্ভরশীল নয় (উদাহরণস্বরূপ, প্রেসিডেন্ট হওয়ার কারণে ব্যক্তি মূল্যবান হয় না, বরং যেহেতু তিনি মূল্যবান ব্যক্তি, সেহেতু তিনি প্রেসিডেন্ট হন)। তাহলে এটা নিশ্চিত, 'পদার্থ, বস্তু অথবা মানুষ (যাত,সত্তা) সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় কারণ হতে পারে না'- ওহাবীদের এই দাবিটি নিছক ভ্রান্তি। আয়াত ও হাদীসসমূহ এবং হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে তারা একটি বিভ্রান্তিকর ও গোমরাহ পথের ওপর বিচরণ করছে।

একটি হাদীসে ঘোষিত হয়েছে: "আমাদের অসুস্থ লোকেরা আমাদের মাটির নেয়ামত ও আমাদেরই একজনের লালার মাধ্যমে এবং আল্লাহ পাকের অনুমতিক্রমে সুস্থ হয়ে ওঠে।" যদি কেউ পরিষ্কার মাটির সঙ্গে নিজের পরিষ্কার লালা মেশিয়ে কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে ওষুধস্বরূপ খাওয়ায়, তাহলে আল্লাহ পাক রোগীকে সুস্থতা দান করেন। মাটি এবং লালা কিংবা ওষুধ প্রস্তুতকারীর বিশেষ প্রভাবযুক্ত ওষুধের সবই পদার্থ বা বস্তু। অর্থাৎ, সেগুলো 'যাত'। সেগুলোর মর্যাদা রয়েছে কিংবা সেগুলো শাফায়াত করতে পারে এ কথা ধারণা-ই করা যায় না। মুসলিম শরীফে একটি সহীহ হাদীস ঘোষণা করে: "যমযম (কূপের) পানি পানকারীর নিয়্যত অনুযায়ী সেটার উপকারিতা রয়েছে।" যখন যমযম-এর পানি বৈষয়িক কিংবা অপার্থিব কোনো উপকার পাওয়ার নিয়্যতে পান করা হয়, তখন সেটা উপকার প্রদান করে। বহু ঘটনা এ বিষয়টিকে প্রমাণ করে। সবাই জানেন যে যমযমের পানি একটা যাত মাত্র, একটা পদার্থ মাত্র, যেটা নিজের উচ্চ মর্যাদার

কারণে কর্ম সংঘটন করতে পারে কিংবা দোয়া ও শাফায়াতের মাধ্যমে সুস্বাস্থ্য দিতে এবং সাহায্য করতে পারে বলে ধারণা-ই করা যায় না।

কাবা শরীফের দরজা এবং হাজর আল আসওয়াদ পাথরের মধ্যবর্তী যিয়ারতের স্থানটাকে ‘মুলতাযাম’ বলা হয়, যা একটা সহীহ হাদীস শরীফে উলামা কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে রওয়ায়াত করা হয়েছে। যদি কেউ এই স্থানটাতে কাবা শরীফের দেয়ালের সঙ্গে নিজের পেটকে স্পর্শ করিয়ে মুলতাযামকে তার দোয়া কবুলের মাধ্যম বানিয়ে আল্লাহতা'আলার কাছে প্রার্থনা করে, তাহলে আল্লাহ পাক তাকে ক্ষতি ও ভুল-ত্রুটি থেকে রক্ষা করেন। এটা বহুবার পরিদৃষ্ট হয়েছে। প্রত্যেকেই জানেন যে মুলতাযাম হচ্ছে কাবা শরীফের দেয়ালের মধ্যে অবস্থিত কিছু পাথরের সমষ্টি। এ সব পাথর হচ্ছে যাত, অর্থাৎ, পদার্থ। আল্লাহতা'আলা যেমনভাবে প্রত্যেকটি পদার্থের মধ্যে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে তিনি ওই পাথরগুলোকে (মূলতাযাম) উপকার ও শুভফল আনার মাধ্যম হিসেবে কাজ করার গুণ প্রদান করেছেন।

একই ধরনের গুণ ও প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা কাবা শরীফের উত্তরাংশে অবস্থিত ঝর্ণার নিচের যিয়ারতের স্থান, যেটাকে 'মাক্বাম আল ইব্রাহীম' বলা হয় এবং যেটা 'মসজিদ আল হারামে' অবস্থিত কাবা-গৃহের দরজার বিপরীত দিকে অবস্থিত, সেটাকেও দেয়া হয়েছে। আরও দেয়া হয়েছে কাবা শরীফের এক কোণায় অবস্থিত 'হাজর আল আসওয়াদ' নামক কালো পাথরকে, যাকে চুম্বন ও হাত-মুখ দিয়ে মাখলে সেই সব গুণের প্রভাব পাওয়া যায়। আল্লাহতা'আলা ওগুলোর ওসীলায় দোয়াপ্রার্থীদের দোয়া কবুল হওয়ার গুণ ওগুলোকে প্রদান করেছেন। যখন এটা পরিদৃষ্ট ও বিশ্বাস্য হচ্ছে যে ওই সব পদার্থ দোয়া কবুলের মাধ্যমস্বরূপ কাজ করতে সক্ষম, তখন এ কথা কীভাবে ধারণা করা যায় যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর অনুসারী আল্লাহতা'আলার প্রিয় বান্দাদের মধ্যস্থতায় প্রেরিত দোয়া কবুল করা হবে না? যদি কেউ এ কথা বলার দুঃসাহস দেখায় যে মাটি, মানুষের লালা, যমযম কুয়োর পানি, মুলতাযাম, মাকাম আল ইব্রাহীমের পাথরগুলো, যেখানে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম-এর পবিত্র পদচিহ্ন আছে, এবং হাজর আল আসওয়াদের ওসীলায় উপকার পাওয়াটা নবী-ওলীবৃন্দের পাক রওযাগুলোকে মাধ্যম বা ওসীলা বানাবার বিষয় প্রমাণ করে না, তবে তার কথা প্রমাণ করবে যে সে দ্বীনের জ্ঞানে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং সে আল্লাহ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলমানদেরকে শরমায় না। কারণ, সাহাবা-এ-কেরাম হুযূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহাসম্মানিত ব্যক্তিত্ব ও সত্ত্বাকে অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন।

আল বুখারী এবং অন্যান্যদের রওয়ায়াতকৃত হযরত উরওয়াহ ইবনে মাসউদ আস্ সাকাফী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর কথা সর্বজনবিদিত; তিনি বলেন,

لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيِّ، وَاللهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدًا، وَاللهِ إِنْ تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ

“আমি হুদায়বিয়ার সন্ধিতে কাফেরদের প্রতিনিধি হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করি। পরবর্তী পর্যায়ে আমি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে কুরাইশ নেতাদেরকে বলি: ’তোমরা জানো যে আমি ইতিপূর্বে পারস্যরাজ ‘খসরু’, বিজিনটিন রোমক-সম্রাট ’সিজার’ এবং আবিসিনীয় বাদশাহ ‘নাজ্জাসী’-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি বহুবার। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবা-এ-কেরাম কর্তৃক তাঁর প্রতি প্রদর্শিত ভক্তি-শ্রদ্ধা ওই সম্রাটরা কেউই পান নি। আমি তাঁর পবিত্র লালা (থুথু) মাটিতে পড়তে দেখি নি; তাঁর সাহাবাগণ সবসময় তা ধরে ফেলেছেন এবং নিজেদের মুখমন্ডলে ও চোখে মেখেছেন । তাঁর ওযুতে ব্যবহৃত পানি সাহাবাগণ ছুটে গিয়ে সংরক্ষণ করে থাকেন পরবর্তীকালে বরকত (আশীর্বাদ) আদায়ের উদ্দেশ্যে। যখন তাঁর চুল বা দাড়ি মুবারক কাটা হয় তখন তাঁরা সেগুলোর কোনো অংশকেই মাটিতে পড়তে দেন না এবং সেগুলো তাঁরা দামী মণি-মানিক্যের মতো সংরক্ষণ করেন। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং নিজেদের বিনয়ের জন্যে সাহাবাগণ তাঁর পবিত্র মুখমন্ডলের দিকে চোখ তুলে তাকাতেও পারেন না।[১]”

---

[১]. আব্দুর রায্যাক্ব : আল মুসান্নাফ, গযওয়াতুল হুদায়বিয়া, ৫/৩৩০ হাদীস নং ৯৭২০।
ক. আহ্‌মদ : আল মুস্‌নাদ, ৩১/২৪৭।
খ. বুখারী : আস সহীহ, বাবু শুরুত্বু ফিল জিহাদি, ৩/১৯৩ হাদীস নং ২৭৩১।

এ বর্ণনা থেকে বোঝা যায় সাহাবা-এ-কেরাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র যাত মোবারক হতে নিঃসৃত ছোট-খাটো কণাকেও কী রকম শ্রদ্ধা করতেন। এমন কি অন্যান্য লোকদের কাছে যে সব বস্তু নোংরা ও বিশ্রী হিসেবে বিবেচিত, সেগুলোকেও তাঁরা ভক্তি করতেন। তাহলে এ কথা কি বলা যাবে যে হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র লালা মোবারক এবং তাঁর পবিত্র দেহ মোবারকস্পৃষ্ট ওযুর পানি দোয়া বা সুপারিশ করার ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ার কারণেই এ ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়েছে? অথবা সেগুলোর উচ্চমর্যাদা ও মূল্যের কারণেই তা করা হয়েছে? সেগুলোর সবই তো পদার্থ; কিন্তু সেগুলো মহামূল্যবান হয়েছে সব চাইতে সম্মানিত যাত, অর্থাৎ, তাঁর দেহ মুবারক হতে নিঃসৃত হওয়ার কারণেই। দেখুন, ওয়াহহাবীরা তাদের চিন্তাধারায় কী রকম অজ্ঞ আহাম্মক যে, যদিও তারা নিজেদেরকে প্রকৃত দ্বীনদার ও তাওহীদপন্থী (মুয়াহহেদ) বলে পরিচয় দেয়, তবুও তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আল্ লাত মূর্তির সমতুল্য মনে করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবাগণ যে সব কাজ করেছেন এবং আমাদেরকে আদেশ করেছেন পালন করতে, সেগুলোকে ওয়াহহাবীরা মূর্তিপূজার সাথে তুলনা দেয়। আমরা আল্লাহর কাছে তাদের কথা ও বিশ্বাস হতে আশ্রয় চাই।

এমন বহু হাদীস আছে যেগুলো প্রতীয়মান করে যে আল্লাহর কাছে কোনো দোয়া কবুল করানোর উদ্দেশ্যে তাঁরই প্রিয় ও মনোনীত আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম এবং তাঁদের অনুসারী আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে ওসীলা বা মাধ্যম বানিয়ে নেয়া অনুমতিপ্রাপ্ত, আর এ সব হাদীসের কোনো উত্তরই আমাদের প্রতিপক্ষ দিতে পারে নি। তারা সম্পূর্ণ বেসামাল অবস্থায় পতিত হয়েছে। আল বুখারী ও মুসলিম শরীফ হাদীসগ্রন্থ দু'টোতে লেখা আছে যে, আসমা বিনতে আবি বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর আশপাশে সমবেত লোকদেরকে সবুজ একটি রেশমের জুব্বা প্রদর্শন করে বলেন, "হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে এ জুব্বাটা ছিল। আমি তাঁর বেসালের পর এটা নিয়েছি। আমরা আমাদের অসুস্থ মানুষদেরকে এটা পরিধান করিয়ে সুস্থ করি। তারা এটা পরিধান করে সুস্থ হয়ে ওঠে।" এতে প্রতিভাত হয় যে সাহাবাগণ সেই জুব্বাটিকে

গ. ত্বরানী : আল মু'জামুল কাবীর, ৯/২০।

ঘ. বায়হাক্বী : আস সুনানুল কুবরা, বাবু মুহাদানাতিন আলান নজ্বর, ৯/৩৬৬ হাদীস নং ১৮৮০৭।

সুস্থতার উদ্দেশ্যে ওসীলাস্বরূপ ব্যবহার করতেন। কারণ আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি সব মাহাত্ম্য ও পূর্ণতার অধিকারী, তিনি তা পরিধান করতেন। আল হামিদী তাঁর কিতাব, যেটা তিনি আল বুখারী ও মুসলিম শরীফের সহীহ কিতাব দু'টো অবলম্বনে রচনা করেছেন, সেটাতে আবদুল্লাহ বিন মাওহিবের কথা উদ্ধৃত করেন, যিনি বলেন,

قَالَ: أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ - وَقَبَضَ إِسْرَائِيلُ ثَلَاثَ أَصَابِعَ مِنْ قُصَّةٍ - فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ، فَاطَّلَعْتُ فِي الجُلْجُلِ، فَرَأَيْتُ شَعَرَاتٍ حُمْرًا.

"আমার স্ত্রী আমাকে একটি পানিপূর্ণ পাত্র (কাপ) প্রদান করে আমাদের মাতা উম্মে সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে প্রেরণ করে। হযরত উম্মে সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একটি রূপার বাক্স নিয়ে আসেন। ওর ভেতরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাক দাড়ি মোবারক ছিল। তিনি পাত্রের পানিকে পবিত্র দাড়ির অংশগুলো দিয়ে নেড়ে সেগুলো বের করে নেন। যে সকল মানুষেরা বদ নযর কিংবা অন্য কোনো বিপদ (বালা-মুসীবত) দ্বারা আক্রান্ত হতো, তারা পানি নিয়ে আসতো এবং এটা করতো, আর পানি পান করে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতো। আমি রৌপ্য বাক্সের ভেতরে তাকিয়ে কিছু লাল বর্ণের চুল দেখতে পাই।"[১]

একই পুস্তকে আল হামিদী হযরত সাহল ইবনে সাদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর কথা উদ্ধৃত করেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিত্র জামাটি আমাকে উপহারস্বরূপ দান করেন। আমার মা আমার কাছ থেকে তা নিতে চান। আমি তাঁকে বলি, 'আমি এটা আমার কাফনের জন্যে রাখতে চাই।' তিনি বলেন, 'আমি আমাদের আক্বা ও মওলা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জামা মুবারক থেকে তবাররুক (আশীর্বাদ গ্রহণ) নিতে চেয়েছিলাম'।" অতএব, এ কথা পরিস্ফুট যে সাহাবা-এ-কেরাম নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

১. বুখারী : আস সহীহ, বাবু মা ইউযকারু ফি শায়বি, ৭/১৬০ হাদীস নং ৫৮৯৬।

ওয়াসাল্লাম-এর নেয়ামতপূর্ণ জামাকে শাস্তি হতে পরিত্রাণ পাবার জন্যে মাধ্যম বা কারণস্বরূপ ব্যবহার করেছিলেন।

আল বুখারী ও মুসলিম শরীফে লিপিবদ্ধ আছে যে উম্মে সালিম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ”রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে ঘুমোচ্ছিলেন। তাঁর পাক মুখমন্ডলে মুক্তার মতো ঘাম জমেছিল। আমি যখন সেগুলো অন্য আরেক জায়গায় সংগ্রহ করে রাখছিলাম, তখন তিনি ঘুম থেকে জেগে ওঠেন এবং জিজ্ঞেস করেন, ‘হে উম্মে সালিম। তুমি কী করছো?’ আমি বল্লাম, এয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি আমাদের সন্তানদেরকে আপনার পবিত্র ঘাম দ্বারা তবাররুক গ্রহণ করাতে চাই। তিনি বল্লেন, ‘তুমি ভাল কাজ করছো।” ইবনে মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর ’শরহে মাসাবিহ’ কিতাবে বলেন, “এই হাদীস পরিস্ফুট করে যে তাসাউফের ইমাম, উলামা-এ-হক্কানী/রব্বানী ও সুলাহা কর্তৃক ব্যবহৃত বস্তুর মাধ্যমে আল্লাহ তা’আলার সন্তুষ্টি অর্জনের প্রচেষ্টা অনুমতিপ্রাপ্ত।”

ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন: “মদীনাবাসীগণ রস্দলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পানিপূর্ণ পাত্রসমূহ নিয়ে যেতেন, যখনি তিনি ফজরের নামায পড়া শেষ করতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেকটি পাত্রেই তাঁর হস্ত মোবারক চুবাতেন। ইবনুল জওযী তার ‘বয়ানুল মুশকিলিল হাদীস’ গ্রন্থে লিখেছেন, “অতএব, মদীনাবাসীগণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে নেয়ামত অর্জন করতেন (ওইভাবে)। এটা ভাল হয় যদি কোনো আলেম (-এ হক্কানী/সূফী/দরবেশ) তাঁর কাছে বরকত আদায়ের উদ্দেশ্যে আগমনকারী মানুষকে ফিরিয়ে না দেন।” ইবনুল জাওযীর এই মন্তব্য এবং ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ’শরহে মুসলিম’-এ উদ্ধৃত লেখনীসমূহ এবং শরহে মুসলিম-এ ইমাম কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বক্তব্যসমূহ এবং হানাফী আলেম ইবনে মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ভাষ্যসমূহ থেকে প্রতিভাত হয় যে এ ধরনের দোয়া প্রার্থনা শুধু নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্যেই খাস বা সুনির্দিষ্ট নয়, যা খারেজীরা মনে করে থাকে।

ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত ইবনে সিরিন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে উদ্ধৃত করেন, যিনি বলেন, ”রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাক দাড়ি মোবারকের একটি চুল সংরক্ষণ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমি আবু ওবায়দা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে এ কথা জানালাম। তিনি বল্লেন, ’পৃথিবীতে

ওই পবিত্র দাড়ির একটি চুল মোবারক পাওয়ার থেকে অন্য কিছু পাওয়াকে আমি বড় মনে করি না'।" আল বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরও লিখেছেন যে দীর্ঘকাল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সোহবত (সান্নিধ্য) লাভকারী হযরত আনাস্ ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু অসীয়ত (অন্তিম ইচ্ছা) করেছিলেন যে দাফনের সময় যেন তাঁর সঙ্গে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দাড়ির একটি চুল মোবারকও কবরস্থ করা হয়। তিনি তা নিয়ে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত-এর হুজূরে উপস্থিত হতে চেয়েছিলেন। 'শিফা' কিতাবে লেখা আছে, "হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাহাত্ম্য ও মোজেযাত এবং নেয়ামতসমূহের একটি এই যে, হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নিজের সঙ্গে সব সময়েই হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দাড়ির একটি চুল মোবারক বহন করতেন। ওই চুলটি তিনি যে সব যুদ্ধে বহন করেছিলেন, তার সব ক'টিতেই তিনি জিতেছিলেন।" যখন হযরত খালিদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর হাজত-মকসূদ পূরণ করতে সক্ষম হয়েছেন হুজূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দাড়ির একটি চুল মোবারক থেকে, তখন হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র যাত মোবারকের মাধ্যমে বা মধ্যস্থতায় (ওসীলায়) কেন আল্লাহতা'আলা কর্তৃক হাজত-মকসূদ পূরণ হবে না? আশেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মহান আলেম-এ-ইসলাম ইমাম বুসীরী তাঁর 'কাসিদা আল বুরদায়' এই সূক্ষ্ম ব্যাপারটি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফের 'সহিহাইনে' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে উদ্ধৃত করা হয়েছে: "রাসূল-এ-আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টো কবরের পাশে উপস্থিত হন। তিনি বুঝতে পারেন যে উভয়ই আযাবে পতিত। তিনি একটি খেজুর গাছের ডাল তলব করেন। এরপর ডালটিকে দু'ভাগে বিভক্ত করে কবর দু'টোর ওপর পুঁতে দেন। হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'এগুলো যতোদিন সজীব (অশুষ্ক) থাকবে, ততোদিন তাদের (মৃত দু'জনের) কষ্ট কম হবে'।" হাদীসটি শিক্ষা দেয় যে আযাব (শাস্তি) প্রশমনের জন্যে কবরের ওপর খেজুর গাছের সবুজ ডাল রাখা যেতে পারে। সবুজ ঘাসের নেয়ামতস্বরূপ আল্লাহ পাক কবর আযাব প্রশমিত করেন। সবুজ ঘাস একটা যাত বা পদার্থ মাত্র। আযাবের ওই ধরনের প্রশমন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্যেই শুধু খাস নয়। এটা ইসলামী উলামার সর্বসম্মত ভাষ্য যে কবরের ওপর যে কোনো সময় সবুজ খেজুর গাছের ডাল স্থাপন করা যেতে পারে। এই কারণেই মুসলমান কবরস্থানে সাইপ্রেস গাছ রোপণ করা হয়ে থাকে। যদি খুজের গাছের ডালের মতো একটি বস্তু আযাব

প্রশমনের কারণ হতে পারে, তাহলে সাইয়্যেদুল মুরসালিন (সকল নবীর শ্রেষ্ঠ নবী পাক-দ:)-কে কেন কারণ বা মাধ্যমস্বরূপ স্থাপন করা অনুমতিপ্রাপ্ত হবে না? জ্ঞান ও যুক্তিসঙ্গত চিন্তাধারার অধিকারী কেউ কি এর প্রতি আপত্তি করতে পারবে?

আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করার জন্যে যাত বা বস্তুকে মাধ্যমস্বরূপ স্থাপন করা অনুমতিপ্রাপ্ত। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা হযরত হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর কলিজার অংশ চিবিয়েছিলেন ওহুদের জিহাদ সংঘটনকালে। নবী-এ-আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, "আল্লাহর দৃষ্টিতে হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন এবং তিনি তাঁর (হামযার) দেহের কোনো অংশকেই জাহান্নামে পোড়াবেন না" (হাদীস)। হুজূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র রক্ত পান করার পর হযরত মালিক ইবনে সিনান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে তিনি বলেন, "দোযখের আগুন তোমাকে পোড়াবে না" (হাদীস)। অনুরূপভাবে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিঙ্গা অস্ত্রোপচারে পরিত্যক্ত রক্ত মোবারক পান করার পর তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে ভর্ৎসনা না করে বলেন, "লোকদের মাধ্যমে তোমার বহু ক্ষতি হবে; আবার তোমার মাধ্যমেও লোকদের বহু ক্ষতি হবে" (হাদীস)। একজন মহিলা হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পান করা পানীয়ের অবশিষ্টাংশ পান করার পর তিনি তাঁকে বলেন, "তুমি আর কখনোই পেটের ব্যথায় পীড়িত হবে না।" এই হাদীসটি সহীহ এবং ওই মহিলার নাম 'বারাকা।' বহু উলামা, উদাহরণস্বরূপ, ইমাম কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'শিফা' কিতাবে এবং ইমাম কসতলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'আল মাওয়াহিবুল্ লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে, এ রওয়ায়াতটি লিখেছেন। ওহে মুসলমানবৃন্দ রক্ত এবং অনুরূপ বস্তু যা পূর্বে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছিল তা যদি দোযখের আগুন হতে পরিত্রাণ লাভের জন্যে এবং রোগ-ব্যাধি উপশমের জন্যে কারণ বা মাধ্যমস্বরূপ কাজ করতে পারে, তবে এ কথা কেন বিশ্বাস করা যাবে না যে তাঁর পবিত্র সত্তা (ব্যক্তিত্ব) অনুরূপ সুবিধাদি অর্জনে মধ্যস্থতাকারী হতে পারেন? তাঁর পাক যাত আল্লাহতা'আলারই নূর (জ্যোতি)। তাঁর ছায়া কখনো মাটিতে পড়ে নি। হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং আরও অনেকে এ কথা বর্ণনা করেছেন। যদি কেউ বলে, "তাঁকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না; তিনি আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় কারণ হতে পারেন না", তাহলে সেই ব্যক্তিকে কি আল্লাহর প্রিয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতের একজন সদস্য হিসেবে গণ্য করা উচিৎ, নাকি শত্রু হিসেবে গণ্য করা উচিৎ? আয়াতসমূহে ঘোষিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম রহমতস্বরূপ, এমন কি কাফেরদের জন্যেও। তাহলে কেন তিনি মুসলমান ও আহল্ আস্ সুন্নাত ওয়াল জামাত, যাঁরা তাঁকে ভালোবাসেন, তাঁদের জন্যে রহমতের কারণ বা মাধ্যম হবেন না?

"ওসীলার তালাশ করো"- আয়াতটিতে উদ্ধৃত 'ওসীলা' (মাধ্যম)-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবাদত, দোয়া এবং পাক ও উচ্চ-মর্যাদাসম্পন্ন 'যাত'সমূহ (ব্যক্তিত্ব, বস্তু)। আমাদের উদ্ধৃত হাদীস ও ঘটনাসমূহ এ সত্যটিকে স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে।

বহু আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে সৃষ্টির কাছে সকল জিনিস প্রার্থনা করা জায়েয (অনুমতি প্রাপ্ত); এমন কি সে সব জিনিসও, যেগুলো মানুষ দিতে পারে না এবং শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলা তাঁর আউলিয়াকে কারামতস্বরূপ যা দান করেছেন তা দিয়েই তাঁরা তা দিতে এবং করতে পারেন। ওই সব আয়াতের একটা হচ্ছে সুরা নমলের ৩৮ নং আয়াত,

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ –قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ

–যেখানে হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম-এর উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে: "হে আমার জাতি। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছ, যে নাকি আমার কাছে রানী বিলকিসের সিংহাসনটি নিয়ে আসতে পারবে?" তিনি যে সকল লোকের মাঝে ভাষণ দিচ্ছিলেন তাদের মধ্যে জ্বিন, ইনসান সবাই ছিলেন। দুষ্টু জ্বিন সম্প্রদায়ের নেতা ইফরিত বললো: "আপনার ওঠে দাঁড়িয়ে সভাস্থল ত্যাগ করার আগেই আমি তা নিয়ে আসতে পারবো।" সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম বল্লেন, "আমি আরও তাড়াতাড়ি তা আনাতে চাই।" সুলাইমান নবী আলাইহিস্ সালাম-এর উযির (প্রধানমন্ত্রী) আসিফ বিন বারখিয়া বল্লেন, "আমি চোখের পলকে নিয়ে আসবো।[১]

বিলকিস রানীর সিংহাসন ছিল ইয়েমেনদেশে, আর হযরত সুলাইমান (আঃ) ছিলেন দামেস্কে। উভয় স্থানের দূরত্ব ছিল পদব্রজে তিন মাসের

[১]. আল কুর'আন : সূরা আন নমল, ২৭/৩৮-৩৯।

যাত্রা-পথ। আসিফ মুহূর্তের মধ্যে মাটির নিচে দিয়ে সিংহাসনটি নিয়ে আসেন। সিংহাসনটি স্বর্ণ ও মণি-মানিক্য দ্বারা অলংকৃত ছিল। এই ঘটনাটি একটি কারামত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রীতি-নীতিবহির্ভূর্ত উপায়ে তাঁর জন্মগত বান্দা আউলিয়াকে কারামত মন্‌জুর করে থাকেন। কুরআনে করীমে তিনি গর্বের সাথে বর্ণনা করেন কারামতটার কথা, যেটা তিনি তাঁর একজন প্রিয় সালেহ বান্দা ও ওলীর কাছে মঞ্জুর করেছিলেন। তিনি হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম-কে এই কারামতটা কামনা করার জন্যে ভর্ৎসনা করেন নি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন নি, "আমি তোমার হৃদযন্ত্রের নালির কাছে থাকা সত্ত্বেও কেন তুমি অন্য কারও কাছে চাইতে গেলে? মানুষ যা করতে পারে না এবং যা আমি ছাড়া আর কেউই করতে পারে না, তা তুমি কেন আমার কাছে চাইলে না?" এর কারণ হচ্ছে হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম আল্লাহর নবী ছিলেন এবং তিনি জানতেন যে তাঁর এই কথা বা ইচ্ছা আর কিছুই নয়, শুধু কারণসমূহকে আঁকড়ে ধরা মাত্র, যেটা তাঁর শরীয়তের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। আল্লাহতা'আলা মানুষদেরকে কারণসমূহকে আঁকড়ে ধরতে আদেশ দিয়েছেন। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আউলিয়া, সুলাহা ও শহীদদেরকে আবেদন জানানো-ও অনুরূপ একটি কাজ। তাঁদের কাছে মঞ্জুরীকৃত আল্লাহ পাকের কারামতগুলোর সদ্ব্যবহারের এটা একটা উপায়মাত্র। তাঁরা হচ্ছেন সৃষ্টির কারণ (সাবাব), বাহন (ওয়াসিতা) এবং মাধ্যম (ওয়াসিলা)। একমাত্র আল্লাহতা'আলাই সৃষ্টি করে থাকেন। আউলিয়ার কারামত হচ্ছে আম্বিয়াবৃন্দের মু'জিযা ও মাহাত্ম্য। আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম-এর মাধ্যমেই আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কারামত অর্জন করেন, কেননা তাঁরা আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম-কে অনুসরণ করেন।

সুরা বাকারার ৮৯ আয়াতটি সেই সমস্ত আয়াতগুলোর একটি, যেগুলোতে প্রতীয়মান হয় যে আল্লাহতা'আলার প্রিয় বান্দাদের, প্রথমতঃ নবীকুলশ্রেষ্ঠ হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শরণাপন্ন হয়ে শাফায়াত প্রার্থনা করা জায়েয। মুহাদ্দীস ওলামা সর্বসম্মতভাবে রওয়ায়াত করেন যে এই আয়াতটি খাইবারের ইহুদীদের প্রতি নাযিল হয়েছে। এ সকল ইহুদীরা জাহেলীয়্যা যুগে 'আসাদ' এবং 'গাতফান' গোত্র দু'টোর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তারা দোয়া করে, 'হে আমাদের আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন সেই নবীর হকের ওপর, যাঁকে আপনি সবশেষে প্রেরণ করবেন।' শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শরণাপন্ন হয়ে তারা বহু যুদ্ধ জয় করে। কিন্তু যখন রাসূল-এ-করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে ইসলাম প্রচার আরম্ভ করেন, তখন ইহুদীরা তাঁকে হিংসা করা শুরু করে এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনে না। ইবনুল কাইয়েম আল জওযিয়া তার 'বাদায়ী আল ফারাইদ' পুস্তকে বলে, "জাহেলীয়্যা যুগে ইহুদীরা তাদের প্রতিবেশী আরবদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাক সত্তার ওসীলায় আল্লাহ পাকের কাছে সাহায্য কামনা করে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবের বহু পূর্বে। আল্লাহতা'আলা তাদেরকে সাহায্য করেন এবং তারা জয়ী হয়। কিন্তু হুজূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম প্রচার শুরু করার পর তারা তাঁকে অবিশ্বাস করে। যদি তারা তাঁকে পূর্বকালে বিশ্বাস না করতো, তাহলে তো আর তারা তাঁর মাধ্যমে সাহায্যপ্রার্থী হতো না।" তফসীর কিতাব 'আল বায়দাবী'-এর কয়েকটি শরাহ বা ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থে হযরত সাদ-উদ-দ্বীন তাফতাযানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে উদ্ধৃত করা হয়েছে; তিনি বলেন, "ইহুদীরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র নাম মোবারক উল্লেখ করে সাহায্য কামনা করেছিল। তারা নিজেদের জন্যে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র নাম মোবারককে শাফায়াতকারী বানিয়েছিল।" 'মাওলীদ আন্ নবী' গ্রন্থে মহান আলেম-এ-হক্কানী ইমাম তাকীউদ্দীন আল হুসনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, "একজন মুসলমান তাঁর প্রত্যেকটি কাজে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে স্থাপন করেন, যখনই তিনি জানতে পারেন হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উচ্চ নৈতিক গুণাবলী, দয়া, ধৈর্য ও সরলতা সম্পর্কে। ফলশ্রুতিতে, তিনি উপলব্ধি করতে পারেন আল্লাহর দরবারে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে। যেহেতু রাসূল-এ-মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন শাফায়াতকারী, সেহেতু আল্লাহতা'আলা তাঁর শাফায়াত প্রত্যাখ্যান করেন না। তিনি হচ্ছেন আল্লাহ পাকের মাহবুব (প্রিয়)। আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে বা মধ্যস্থতায় প্রেরিত প্রার্থনার জওয়াব দেন। মহান আল্লাহ তা'আলা এটা কোরানে ঘোষণা করেছেন এবং তাঁর আউলিয়ার কাছে উম্মোচিত করেছেন। কুরআন মজীদ ইরশাদ ফরমায় যে সকল মুসলমান, এমন কি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শত্রুরাও তাদের হাজত-মকসূদ পূরণ করেছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ওসীলা বা মধ্যস্থতাকারী বানিয়ে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে তিনি তাদেরকে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে দিয়েছেন, কারণ তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অত্যন্ত ভালোবাসেন এবং তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে বানিয়েছেন বলে (তাঁর ওয়াস্তে

প্রেরিত দোয়া আল্লাহ প্রত্যাখ্যান করেন নি)। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'জাহেলীয়্যা যুগে খাইবারের ইহুদীরা গাতফান গোত্র নামক আরবীয় কাফেরদের সঙ্গে সদা-সর্বদা যুদ্ধে লিপ্ত হতো এবং পরাজিত হতো। এরপর তারা দোয়া করে: 'হে আমাদের আল্লাহ আপনার (সর্বাধিক) প্রিয় এবং প্রতিশ্রুত সর্বশেষ নবীর ওয়াস্তে আমাদেরকে আপনি সাহায্য করুন।' ফলস্বরূপ, তারা গাতফান কাফেরদের বিরুদ্ধে জয়ী হয়।' কিন্তু ইহুদীরা হুযূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বিশ্বাস করেনি যখন তিনি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রেরিত হন। তারা কাফের হয়ে যায়। আল্লাহ পাক উপরোক্ত আয়াতে ঘটনাটি ব্যক্ত করেন। আমরা দেখছি যে আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতোই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন যে তিনি (আল্লাহ) এমন কি সেই সব কাফেরদের দোয়াও কবুল করে নিয়েছিলেন যারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মধ্যস্থাকারী বানিয়েছিল। যদিও আল্লাহ তা'আলা জানতেন যে ইহুদীরাই তাঁর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সবচেয়ে মারাত্মক শত্রুতে পরিণত হবে এবং নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ষতি করতে প্রয়াস পাবে, তবুও তিনি তাদের দোয়া কবুল করে নেন যখনই তারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ওসীলা বানিয়ে দোয়া করেছিল। এ কথা যখন প্রতিভাত হলো যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উচ্চ মর্যাদা ও শাফায়াত তাঁর পৃথিবীতে আগমনের পূর্বেই ওই রকম উচ্চ পর্যায়ে ছিল, তখন এটা কি কোনো জ্ঞানী এবং বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির দাবি করা উচিৎ যে তাঁকে ওসীলা ও শাফায়াতকারী বানানো গুনাহের কাজ? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সব আলমের (জগতের) জন্যে রহমত হিসেবে প্রেরণের পরও কি এ দাবি করা যুক্তিসঙ্গত হবে? এক্ষণে বোঝা যায় যে যারা এতে (শাফায়াতে) বিশ্বাস করে না, তারা ইহুদীদের চাইতেও জঘন্য এবং নিকৃষ্ট। প্রথম নবী হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম-এর দোয়াও তখন কবুল করা হয়েছিল, যখনই তিনি রাসূল-এ-মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওসীলা করেছিলেন। এ বিষয়টি তফসির ও হাদীস কিতাবসমূহে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। যারা এ সকল দলিল অধ্যয়ন করে বুঝতে পারেন, তাঁরা সুস্পষ্টভাবে জানেন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ওসীলা করার বৈধতায় অবিশ্বাসীরা কী ধরনের নিকৃষ্ট জাতের লোক।" (মওলিদ আন্ নবী)

<u>সম্পূরণ</u>

আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম-বৃন্দের মো'জেযা ও আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-গণের কারামতের কারণেই আল্লাহ পাক কর্তৃক আবেদনসমূহ মন্‌জুর হয়, যখনই

সেই সব আবেদন তাঁদের মধ্যস্থতায় এবং সুপারিশে পেশ করা হয়। তাঁরা বেসালের পরও কারামতসম্পন্ন হয়ে থাকেন। আহল আস সুন্নাতের উলামা সর্বসম্মতভাবে রওয়ায়াত করেন যে কারামত সত্য এবং এতে ঈমান রাখা ওয়াজিব (অবশ্য কর্তব্য)। আল্লাহ ইরশাদ ফরমান যে আউলিয়াবৃন্দ কারামতসম্পন্ন। একটি আয়াতে বিবৃত হয়েছে যে সুলায়মান আলাইহিস্ সালাম বিলকিস রানীর সিংহাসনটি মূহূর্তে ইয়েমেনের সাবা হতে দামেস্কে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। এই সিংহাসনটি স্বর্ণ ও মণি-মানিক্য দ্বারা অলংকৃত ছিল। আসিফ বিন বারখিয়া সেটা মুহূর্তের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন। আনার সময় সিংহাসনটার কোনো রকম ক্ষতি সাধিত হয় নি। আসিফ একজন ওলী ছিলেন। সিংহাসনটা মুহূর্তের মধ্যে নিয়ে আসাটা তাঁর একটা কারামত। হযরত মরিয়ম-এর কারামতও কুরআনের সুরা আল-ই-ইমরানের ৩৭ নং আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। যদিও শুধুমাত্র যাকারিয়া নবী আলাইহিস্ সালাম-ই মরিয়মের আলাইহিস্ সালাম হুজরায় গমন করতেন, তবুও তিনি যখনই সেখানে যেতেন তখনই তাজা খেজুর দেখতেন। মরিয়ম আলাইহাস্ সালাম বলতেন যে সেগুলো আল্লাহতা'আলা কর্তৃক প্রেরিত হতো। আহল্ আস্ সুন্নাতের উলামাবৃন্দ সর্বসম্মতভাবে ঘোষণা করেন যে নবীগণের মো'জেযার মতোই আউলিয়াদেরও কারামত রয়েছে; কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ভালোবাসেন যাঁরা আম্বিয়াকে মান্য এবং অনুসরণ করেন। তিনি তাঁদেরকে জীবনে-বেসালে কারামত দ্বারা ধন্য করেন। বেসালের পরও নবী-ওলীদের মু'জিযা ও কারামত বিরাজমান থাকার ব্যাপারটি প্রতীয়মান করে যে তাঁরা সত্য ছিলেন। কেননা, তাঁদের জীবদ্দশায় প্রদর্শিত মু'জিযা এবং কারামত প্রত্যক্ষকারী অবিশ্বাসী শত্রুরা মনে করেছিল যে তাঁরা অন্যদের কাছ থেকে শিক্ষা করে বুঝি সেগুলো প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু তাঁদের বেসালের পর সংঘটিত মু'জিযা ও কারামত সম্পর্কে তো তা বলা বা ধারণা করা যায় না। আল্লাহ পাক নিজেই মু'জিযা বা কারামত সৃষ্টি করে থাকেন। এগুলো একমাত্র তাঁর ক্ষমতা থেকেই উদ্ভূত হয়। তিনি তাঁর নবী-ওলীদের প্রতি দয়া ও নেয়ামতস্বরূপ এগুলো তাঁদের মাধ্যমে এবং তাঁদের শাফায়াতের মাধ্যমে সৃষ্টি করে থাকেন। 'মু'জিযা' একজন নবী আলাইহিস্ সালাম-এর কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করা হয়; আর 'কারামত' এমন একজন সালেহ (পুণ্যবান) ঈমানদারের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করা হয় যিনি কোনো নবী আলাইহিস্ সালাম-এর অনুসারী হিসেবে জ্ঞাত। আম্বিয়াবৃন্দ সকলেই মা'সুম, অর্থাৎ, তাঁরা কখনো গুনাহ করেন না। শয়তান কোনো নবীর সুরত (চেহারা) ধরে আসতে পারে না। আউলিয়া-বুযূর্গ নবীগণের উত্তরাধিকারী (ওয়ারিস) এবং তাই শয়তান তাঁদের কাছেও আসতে পারে না। বহু কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে যে শয়তান হযরত

উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং আরও অনেক সাহাবীর কাছ থেকে পালিয়েছিল। আলীউশী ফারগানাউয়ী তাঁর 'বাদ-উল-আমালী' নামক কাসিদার বইয়ে বলেন:

"আউলিয়ার কারামত পৃথিবীতে বিরাজমান,তাঁরা অতি দয়াবান।"

উপরোক্ত পংক্তির ব্যাপারে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের সংশয় থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এটা ব্যক্ত করে যে আউলিয়ার কারামত এ পৃথিবীতেই সংঘটিত হয়। কারণ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সঙ্গে এ ব্যাপারে মু'তাযিলাদের মতভেদ ছিল। মু'তাযিলারা বলতো যে এ পৃথিবীতে কোনো কারামত নেই। তারা মনে করেছিল যে আউলিয়ার কারামতের সঙ্গে আম্বিয়ার মু'জিযা বুঝি তালগোল পাকিয়ে যাবে এবং ফলশ্রুতিতে নবীকে ওলীর কাছ থেকে পৃথকভাবে চেনা যাবে না। আহলে সুন্নাতের মতে, মো'জেযার অধিকারীকে ঘোষণা করতে হয় যে তিনি একজন নবী; অপর পক্ষে, কারামতের অধিকারীর জন্যে নিজেকে ওলী হিসেবে ঘোষণা করা নিষিদ্ধ। কেউ এ ধরনের কথা বল্লে বুঝতে হবে সে ওলী নয়। যদি ওয়াহহাবীরা এ বিষয়টি বুঝতে পারতো, তাহলে তারা যিনদিক ও মিথ্যাবাদীদের কথার ছুতো ধরে আউলিয়ার কুৎসা রটনা করতো না। উপরোক্ত পংক্তি দুটোর অর্থ: 'কোনো ওলীর কারামত এ পৃথিবীতেও সংঘটিত হয়। আল্লাহ তা'আলা সেই সব মানুষের হাজত (প্রয়োজন) পূরণ করেন যারা আউলিয়ার কাছে কোনো জিনিস চায় কিংবা তাঁদের শাফায়াত প্রার্থনা করে।' যাদের উপলব্ধি ক্ষমতা কম, তারা ওই পংক্তি দুটো থেকে এই সিদ্ধান্ত নেয় যে একজন ওলীর কারামত শুধু এই পৃথিবীতেই বিরাজমান; বেসালের পর তাঁর আর কোনো কারামত থাকে না। এই ব্যাখ্যাটা একেবারেই ভুল, কেননা মহান উলামা, উদাহরণস্বরূপ, হযরত হানাফী আল বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'শরহে কাছীদায়ে আমালী' পুস্তকে এবং শায়খ আহমদ তাঁর 'শরহে আশবাহ' বইয়ে হুবহু আমরা ওপরে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছি, ঠিক সেভাবেই এই পংক্তি দুটোর ব্যাখ্যা করেছেন। এটাও বলা যেতে পারে যে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত সকল মানুষ এ পৃথিবীতেই রয়েছে (মৃত্যুর পরও)। অর্থাৎ, পরবর্তী জগতে জীবন সূচনার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত।

আউলিয়ার বেসালের পরও অগণিত কারামত তাঁদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। উলামা-এ-কেরাম এটা সর্বসম্মতভাবে রওয়ায়াত করেছেন। আমরা এখন সেগুলোর কয়েকটি বর্ণনা করবো। আল বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন: "সাহাবী হযরত আসিম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহ পাকের কাছে শপথ করেন যে তিনি কোনো মুশরিককে স্পর্শ (অসম্মান)

করবেন না এবং প্রতিদানে তাঁকেও যেন কোন মুশরিক স্পর্শ না করে। তাঁকে শহীদ করার পর কাফেররা তাঁর মরদেহের কাছে যেতে চায়। আল্লাহ তা'আলা হযরত আসিম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে রক্ষা করার জন্যে এক ঝাঁক মৌমাছি প্রেরণ করেন। এতো মৌমাছির আগমন ঘটে যে কাফেররা আর তাঁর কাছে যেতেই পারে নি। কাফেররা সাহাবী হযরত হাবীব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে কারারুদ্ধ করে। তারা তাঁকে হুমকি দেয়, 'আমরা তোমাকে মুক্ত করে দেবো যদি তুমি বলো যে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন মিথ্যাবাদী যদি তুমি না বলো, তবে আমরা তোমাকে হত্যা করবো।' হযরত হাবীব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দেন, 'তাঁর পবিত্র কদম মোবরকও যাতে একটি কাঁটা দ্বারা ব্যথিত না হয়, সে জন্যে আমি আমার প্রাণ কুরবান করতে প্রস্তুত আছি।' কাফেররা তাঁকে শহীদ করে। কিছু সংখ্যক সাহাবী রাত্রে সেখানে গিয়ে শহীদের গলা হতে ফাঁসির দড়ি কেটে দেন। তিনি মাটিতে পড়ে যান। এর পরপরই তিনি অদৃশ্য হয়ে যান। সাহাবীবৃন্দ বুঝতে পারেন নি তিনি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। 'হানযালা' নামের একজন সাহাবী রাসূল-এ-করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে গযওয়ায় (জেহাদে) যাওয়ার জন্যে তাড়াতাড়ি তৈরি হন। ফলে তিনি গোসল না করে জ্বিহাদে যান। তাঁকে শহীদ করা হয়। ফেরেশতারা তাঁকে গোসন দেন। তাই তিনি 'গাসিল আল মালাইকা' নামে সুপ্রসিদ্ধ হন। 'মিশকাত' কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে: ''হযরত আয়েশা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'আবিসিনীয় রাজা নাজ্জাশী ঈমানদার হয়ে যান। আমি বহু লোককে বলতে শুনেছি যে সব সময় তাঁর মাযারের ওপর নূর জ্বলজ্বল করতো।' রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানান যে হযরত আলী (রঃ)-এর ভাই হযরত জাফর তাইয়ার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ফেরেশতাদের সঙ্গে ইয়েমেনের বিশা নগরীতে গমন করে সেখানকার অধিবাসীদের শুভসংবাদ দেন যে বৃষ্টি হবে। একজন ক্বারী বা হাফীয হযরত হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর পাক মস্তক মোবারকের পাশে বসে সুরা কাহাফ তেলাওয়াত করছিলেন। যখন 'আসহাবুল কাহাফ আমার আয়াতসমূহ দ্বারা আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল' এই আয়াতটি পাঠ করা হয়, তখন হযরত হুসাইনের পবিত্র মস্তক হতে একটি কণ্ঠস্বরকে বলতে শোনা যায়, 'আসহাবুল কাহাফের ঘটনার চাইতে আমাকে হত্যা এবং আমার দেহকে টানা-হেঁছড়া করার ঘটনাটি আরও আশ্চর্যজনক।' খলিফা মামুন হযরত নাসর আল হাযাইকে ফাঁসী দেন।

নাসরের মুখ যাতে কেবলার দিকে ফিরতে না পারে, তার জন্যে বর্শা-সজ্জিত একজন পাহাড়াদার নিযুক্ত করা হয়। রাত্রে তাঁর পবিত্র মুখ কিবলার দিকে ফিরে যায়। সেই মুহূর্তে তাঁর কাছ থেকে সূরা আনকাবুতের ২য় আয়াতটি তেলাওয়াত হতে শোনা যায়:

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ.

> 'এ কথা কি ধারণা করা হয় যে যারা ঈমানদার বলে ঘোষণা দিয়েছিল, তারা সবাই একাকী পড়ে রয়েছে?'[১] একটি কবর থেকে সুরা মূলকের প্রারম্ভ হতে শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত হতে শোনা গিয়েছিল" (মিশকাত)।

এ সকল ঘটনার সবই সত্য। এগুলো মুহাদ্দীস উলামা রওয়ায়াত করেছেন।

ইবনে আসাকির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন যে উমাইর ইবনে হাববাব আস্ সালামী বলেন: "উমাইয়াদের সময় আমরা আটজন বন্ধু বিজিনটিনীয় রোমানদের দ্বারা কারারুদ্ধ হই। তারা আমাদেরকে তাদের সম্রাটের কাছে নিয়ে যায়। সে আদেশ দেয় 'শিরোচ্ছেদ করো'। আমি আমার বন্ধুদের আগে নিজের জান দিতে প্রস্তুত হই। পাদ্রীরা আমার প্রতি দয়াবান হয়। তারা আমার আচরণে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল। তারা সম্রাটকে আমার প্রতি দয়া প্রদর্শনের আবেদন জানায় তার হাত-পায়ে চুমো খেয়ে। একজন পাদ্রী আমাকে তার ঘরে নিয়ে যায়। সে একজন সুন্দরী রমনীকে নিয়ে এসে আমার কাছে পরিচয় দেয়, 'এ আমার কন্যা। আমি তোমাকে এর সাথে বিয়ে দেবো যদি তুমি আমাদের ধর্ম গ্রহণ করো।' তখন আমি বল্লাম, 'আমি স্ত্রী কিংবা সম্পত্তির জন্যে আমার ধর্মকে বিসর্জন দিতে পারবো না।' কিছু দিন পর তার কন্যা আমাকে তাদের বাগানে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যায়। সে বলে, 'তুমি কেন আমার পিতার উপদেশ মেনে চলো না?' আমি আবারো উত্তর দেই: 'আমি নারী কিংবা ধন-সম্পদের জন্যে আমার দ্বীনকে বিসর্জন দিতে পারবো না।' তখন সে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি এখানে থাকতে চাও, নাকি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করতে চাও?' আমি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা তার কাছে প্রকাশ করি। সে এরপর একটি তারকার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে আমায় বলে, 'রাতে ওই তারকার দিকে ধাবিত হবে, আর দিনে লুকিয়ে থাকবে। তুমি তোমার রাজ্যে পৌঁছে যাবে।' এ কথা বলেই সে ভেতরে চলে যায়। আমি তিন রাত হাঁটি। চতুর্থ

---

[১]. আল কুর'আন : আল আনকাবুত, ২৯/২।

দিন আমি যখন লুকিয়েছিলাম, তখন কিছু লোককে বলতে শুনি, ‘উমাইর, উমাইর’ আমি তাকিয়ে দেখি আমার শাহাদাৎপ্রাপ্ত বন্ধুরাই আমাকে ডাকছে। ’তোমরা কি শহীদ নও?’ আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি। তারা উত্তর দেয়, ’হ্যাঁ, আমরা শহীদ; কিন্তু এখন আল্লাহ তা’আলা শহীদদেরকে আদেশ দিয়েছেন (খলীফা) উমর ইবনে আব্দুল আযিযের জানাযা ও দাফনে শরীক হতে।’ তারা সবাই ঘোড়ার পিঠে উপবিষ্ট ছিল। তাদের একজন বললো, ’হে উমাইর, তোমার হাতটা দাও দেখি।’ আমি হাতটা এগিয়ে দিলাম। সে আমাকে এক টান দিয়ে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিলো। আমরা দ্রুত ছুটে চল্লাম। সহসা আমি নিজেকে স্বদেশ আল জাযিরায় (আরব উপদ্বীপে) আবিষ্কার করলাম।’

ইবনুল জওযী লিখেছেন: ”আবু আলী বারবারী ছিলেন তারসুসে বসতি স্থাপনকারী প্রথম তিনজনের একজন। তিনি বিজিনটিনীয় রোমানদের বিরুদ্ধে জ্বিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর বন্ধুদের সাথে বন্দী হন। উমাইর-এর অনুরূপ ঘটে তাঁদের বেলায়ও। রোমানরা তাঁর বন্ধুদেরকে শহীদ করে। একজন পাদ্রী তাঁকে রক্ষা করে এবং তাঁকে তার গৃহে নিয়ে যায়। সে কন্যার মাধ্যমে তাঁকে ধোকা দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ তা’আলা ওই কন্যাকে হেদায়েত দান করেন (সত্য, সঠিক পথের দিকে)। তাঁরা দু’জনেই সবার অগোচরে বেরিয়ে পড়েন। দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকেন উভয়েই। অতঃপর তাঁরা মানুষের পায়ের শব্দ শোনেন। আবু আলী বারবারী তাঁর দু’জন শহীদ বন্ধুকে দেখতে পান। তাঁদের সঙ্গে ফেরেশতাও ছিলেন। তিনি তাঁদেরকে সালাম জানিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করেন। তাঁরা উত্তর দেন, ‘আল্লাহ তা’আলা তোমাদের কাছে আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। আমরা এ মহিলার সঙ্গে তোমার নেকাহ (বিয়ে) প্রত্যক্ষ করবো।’ তাঁরা নিকাহ-কাজ সমাপ্ত হবার পর প্রস্থান করেন। ওই দম্পতি দামেস্কে গমন করে সেখানে দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। এ ঘটনাটি দামেস্কে সুপ্রসিদ্ধ হয়ে যায়।” বেসালের পর জীবিত হয়ে প্রত্যাবর্তনকারী ব্যক্তিদের এ ধরনের ঘটনা ও জীবনী লিপিবদ্ধ আছে ইবনে আবিদ্ দুনইয়ার কিতাবসমূহে, আবু নুয়াইমের ‘হিলইয়া’ গ্রন্থে, ইবনুল জওযীর ‘সিফাতুস সাফওয়া’ এবং ’উয়ুন আল হিকায়াত’ পুস্তকে এবং আরও বহু উলামার অসংখ্য গ্রন্থে। ইবনে তাইমিয়া এবং ইবনুল কাইয়েম আল জওযিয়াও আউলিয়ার কারামত সম্পর্কে সুন্দর বর্ণনা দিয়েছে।

এটা সত্যি বিস্মষকর যে, কতিপয় হানাফী উলামা এবং ওয়াহহাবীরা বিশ্বাস করে না যে আউলিয়া মুহূর্তের মধ্যে দূরবর্তী কোনো জায়গায় গমন করতে পারেন (তায়ী আল মাকান), যা এক ধরনের কারামত বৈ কিছু নয়। এর অস্বীকারকারীদের প্রতি হানাফী উলামা তাঁদের ফিকাহ ও আকাঈদের কিতাবসমূহে

অতি সুন্দর উত্তর প্রদান করেছেন। উদারহণস্বরূপ, তাঁরা বলেছেন যে যদি কোনো পশ্চিমদেশীয় ব্যক্তি কোনো পূর্বদেশীয় রমনীকে বিয়ে করে এবং তার স্ত্রীর কাছ থেকে দীর্ঘকাল দূরে থাকে, আর যদি কয়েক বছরের মধ্যে স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা হয়, তাহলে কাঙ্ক্ষিত সন্তান তার পিতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবে। কারণ সেই ব্যক্তি তার স্ত্রীর কাছে 'তায়ী আল মাকান'স্বরূপ গমন করতে পারে। ওই ব্যক্তির এই ধরনের কারামত থাকার ব্যাপারটি অনুমতিপ্রাপ্ত। এটা ফকীহ উলামাবৃন্দ কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে ঘোষিত হয়েছে এবং আকাঈদের কিতাবসমূহেও লিপিবদ্ধ আছে। 'ওয়াহবানিয়্যা' পুস্তকে লেখা হয়েছে, "তায়ী আল মাসাফা, অর্থাৎ, মুহূর্তের মধ্যে দীর্ঘপথ পাড়ি দেয়ার ক্ষমতা আউলিয়ার কাছে ন্যস্ত করা হয়েছে। এর প্রতি ঈমান রাখা ওয়াজিব।" এই বিষয়টি 'আন্ নাসাফী,' 'আল ফিকাহ্ আল আকবর,' 'আস সওয়াদ আল আযম,' 'ওয়াসিয়্যাতু আবি ইউসুফ,' 'মাওয়াকিফ' ও 'মাকাসিদ' কিতাবসমূহে এবং উক্ত কিতাবসমূহের শরাহ (ব্যাখ্যা)-গুলোতে লিপিবদ্ধ আছে। আয়াতে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হওয়ার পর কেন এতে বিশ্বাস করা হবে না? আহলে সুন্নতের উলামাবৃন্দ এ আয়াতটির (সুরা নমল) ওপর ভিত্তি করেই যুক্তির অবতারণা করেছেন। আয়াতে বিবৃত ঘটনাটি, যে ঘটনায় রানী বিলকিসের সিংহাসনকে মুহূর্তে মধ্যে দামেস্কে নিয়ে আসা হয়েছিল, সেই ঘটনাটি প্রতীয়মান করে যে 'তায়ী আল মাসাফা' একটি কারামত বৈ কিছু নয়।

ইমাম আল আযম হযরত আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর গ্রন্থ 'আস সওয়াদ আল আযম'-এর শরাহ-তে আউলিয়ার কারামত সম্পর্কে অতি সুন্দর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। আমরা এখন ওই বইটির ৩২তম পরিচ্ছেদ থেকে এবারত উদ্ধৃত করছি: "আউলিয়ার কারামতে বিশ্বাস করার আবশ্যক। তাঁদের কারামতে যে ব্যক্তি অবিশ্বাস করবে, সে বিদয়াতী-গোমরাহতে পরিণত হবে। আউলিয়ার কারামতের প্রতি তিন ধরনের বিশ্বাস রয়েছে। কোনো ব্যক্তি যদি কারামত বর্ণনাকারী আয়াতসমূহে অবিশ্বাস করে, তাহলে সে কাফেরে রূপান্তরিত হবে। যদি সে আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে, কিন্তু বলে যে,'তাঁরা নবী ছিলেন', তাহলে পুনরায় সে কাফেরে পরিণত হবে। আর যদি সে আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে এবং এ কথা না বলে যে, 'তাঁরা নবী ছিলেন,' তবে তার জন্যে এ কথা বলা অনুপ্রতিপ্রাপ্ত হবে যে 'আয়াতসমূহ আউলিয়ার কারামত সম্পর্কে বর্ণনা দেয়।' কারণ আল্লাহ তা'আলা আয়াতটিতে ঘোষণা করেন, যে ব্যক্তি বিলকিস রানীর সিংহাসনটি মুহূর্তের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন, তিনি একজন আলেম ছিলেন ('কিতাবের এলমসম্পন্ন')। সেই আলেম হচ্ছেন

আসিফ বিন বারখিয়া। তিনি একজন ওলী ছিলেন, তিনি নবী ছিলেন না। সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম-এর উম্মতেরই একজন ছিলেন। যখন সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম-এর উম্মতের মধ্যে একজনের কারামত সম্পর্কে কুরআনে ঘোষণা দেয়া হয়েছে, তখন এ কথা কেন বিশ্বাস করা হবে না যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত কারামতসম্পন্ন? নিশ্চয়ই নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম থেকে শ্রেষ্ঠ এবং তাঁর উম্মতও সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম-এর উম্মতের চাইতে শ্রেষ্ঠ। এখন যদি ওয়াহহাবী গোমরাহরা বলে: 'কারামতটি হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম-এর ছিল,' তাহলে আমরা উত্তরে বলবো, 'এই উম্মতের কারামতসমূহ হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধিকারে।' সুরা মরিয়মের ২৪ তম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান:

وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّ.

> 'খেজুর গাছকে তোমার দিকে নাড়া দাও তোমার জন্যে সেখান থেকে তাজা খেজুর পড়বে'।[১]

আল্লাহ পাক উম্মোচন করেন যে তিনি হযরত মরিয়মের জন্যে শুকনো খেজুর গাছ থেকে তাজা ফল উৎপন্ন করেছিলেন। হযরত মরিয়ম কোনো নবী ছিলেন না। হযরত মরিয়মের পাশে যে সব ফল হযরত যাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম দেখেছিলেন এবং আসহাবুল কাহাফের ঘটনা ইত্যাদি সবই কারামত ছিল। এ সকল কারামতের অধিকারী ব্যক্তিগণ কেউই নবী ছিলেন না। পূর্ববতী আম্বিয়াবৃন্দের উম্মতদের মধ্যে যদি কারামতসম্পন্ন আউলিয়া থাকতে পারেন, তাহলে হযরত রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতের মধ্যে কেন কারামতসম্পন্ন আউলিয়া থাকবেন না? সুরা আল-ই-ইমরানের ১১ নং আয়াতে ঘোষিত হয়েছে, 'তোমরা-ই উম্মতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।' যদি কারামতে অবিশ্বাসীদের কেউ বলে, 'কোনো ব্যক্তি এক রাতের মধ্যে কাবা শরীফ গমন করে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না,' তাহলে আমরা উত্তরে বলবো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সাত আসমানের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং আল্লাহ তা'আলা যেখানে নিতে চেয়েছিলেন সেখানে নিয়েছিলেন এবং মুহূর্তে ফেরতও নিয়ে গিয়েছিলেন। এ থেকে বড় কি আর কোনো

---

[১]. আল কুর'আন : মরিয়ম, ১৯/২৪।

কারামত হতে পারে?' আমরা আরও বলবো, কে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন? একজন ঈমানদার নাকি একজন কাফের? আমরা এক কাফেরকে চেনি, যে নাকি পূর্ব থেকে পশ্চিমে আবার পশ্চিম থেকে পূর্বে মুহূর্তে গমন করতে পারে এবং এতে আমরা বিশ্বাসও করি। এই কাফের হচ্ছে ইবলিস (শয়তান)। একজন কাফেরকে প্রদত্ত ক্ষমতা কেন আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাদেরকে প্রদান করা হবে না? এ বিষয়ে প্রত্যেকের উচিত প্রভীরভাবে চিন্তা করা এবং ন্যায়পরায়ণ হওয়া।" (আস সওয়াদ আল আযমের শরাহ-এর উদ্ধৃতি শেষ হলো)

ইবনে তাইমিয়া এবং আরো অনেকে লিখেছেন যে আউলিয়ার কারামতে যারা বিশ্বাস করে নি, তারা ছিল খারেজী, মু'তাযিলা ও রাফেযী (শিয়া)-রা। অতএব, এ সকল গোমরাহদের কাছে কারামত নেই। তাই তারা কারামত দেখে না, অথবা শোনেও না এবং এতে তারা ঈমানও রাখে না। ('ওহাবী মতবাদ খন্ডনে ঐশী অবদান' বইটির অনুবাদ শেষ হলো)

আল্লামা দাউদ ইবনে সুলাইমান প্রণীত 'আল মিনহাতুল ওয়াহবীয়াহ ফী রাদ্দীল ওয়াহহাবীয়াহ' (ওহাবী মতবাদ খন্ডনে ঐশী অবদান) পুস্তকটি অনুবাদ করতে পেরে আমি (এই ফকির হুসাইন হিলমী ইসিক) আমার প্রভু মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই। এই শুভলগ্নে মহামূল্যবান ও মহাবরকতময় এ আরবী বইটি অনুবাদের কাজ সুসম্পন্ন করতে পেরে আমি আনন্দিতও বটে। আল্লাহ পাক আমার মুসলিম ভাইদেরকে এ বইটি পাঠ করে আহলে সুন্নতের সত্য ও সঠিক পথকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার সামর্থ্য দিন এবং ওহাবীদের মহাভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা ও লেখনী থেকে হেফাযত করুন, আমিন

২৫/ ওহাবীরা নিজেরাই স্বীকার করে যে তারা সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সত্য বলতে বাধ্য করেছেন। দেখুন, কীভাবে ওহাবী পুস্তকটি আহলে সুন্নতকে প্রশংসা করছে:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: أَقْضِي بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ

تَجِدْهُ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي لاَ آلُو، قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللهِ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে ইয়ামেন-দেশে বিচারক হিসেবে যাবার প্রাক মুহূর্তে জিজ্ঞেস করেন যে কীভাবে তিনি বিচার-কাজ সমাধা করবেন। হযরত মুয়ায রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী।' রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, 'যদি তুমি তাতে সমাধান না পাও?' হযরত মুয়ায রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দেন, 'তাহলে আমি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নতের দিকে তাকাবো।' আর যখন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, 'যদি তাতেও তুমি না পাও?' তখন হযরত মুয়ায (রা) উত্তরে বলেন, 'তাহলে আমি আমার ইজতেহাদ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবো'।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ তা'আলার কাছে শোকরিয়া যে তিনি তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিকে এমনই সামর্থ্য দিয়েছেন যার দরুণ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই তার প্রতি রাজি (সন্তুষ্ট) আছেন।[১]

فَمُعَاذُ مِنْ أَجَلِ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ بِالأَحْكَامِ وَمَعْرِفَةِ الحَلاَلِ مِنْ الحَرَامِ، وَمَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. وَلِهَذَا سَاغٍ لَهُ الاِجْتِهَادُ إِذَا لَمْ يَجِدْ لِلقَضِيَّةِ

---

[১] .ইব্‌ন আবূ শায়বা : আল মুসান্নাফ, ফিল কাদ্বী আঁই ইয়ানবাগী ৪/৫৪৩ হাদীস নং ২২৯৮৮।
ক. আহ্‌মদ : আল মুস্‌নাদ, হাদীসু মু'য়ায বিন জাবাল, ৫/২৩০ হাদীস নং ২২০৬০।
খ. দারেমী : আস সুনান, ১/২৬৭ হাদীস নং ১৭০।
গ. মুসলিম : আস সহীহ, বাবুত তাহরীজ আলাল কৃতলিল খাওয়ারিজ, ২/৭৪৬ হাদীস নং ১০৬৬।
ঘ. আবূ দাঊদ : আস সুনান, বাবু ইজতিহাদির রায়ি, ৩/৩০৩ হাদীস নং ৩৫৯২।
ঙ. তিরমিযী : আস সুনান, বাবু মা জা'য়া ফিল কাদ্বি, ৩/৯ হাদীস নং ১৩২৭।
চ. ত্ববরানী : আল মু'জামুল কাবীর, ২০/১৭০ হাদীস নং ১৭১১৯।
ছ. বাগাবী : শরহুস সুন্নাহ, বাবু ইজতিহাদিল হাকিম, ১০/১১৬।
জ. মুশকিলুল আছার : আশ শরাহ, ২/২১২ হাদীস নং ৩৫৮২।
ঝ. মুফতী আহমদ ইয়ার খান : জায়াল হক ১/৪৭ বাংলা সংস্করণ ।

حُكْمًا فِيْ كِتَابِ اللهِ، وَلاَ فِيْ سُنَّةِ رَسُوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِخِلاَفِ مَا يَقَعَ اليَوْمَ وَقَبْلَهُ مِنْ أَهْلِ التَفْرِيْطِ فِيْ الأَحْكَامِ مِمَّنْ يَجْهَلُ حُكْمَ اللهِ فِيْ كِتَابِهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ، فَيَظُنُّ أَنَّ الاجْتِهَادَ يَسُوْغُ لَهُ مَعَ الجَهْلِ بِأَحْكَامِ الكِتَابِ وَالسُنَّةِ وَهيْهَاتَ.

–ফেকাহ এবং হালাল-হারামবিষয়ক জ্ঞানে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত মুয়ায রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু অন্যতম জ্ঞানী পন্ডিত ছিলেন। সুতরাং তিনি ইজতেহাদ প্রয়োগে সক্ষম একজন জ্ঞান বিশারদ। আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতে না পেলে তাঁর পক্ষে নিজ ইজতেহাদ অনুসারে সিদ্ধান্ত নেয়ার অনুমতি ছিল। কিন্তু বর্তমানকালে এবং অতীতেও এমন কিছু লোকের আগমন হয়েছে, যারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত সম্পর্কে অজ্ঞ; অথচ তারা নিজেদেরকে ইজতেহাদ প্রয়োগে সক্ষম বলে মনে করে। তাদের প্রতি ধিক।[১]

এই ওহাবী ওপরের কথাগুলো আহলে সুন্নতের মহান উলামাদের বইপত্র থেকে উদ্ধৃত করেছে, যেমনিভাবে সে সকল প্রাথমিক দলিল তাঁদেরই বইপত্র থেকে গ্রহণ করেছে। ইবনে তাইমিয়ার আগে কেউই গোমরাহ ধ্যান-ধারণা লিপিবদ্ধ করেনি। সে-ই সর্বপ্রথম গোমরাহ ধারণার সূচনা করে। পরবর্তীকালে ওহাবীরা এই দাম্ভিক আচরণে সীমা লংঘন করে। সুন্নী উলামাগণের যে সমস্ত মহামূল্যবান বাণী তারা উদ্ধৃত করে, সেগুলোর মারাত্মক অপব্যাখ্যা-ই দিয়ে থাকে তারা। তারা বলে যে প্রত্যেকের আরবী শিক্ষা করা এবং ইজতেহাদ প্রয়োগ করা উচিৎ। ফলে ওহাবীরা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং সহস্র সহস্র মানুষকে গোমরাহ বানিয়েছে। উপরোক্ত উদ্ধৃতি তাদের ধারণাকে খন্ডন করে পরিস্ফুট করে যে ওহাবীদের মতো অজ্ঞ লোকদের ইজতেহাদ প্রয়োগ করার কোনো ক্ষমতা-ই নেই। আর ('নস'থেকে) তাদের বের করা অর্থ ও সিদ্ধান্তগুলোর সব-ই গোমরাহী ছাড়া কিছু নয়।

[১]. ফাতুহুল মাজীদ : ১/৪৩২।

আজকাল মযহাবে অবিশ্বাসী লোকদের সংখ্যা বাড়ছে। তারা বলে, “মযহাবের কী দরকার, যা মুসলিমদেরকে বিভক্ত করে থাকে? মযহাব ধর্মকে কঠিন করে দেয়। আল্লাহ ধর্মে সহজ-সরলতার আদেশ দিয়েছেন। ইসলামে ‘মযহাব’ বলতে কিছুই নেই। এগুলো পরে তৈরি করা হয়েছে। আমরা সাহাবায়ে কেরামের পথ অনুসরণ করি এবং অন্য কোনো পথকে স্বীকৃতি দেই না।”

এ ধরনের কথা ওহাবীদের দ্বারা বানানো হয়েছে, যারা বর্তমানে এগুলোকে মুসলিমদের মাঝে ধূর্ততার সাথে প্রচার করছে। সুন্নী উলামাগণের সঠিক মন্তব্যগুলো উদ্ধৃত করার পর তারা নিজেদের বানোয়াট ও মিথ্যা কথাগুলো-ও ওর সঙ্গে জুড়ে দেয়, ভাব এমন যেন উদ্ধৃতিটি এখনো চলছে। মানুষেরা সঠিক মন্তব্যগুলো দেখে মনে করে যে সবই বুঝি সঠিক; ফলে তারা ফাঁদে পড়ে যায়। উপরোক্ত মন্তব্য “আমরা সাহাবাগণকে অনুসরণ করি”- অবশ্যই সঠিক এবং বিবেচনাযোগ্য; কেননা, নাজাতের একমাত্র পথই হলো সাহাবীগণের পথ। বায়হাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণিত এবং ’কানযুদ্ দাকাইক’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ একটি হাদীস ঘোষণা করে,

أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ

> “আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রতুল্য। তাদের যে কাউকে তোমরা অনুসরণ করবে, হেদায়াত পাবে”।[১]

হাদিসটি প্রতীয়মান করে, যে ব্যক্তি কোনো একজন সাহাবীকে অনুসরণ করবে, সে উভয় জাহানের নেয়ামত অর্জন করতে পারবে। দায়লামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণিত একটি হাদীস ঘোষণা করে, “আমার সাহাবীরা উত্তম মানব। আল্লাহ তা’আলা যেন তাদের প্রতি সব সময়েই উত্তম নেয়ামত নাযেল করেন।” দায়লামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণিত অপর দুইটি হাদীসে ঘোষিত হয়েছে, “আমার সাহাবীদের দোষ-চর্চা করো না;” এবং “নিশ্চয়ই মুয়াবিয়া শাসক হবে” (হাদীস)।

সাহাবীদের পথ অনুসরণের দাবিদার লোকেরা কোন্ উৎস থেকে এ পথ সম্পর্কে জানবে? তারা কি ওহাবীদের কাছ থেকে তা জানবে, যারা সাহাবায়ে কেরামের এক হাজার বছর পরে এসেছে? নাকি তারা সেই সকল উলামাদের বইপত্র থেকে

---

[১]. নাওদিরুল উসূল ফি আহাদিসির রাসূল : ৩/৬২।
ক. ইব্ন বাত্বা : আল ইবানাতুল কুবরা, ২/৫৬৪ হাদীস নং ৭০২।
খ. জামিউল বয়ানিল ইলমি ওয়া ফদ্বলিহি : ২/৮৯৮ হাদীস নং ১৬৮৪।
গ. আল আজরী : আশ শরিয়াহ, ৪/১৬৯০ হাদীস নং ১১৬৬।

তা শিক্ষা করবে, যাঁরা সাহাবীদের সময়কার ছিলেন এবং সাহাবীদের দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন? সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্ত উলামাগণ এবং তাঁদের শিষ্যগণের সমষ্টি-ই হলেন সুন্নী জামাতের আলেম সম্প্রদায়। মযহাব অর্থ পথ। আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাত হলেন সেই সকল মুসলিম জনসাধারণ, যাঁরা নবীয়ে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-দের পদাংক অনুসরণ করেন। এই পথের নেয়ামতপ্রাপ্ত উলামাবৃন্দ সাহাবয়ে কেরাম থেকে যা শিখেছিলেন, তা হুবহু লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত অভিমত লিখেন নি। তাঁদের বইপত্রে এমন কোনো মন্তব্য নেই যাকে তাঁরা দালিলিক প্রমাণ দ্বারা পাকাপোক্ত করেন নি। চার মযহাবের সকল ইমামের ঈমান (আকিদা-বিশ্বাস) একই। বিশ্বাস-সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য নেই। সাহাবায়ে কেরামের পথটি কেবলমাত্র সুন্নী উলামাদের বইপত্র থেকেই শিক্ষা করা যায়। যারা সাহাবীদের পথে থাকতে চায়, তাদেরকে অবশ্যই সুন্নী পথে থাকতে হবে এবং ওহাবী মতবাদের মতো গোমরাহ-পথভ্রষ্ট আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকতে হবে।

২৬/ ওহাবী পুস্তকটি আহলে সুন্নতের সঠিক জ্ঞানের প্রতি স্বীকৃতি জানাতে বাধ্য হয়েছে, যদিও বিষাক্ত ও ভ্রান্ত এবং আক্রমণাত্মক মন্তব্যসমূহ ওরই মধ্যে সন্নিবেশিত করা হয়েছে:

أَنَّ الَّذِيْ شَرَّعَهُ الرَّسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ زِيَارَةِ القُبُوْرِ إِنَّمَا هُوَ تُذَكِّرُ الآخِرَة، وَالإِحْسَانُ إِلَىٰ المَزُوْرِ بِالدُّعَاءِ لَهُ، وَالتَّرَحُّمُ عَلَيْهِ، وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُ، وَسُؤَالُ العَافِيَةِ لَهُ فَيَكُوْنُ الزَائِرُ مُحْسِنًا إِلَىٰ نَفْسِهِ وَإِلَىٰ المَيِّتِ–

–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে আদেশ দিয়েছেন আখেরাতের কথা স্মরণ করতে এবং মৃতদের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে তাঁদের জন্যে ক্ষমাশীল ও দয়াপরবশ হয়ে দোয়া চাইতে এবং তাঁদের কবর যিয়ারতকালে ক্ষমা প্রার্থনা করতে। ফলে যিয়ারতকারী নিজের এবং কবরবাসীর জন্যে কল্যাণ সাধন করতে পারবে।

হযরত আবু হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণিত একটি হাদীস ঘোষণা করে,

زُوْرُوا الْقُبُوْرَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ.

–কবরসমূহ যিয়ারত করো নিশ্চয়ই তা তোমাদেরকে পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মোনাওয়ারার কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাবার সময় কবরগুলোর দিকে তাকিয়ে সম্ভাষণ জানান:

فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ القُبُورِ، يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا، وَنَحْنُ بِالأَثَرِ.

অর্থাৎ, ওহে কবরবাসী, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহ পাক আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে মাফ করুন। তোমরা পূর্ববর্তী এবং আমরা সময়ের সাথে অনুগামী।[২]

ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে ইবনে কাইয়েম আল জাওযিয়া বর্ণিত একটি হাদীস ঘোষণা করে: 'আমি ইতিপূর্বে তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন থেকে তা তোমরা যিয়ারত করো। কেননা, তা তোমাদেরকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে ইবনে মাজা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণিত অপর একটি হাদীসে ঘোষিত হয়েছে, 'আমি আগে তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন থেকে যিয়ারত করো। এর ফলে তোমাদের অন্তরগুলোকে দুনিয়ার মোহ থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হবে এবং আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে' (হাদীস)। আবু সাঈদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণিত হাদীসটি ঘোষণা করে, 'আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন থেকে যিয়ারত করো

---

[১]. মুসলিম : আস সহীহ, বাবুল ইস্তিযানি নাবিয়্যি ২/৬৭১ হাদীস নং ৯৭৬।
ক. নাসায়ী : আস সুনান, যিয়ারাতুল কুবুর আলাল মুশরিক ২/৪৬৫ হাদীস নং ২১৭২।
খ. হাকিম : আল মুস্তাতাদরাক, কিতাবুল জানায়িয ১/৫৩১ হাদীস নং ১৩৯০।
গ. বায়হাক্বী : আস সুনান, বাবু যিয়ারতিল ক্বুবুর ২/৩৬ হাদীস নং ১১৫২।
ঘ. আহ্‌মদ : আল মুসনাদ ২/৪১।
ঙ. শাফেয়ী : আল মুসনাদ ১/২১৭ হাদীস ৬০৩।
চ. বাগাবী : শরহুস সুন্নাহ ৫/ ৪৬৩ হাদীস ১৫৫৪।
[২]. তিরমিযী : আস সুনান, বাবু মা ইক্বুলুর রাজুল ইযা দাখালাল মাক্বাবির, ২/৩৬০ হাদীস নং ১০৫৩।
ক. তুওসী : মুখতাছারুল আহকাম, ৫/৮৭।
খ. ইব্‌ন সারী : আয যুহদ, ১/২১৭।

ফলে তোমরা সতর্ক হতে পারবে এবং গাফলাত বা উদাসীনতা থেকে জেগে উঠতে পারবে' (হাদীস)।

قَالَ اِبْنُ الْقَيِّمْ: فَقَالَ سَلَمَةَ بْنُ وِرْدَانٍ: ''رَأَيْتُ أَنَسَ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَسْنَدُ ظَهْرَهُ إِلَىٰ جِدَارِ الْقَبْرِ ثُمَّ يَدْعُوْ-

–ইবনে কাইয়েম আল জাওযিয়া উদ্ধৃত করে সালামত ইবনে ওয়ারদানের কথা, যিনি বলেন: ‘আমি হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সম্ভাষণ জানাতে। এরপরে তিনি একটি কবরের দেয়ালে হেলান দিয়ে দোয়া করেন।’

মুশরিক’রা (?) কবর যিয়ারত পাল্টে ফেলেছে। তারা ধর্মকে ওলট-পালট করে দিয়েছে। তারা কবরে গিয়ে বেসালপ্রাপ্তজনকে আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার বানিয়ে থাকে। তারা বেসালপ্রাপ্তজনের কাছে প্রার্থনাও জানিয়ে থাকে। আল্লাহর কাছে তারা বেসালপ্রাপ্তদের মাধ্যমে দোয়াপ্রার্থী হয়। তারা বেসালপ্রাপ্তদের কাছে নিজেদের অভাব পূরণের জন্যে প্রত্যাশী হয় এবং নেয়ামত আশা করে, আর তাদেরকে তারা নিজেদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করার জন্যে আবেদন জানায়। ফলে তারা নিজেদের জন্যে এবং বেসালপ্রাপ্তদের জন্যেও ক্ষতিকর হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ধরনের কুপ্রথা বিলোপ করার জন্যেই মানুষদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলেন। মানুষদের মনে তৌহিদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই তিনি কবর যিয়ারত করার অনুমতি দেন। কিন্তু কবরের কাছে হুজর বা আজে-বাজে কথাবার্তা বলাটা নিষিদ্ধ। সবচেয়ে বড় হুজর হচ্ছে কবরস্থানে কথা বা কাজে শিরক সংঘটন করা। মানুষেরা এখন মাযারকে সাজায়, কিন্তু মসজিদের যত্ন নেয় না। আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম দ্বারা উম্মোচিত আল্লাহর দ্বীনকে তারা পাল্টে দিয়েছে। যেহেতু রাফেযী শিয়ারা সবেচেয়ে অজ্ঞ এবং দ্বীন থেকে দূরে অবস্থিত, সেহেতু তারা মাযার নির্মাণ করে, আর মসজিদ ধ্বংস করে।[১]

[১]. ফাতহুল মাজীদ : ১/৪৮৭।

আমরা রাফেযীদের ব্যাপারে ওহাবীদের সঙ্গে একমত। আমরাও শিরক ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার। আমাদের সুন্নী ইমাম হযরত মোজাদ্দিদে আলফে সানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ বিষয়ে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন (মকতুবাত ৩য় খন্ড, ৪১ নং চিঠি, অথবা আমার রচিত 'সায়াদাতে আবাদিয়্যা, ৩য় খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা দেখুন)। কিন্তু যদিও ওহাবীরা বলে যে কবর যেযারত করার বৈধতায় তারা বিশ্বাসী এবং মাযারস্থ বেসালপ্রাপ্তজনের রূহের প্রতি সওয়াব বখশানোর জন্যে কুরআন তেলাওয়াত করা এবং দোয়ার দ্বারা বেসালপ্রাপ্তজনের কল্যাণ সাধনের বিষয়টিতে তারা বিশ্বাসী, তবুও তারা বলে যে বেসালপ্রাপ্তজন শ্রবণ করতে অক্ষম; আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মধ্যস্থতায় আল্লাহর কাছে দোয়া করাটা শেরেকী কাজ তাদের কথাগুলো পরস্পরবিরোধী। আমার এ গ্রন্থের শুরু থেকে এ পর্যন্ত দেখা গিয়েছে যে ওহাবীদের আক্রমণের মূল দিকটি-ই ছিল উপরোক্ত বিষয়বস্তুর ওপর নিবদ্ধ। অতএব, এসব গোমরাহদের দ্বারা যেন আমার মুসলিম ভাইয়েরা বিভ্রান্ত না হন, সেই উদ্দেশ্যে আমি বিষয়টি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা যথার্থ মনে করেছি।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় পীর ও মহান ইসলামী আলেম এবং কামেল বুযুর্গ সৈয়দ আবদুল হাকিম আরওয়াসী নকশবন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, যিনি ওসমানীয় খেলাফত আমলে প্রসিদ্ধ দ্বীনী প্রতিষ্ঠান "মাদ্রাসাতুল মুতাহাসসিসিন" (ইস্তাম্বুল)-এর তাসাওউফ বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন, তিনি তাঁর তুর্কী 'রাবেতায়ে শরীফাহ'পুস্তিকায় লিখেছেন:

"আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীতে গুণান্বিত ও মুশাহাদার পর্যায়ে উন্নীত কোনো ওলীর সঙ্গে নিজ অন্তর সংশ্লিষ্ট করাকে এবং তাঁর উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতিতে তাঁর চেহারা মোবারক স্মরণ করাকেই 'রাবেতা' বলে। পূর্ণতা অর্জনকারীদের সম্পর্কে চিন্তা করা খুবই উপকারী যা হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে–

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، مَنْ أَوْلِيَاءُ اللّٰهِ؟ قَالَ: الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللّٰهُ تَعَالَى

–আউলিয়াকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়' এবং 'যারা আউলিয়ার সঙ্গে থাকে তারা (আল্লাহর বিরুদ্ধে) বিদ্রোহী হয় না' [বুখারী ও মুসলিম]।

এই ধরনের একজন আল্লাহ-ওয়ালার কথা চিন্তা করেই তাঁর গুণাবলী এবং হাল বা আধ্যাত্মিক অবস্থাসমূহ অর্জন করে থাকেন একজন বিশ্বাসী ও প্রকৃত মুসলিম। হাদীসগুলো মুসলিমদেরকে আদেশ দেয় পরহেযগার

বুযূর্গ তথা ওলী-আল্লাহদের সঙ্গে থাকতে। দায়লামী ও তাবরানী বর্ণিত এবং 'কানুযুদ্ দাকাইক' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ একটি হাদীস ঘোষণা করে, أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا 'আমি জ্ঞানের শহর এবং আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তার দরজা'।[১] হাদীসটির ইশারা অনুযায়ী, আল্লাহ্-ওয়ালাগণ, যাঁরা আল্লাহ্ আল্লাহ্ পাকের ফয়েযের অসীম সাগরের দ্বারস্বরূপ বিরাজমান, তাঁদের কলবসমূহ হতেও ফয়েয, মা'রেফত ও নূর তাঁদেরকে স্মরণকারী এবং তাঁদের প্রতি মহব্বত পোষণকারী মুসলিমদের কলবে (অন্তরে) প্রবাহিত হয়। এই ফয়েয অর্জন করতে হলে প্রথমতঃ আহলে সুন্নতের আকিদা-বিশ্বাসকে ধারণ করতে হবে এবং শরীয়তকে সম্পূর্ণভাবে মান্য করতে হবে; আর আল্লাহ্-ওয়ালাদেরকে ভালোবাসতে হবে। যেহেতু ওহাবীরা এ সকল পূর্বশর্ত পূরণ করতে অক্ষম, সেহেতু তারা আল্লাহ-ওয়ালাদের ফয়েয ও মা'রেফত হতে বঞ্চিত হচ্ছে। তারা যা জানে না, সেগুলোকে অস্বীকার করা ছাড়া তাদের আর কোনো গত্যন্তর নেই। ফয়েযপ্রাপ্তির জন্যে দ্বিতীয় যে জিনিসটি জরুরি, তা হলো মুরশীদ (পীর)-কে অবশ্যঅবশ্যই রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন প্রকৃত ওয়ারিস (উত্তরাধিকারী) হতে হবে এবং তাঁরই পদাংক অনুসরণ করতে হবে; আর আল্লাহর একজন প্রিয় বান্দাও হতে হবে। যেহেতু ওহাবীদের মধ্যে কোনো আল্লাহ-ওয়ালা নেই, সেহেতু ফয়েয ও মা'রেফাতের দ্বার তাদের জন্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এ কারণেই মূর্তি পূজারী মুশরিকেরা এবং ভন্ড পীর ও অজ্ঞ লোকদের অনুগামী হতভাগা মুসলমানেরা কোনো ফয়েয বা উপকার লাভ করতে পারে না। আবু জাহেল, আবু তালেব ও আবু লাহাবের মতো লোকদের দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ফয়েয বা হেদায়েত লাভ না করার কারণটি হলো তারা প্রথম শর্তটি পূরণ করতে পারে নি। আম্বিয়া (আঃ) হলেন দুনিয়ার বুকে আল্লাহ তা'আলার খলীফা। আর যেহেতু আউলিয়া কেরাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম-এর উত্তরাধিকারী, সেহেতু তাঁরাও এ সম্মানের একটি অংশ পেয়েছেন এবং তাঁদের অন্তরগুলোও তাই আল্লাহতা'আলার আয়নায় পরিণত হয়েছে।

---

১. তৃবরানী : মু'জামুল কাবীর, মুজাহিদ আন ইব্ন আব্বাস, ১১/৬৫ হাদীস নং ১১০৬১।
ক. হাকিম : আল মুস্তাদরাক, ৩/১৬৫ হাদীস নং ৪৬৩৭।

সূরা সোয়াদের ২৬ আয়াত ও সুরা আনআমের ১৬৫-আয়াত এবং আরও বহু আয়াত আমাদের কথাকে সমর্থন দেয়।

"কোনো কামেল (পূর্ণতাপ্রাপ্ত) ওলীর অন্তরের সঙ্গে অন্তর সংশ্লিষ্টকারী মুসলমান সেই ওলীর নেয়ামতপূর্ণ অন্তরের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার ফয়েয অর্জন করেত সক্ষম হবেন। দায়লামীর কিতাব ও 'কানযুদ দাকাইক' গ্রন্থে উদ্ধৃত একটি হাদীস শরীফ ঘোষণা করে, 'একজন পীর তাঁর (অনুসারী সিলসিলাধারী) জাতি-সম্প্রদায়ের জন্যে সেই রকম (হেদায়েতকারী), যে রকম একজন নবী আলাইহিস্ সালাম তাঁর উম্মতের জন্যে (হেদায়েতকারী)' [হাদীস]। ওই আল্লাহ-ওয়ালা জীবিত অথবা বেসালপ্রাপ্ত হলেও কলব কর্তৃক ফয়েয ও মা'রেফতপ্রাপ্তিতে কোনো রকম পার্থক্য সৃষ্টি হবে না। তাঁর কামালাত বা পূর্ণতা কখনোই তাঁর রূহকে ত্যাগ করে না। আর রূহ তো স্থান, কাল, জীবন-মৃত্যু দ্বারা আবদ্ধ নয়। যদি উপরোল্লিখিত শর্ত দুইটি পূরণ করা যায়, তাহলে একজন আল্লাহ-ওয়ালার সঙ্গে অন্তর সংশ্লিষ্টকারী মুসলিম আবিলম্বে ফয়েয ও মারেফত অর্জন করবেন। ওই ওলী যেখানে-ই থাকুন অথবা জীবিত কিংবা বেসালপ্রাপ্ত হোন, তাতে কিছুই আসবে যাবে না। এটা বিশ্বাস করা জরুরি যে তাঁদের রূহের তাসাররূফ (কর্মক্ষমতা) আসলে তাঁদের ওপর আল্লাহতা'আলার তাসাররূফ দ্বারা সংঘটিত।

"যতোক্ষণ পর্যন্ত একজন মানুষ কোনো মধ্যস্থতাকারী ছাড়া আল্লাহতা'আলার ফয়েয গ্রহণ করতে না পারে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তার এমন একজন মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন যাঁকে আল্লাহ পাক ভালোবাসেন এবং যিনি ফয়েয গ্রহণ ও বিচ্ছুরণ করতে সক্ষম।

"২০০ হিজরী হতে ১২০০ হিজরী পর্যন্ত বুখারা, খিবা, সমরকন্দ ও ভারতের উলামাবৃন্দ যে সর্বসম্মতভাবে রাবেতাকে স্বীকৃতি দিয়ে তা পালন করেছেন এবং নিজেদের শিষ্যদেরকে তা পালন করতে আদেশ দিয়েছেন, সেটা-ই হলো আমাদের উপরোক্ত কথার সর্বোৎকৃষ্ট সমর্থনসূচক দলিল। এ দলিলের বদলে আরেকটি দলিল তালাশ করার অর্থ হবে বিশাল এশিয়া মহাদেশে গত এক হাজার বছর ধরে আগমনকারী শত-সহস্র ইসলামী উলামার কুৎসা রটনা করা। বর্তমানে বিরাজমান তাঁদের বইপত্র প্রতীয়মান করে যে তাঁরা উলামা ছিলেন এবং এতে আরও পরিস্ফুট হয় যে তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই আউলিয়া ছিলেন।

"সুরা মায়েদার ৩৮ নং আয়াত ঘোষণা করে,

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ.

‘আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্যে ওসীলা বা মাধ্যম তালাশ করো’।

এ আদেশসূচক আয়াতটিতে ওসীলাটি কোনো শর্ত দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়; বরং সার্বিক অর্থে ব্যবহৃত হলে এবাদত, যিকির, দোয়া ও আউলিয়াগণের রূহ সমূহও এই আদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এই সার্বিক আদেশটিকে সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করাটা আসলে আয়াতটির প্রতি কুৎসা রটনা করা ছাড়া আর কিছু নয়। ওসীলাটি যে প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সুরা আলে ইমরানের ৩১ নং আয়াতে বর্ণিত ঐশী আদেশে জ্ঞাত করানো হয়েছে, إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ‘যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন’।[১] যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করেন, তার উচিৎ এ আয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করা। إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ ‘উলামাগণ আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম-এর উত্তরাধিকারী’-[২] এই হাদীসটি পরিস্ফুট করে যে আউলিয়াগণও ওসীলা। আর ভালোবাসা ছাড়া ‘এত্তেবা বা অনুসরণ করো’- কুরআনের এই আদেশটি মান্য করা একেবারেই অসম্ভব।

”আল বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উদ্ধৃত করেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর কথা, যিনি বলেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো-ই তাঁর অন্তর ও মস্তিষ্ক থেকে দূরে ছিলেন না; যার ফলে তিনি আরয করেছিলেন যে এমন কি গোসলখানায়ও তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা মোবারককে তাঁর স্মৃতিপটে দেখতে পেতেন।

“আল্লাহ তা’আলা ঘোষণা করেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ‘হে বিশ্বাসীরা, তোমরা মুত্তাকী (পরহেযগার, খোদাভীরু) হও এবং সত্যনিষ্ঠ (আউলিয়া)-দের সঙ্গে থাকো’।[৩] এক্ষেত্রে ‘সঙ্গে থাকো’ বাক্যটি কোনো শর্ত দ্বারা

---

[১]. আল কুর‘আন : আলে ইমরান, ৩/৩১।

[২]. ইব্‌ন মাজাহ : আস সুনান, বাবু ফদ্বলিল উলামা, ১/৮১ হাদীস নং ২২৩।

ক. আবূ দাউদ : আস সুনান, বাবুল হাছ্ছু আলাত্ব ত্বলাবিল ইলম, ৩/৩১৭ হাদীস নং ৩৬৪১।

খ. তিরমিযী : আল জামে, বাবু মা জা‘য়া ফি ফদ্বলিল ফিক্বহি, ৫/৪৮ হাদীস নং ২৬৮২।

গ. ইব্‌ন হিব্বান : আস সহীহ, ১/২৮৯ হাদীস নং ৮৮।

ঘ. বায়হাক্বী : শু‘য়াবুল ঈমান, ২/২৬২ হাদীস নং ৭১৮।

[৩]. আল কুর‘আন : আত তাওবা, ৯/১১৮।

আবদ্ধ নয়। এটা একটা সার্বিক মন্তব্য। অতএব, সত্যনিষ্ঠদের 'সঙ্গে থাকা'র মধ্যে বস্তুগত ও আত্মিকভাবে থাকাটা অন্তর্ভুক্ত। শারীরিক বা বস্তুগতভাবে থাকার অর্থ হচ্ছে তাঁদের উপস্থিতিতে (হুযূরে) বিনয়, আদব ও মহব্বত সহকারে অবস্থান করা। আর আত্মিকভাবে থাকার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর কোনো প্রিয় ও সত্যনিষ্ঠ বান্দাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা।

'সুরা ইউসুফের ২৪ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ 'যদি না ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম তাঁর প্রভুর বুরহান তথা প্রামাণ্য নিদর্শন দেখতেন।[১]' 'বুরহান' বা এই প্রমাণটি প্রকৃতপক্ষে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম-এর কাছে হযরত এয়াকুব আলাইহিস্ সালাম-এর দৃশ্যমান হওয়ার ঘটনা ছিল, যা প্রায় সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত হয়েছে। তাফসীরে কাশশাফের প্রণেতা আয্ যামাখশারী, যদিও তিনি একজন গোমরাহ মু'তাযিলা ছিলেন, তবুও তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুফাসসীর (কুরআন ব্যাখ্যাকারী)-দের সাথে যোগ দিয়ে বলেছেন যে জন্দানে অবস্থানকারী হযরত এয়াকুব আলাইহিস্ সালাম মিশরের একটি ঘরে যুলাইখার সাথে অবস্থানরত হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম-এর সামনে দৃশ্যমান হন।

"আশবাহ গ্রন্থটির ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ রচয়িতা ও হানাফী আলেম হযরত আহমদ হামাভী তাঁর 'নাফাখাত আল কুরব্ ওয়াল ইততিসাল বি ইসবাতিত্ তাসাররুফী লি আউলিয়াইল্লাহী তা'আলা ওয়াল কারামাতি বা'দ আল ইনতিকাল' পুস্তকটিতে লিখেছেন যে আউলিয়ার 'রূহানিয়াত' বা আধ্যাত্মিক শক্তি তাঁদের 'জিসমানিয়াত' বা শারীরিক অস্তিত্ব থেকেও অধিক ক্ষমতাশালী; আর তাই তাঁদেরকে একই সময়ে বিভিন্ন জায়গায় দেখা যেতে পারে। তিনি তাঁর কথার সপক্ষে নিম্নোক্ত হাদীসটি উদ্ধৃত করেন: 'কিছু মানুষ বেহেশতের প্রত্যেকটি প্রবেশ-দ্বারের মধ্য দিয়েই বেহেশতে যাবে। প্রত্যেক দরজাই তাদেরকে আহ্বান করবে।' অতঃপর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করেন, 'এয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কোনো ব্যক্তি কি থাকবেন যিনি আটটি দরজার প্রত্যেকটির মধ্য দিয়েই প্রবেশ করতে পারবেন? হুযূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেন, 'আমি আশা করি, তুমি তাদের মধ্যে একজন হবে' (হাদীস)। যখন কোনো ব্যক্তির রূহ 'আলম আল আমর'-এ অবস্থিত তাঁর মৌলিক মাক্কাম বা মর্যাদাপূর্ণ স্থানে উন্নীত হন, তখনই তাঁকে একই মুহূর্তে বিভিন্ন জায়গায় দেখা যেতে পারে। যেহেতু মানুষের ইনতেকালের পরে দুনিয়ার মোহ তাঁর রূহ

---

[১]. আল কুর'আন : ইউছুপ, ১২/২৪।

হতে তিরোহিত হয়, সেহেতু তাঁর রূহ আরও শক্তিশালী হয়। ফলে একই সময়ে বিভিন্ন জায়াগায় দৃশ্যমান হওয়া তাঁর পক্ষে সহজতর হয়।

“ইমাম ইবনে হাজর মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কৃত ‘শামাইল’ গ্রন্থের শরাহ-তে এবং ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রণীত ’তানউইরুল হালাক’ পুস্তকটিতে লিপিবদ্ধ আছে যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ’আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখি। তিনি আমার প্রতি কৃপাপূর্ণ আচরণ করেন। আমি জেগে ওঠার পর তাঁর এক স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করি। অতঃপর আয়নায় মুখ দেখতে গিয়ে নিজের চেহারার পরিবর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখতে পাই।’ এই হাল বা অবস্থাটি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্যে খাস (নির্দিষ্ট) নয়। কারণ, ইসলামী উলামাবৃন্দ তাঁদের বইপত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ’খাসাইস’ (সুনির্দিষ্ট গুণাবলী) সংগ্রহ করেছেন এবং এই হালটিকে তাঁর জন্যে খাস হিসেবে চিহ্নিত করেন নি। ফিকাহ এবং উসূলে ফিকাহ-এর মৌলিক আইন-কানুন অনুযায়ী রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতের উলামা তথা আউলিয়া কেরাম তাঁর ’খাসাইস’ ভিন্ন অন্য সব হালের উত্তরাধিকারী বলে পরিগণিত। উদাহরণস্বরূপ, রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে নামাযের মধ্যে কথা বল্লে কারও নামায ভঙ্গ হবে না। কিন্তু এ গুণটি কেবলমাত্র নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্যেই সুনিন্দিষ্ট। সুতরাং উলামায়ে কেরাম তথা আউলিয়াবৃন্দের সাথে কথা বল্লে নামায ভেঙ্গে যাবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সামনে হাযির জেনে তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম (সম্ভাষণ) জানানো তাঁর খাসাইস-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব, কোনো ওলীর চেহারা মোবারককে খেয়াল করে তাঁর রূহ হতে সাহায্য কামনা করা অনুমতিপ্রাপ্ত। শাফেয়ী আলেম ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী তাঁর রচিত ‘আত তাবাকাতুল কুবরা’ নামক গ্রন্থে বলেন, ‘২২তম ধরনের কারামত হচ্ছে এই যে, আউলিয়াবৃন্দ বিভিন্ন আকৃতিতে দৃশ্যমান হতে পারেন।’ সূরা মরিয়মের ১৭ নং আয়াত ঘোষণা করে فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ‘তিনি (জিবরীল-আ:) মরিয়মের সামনে মানব আকৃতিতে দৃশ্যমান হন’।[১] উলামায়ে কেরাম এ আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে আউলিয়া কেরামের রূহসমূহ বিভিন্ন আকৃতিতে দৃশ্যমান হতে পারেন। হযরত কাদিব আল বান হাসান আল মুসুলী (বেসাল ৫৭০ হিজরী, মুসুল)-এর সর্বজনবিদিত ঘটনাটি এই ধরনের একটি

[১]. আল কুর‘আন : মরিয়ম, ১৯/১৭।

কারামত। [আল মুসুলীর এই কারামত এবং অন্যান্য কারামত সম্পর্কে জানতে হলে আল্লামা ইউসুফ নাবহানীর 'জামেউল কারামত আল্ আউলিয়া' পুস্তকটি পড়ুন। শাফেয়ী আলেম আল্লামা আল জায়লী তাঁর রচিত 'শরহে বুখারী' পুস্তকে লিখেন, 'প্রকৃত আউলিয়া যাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তরাধিকারী, তাঁদের চেহারা শয়তান ধারণ করতে পারে না যেমনিভাবে সে পারে না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা মোবারক ধারণ করতে।']

"হানাফী আলেম সাইয়েদ শরীফ আল জুরজানী তাঁর কৃত 'শরহে মাতালী' ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থে এবং 'শরহে মাওয়াকিফ' পুস্তকের শেষে তিয়াত্তরটি মুসলিম সম্প্রদায়ের তালিকা প্রদানের আগে বলেন যে জীবিত কিংবা বেসালপ্রাপ্ত আউলিয়া তাঁদের শিষ্যদের কাছে বিভিন্ন আকৃতিতে দৃশ্যমান হতে পারেন এবং তাঁদের শিষ্যগণ (মুরীদগণ) ওই সকল আকৃতি থেকে অশেষ ফয়েয ও উপকার পেতে পারেন।

"মালেকী মযহাবের আলেম তাজুদ্দিন আহমদ ইবনে আতা-আল্লাহ আল ইসকান্দরী তাঁর প্রণীত 'তাজিয়্যা' গ্রন্থে লিখেছেন, কারো পক্ষে অনেক উপকার পাওয়া তখনি সম্ভব, যখন তিনি কোনো প্রকৃত ওলীকে দেখেন বা তাঁর সম্পর্কে চিন্তা করেন।

"হানাফী আলেম আল্লামা শামসুদ্দিন ইবনে নুয়াইম তাঁর 'কিতাবুর রূহ' পুস্তকটিতে বলেন, 'রূহসমূহ যখন নিজেদের দেহের বাইরে থাকে, তখন বিভিন্ন হালে থাকতে পারে। আউলিয়াগণের রূহসমূহ "রফিক আল্ আ'লা" নামক স্থানে অবস্থানরত এবং তাঁরা তাঁদের বেসালপ্রাপ্ত দেহের সাথেও সম্পর্কযুক্ত। যদি কোনো ব্যক্তি এ রকম একজন ওলীর মাযার যিয়ারত করে তাঁকে সম্ভাষণ জানায়, তবে রফিক আল আ'লায় অবস্থিত তাঁর রূহ মোবারক ওই ব্যক্তির প্রত্যুত্তর দেন।' এটা ইমাম সুয়ুতীর কিতাবুল মুনজালী গ্রন্থেও লিপিবদ্ধ আছে। এ সকল প্রমাণ পরিস্ফুট করে যে আউলিয়াগণ তাঁদের বেসালের পরও ভীষণ শক্তিশালী তাসাররুফ (কর্মক্ষমতা) এবং প্রভাবের অধিকারী যা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

"মালেকী আলেম ও 'মুখতাসার' বইটির প্রণেতা খলিল ইবনে ইসহাক আল জান্দী বলেন, 'বিভিন্ন আকৃতিতে দৃশ্যমান হওয়ার সামর্থ্য তখনই আল্লাহতা'আলা কর্তৃক একজন ওলীকে প্রদান করা হয়, যখন তিনি পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হন। এটা অসম্ভব কিছু নয়। কারণ, দৃশ্যমান বিভিন্ন আকৃতি আসলে বস্তুগত জিসম (দেহ)

নয়। রূহসমূহ কোনো বস্তু নয় এবং এগুলো মহাশূন্যে কোনো জায়গা দখল করে থাকে না।'

"এতোজন শরীয়তের জ্ঞান বিশারদের তথা আউলিয়ার দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত শরীয়তের শিক্ষা ও দলিলপত্রে অবিশ্বাস স্থাপন করার অর্থ হলো শরীয়ত এবং যুক্তির সঙ্গে মতভেদ সৃষ্টি করা। সুন্নী মুসলিমদের এ বিশ্বাসটির জন্যে তাঁদেরকে মুশরিক (কাফের) আখ্যাদানকারী ওহাবীদের প্রতি যেন আল্লাহতা'আলা যুক্তি ও ন্যায়বিচার ক্ষমতা মন্‌ঞ্জুর করেন। ওহাবীরা, যারা বিষয়টিতে বিশ্বাস স্থাপনকারী মুসলিম জনগণকে মূর্তি পূজারী ও মূর্তিকে স্রষ্টা জ্ঞানকারী কাফেরদের সমতুল্য করতে চায়, তাদের প্রতি ধিক মালেকী মযহাবের আলেম ও কাদেরীয়া তরীকার একজন বিশিষ্ট পথিক যিনি 'সুলতানুল আশেকীন' (প্রেমিকগণের রাজা) হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং যাঁর অন্তর রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর ওয়ারিস তথা আউলিয়াগণের ভালোবাসায় প্রজ্জ্বলিত ছিল, তিনি তাঁর বিখ্যাত কাসিদা 'খামরিয়া'-তে তাসাউফের পূর্ববর্তী জ্ঞান বিশারদগণের মর্যাদার যথাযথ গুণকীর্তন করেছেন। যে সব গোমরাহকে আখেরাতে 'গোমরাহ' ও 'আযাব ভোগকারী' হিসেবে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে, তাদেরকে যতো ভাল করেই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহকারে বোঝানো হোক আর যতোগুলো প্রমাণ্য দলিল অথবা কারামতই প্রদর্শন করা হোক, তারা মু'মিন হওয়ার নেয়ামত অর্জন করতে পারবে না। মাওলানা আবদুর রহমান জামী তাদেরকে নিম্নোক্ত চারটি পংক্তিতে যথাবিহিত জওয়াব দিয়েছেন

'বিশ্বের সকল সিংহ একই শৃঙ্খলের দ্বারা সংযুক্ত, কীভাবে তা একটি শেয়াল তার দুঃসাহস-ভরা ধূর্ততা দ্বারা করবে ছিন্ন?যদি কোনো গোমরাহ লোক আউলিয়াকে করে সমালোচনা, তবে তাঁরা নির্মল থাকেন, কেবল সে-ই প্রমাণিত হয় খারাপ-মনা।'

"যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায়, শুধুমাত্র তার দাড়িতেই আগুন ধরে যাবে।" (আল্লামা সাইয়েদ আবদুল হাকিম আরওয়াসী কৃত 'রাবিতায়ে শরীফা', ইস্তাম্বুল, ১৩৪২ হিজরী/১৯২৪ খৃষ্টাব্দ)

২৭/ ওহাবী লেখক 'ফাতহুল মাজীদ' পুস্তকের ৪৮৬ পৃষ্ঠায় সত্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে আবু দাউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটি সে উদ্ধৃত করেছে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا

قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ "আমার কবরকে ঈদগাহ্ বানিও না তোমাদের ঘরগুলোকে কবরস্থান বানিও না। আমার প্রতি দুরুদ পাঠ করো কেননা, নিশ্চয়ই তোমাদের সালাত-সালাম তোমরা যেখানে-ই থাকো না কেন, আমার কাছে পৌঁছে যাবে।[১] যদিও ওহাবীটি এ হাদীসটিকে নিজের গোমরাহ গোমরাহ ধ্যান-ধারণা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে পেশ করেছে, তবুও এটা প্রতীয়মান করে যে আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম তাঁদের মাযার-রওযায় জীবিতাবস্থায় আছেন। কারণ বাচনিক যোগাযোগ শুধু তাঁদের সাথেই স্থাপন করা যায় যাঁরা জীবিত।

২৮/ ফাতহুল মাজীদ'-এর ৪৯০ পৃষ্ঠায় ওই ওহাবী লেখক বলে, "ইমরান ইবনে হাসসিন হতে আবু দাউদ ও তিরমিযী এবং সহিহ্ মুসলিম রওয়ায়েতকৃত একটা হাদীস ইরশাদ ফরমায়, 'خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ' আমার উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে তারা-ই, যারা আমার সময়ে বসবাস করছে। এরপর শ্রেষ্ঠ হলো যারা তাদের পরে আগমন করবে। তাদের পরে যারা আগমন করবে তারা-ই হলো পরবর্তী শ্রেষ্ঠ[২] । "خَيْرُ أُمَّتِيْ قَرْنِيْ" لِفَضِيْلَةِ أَهْلِ ذٰلِكَ الْقَرْنِ فِيْ الْعِلْمِ وَالْإِيْمَانِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ– এই হাদীসটি সহিহ বুখারীতেও লিপিবদ্ধ আছে এবং এটার শুরু 'তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ'- কথাগুলো দ্বারা। 'শ্রেষ্ঠ' মানে হচ্ছে জ্ঞান, ঈমান ও কর্মে শ্রেষ্ঠ।

وَمَا ظَهَرَ فِيْهِ مِنَ الْبِدْعِ أَنْكَرَ وَاسْتَعْظَمَ وَأُزِيْلَ أَنَّ الْقُرُوْنَ الْمُفْضِلَةَ ثَلَاثَةٌ، الثَّالِثُ دُوْنَ الْأَوَّلِيْنَ فِيْ الْفَضْلِ، لِكَثْرَةِ الْبِدْعِ فِيْهِ، لَكِنَّ الْعُلَمَاءَ مُتَوَافِرُوْنَ وَالْإِسْلَامَ فِيْهِ ظَاهِرٌ وَالْجِهَادَ فِيْهِ قَائِمٌ–

–তাঁরা বিদয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। যদিও তৃতীয় হিজরীতে বিদয়াত বৃদ্ধি পায়, তবুও তখন বহু উলামা ছিলেন এবং ইসলামকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখানো হতো এবং মানুষেরা জিহাদও পালন করতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত

[১]. আবূ দাউদ : আস সুনান, বাবু যিয়ারতিল কুবূর, ২/২১৮ হাদীস নং ২০৪২।
ক. বায়হাক্বী : শু'য়াবুল ঈমান, বাবু ফদ্বলিল হজ্জ ও ওমরা, ৬/৫২ হাদীস নং ৩৮৬৫।
খ. ফাতহুল মাজীদ : ১/৪৮৭।
[২]. বুখারী : আস সহীহ, বাবু ফাদ্বায়িলিল আসহাবিন নবী, ৫/২ হাদীস নং ৩৬৫০।
ক. আবূ দাউদ : আস সুনান, মা আসনাদা আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ রা.,২/২৩৯ হাদীস নং ২৯৭।
খ. মা'য়ানিল আছার : আশ শরাহ, ৪/১৫১ হাদীস নং ৬১২৪।

এবং সহিহ্ মুসলিম শরীফে লিপিবদ্ধ হাদীসটিও অনুরূপ একটি হাদীস। কিন্তু এই হাদীসটিতে পর পর তিনটি শতাব্দী সম্পর্কে বলা হয়েছে। অতএব এটা বোঝা যে, হিজরীর চতুর্থ শতাব্দীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত খারাপের চেয়ে ভাল অনেক বেশি ছিল।[১]

উপরোক্ত হাদীসগুলো আহলে সুন্নাতের আলেমগণের প্রশংসা করেছে, যেহেতু তাঁরা এ চারটি শ্রেষ্ঠ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বত্র প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আহল-এ-সুন্নতের উলামার এই মাহাত্ম্য তাঁদেরই সময়কার মুসলিমগণের সর্বসম্মতি দ্বারা সমর্থিত হয়েছে।

ওহাবী পুস্তকটি তার সুবিধানুযায়ী আহলে সুন্নাতের উলামায়ে কেরামের প্রশংসা করে এবং তাঁদের বিভিন্ন পুস্তকে লিপিবদ্ধ ইজতেহাদসমূহ নিজের জন্যে দলিল হিসেবে ব্যবহার করতে অপপ্রয়াস পায়। একদিকে সে আহলে সুন্নাতের উলামার ভূয়সী প্রশংসা করে, অপরদিকে তাঁদের দ্বারা আরোপিত কুরআন-হাদীসের অর্থকে সে ঘৃণা করে এবং আরও অভিযোগ করে যে ব্যাখ্যাগুলোর অনেকগুলোই শিরকের উৎপত্তিস্থল। মুসলিমদেরকে মুশরিক আখ্যায়িত করতে সে মোটেও লজ্জিত নয়। ওয়াহাবী বইটি ঘন ঘন ইসমাইল ইবনে উমর ইবনে কাসির ইমাদুদ্দীনের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেয়, কারণ ইমাদ ইবনে কাসির তার ফাতওয়াগুলো ইবনে তাইমিয়ার ধ্যান-ধারণার ওপর ভিত্তি করেই দিয়েছে।

২৯/ ওয়াহাবী পুস্তকটির ৫০৩ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে بَلْ كُلُّ حَيٍّ صَالِحٍ يَرْجِىُ أَنْ يَسْتَجَابَ لَهُ– "যে কোনো জীবিত লোককে শাফায়াত, অর্থাৎ, সাহায্য ও দোয়া করার জন্যে আবেদন জানানো জায়েয। হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যখন হজ্ব করার জন্যে মক্কার উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগ করছিলেন, তখন হযরত রাসূল-এ-করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন, يَا أَخِي أَشْرِكْنَا فِي صَالِحِ دُعَائِكَ وَلاَ تَنْسَنَا 'হে ভ্রাতা তোমার উত্তম দোয়ায় আমাদেরকে স্মরণ করতে ভুলো না।[২]' হাদীসটি আবু দাউদ

---

[১]. ফাতহ্ আল মজিদ : ১/৪৯১।
[২]. আহ্মদ : আল মুস্নাদ, ২/৫৯ হাদীস নং ৫২২৯।
ক. আবূ ইয়ালা : আল মুস্নাদ, ৯/৪০৫ হাদীস নং ৫৫৫০।
খ. বায়হাক্বী : আস সুনান, বাবু তাওয়াদিহ, ৫/৪১২ হাদীস নং ১০৩১৪।
গ. আবূ দাঊদ : আস সুনান, ১/১২ হাদীস নং ১০।
ঘ. তিরমিযী : আল জামেউ, ৫/৪৫১ হাদীস নং ৩৫৬২।
ঙ. বাগাবী : শরহুস সুন্নাহ,৫/১৯৯ ।

রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মুসনাদে লিপিবদ্ধ আছে। হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'ওই হাদীসটিতে "ভ্রাতা" শব্দটির মতো এতো সুন্দর কথা আর আমি জীবনে শুনি নি।' শুধুমাত্র বেসালপ্রাপ্তদের জন্যে দোয়া করার অনুমতি শরীয়ত দিয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে দোয়া (এবং শাফায়াত ও সাহায্য) প্রার্থনা করা শরীয়তে বিবৃত হয়নি। আয়াত ও হাদীসসমূহ এটা নিষেধ করে। সুরা ফাতির-এর ১৩ নং আয়াত ঘোষণা করে, إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ 'আল্লাহ ভিন্ন তোমরা যে সব মূর্তির পূজা করো, সেগুলো খেজুরের বিচির চারপাশ পরিবেষ্টনকারী আবরণের সমপরিমাণ উপকারও তোমাদেরকে দিতে পারে না। তোমরা যখন তাদের কাছে প্রার্থনা জানাও, তখন সে সব মূর্তি তোমাদের ফরিয়াদ শোনে না। যদি তারা শুনতেও পারতো, তবুও তারা প্রত্যুত্তর দিতো না; কেননা, তোমাদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতা তাদের কাছে নেই। আর এই সব মূর্তিই শেষ বিচারের দিনে তোমাদেরকে বলবে যে তোমরা সেগুলোকে আল্লাহ সঙ্গে শরীক করে মারাত্মক ভুল করেছিলে।[১] এ আয়াতটি ইঙ্গিত দেয় যে যারা বেসালপ্রাপ্তদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, তাদেরকে শেষ বিচারের দিবসে কাফের (অবিশ্বাসী) হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এটা সুরা আহকাফ-এর ষষ্ঠ আয়াতেও ব্যক্ত হয়, وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ 'তাদের উপাস্যগুলো শেষ বিচারের দিনে কাফেরদের শত্রুতে পরিণত হবে এবং তাদেরকে বলবে যে তাদের উপাসনা ভ্রান্তি ছিল'।[২]

فَكُلُّ مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ لَا يَسْمَعُ وَلَا يَسْتَجِيْبُ وَلاَ يَنْفَعُ وَلاَ يَضُرُّ. وَالصَّحَابَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ-، لَا سَيَّمَا أَهْلُ السَّوَابِقِ مِنْهُمْ كَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ، لَمْ يَنْقُلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَلاَ عِنْ غَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ أَنْزَلُوْا حَاجَتَهُمْ

[১]. আল কুর'আন : ফাতির, ৩৫/১৩।
[২]. আল কুর'আন : আল আহক্বাফ, ৪৬/৬।

بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ، حَتَّىٰ فِيْ أَوْقَاتِ الجَدْبِ، كَمَا وَقَعَ لِعُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ–

অতএব, কোনো বেসালপ্রাপ্ত কিংবা অনুপস্থিতজনই শ্রবণ, সাহায্য কিংবা ক্ষতি করতে সক্ষম নন। সাহাবায়ে কেরাম এবং খুলাফায়ে রাশেদীন যাঁরা সাহাবাগণের গুরুজন ছিলেন, তাঁরা কেউই হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা শরীফ যিয়ারত করে তাঁর কাছে কোনো জিনিস প্রার্থনা করেন নি। হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বৃষ্টির জন্যে দোয়া করতে হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে আবেদন জানিয়েছিলেন, কারণ তিনি জীবিত ছিলেন এবং তাই আল্লাহর কাছে দোয়া করতে সক্ষম ছিলেন। যদি বেসালপ্রাপ্তদের কাছে বৃষ্টির দোয়া করতে আবেদন জানানো অনুমতিপ্রাপ্ত হতো, তবে হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং সাহাবাগণ হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওযায় তা চাইতেন।[১]

ওয়াহাবী পুস্তকটি তার ৪৮৬ পৃষ্ঠায় লিখেছিল যে,

وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ.

–তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তোমাদের সালাওয়াত আমার কাছে পৌঁছানো হবে।[২]

হাদীসটি সহীহ ও মাশহুর, কিন্তু উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে সে বলতে চাচ্ছে যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুই শ্রবণ করতে পারেন না, আর তাই দোয়াও করতে অক্ষম এবং তাঁর কাছে দোয়া করার জন্যে আবেদন জানানো শির্ক ওয়াহহাবীটির কথা পরস্পরবিরোধী। সুরা ফাতিরের আয়াত, যেটা সে তার ধ্যান-ধারণা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে পেশ করেছে, সেটা আসলে অবতীর্ণ হয়েছিল সেই সকল মুশরিকদের প্রতি যারা আল্লাহর এবাদত-বন্দেগী না করে মূর্তি পূজা করতো। আল্লাহর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মাযার-রওযায় গমন করে শাফায়াত প্রার্থনাকারী

---

১. ফাতহ আল মজিদ : ১/৫০৩।

২. আবূ দাঊদ : আস সুনান, বাবু যিয়ারতিল কুবূর, ২/২১৮ হাদীস নং ২০৪২।

ক. বায়হাক্বী : শু'য়াবুল ঈমান, বাবু ফদ্বলিল হজ্জ ও ওমরা, ৬/৫২ হাদীস নং ৩৮৬৫।

মুসলিমদের ওপর কাফেরদের প্রতি নাযেলকৃত আয়াতসমূহ চাপানো কুরআনের কুৎসা রটনা বৈ কিছু নয়। উপরোক্ত আয়াতটি কবর কিংবা বেসালপ্রাপ্তজন-সংক্রান্ত নয়, বরং আল্লাহ্ পাকে অবিশ্বাসী মূর্তি পূজারী সংক্রান্ত। মুসলিমদেরকে ওই আয়াতের বিষয়বস্তুতে পরিণত করার কোনো অধিকার ওয়াহাবীদের নেই। কেননা, তাদের ধারণাটির-ই কোনো ভিত্তি নেই। সুরা আহকাফের উক্ত আয়াতের আগের আয়াতটিতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ ফরমান,

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ.

–সেই ব্যক্তির চেয়ে খারাপ এবং গোমরাহ আর কেউ হতে পারে না, যে নাকি আল্লাহকে ছেড়ে শ্রবণে অক্ষম মূর্তিসমূহের অর্চনা করে'।[১]

এ আয়াতটিও কাফেরদের সম্পর্কে নাযেল হয়েছে। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বৃষ্টির জন্যে দোয়া করতে যাবার সময় সুন্নত পালনের নিয়্যতেই গিয়েছিলেন। যেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্যে দোয়া করেছিলেন, সেহেতু হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-ও সুন্নাত অনুযায়ী বৃষ্টির জন্যে দোয়া করেছিলেন। বৃষ্টির জন্যে দোয়া পালন হচ্ছে একটা এবাদত এবং এবাদত সবসময়-ই সুন্নত অনুযায়ী পালন করতে হয়। উপরন্তু, হানাফী ফিকাহর কিতাব 'মারাকিউল ফালাহ'-তে লেখা আছে, 'বৃষ্টির দোয়া (ইসতিস্কা) করার সময় মাদীনাবাসীদের জন্যে মসজিদ আন্ নববীতে সমবেত হওয়া উত্তম। কারণ, সেখানে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কারও মধ্যস্থতায় আল্লাহর কাছে কোনো আবেদন জানানো হয় না; যেহেতু সেভাবে কোনো কিছু অর্জন করা-ই অসম্ভব। আল বুখারী ও মুসলিম শরীফে লিপিবদ্ধ আছে যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও মসজিদ-এ-নববীতে বৃষ্টির দোয়া পালন করেছিলেন। দোয়া পালনের স্থানটি যতো বেশি মর্যাদাসম্পন্ন হবে, নেয়ামত বর্ষণ-ও ঠিক ততো বেশি হতে থাকবে। প্রথমে দুই খলিফা [হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর]-এর মাধ্যমে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আবেদন জানানো হবে। এর পর তিন জনের মধ্যস্থতায়

[১]. আল কুর'আন : আল আহ্কাফ, ৪৬/৫।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হবে’ (মারাক-ইউল-ফালাহ)। ওহাবী পুস্তকটির আরেকটি মিথ্যা প্রচারণা হচ্ছে এই যে, রওযায়ে আকদাস যিয়ারতকালে কিবলার দিকে মুখ করে রওযাগুলোর দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াতে হবে। ’মারাক-ইউল-ফালাহ’ পুস্তকটি বলে, ’যিয়ারতকারী রওযার দিকে মুখ করে কেবলাকে পেছনে রেখে যিয়ারত করবে। অন্যান্য মাযার-রওযা যিয়ারতের সময়েও একই রকম হবে।’ সুন্নত অনুসারে সমবেত হয়ে বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা কুরআন-সুন্নাহসমর্থিত একটি এবাদত। এই সংশ্লিষ্ট সুন্নাহ না মেনে রওযায়ে আকদসে বৃষ্টি কামনা করার অর্থ এই এবাদতকে পরিবর্তন করা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রত্যেক মুসলিমকে আদেশ দেয়া হয়েছে কোনো ফরয সালাত কাযা হয়ে গেলে তা যেন তিনি আদায় করে নেন, যাতে কাযা হওয়ার গুণাহ মাফ হয়ে যায়। কাযা সালাত পূরণ না করে যেমন রওযায়ে আকদসে ওর জন্যে গুনাহ্ মাফ চাওয়া অনুমতিপ্রাপ্ত নয়, ঠিক তেমনি রওযায়ে আকদসে বৃষ্টির জন্যে আবেদন জানানো-ও অনুমতিপ্রাপ্ত নয়। তবুও সুপ্রসিদ্ধ হাদীসে বিবৃত হয়েছে যে রওযায়ে আকদসে ওই ধরনের এবাদত পালন অন্যান্য স্থানে তা পালনের চেয়ে সহস্র গুণ উপকারী।

নিশ্চয় কোনো ওলীর জন্যে নামায পড়া যাবে না। নামায পড়ার সময় কোনো ব্যক্তি কোনো ওলীর মাযারের দিকে নিয়্যত করতে পারবে না। এটা মহা-গুনাহ, কিংবা শিরক-ও হতে পারে। কিন্তু আউলিয়ার মাযার-রওযার কাছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে কিবলামুখো হয়ে নামায পড়া মহা-সওয়াবদায়ক। কারণ, খোদায়ী নেয়ামত আউলিয়ার মাযার-রওযায় প্রবাহিত হয়। যদি কবর কিংবা মাযারের কাছে নামায পড়া অনুমতিপ্রাপ্ত না হতো, তবে সাহাবায়ে কেরাম কখনো রওযায়ে আকদসকে মসজিদের ভেতরে স্থাপন করতেন না। সকল সাহাবা এবং কোটি কোটি মুসলিম গত ১৪’শ বছর ধরে রওযায়ে আকদসের কাছে নামায পড়েছেন। সেই জায়গায় নামায পড়ার উচ্চমর্যাদা হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে। মসজিদ আন-নববীতে যারা শেষ কাতারে নামায পড়েন, তাঁরা রওযায়ে আকদসকে সামনে রেখে নামায পড়ে থাকেন। কোনো ইসলামী আলেম-ই এর বিরোধিতা করেন নি। আউলিয়ার মাযার-রওযার কাছে নামায পড়ার বৈধতা প্রমাণকারী এই দলিলের চেয়ে কি কোনো বড় দলিল আর আছে? হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে কবরকে উদ্দেশ্য করে নামায পড়তে। কিন্তু উলামার ইজমা অনুযায়ী, কিবলার দিকে নামায পড়ার সময় সামনে যদি কোনো কবর থাকে, তাহলে নামাযের কোনো ক্ষতি হবে না। ইমাম ইবনে হাজার আল হায়তামী আল মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর

কৃত 'যওয়াজির' গ্রন্থের ৯১ পৃষ্ঠায় সহীহ বুখারী শরীফে লিপিবদ্ধ হাদীস-এ-কুদসীটি উদ্ধৃত করেন: আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ ফরমান, مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ যে ব্যক্তি আমার ওলীর প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন, সে প্রকৃতপক্ষে আমার সঙ্গেই যুদ্ধে লিপ্ত। আমার বান্দা আর অন্য কোনো কিছুর মাধ্যমে আমার এমন নৈকট্য পায় না যেমনটি পায় ফরয পালনের মাধ্যমে। সে যখন নফল পালন করে, তখন তাকে আমি এতো ভালোবাসি যে, সে যা-ই কিছু চায় তা-ই আমি তাকে মঞ্জুর করে থাকি।[১] পৃষ্ঠা ৯৫-তে ইমাম ইবনে হাজর হায়তামী মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেন, "একটা হাদীস ঘোষণা করে:

'যখন কেউ আমার প্রতি সালাওয়াৎ পাঠ করে, তখন তা আমাকে জানানো হয়। আর আমি তার জন্যে দোয়া করি'(হাদীস)। আরেকটি হাদীস ঘোষণা করে,

مَا مِنْ أَحَدٍ سَلَّمَ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللّٰهُ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

> 'যখন কোনো মুসলমান আমার প্রতি সালাম দেয়, তখন আমার রূহকে ফিরিয়ে দেয়া হয়।[২]

আমি তার সালামের জওয়াব দেই। আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম তাঁদের মাযার-রওয়ায় জীবিত।' আবু দারদা বর্ণিত একটি হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, 'আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম-এর দেহ মোবারক মাটিতে পচে না। শুক্রবার আমার প্রতি ঘন ঘন সালাওয়াত পাঠ করবে; প্রতি শুক্রবার উম্মত কর্তৃক পঠিত এই সালাওয়াত আমার সামনে পেশ করা হবে।' সাহাবা-এ-কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আরয করেন, 'এয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটিতে আপনার দেহ মোবারক মিশে যাওয়ার পর কীভাবে আপনাকে সালাওয়াত সম্পর্কে জ্ঞাত করানো হবে?' তিনি জবাবে বলেন, 'আল্লাহ পাক মাটির জন্যে আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম-এর দেহ মোবারককে হারাম করে দিয়েছেন' (হাদীস)। এ ধরনের বহু হাদীস আছে। এ সব হাদীস প্রতিভাত করে যে আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম তাঁদের মাযার-রওয়ায় জীবিত এবং তাঁরা মাটির মধ্যে পচেন না। আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হলেন তাঁদের ওয়ারিশ (আর তাই তাঁরাও ওয়ারিশীসূত্রে এই নেয়ামত পেয়ে থাকেন)।" [ইমাম ইবনে হাজরের 'যাওয়াজীর', ৯৫ পৃষ্ঠা] ইমাম দায়লামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণিত এবং ইমাম মানাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর

---

[১]. বুখারী : আস সহীহ, বাবুত তাওয়াদ্বুউ, ৮/ ১০৫ হাদীস নং ৬৫০২।
ক. বাগাবী : শরহু সুন্নাহ, বাবুত তাক্বাররুবু ইলাল্লাহি তা'য়ালা, ৫/১৯ হাদীস নং ১২৪৭।
[২]. ইসহাক্ব ইব্‌ন রাহভিয়া : আল মুসনাদ ১/৪৫২।

'কানযুদ্ দাকায়েক' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ একটি হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, "যদি মাযারস্থ (আউলিয়া) না থাকতেন, তবে দুনিয়াবাসী জ্বলে পুড়তো।" এ সকল হাদীস পরিস্ফুট করে যে আল্লাহতা'আলা বেসালপ্রাপ্তজনের ওয়াস্তে জীবিতদেরকে নেয়ামত দান করে থাকেন। আল আসকারী রাওয়ায়াতকৃত এবং ইমাম মানাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর 'কানযুদ্ দাকায়েক' পুস্তকে লিপিবদ্ধ একটি হাদীস ঘোষণা করে, "আমি ইয়াহইয়া আলাইহিস্ সালাম-এর মাযার যিয়ারত করতাম যদি ওর অবস্থান জানতাম" (হাদীস)।

৩০/ ওয়াহহাবী লেখক তার পুস্তকের ১৪৬ এবং ৯৫৮ পৃষ্ঠায় লিখেছে:

وَعَلَى هَذَا فَلَوْ ذَبِحَ لِغَيْرِ اللهِ مُتَقِرِبًا إِلَيْهِ يَحْرُمُ وَإِنْ قَالَ فِيْهِ بِاِسْمِ اللهِ، كَمَا قَدْ يَفْعَلُهُ طَائِفَةٌ مِنْ مُنَافِقِيِّ هَذِهِ الأُمَّةِ الَّذِيْنَ يَتَقَرِبُوْنَ إِلَىٰ الكَوَاكِبِ بِالذَّبْحِ وَالبُخُوْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ هَؤُلَاءِ مُرْتَدِيْنَ لَا تَبَاحَ ذَبِيْحَتَهُمْ بِحَالٍ قَالَ الزَمَخْشَرِيُّ: ''كَانُوْا إِذَا اشْتَرُوْا دَارًا أَوْ بَنُوْهَا أَوْ اسْتَخْرِجُوْا عَيْنًا ذَبِحُوْا ذَبِيْحَةً خَوْفًا أَنْ تَصِيْبَهُمْ الجِنَّ، فَأُضِيْفَتْ إِلَيْهِمْ الذَبَائِحِ لِذَلِكَ''. وَذَكَرَ إِبْرَاهِيْمُ المَرْوَزِيُّ: أَنَّ مَا ذُبِحَ عِنْدَ اسْتِقْبَالِ السُّلْطَانِ تَقَرَّبًا إِلَيْهِ-

"আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারও উদ্দেশ্যে পশু-পাখি কুরবানি করা হারাম। এই উম্মতের মুনাফেকরা যারা নক্ষত্রের নৈকট্য লাভের জন্যে তা করতো তাদের মতো যদি এরাও [মুসলিমগণ] জন্তু-জানোয়ার ইত্যাদি জবেহ করে, তবে এরাও মুরতাদ হয়ে যাবে এমন কি যদি এরা জবেহ করার সময় বাসমালা বলেও, তাতেও কোনো লাভ হবে না। এদের জবেহকৃত পশুর গোস্ত খাওয়া হালাল নয়। আয্ যামাখশারী বলেছেন যে যখন কেউ একটা নতুন বাড়ি কিনে কিংবা নির্মাণ করে, তখন যদি সে জ্বিনের আসর থেকে তা মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে জন্তু-জানোয়ার কুরবানী করে, তবে সে ক্ষেত্রেও একই অবস্থা বিরাজ করবে। ইব্রাহীম আল মারুযী বলেন যে সুলতান কিংবা প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ যখন ক্ষমতাসীন হন, তখন যদি কেউ তাঁদের কাছ থেকে সুবিধাদি পাওয়ার জন্যে পশু-পাখি কুরবানী করে, তবে তা হারাম হবে; কারণ তখন সেগুলো আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারও উদ্দেশ্যে কুরবানি করা হবে। 'ইহলাল'-এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারও নাম নিয়ে পশু জবেহ করা। আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারও নামে পশু জবেহ করার নযর অথবা মানত করাও একই

ব্যাপার [অর্থাৎ, ইহলাল]। পশু জবেহ করার বহু আগেও যদি ওই বুযূর্গের নাম বলা হয়, যেমন 'অমুক সাইয়েদ অথবা সাইয়েদার জন্যে'-তাতেও কোনো পার্থক্য হবে না। ওই ধরনের নযরকৃত পশু-পাখি জবেহ করার সময় বিসমিল্লাহ বললেও কোনো লাভ হবে না। আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে সুবিধা পাওয়ার উদ্দেশ্যে খাদ্য এবং পানীয় নযর-মানত করাটাও এ ধরনের একটা উদাহরণ। 'মৃত'জনের উপকারার্থে অথবা তাঁদের কাছ থেকে বরকত আদায়ের উদ্দেশ্যে তাঁদের মাযারে খাদ্য ও পানীয় নিয়ে গিয়ে গরীবদেরকে দান করাও আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারও জন্যে নযর পালন করার সমতুল্য, যেমন মূর্তি, সূর্য, চাঁদ অথবা কবরসমূহ, কিংবা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারও নামে কসম করা ওই ধরনের কাজ। এগুলোর সব-ই শির্ক মুসলিমদের ঐকমত্য অনুযায়ী, কিছু গোমরাহ কর্তৃক মাযারে মোমবাতি কিংবা প্রদীপ ইত্যাদি মানত করা মহাপাপ। মাযারে যে সকল গরীব লোক খেদমত করে তাদের জন্যে কিছু দ্রব্য-সামগ্রী দান করার মানত করা অনেকটা গীর্জায় অবস্থিত মূর্তির খেদমতগারদের জন্যে নযর করার মতো-ই ব্যাপার এ সকল কাজ এবাদত বটে, কিন্তু যখন আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারও জন্যে এগুলো করা হয়, তখন তা নিঃসন্দেহে শিরক হানাফী আলেম শায়খ কাসিম তাঁর প্রণীত 'দুরার' গ্রন্থে লিখেন, 'কিছু অজ্ঞ লোক যাদের আত্মীয় অথবা বন্ধু-বান্ধব কোনো দূরদেশে সফরে গিয়েছেন কিংবা অসুস্থ অথবা যারা কোনো জিনিস হারিয়েছে তারা সালেহ মুসলিমদের কবর যিয়ারত করে এবং স্বর্ণমুদ্রা কিংবা মোমবাতি অথবা খাদ্য ও পানীয় প্রদান করার মানত করে থাকে, যাতে আল্লাহ্ তাদের আত্মীয় এবং বন্ধু-বান্ধবদেরকে সহিহ সালামতে ফিরিয়ে আনেন কিংবা অসুস্থদের সুস্থ করে দেন কিংবা হারিয়ে যাওয়া জিনিস পাইয়ে দিন; এই ধরনের মানত কুসংস্কারাচ্ছন্ন। নযর করা এক ধরনের এবাদত, যেটা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারও জন্যে পালন করা যায় না। 'মৃত'জন কোনো কিছুর মালিক নন এবং তাদের কাছে কোনো কিছুই পেশ করা যায় না। শুধুমাত্র আল্লাহ্ই সমস্ত কিছু পরিচালনা করে থাকেন। 'মৃতজন' কিছু-ই করতে সক্ষম নন। তাঁরা কাজ করতে সক্ষম ধারণা পোষণ করাটা কুফর। 'বাহর' গ্রন্থে ইবনে নুজাইম বলেন, 'ওই ধরনের গোমরাহ কাজ আহমদ আল বাদাউয়ীর মাযারে অহরহ সংঘটিত হয়ে থাকে। হানাফী আলেম শায়খ সানাউল্লাহ হালাবী বলেছেন যে, আউলিয়ার জন্যে নযর (মানত) এবং পশু-পাখি জবেহ করা অনুমতিপ্রাপ্ত নয়। আহমদ আল বাদাওয়ীর মাযার তানতা নগরীতে অবস্থিত। সে মরক্কোর কাছে অবস্থিত মুলাসসামা রাষ্ট্রের গুপ্তচর ছিল। এই গুপ্তচর মুসলিমদেরকে মিথ্যা ও চালবাজির মাধ্যমে ধোকা দিয়েছিল। তার কবর এখন একটা গীর্জার মতো। মানুষেরা তার উদ্দেশ্যে নযর

করে। তারা তার পূজা করে থাকে। প্রত্যেক বছর তিন লক্ষ লোক এই মূর্তির কাছে তীর্থযাত্রা করে থাকে।' বাহর গ্রন্থের উদ্ধৃতি এখানে শেষ হলো।"[১]

ওহাবী পুস্তকটির উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি যদি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে সেটা প্রথমে কোরআনের আয়াত, হাদীস এবং আহলে সুন্নাতের আলেমদের কথা উদ্ধৃত করে মুসলিমদেরকে ধোকা দিতে অপতৎপর এবং এরপর সেটা হারাম, মকরূহ, এমন কি মুবাহকেও কুফর ও শিরক হিসেবে চিহ্নিত করার অপপ্রয়াস পেয়েছে। ওই ওহাবী আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সঙ্গে মূর্তির এবং তাঁদের মাযারগুলোর সঙ্গে গির্জার তুলনা দিতে চেষ্টারত বাহাত্তরটি ভ্রান্ত ফেরকাকে তাদের গোমরাহীপূর্ণ কর্মের জন্যে সমালোচনা করতে যেয়ে সে সুন্নী আউলিয়া ও মুসলিমদেরকে কাফের ও মুশরিক হিসেবে ফতওয়া দিয়েছে। মুসলিমদেরকে ওহাবীদের ধোকা থেকে রক্ষা করার জন্যে এক্ষণে আমি আল্লামা দাউদ ইবনে সুলাইমান আল বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রণীত "আশাদ্দুল জ্বিহাদ ফী দাওয়া' আল ইজতিহাদ" গ্রন্থ থেকে দশটি পাতা উদ্ধৃত করবো। আশা করি এর ফলে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে ওয়াহাবীরা মিথ্যাবাদী।

কিন্তু উদ্ধৃতিটির আগে হযরত আহমদ ইবনে আল বাদাওয়ী যাঁকে এই ওয়াহহাবী লেখক একটি মূর্তি হিসেবে আখ্যা দিয়েছে, তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী পেশ করা সমীচীন বলে মনে করি। 'ক্বামুস আল আলম' গ্রন্থে শামসুদ্দীন সামী বেগ তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, 'হযরত আহমদ বাদাওয়ী একজন প্রখ্যাত ওলী এবং শরীফ, অর্থাৎ, ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর বংশধর ছিলেন। তাঁর প্রপিতামহ আল হাজ্জাজের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্যে মরক্কো আসেন। আল বাদাওয়ী ৫৯৬ হিজরী সালে মরক্কোতে জন্ম গ্রহণ করেন। সাত বছর বয়সে তিনি তাঁর পিতা ও ভ্রাতাদের সঙ্গে মক্কা গমন করেন। স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে তিনি ৬৩৩ হিজরী সালে ইরাক ও দামেস্ক যান। পরে তিনি মিসরের তানতায় বসতি স্থাপন করেন। তাঁর কাছ থেকে বহু কারামত প্রত্যক্ষ করা হয়েছিল এবং তিনি যে একজন মহান ওলী ছিলেন, তা এতে প্রতিভাত হয়েছিল। তাঁর খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার পর সহস্র সহস্র মুসলিম তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করেন। তিনি ৬৭৫ হিজরী সালে তানতায় বেসালপ্রাপ্ত হন।[২]' ওয়াহহাবী পুস্তকটার আরেকটা জঘন্য কুৎসা রটনা হচ্ছে হযরত বাদাওয়ীকে মুলাসসামা রাষ্ট্রের চর হিসেবে চিহ্নিতকরণের প্রচেষ্টা। মুলাসসামা অথবা মুরাবিতিন ইসলামী রাষ্ট্রের পত্তন হয় দক্ষিণ মরক্কোতে, ৪৪০

---

[১]. ফাত্হ আল মজীদ : ১৪৬ হাদীস নং ৯৫৮।
[২]. ক্বামুস আল আলম।

হিজরী সালে। এর রাজধানী ছিল মারাকেশ। মুলাসসামা শাসনামলে স্পেন জয় হয়। এক শতাব্দী পরে ৫৪১ হিজরীতে ওর ভুখন্ডে মুওয়াহহিদীন রাষ্ট্রের পত্তন ঘটে। হযরত আহমদ আল বাদাওয়ী যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন আর কোনো মুলাসসামা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না। সেটা বিলুপ্ত হয়েছিল এবং সেটার নাম তখন ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছিল। ওয়াহাবী গোমরাহ লোকেরা তাফসীর ও হাদীসের জ্ঞানে যেমন পরিতাপজনকভাবে অজ্ঞ, ঠিক তেমনি ইতিহাস এবং বৈষয়িক জ্ঞানেও মাত্রাতিরিক্ত অজ্ঞ। যেহেতু আরবী তাদের মাতৃভাষা, সেহেতু তারা সাবলীল কলম দ্বারা আয়াত, হাদীস ও উলামা-এ-ইসলামের বাণীসমূহের বিকৃত ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হয়েছে। তারা এসব সূক্ষ্ম এবং সুগভীর দলিলগুলোকে খবর কাগজের মতো পড়ে যায় এবং তাদের শূন্য মস্তিষ্ক ও খাটো যুক্তি দ্বারা যা উপলব্ধি করে, তা-ই তারা সেগুলোর প্রতি আরোপ করে থাকে। সাইয়েদ কুতুব এবং মুহাম্মদ আবদুহ এই ধরনের বিকৃত ব্যাখ্যাদানকারীদের মধ্যে অন্যতম। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিম সাধারণকে এই সকল ভাঁওতাবাজ, ইসলামের দুশমনদের ক্ষতিকর চক্রান্ত থেকে মুক্ত রাখুন, আমিন

হযরত দাউদ ইবনে সুলাইমান আল বাগদাদী তাঁর 'আশাদ্দুল জিহাদ' পুস্তকে লিখেছেন: "কিছু লোক বলে যে আল্লাহর জন্যে নযর-মানত এবং পশু-পাখি জবেহ করে গোস্তগুলো গরীবদেরকে দান করে ওর সওয়াব আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম এবং আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-বৃন্দের রূহের প্রতি বখশে দেয়া জায়েয নয়। তারা এটাকে কুফর ও শিরক আখ্যা দিয়ে থাকে। তাদেরকে সাথে সাথে প্রতুত্তর দেয়া জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। তারা হচ্ছে লা-মযহাবী গোষ্ঠী। তারা কোনো ইমাম আল মযহাব অথবা কোনো ইসলামী আলেমকেই অনুসরণ করে না। তাদের স্থূল দৃষ্টিকোণ ও ত্রুটিপূর্ণ যুক্তির সাহায্যে তারা মন্তব্য করে থাকে। এখানে আমরা প্রথমে তাদের কথাকে খন্ডন করবো; তারপর ইসলামী উলামা যা লিখেছেন, তা লিপিবদ্ধ করবো।

আল্লাহ্ তা'আলা সুরা বাকারার ২৭০ নং আয়াতে (যথাক্রমে) ইরশাদ ফরমান,

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

'গরীবদের জন্যে প্রদত্ত তোমাদের সাদকা এবং তোমাদের কৃত নযর (মানত) সম্পর্কে আল্লাহ্ ভালোই জানেন' [1]এবং 'তাদের নযরগুলো পূরণ করা উচিৎ' (আল আয়াত)।

[1]. আল কুর'আন : আত তাওবা, ২/২৭০।

সুরা আদ দাহর ৭ নং আয়াতে ‘তারা যা মানত করে তা তারা পূরণ করে’ এ কথা ঘোষণা করে তিনি নযর পালনকারীদেরকে প্রশংসা করেছেন। এ সকল আয়াতে আল্লাহ্ পাক বোঝাচ্ছেন, যারা নযর পালন করে তাদেরকে তিনি চেনেন এবং তাদের প্রশংসা করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে নযর এমন একটা জিনিস যা তাঁর ওয়াস্তেই পালন করা হয়। নবী-এ-মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হয়: ’এয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি কোনো নর অথবা নারী মক্কার বাইরে একটা উট জবেহ্ করার মানত করে, তবে সেটা কি জাহেলীয়া যুগের মূর্তিদের সামনে জবেহকৃত উটগুলোর মতোই হবে?’ হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জওয়াব দেন, ’না, তা হবে না সেই নর অথবা নারীর নযর পূরণ করা উচিৎ। আল্লাহ্ সর্বত্র হাযির-নাযির আছেন এবং তিনি সব কিছুই দেখছেন। প্রত্যেক ব্যক্তির নিয়্যত সম্পর্কে তিনি ওয়াকেফহাল আছেন’ (হাদীস)। ওহাবীদের গোমরাহীকে খন্ডন করার জন্যে এই হাদীসটিই যথেষ্ট। আল্লাহর ওয়াস্তে নযরকৃত পশু-পাখি বুযূর্গ-সালেহীনদের মাযার-রওযার কাছে জবেহ করে সেখানে বসবাসরত গরীবদের কাছে গোস্তগুলো দান করে সাওয়াবটুকু ওই সকল বুযূর্গ-সালেহীনদের রূহ্ মোবারকের প্রতি বখশিয়ে দেয়া জায়েয। এটা ফিসক নয়। আল্লাহর ওয়াস্তে মানতকৃত জন্তু-জানোয়ার জবেহ্ করা একটা এবাদত বিশেষ। আর গরীব মিসকিনদেরকে গোস্তগুলো দান করা আরেকটা এবাদত। এ দু’টো এবাদতের প্রত্যেকটাকেই ভিন্ন ভিন্নভাবে পুরস্কৃত করা হবে।

মুসলিমগণ কর্তৃক আল্লাহর ওয়াস্তে বেসালপ্রাপ্ত জনের প্রতি মানত পূরণার্থে মাযার-রওযার কাছে পশু-পাখি জবাইকে মূর্তি পূজার সঙ্গে তুলনা দেয়াটা ওহাবীদের একটা জঘন্য কুৎসা রটনার অপপ্রয়াস মাত্র। আয়াত ও হাদীস পেশ করে তাদেরকে এটা প্রমাণ করতে হবে। এই ধরনের কোনো প্রামাণ্য দলিল তারা নযর-মানতের বিরুদ্ধে এখনও পেশ করতে পারে নি। মুসলিমদেরকে তারা কাফের-মুশরিকদের প্রতি নাযেলকৃত আয়াতগুলোর বিষয়বস্তু হিসেবে পরিণত করতে চায়। ফকীহ্ উলামাবৃন্দের বইপত্রে বর্ণিত হারাম অথবা মকরূহ, এমন কি জায়েয বিষয়গুলোকে পর্যন্ত উল্লেখ করে তারা চিৎকার করতে থাকে ’এটা কুফর’ এবং ’ওটা শিরক’ বস্তুতঃ তারা মযহাবের ইমাম অথবা ফকীহ্ উলামাকে তা’যিম করে না। ওয়াহহাবীরা তাদের স্বার্থের অনুকূল উদ্ধৃতিসমূহ পেশ করে থাকে, অথবা আহল-এ-সুন্নাতের মুসলিমদেরকে প্রতারিত করার জন্যে নিজেদের ভ্রান্ত প্রমাণগুলো পেশ করে থাকে। কিন্তু আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে তারা যা উপলব্ধি করে, তা-ই তারা অনুসরণ করে। সুরা বাকারার ১৭৩ নং আয়াত তারা পেশ করে থাকে: وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ‘মুশরিকরা আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারও জন্যে ইহলাল

পালন করে’[১] তাদের যুক্তির ভিত্তি হিসেবে এই আয়াতটাও তারা সবসময় পেশ করে। তারা বলে যে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারও জন্যে যদি কেউ কোনো জন্তু-জানোয়ার কোরবানি করে, তবে সে কাফের ও মুশরিক হয়ে যাবে। তাহলে তাদের কথানুযায়ী সকল ওহাবী এবং মুসলিমগণ কাফের হয়ে গিয়েছে, যেহেতু মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে প্রত্যেক দিন আল্লাহর ওয়াস্তে কিংবা এবাদতের উদ্দেশ্যে নয়, বরং ব্যবসায়িক ও পুষ্টিগত উদ্দেশ্যে শত-সহস্র পশু-পাখি জবেহ করা হয়। ওহাবীরা এ সম্পর্কে কী উত্তর দেবে, যেখানে তারাই দাবি করে যে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারও জন্যে পশু কোরবানি করা কুফর?

“লা-মযহাবীরা বলে যে মাযার থেকে দূরে কোথাও জন্তু-জানোয়ার কোরবানী করে সওয়াবগুলো বেসালপ্রাপ্ত জনের রূহের ওপর বখশিয়ে দেয়া জায়েয। কিন্তু এটাও তাদের ফতোওয়া অনুযায়ী কুফর ও শির্ক হওয়া উচিত। তারা বলে যে তারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে জবেহ দিয়ে গরীবদেরকে গোস্তগুলো দান করে এবং সওয়াবগুলো বেসালপ্রাপ্তদের রূহের ওপর বখশিয়ে দেয়। আমরা বলি, আমরাও একই উদ্দেশ্য নিয়ে আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম এবং আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর জন্যে জবেহ করে থাকি। তাঁদের জন্যে পশু-পাখি জবেহ দানকারীদের যে বদ নিয়্যত আছে তা তোমরা কীভাবে জানো? একমাত্র আল্লাহ্ এবং তাঁর দ্বারা পরিজ্ঞাত ব্যক্তিগণই মানুষের নিয়্যত সম্পর্কে জানতে পারেন। অন্য কেউ কখনো জানতে পারে না। ওহাবীদের দ্বারা অহরহ ব্যবহৃত উপরোক্ত আয়াতের ’ইহলাল’ শব্দটির অর্থ হচ্ছে ‘উচ্চস্বরে ঘোষণা করা।’ জাহেলীয়া যুগে মূর্তি পূজারীরা জন্তু-জানোয়ার জবেহ করার সময় চিৎকার করে বলতো, ‘আল-লাতের জন্যে’ কিংবা ‘আল-উযযার জন্যে’। মুসলিমগণ ’বিসমিল্লাহ’ অথবা ’আল্লাহু আকবর’ বলেন জবেহ করার সময়; অথচ মূর্তি উপাসকরা আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তির নাম করে ডাকতো। যদি কোনো মুসলমান জবেহ করার সময় আল্লাহর নামের পরিবর্তে ‘আবদুল কাদির আল জিলানীর জন্যে’ কিংবা ‘আহমদ বাদাওয়ীর জন্যে’ বলে এবং সে যদি এটা ইচ্ছাকৃতভাবে বলে, তবে তার এ কাজটা হারাম। যদি অজ্ঞ হওয়ার কারণে সে এই কথা বলে, তাহলে উলামায়ে কেরামের উচিৎ তাকে সঠিক নিয়্যত শেখিয়ে দেয়া। তাকে সাথে সাথেই কাফের বলা যাবে না, যেমনিভাবে ওয়াহহাবীরা বলে থাকে। আমরা এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেবো।

১. আল কুর’আন : আল বাক্বারা, ২/১৭৩

”কাসিম ইবনে কাতলুবুগা-এর উদ্ধৃতি (দুরারুল বিহার-এর ব্যাখ্যা) দিয়ে ‘বাহর-এ রাইক’, নাহর-এ ফাইক’ এবং ’রাদ্দুল মুখতার’ গ্রন্থগুলো লিখে: ‘অজ্ঞ লোকদের দ্বারা নযর-মানতকৃত মোমবাতি কিংবা প্রদীপের তেল ও টাকা-পয়সা যা মাযারে নিয়ে যাওয়া হয়ে থাকে আউলিয়ার নৈকট্যপ্রাপ্তির অন্বেষায়, তা যদি শুধুমাত্র বেসালপ্রাপ্ত জনের জন্যে হয়, তাহলে এ সকল কাজ হবে হারাম এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। কিন্তু সেগুলো কুফর ও শির্ক হবে না। ওই সব কাজ জায়েয হবে, যদি সেগুলো গরীবদেরকে দান করে প্রাপ্ত সওয়াব আউলিয়ার রূহসমূহের প্রতি বখশিয়ে দেয়ার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে করা হয়। কাসিম আল কাতলুবুগা মিসরী হানাফী (ইনতেকাল ৮৭৬ হিজরী/১৪৭৪ খৃ:) বলেন যে নযর-মানত করাটা এক ধরনের এবাদত এবং কোনো সৃষ্টির জন্যে কোনো এবাদত পালন করা জায়েয নয়। কিন্তু ওপরের এ মন্তব্যটা ‘নযর কোনো উপকার বহন করে আনে না; এটা একজন কৃপণ লোকের সম্পত্তি খরচ হওয়ার কারণস্বরূপ’ হাদীসটার সঙ্গে একমত নয়। এই হাদীস প্রতীয়মান করে যে নযর মকরূহ। একটা মকরূহ কাজ কখনো এবাদত হতে পারে না। আউলিয়ার মাযারের সন্নিকটে বা অন্য কোনো জায়গায় বসবাসকারী গরীবদেরকে সাদাকাস্বরূপ দান করার উদ্দেশ্য নিয়ে মুসলমানগণ জন্তু-জানোয়ার ও অন্যান্য জিনিস মানত করে থাকেন। কেউই গোস্ত কিংবা জিনিসগুলো বেসালপ্রাপ্তদের ব্যবহারের জন্যে বেসালপ্রাপ্তজনকে প্রদান করার কথা চিন্তা করেন না। হানাফী মযহাব অনুযায়ী, নযর পালন করা জরুরি নয়। পূর্ব নির্ধারিত কোনো জায়গায় নযর পালন করাটাও অত্যাবশ্যক নয়। উদাহরণস্বরূপ, ‘অমুক শায়খের জন্যে আমার নযর’ বলা জায়েয। এর অর্থ- আল্লাহর ওয়াস্তে কৃত আমার নযরের সওয়াব ওই শায়খের জন্যে হবে। ওই শায়খের মাযারের কাছে পশুটি জবেহ করা আবশ্যক নয়। অন্য কোনো জায়গায় জবেহ করে অন্যত্র বসবাসকারী গরীবদেরকে সাদাকাস্বরূপ গোস্তগুলো দান করা জায়েয। পশু-পাখি যেখানে-ই জবেহ করা হোক না কেন, সওয়াবটুকু ওই ওলীর কাছেই চলে যাবে যাঁর জন্যে নিয়্যত করা হয়েছে। তবে উপরোক্ত কথাগুলো শায়খ কাসিম-এর যিনি কামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে হুমামের শিষ্য ছিলেন। ইবনে তাইমিয়া ছাড়া আর কোনো পূর্ববর্তী আলেমই শায়খ কাসিমের মতো কথা বলেন নি। ইবনে তাইমিয়া এতোই সীমা লংঘন করেছিল যে বিভিন্ন নযর, বিশেষ করে পশু-পাখি জবেহ এবং মাযার যেয়ারতের জন্যে সে মুসলিমদেরকে দোষারোপ করেছিল। আহলে সুন্নাতের অধিকাংশ উলামা যাঁরা তার সময়ে বসবাস করতেন এবং যাঁরা পরবর্তীকালে এসেছিলেন, তাঁরা সবাই তার গোমরাহ ধ্যান-ধারণা খন্ডন করেন এবং তা যে ভিত্তিহীন তা প্রমাণ করেন। যদি শেখ কাসিমের কথাগুলো সত্য

হিসেবে ধরেও নেয়া হয়, তবুও আহলে সুন্নাতের উলামাবৃন্দ মন্তব্য করেছেন যে কথাগুলো মুসলিমদেরকে খাটো করার জন্যে উচ্চারিত হয় নি, কারণ শায়খ কাসিমও বলেছেন যে গরীবদেরকে সাদকাস্বরূপ গোস্ত দান করার উদ্দেশ্যে পশু-পাখি জবেহ করা অনুমতিপ্রাপ্ত। আমরা ওপরে লিখেছি যে মুসলমান সমাজ এই নিয়্যতেই নযর পালন করে থাকেন। শায়খ কাসিমের মন্তব্যের অনুরূপ সুন্নী আলেমগণের কথাকে ওহাবীরা দলিলস্বরূপ পেশ করে, যাতে মুসলমানদের প্রতারিত করা যায়; কারণ ওহাবীরা নিজেরাই কুরআন কিংবা হাদীস ছাড়া অন্য কোনো মন্তব্যকে দলিলস্বরূপ গ্রহণ করে না। এমতাবস্থায় আমরা তাদেরকে অনুরোধ জানাই কুরআনের কোনো আয়াত কিংবা কোনো হাদীস পেশ করতে, যেখানে নবী কিংবা ওলীগণের জন্যে নযর-মানত করাকে শিরক বলা হয়েছে। তারা শুধু 'ইহলাল' সংক্রান্ত উপরোক্ত আয়াতখানা প্রদর্শন করে থাকে। আয়াতটি থেকে নিঃসৃত তাদের ধারণাগুলো সম্ভাবনা ও সন্দেহের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যুক্তি এবং সিদ্ধান্ত কখনো সন্দেহ ও সম্ভাবনার ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। খাদ্যের জন্যে জন্তু-জানোয়ার জবেহ করা 'ইহলাল' নয়; উদাহরণস্বরূপ, মেহমানদের জন্যে, যেহেতু সেটা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম-এর সুন্নত। যদি তা 'ইহলাল' হতো, তাহলে নিশ্চয়ই হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম মুশরিকদের ইহলাল পালন করতেন না'।[১]

"সংক্ষেপে, আল্লাহর প্রিয় বান্দা, অর্থাৎ, আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর জন্যে পশু-পাখি জবেহ করার নযর করার মধ্যে তিনটি উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে: আল্লাহর ওয়াস্তে জবেহ করা; গরীবদেরকে সাদাকাস্বরূপ গোস্ত এবং অন্যান্য অংশগুলো দান করা; সওয়াবটুকু কোনো ওলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর রূহের প্রতি বখশিয়ে দেয়া। একমাত্র এই নিয়্যত নিয়েই মুসলমানগণ পশু জবেহ করার নযর করে থাকেন; এই ধরনের নযর পালন করাটা মেহমানদের জন্যে পশু জবেহ করার চেয়েও ভালো, কেননা মেহমানগণ হয়তো ধনী হতে পারেন এবং তাই তাঁদের জন্যে সাদকা গ্রহণ করা জায়েয হয়তো না-ও হতে পারে। তবে কোনো সুলতান অথবা প্রশাসক কিংবা প্রত্যাশিত সফরকারী কোনো মেহমানের আগমন উপলক্ষে পশু-পাখি জবেহ দেয়া এবং গোস্তগুলো গরীবদের মাঝে বিতরণ না করে পচতে দেয়া নিঃসন্দেহে মূর্তি পূজারীদের দ্বারা তাদের মূর্তির প্রতি পশু বলি দেয়ার মতো-ই ব্যাপার। বস্তুতঃ শাফেয়ী মযহাবে এটা হারাম।

---

[১] . বাহর-এ-রাইক : নাহর-এ-ফাইক ও রাদ্দুল মুখতার।

"আল্লামা ইবনে হাজর আল মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে মানুষেরা একবার জিজ্ঞাসা করে: 'কোনো জীবিত ওলীর জন্যে মানত করা কি জায়েয? নযরকৃত জিনিসগুলো সেই ওলীকে কিংবা কোনো গরীব লোককে দেয়া কি অত্যাবশ্যক? কোনো বেসালপ্রাপ্ত ওলীর জন্যে নযর করা কি জায়েয? সেই ওলীর সন্তান ও আত্মীয়, অথবা তাঁর অনুসারী মুরীদ ও খাদেমদেরকে কি নযর-মানতকৃত সম্পত্তি প্রদান করা জরুরি? কবরের ওপর দেয়াল, রেইলিং নির্মাণ অথবা কোনো পুরোনো ইমারত পুনঃনির্মাণ করা কিংবা কবরের ওপর গুম্বজ নির্মাণ করার নযর-মানত করা সহীহ কিনা?

"তিনি উত্তর দেন: 'একজন জীবিত ওলীর জন্যে মানত করা সহীহ। মানতকৃত জিনিস তাঁকে প্রদান করা ওয়াজিব। অন্য কাউকে দেয়া অনুমতিপ্রাপ্ত নয়। আর বেসালপ্রাপ্ত ওলীর ক্ষেত্রে যদি মানতকারী শুধু তাঁকে দেয়ার জন্যেই নিয়্যত করে, তাহলে তা অ-সহীহ এবং ভ্রান্তি; মানত সহীহ হবে যদি তা দান-খয়রাতের নিয়্যতে করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ওই ওলীর সন্তান-সন্ততি, মুরিদানবৃন্দ কিংবা তাঁর মাযারের সন্নিকটে অথবা অন্যত্র বসবাসকারী গরীব-মিসকিনদেরকে দান করার নিয়্যতে নযর-মানত করা সহীহ এবং তখন মানতকৃত জিনিসপত্র দান করা ওয়াজিব। যদি মানতকারী ব্যক্তি তার নযর পালন করার পদ্ধতি নির্ধারণ না করে থাকে, তবে সে তার সমসাময়িক মুসলমানদের প্রথানুযায়ী তা পালন করবে। প্রায় প্রত্যেক মুসলমান-ই উপরোক্ত লোকদের একজনকে মানতকৃত বস্তু দান করে সেটার সওয়াব বেসালপ্রাপ্ত জনের কাছে উপহারস্বরূপ বখশিয়ে দেয়ার কথা চিন্তা করেন তখনি, যখন তিনি "এটা অমুক বেসালপ্রাপ্ত ওলীর জন্যে আমার নযর'- কথাগুলো বলে মানত করেন, এবং যেহেতু মানতকারী দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রথাসমূহ সম্পর্কে জানেন, সেহেতু তাঁর মানত প্রথানুযায়ী-ই হয়। তাঁর নযর ওয়াক্ফের মতো-ই সহীহ হবে। যদি ওয়াকফ প্রদানকারী কোনো ব্যক্তি কোনো শর্ত উল্লেখ না করেন, তাহলে তাঁর প্রদত্ত ওয়াকফটি প্রচলিত প্রথাসমূহের আওতাধীন হবে। মাযার-রওযা নির্মাণ ও আস্তর করার নযর করা বাতিল (কুসংস্কার)। তবে ইমাম আযরাই ও ইমাম আয্ যারকাশী এবং অনেকের মতে, নবী, ওলী ও উলামার মাযার-রওযার চারপাশে তা নির্মাণ করা জায়েয, যেগুলোতে বন্য জন্তু-জানোয়ার, চোর ও শত্রুরা খুঁড়ে তুলে ফেলার আশংকা থাকে; তাই ওই ধরনের উপকারী নযর করা এবং ওই ধরনের ইমারত নির্মাণ করার জন্যে ওসিয়ত করা সহীহ, জায়েয ও ভাল।' ইমাম ইবনে হাজর আল মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ফত্ওয়া আরও বড়, কিন্তু আমাদের জন্যে এতোটুকু-ই যথেষ্ট। হযরত খায়রুদ্দীন রামলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এরও বহু ফত্ওয়া আছে এই

বিষয়ে। এসব ফত্‌ওয়ার প্রধান উৎস হচ্ছে জুরজানে অবস্থিত হযরত ইমাম রাফে'ই রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মাযার শরীফের জন্যে পালিত নযর-মানত সম্পর্কে লিখিত নিবন্ধসমূহ। ইমাম ইবনে হাজর আল মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'তুহফা' পুস্তক এবং ফাতোয়ার কিতাবগুলোতে সে সব উদ্ধৃত করেছেন। ওপরে ব্যাখ্যাকৃত সমস্ত নযর শাফেয়ী মযহাবে সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয।

"মূখতাসার-এ-খলিল গ্রন্থে লেখা মালেকী মযহাবের মতানুযায়ী, 'কোনো লোক, যে নাকি মক্কার বাইরে, উদাহরণস্বরূপ, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা কোনো ওলীর মাযারে মৌখিক অথবা অ-মৌখিক জবেহ-এর নিয়্যত করে একটা উট কিংবা একটা ভেড়া নিয়ে যায়, তার উচিৎ সেটা জবেহ করা এবং সেটার গোস্ত গরীবদেরকে সাদকাস্বরূপ দান করা। যদি কোনো ব্যক্তি এ ধরনের মাযারে কাপড়, টাকা-পয়সা কিংবা খাদ্যের মতো জিনিসপত্র পাঠাবার ইচ্ছা পোষণ করে এই নিয়্যতে যে, সেগুলো সে সেখানকার খাদেমদের মাঝে বিতরণ করবে, তবে তাকে তা পাঠাতে হবে; এমন কি সেখানকার খাদেমরা যদি ধনীও হয়, তবুও তাকে তা পাঠাতে হবে। যদি সে ওই ওলী/বুযর্গের প্রতি সওয়াবটুকু উপহারস্বরূপ বখশিয়ে দিতে চায়, তবে তাকে নিজের দেশের গরীবদের মাঝে তা বিতরণ করতে হবে। যদি সে কোনো নিন্দিষ্ট নিয়্যত নির্ধারণ না করে থাকে, অথবা যদি সে তার নিয়্যত ব্যক্ত করার আগেই মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার দেশের প্রথানুযায়ী তা পালন করা হবে।' ইবনে আরাফা এবং আল বারযালী-ও একই কথা লিখেছেন।

"আর হাম্বলী মযহাবে শায়খ মনসুর আল বাহুতী তাঁর কৃত 'ইক্না' গ্রন্থের শরাহ-এ এবং ইবনে তাইমিয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে মুফলী তাঁর 'ফুরু' কিতাবে লিখেন: 'কোনো নিন্দিষ্ট শায়খ যাতে মুশকিল আসান করে দেন অথবা দেখা সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দেন এই উদ্দেশ্যে নযর করার মানে হলো আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারও জন্যে মানত করা। এটা অনেকটা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারও নামে কসম করার মতোই। এই ধরনের নযর সহীহ, কিন্তু অন্যান্যদের মতানুযায়ী পাপযুক্ত।' ওপরের উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় যে আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর জন্যে মানত করা এবং তাঁদের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হওয়া ইবনে তাইমিয়ার মতে মাকরূহ-এ-তানযিহী। আর অন্যান্যদের মতানুযায়ী 'পাপযুক্ত' বলে তাঁরা বোঝালেন যে তাঁদের মতে এটা পাপ নয়। 'ইকনা' গ্রন্থের শরাহতে আরও লেখা আছে, ইবনে তাইমিয়া বলেছিল যে হুজূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্যে মানতকৃত প্রদীপ অথবা মোমবাতি মদীনার গরীবদেরকে প্রদান করা উচিৎ।

”কোনো নবী আলাইহিস্ সালাম কিংবা ওলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর জন্যে পশু যবেহ করার মানত করার মানে হলো আল্লাহর ওয়াস্তে যবেহ করে সেটার সওয়াব তাঁর রূহের প্রতি বখশিয়ে দেয়া। একটি হাদীস ইরশাদ ফরমায়, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্যে পশু জবেহ করে, তার প্রতি আল্লাহর লা'নত' (হাদীস)। ইবনুল কাইয়েম আল জওযিয়া তার 'কিতাবুল কাবাইর' গ্রন্থে, আয্ যাহাবী তাঁর 'কাবাইর' পুস্তকে এবং ইমাম ইবনে হাজর আল মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'যাওয়াজির' কিতাবে এই হাদীসটিকে বিশদ ব্যাখ্যা করে বলেন যে, আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারও জন্যে যবেহ দানকারী হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে জবেহ করার সময় বলে: 'আমার মনিব অমুক শায়খের জন্যে।' কাফেররাও তাদের মূর্তির নামে পশু-পাখি যবেহ করে থাকে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও নামে যবেহ করাটা ওই রকমই একটা কাজ। ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর রচিত 'রাওদা' গ্রন্থে লিখেছেন: 'জবেহ করার সময় 'কাবার জন্যে' বলা জায়েয, যেহেতু সেটা বাইতুল্লাহ (আল্লাহর ঘর); এবং নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্যে তা বলা-ও জায়েয, যেহেতু তিনি রাসূলুল্লাহ (আল্লাহর রাসূল)। মক্কা অথবা কাবায় উপহার প্রেরণও অনুরূপ।'

“আমরা ওপরে উল্লেখ করেছি, যখন কোনো সুলতান কিংবা রাষ্ট্রপ্রধান আগমন করেন, তখন তাঁর কাছ থেকে সুবিধা লাভের জন্যে পশু যবেহ করা হারাম। তবে জবেহ করা জায়েয তখনি, যখন কেউ তাঁদের আগমন উপলক্ষে কিংবা নিজ সন্তানের জন্ম উপলক্ষে আনন্দিত হয়, অথবা কারও মেজাজ ঠান্ডা করার উদ্দেশ্যে তা করে। কারও সঙ্গে হৃদ্যতা গড়ার চেষ্টা করা, সেই ব্যক্তির কাছ থেকে সুবিধা লাভ করার চেষ্টা থেকে আলাদা ব্যাপার। আর মূর্তির জন্যে যবেহ করা তো সম্পূর্ণ আলাদা একটা কাজ। জ্বিনদের জন্যে পশু যবেহ করার ব্যাপারটা জায়েয হবে, যদি সেটা আল্লাহর ওয়াস্তে করা হয় এবং এই বিশ্বাস পোষণ করা হয় যে আল্লাহ-ই জ্বিনদের থেকে রক্ষা করবেন। এই যথার্থ নিয়্যত কিংবা চিন্তাধারা ছাড়া জবেহ করা হারাম।

”অতএব, এটা পরিস্ফুট যে ইসলামী উলামা যে সব প্রশ্নের উদ্ভব হতে পারে, সেগুলোর প্রত্যেকটারই উত্তর প্রদান করেছেন এবং অন্য কারও দ্বারা কোনো কিছু সংযোজনের অবকাশ রাখেন নি। তাঁরা ক্ষতিকর নিয়্যত ও কাজকর্ম থেকে উপকারীগুলোকে পৃথক করে দিয়েছেন। ফলে শতাব্দীর পর শতাব্দী গত হয়েছে এবং মানুষেরা তাঁদের বইপত্রে নিজেদের সমস্যাসমূহের সমাধান পেয়েছে। যদি কোনো অজ্ঞ-আহাম্মক নিজের বদ-আকীদা প্রচারের জন্যে আবির্ভূত হয় এবং ফিতনার মাধ্যমে মুসলিমদেরকে বিভক্ত করতে চেষ্টা করে এবং ইসলামী উলামাকে

দোষারোপ করতে অপপ্রয়াসী হয়, আর সঠিক পথের ওপর বিচরণকারীদেরকে ঘৃণা করে, তাহলে বোঝা যাবে যে সে একজন গোমরাহ-যিনদিক এবং তার কথা তখন আর কোনো বুদ্ধিমান মানুষে বিশ্বাস করবেন না অথবা তার দ্বারা ধোকাপ্রাপ্তও হবেন না। শুধুমাত্র দাজ্জালের সৈন্যরাই ওই আহাম্মক লোকটিকে বিশ্বাস করবে এবং সঠিককে বলবে ভুল, সুন্দরকে 'বিশ্রী'।

"আযান দেয়ার সময় মুয়াজ্জিন যখন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম মোবারক উচ্চারণ করেন, তখন মুসলিমগণ তাঁদের হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ দুটো বুসা (চুম্বন) দিয়ে চোখে স্পর্শ করেন। বহু উলামা, উদাহরণস্বরূপ, আদ-দায়রাবী তাঁর 'মুজারাবাত' গ্রন্থে একথা লিখেছেন। আমি এর আগে এ ব্যাপারে কানো হাদীস দেখিনি, কিন্তু 'সালেহীন তথা পুণ্যবান বান্দাদেরকে যেখানে উল্লেখ করা হয়, সেখানে (আল্লাহর) রহমত অবতীর্ণ হয়'- হাদীসটি ইশারা করে যে এই আমলটি অনুমতিপ্রাপ্ত। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইবনুল জাওযী ও ইমাম ইবনে হাজর আল হায়তামী আল মক্কী এই হাদীসটির সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। ইমাম সুয়ুতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর প্রণীত 'জামিউস সাগির' পুস্তকে হাদীসটি লিখেছেন। আমাদের হুজূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চয়ই সকল নবী ও সালেহীনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর আল্লাহ নিশ্চয়ই তাঁর নাম যখন উল্লেখ করা হয়, তখন দয়া ও রহম করেন। আল্লাহ যখন দয়া করেন, তখন দোয়াসমূহ কবুল হয়। যখন আযান শ্রুত হয়, তখন 'এয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার জন্যে আমার চোখ নূরানী এবং হৃদয় উৎফুল্ল হয়' বলাটা একজন লোকের ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক সুখ-শান্তির জন্যে একটা দোয়া ছাড়া আর কিছু নয়। এই দোয়া ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্ কুহিস্তানীর এসনাদে হানাফী আলেম আত্ তাহতাবী তাঁর কৃত 'মারাক-ইউল-ফালাহ-এর শরাহ-এ লিখেন: 'আযান দেয়ার সময় মুয়াজ্জীন যখন দ্বিতীয়বার হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম মুবারক উচ্চারণ করেন, তখন কোনো ব্যক্তি তার হাতের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি চোখের ওপর মোছেন এবং বলেন, কুররাত আইনাইয়্যা বিকা এয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহুম্মা মাত-তি'নী বিস্ সামি-ই ওয়াল বাসারি এ রকম বলা মুস্তাহাব কারণ, রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই রকম আমলকারীকে বেহেশতে নিয়ে যাবেন। শায়খযাদা তাঁর কৃত 'বায়দাবী তফসীর' বইয়ের শরাহ-এ শায়খ আবুল ওয়াফা থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি (আবুল ওয়াফা) এমন কিছু ফাত্ওয়া দেখেছেন যেগুলো এই মর্মে বিবৃতি দিয়েছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আযানে হুজূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম

শোনার পর বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয়ের নখ চুম্বন করে চোখ মুছতেন; আর যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি উত্তর দেন, 'আপনার পবিত্র নামের মাধ্যমে বরকত আদায়ের উদ্দেশ্যে; এরপর হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'তুমি ভালো করেছ। যে ব্যক্তি এ রকম করে, সে কখনও চোখের ব্যারামে ভুগবে না।' যখন নখগুলো চোখ স্পর্শ করে, তখন প্রত্যেকের বলা উচিৎ "আল্লাহুম্মাহফুয আইনাই-ইয়্যা ওয়া নাও-ওয়ীরহুমা।" হযরত আবু বকর আস সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণিত একটা হাদীস ইমাম দায়লামী উদ্ধৃত করেন: 'যখন মুয়াযযিন আযানে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বাক্যটি উচ্চারণ করেন, তখন যদি কেউ নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় চুম্বন করে নিজ চোখে মোছে এবং 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, রাদিইতু বিল্লাহি রাব্বান ওয়া বিল ইসলামী দ্বীনান ওয়া বি মুহাম্মদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা নাবিয়্যান' বলে, তবে আমার শাফায়াত তার জন্যে হালাল হয়ে যাবে" (হাদীস)।' (আত্ তাহ্তাবীর উদ্ধৃতি এখানে শেষ হলো)।' একটা হাদীস ইরশাদ ফরমায়: 'যারা আযানে আমার নাম শোনার পর তাদের বৃদ্ধাঙ্গুলিগুলো নিজেদের চোখে মোছে, তাদেরকে আমি শেষ বিচারের দিনে তালাশ করে খুঁজে বের করে বেহেশতে নিয়ে যাবো' (হাদীস)। 'কানযুল ইবাদ' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম কুহিস্তানী লিখেন যে আযানে প্রথমবার হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম উচ্চারিত হওয়ার পর 'সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামা আলাইকা এয়া রাসূলাল্লাহ' এবং দ্বিতীয়বার উচ্চারিত হওয়ার পর 'কুররাত আঈনাই-ইয়্যা বিকা এয়া রাসূলাল্লাহ' বলা এবং তার পর দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি চুম্বন করে চোখ থেকে আঙ্গুল সরাবার আগে 'আল্লাহুম্মা মাততি'নী বিস্ সামি-ই ওয়াল বাসারি' বলা মুস্তাহাব; হযরত রাসূল-এ-করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রকম আমলকারীকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন"।[১]

৩১/ নিচের দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি আবারও 'আশাদ্দুল জিহাদ' পুস্তকটি হতে গৃহীত হয়েছে:

"শায়খ মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান আল মাদানী আশ-শাফেয়ীকে ওহাবী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব নজদী সম্পর্কে মতামত পেশ করার জন্যে অনুরোধ জানানো হয়। তিনি বলেন, 'এই লোক বর্তমানকালের অজ্ঞ মানুষদেরকে একটা গোমরাহ পথের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তারা আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নূরকে মুশরিকদের বিরোধিতার

---

[১]. আল্লামা দাউদ ইবনে সুলাইমান : আশাদ্দুল জ্বিহাদ ফী দাওয়ায়িল ইজতেহাদ, ১/৪০।

মুখে নিভে যেতে দেবেন না এবং তিনি আহলে সুন্নাতের উলামাবৃন্দের আলো দ্বারা সর্বত্র নূরানী করে দেবেন।” শায়খ সুলাইমানের ফতোয়াগুলোর শেষে প্রশ্ন-উত্তরগুলো নিম্নরূপ:

“প্রশ্ন: সাইয়েদুল মুরসালিনের [সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] পথের দিক-নির্দেশকারী নক্ষত্ররাজিসম মহান উলামা আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি যদি কোনো লোক নিজ স্থূল দৃষ্টিকোণ ও সংকীর্ণ মস্তিষ্ক দ্বারা বিভিন্ন দ্বীনী কিতাব হতে সংগৃহীত দ্বীনী জ্ঞানের সাহায্যে সিদ্ধান্ত নেয় যে সমস্ত উম্মত ইসলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে এবং যদি সেই লোক উলামায়ে ইসলাম কর্তৃক বিবৃত মুজতাহিদের গুণাবলীসমূহের অধিকারী না হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে কুরআন-হাদীস থেকে অর্থ বের করার ক্ষমতাসম্পন্ন মুজতাহিদ দাবি করে, তবে তাকে কি তার ধ্যান-ধারণা প্রচার করার অনুমতি দেয়া যাবে? তার কি উচিৎ নয় এই দাবি পরিত্যাগ করে ইসলামী উলামাকে অনুসরণ করা? সে বলে যে সে একজন ইমাম এবং তাকে অনুসরণ করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্যে জরুরি এবং আরও দাবি করে যে তার মযহাব মান্য করা একান্ত দরকারি। সে মুসলিমদেরকে জোরপূর্বক নিজের মযহাবে দীক্ষা দিয়ে থাকে। সে বলে, যে সকল লোক তাকে মানে না, তারা সবাই কাফের এবং তাই তাদেরকে হত্যা করে তাদের মালামাল ছিনিয়ে নেয়া উচিৎ। এই লোক কি সত্য বলছে? নাকি সে ভ্রান্ত? যদি কেউ ইজতেহাদ প্রয়োগের পর্যায়ে উন্নীত হয়ে একটা মযহাবের পত্তন করেও, তবুও তার জন্যে কি জায়েয হবে অন্যান্যদেরকে তার মযহাবে দীক্ষা দেয়া? একটা নিন্দিষ্ট মযহাব মান্য করা কি একান্ত অপরিহার্য? নাকি প্রত্যেকে তার পছন্দানুযায়ী মযহাব বেছে নিতে পারবে? যদি কোনো মুসলিম আল্লাহর একজন সালেহ বান্দার অথবা একজন সাহাবীর মাযার যিয়ারত করেন এবং উক্ত ওলীর জন্যে কোনো কিছু মানত করেন এবং যদি তিনি কোনো কবরের কাছে একটা জন্তু জবেহ করেন এবং যদি তিনি কোনো বেসালপ্রাপ্ত জনের মধ্যস্থতায় (ওসীলায়) দোয়া করেন এবং এ রকম কোনো কবর থেকে বরকত আদায়ের উদ্দেশ্যে মাটি নেন কিংবা যদি তিনি বিপদ মুক্তির জন্যে রাসূল-এ-করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা কোনো সাহাবীর সাহায্য প্রার্থনা করেন, তা হলে কি তিনি ইসলাম থেকে বিচ্যুত হবেন? যদি ওই মুসলিম এ কথা বলেন, ‘আমি বেসালপ্রাপ্ত জনের উপাসনা করি না; কারণ আমি তাঁর [একাকিভাবে] কোনো কিছু করার ক্ষমতায় বিশ্বাস করি না। আমি হাজত (প্রয়োজন) পূরণের উদ্দেশ্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করার সময় তাঁকে মধ্যস্থতাকারী ও শাফায়াতকারী হিসেবে স্থাপন করি, যেহেতু তাঁকে একজন

আল্লাহর সালেহ বান্দা হিসেবেই জানি' তা হলেও কি তাঁকে হত্যা করা জায়েয হবে? যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ ভিন্ন অন্য কিছুর নামে কসম করে, তবে কি সে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হবে?

"উত্তর: এটা ভালোভাবে জানা উচিৎ যে, জ্ঞান একজন শিক্ষকের কাছ থেকে শেখতে হবে। যারা বই-পুস্তক থেকে নিজে নিজে জ্ঞান ও ধর্মশিক্ষা করে তারা বহু ভুল করে বসে। তাদের সঠিক সিদ্ধান্তগুলোর চেয়ে ভুল সিদ্ধান্তগুলোর সংখ্যাই বেশি। আজকে এমন কেউ নেই, যে নাকি ইজতেহাদ প্রয়োগ করতে পারে। ইমাম রাফী-ই, ইমাম নববী ও ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী বলেছেন, 'উলামা সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে বর্তমানে ইজতেহাদ প্রয়োগের ক্ষমতাসম্পন্ন আর কেউ নেই।' ইমাম আস্-সুয়ূতী যিনি প্রত্যেকটা জ্ঞানের শাখায় সাগরসম জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং যিনি একজন মহান আলেম ছিলেন, তিনি যখন নিজেকে একজন নিসবী মুজতাহিদ, অর্থাৎ, পূর্বে প্রতিষ্ঠিত কোনো মযহাবের অন্তর্গত মুজতাহিদ দাবি করেন, তখন কোনো আলেম-ই তাঁর সঙ্গে একমত হন নি; অথচ তিনি নিজেকে মুতলাক্ব (সম্পূর্ণ) মুজতাহিদ কিংবা নিজের প্রতিষ্ঠিত কোনো মযহাবেরও দাবি করেন নি তিনি পাঁচ শতাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। তাঁর প্রত্যেকটি বই-ই প্রতীয়মান করে যে তফসীর ও হাদীস এবং দ্বীনী এলমের অন্যান্য শাখায় তিনি অত্যন্ত উচ্চ একটি পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন। ইমাম সুয়ূতীর মতো ওই ধরনের একজন উচ্চপর্যায়ের আলেমকে যখন নিসবী মুজতাহিদ হিসেবেই গ্রহণ করা হয় নি, তখন ওই পর্যায় থেকে বহু দূরে অবস্থানকারী লোকদের অনুরূপ দাবি কি বিশ্বাস করা উচিৎ হবে? তাদের কথা শোনাই উচিৎ নয়। আর যদি তাদের মধ্যে কেউ সীমা লংঘন করে এই কথা বলে যে, ইসলামী উলামার কিতাবগুলো ভুল, তবে তার ঈমান ও যুক্তি সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবো আমরা। কারণ, আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করবো: সে কার কাছ থেকে তার এই এলম পেয়েছে? যেহেতু সে হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কিংবা কোনো সাহাবীকে দেখে নি, সেহেতু সে ইসলামী উলামার বইপত্র পড়েই এলম শিখেছে, যদি সে কিছু শিখে থাকে। যদি সে বলে যে উলামা-এ-ইসলামের বইপত্র বিকৃত অবস্থায় আছে, তাহলে সে কীভাবে সঠিক পথের সন্ধান পেল? এই বিষয়টি আমাদের কাছে তার ব্যাখ্যা করা উচিৎ। চার মযহাবের ইমামগণ এবং তাঁদের পরে আগত উলামা কুরআন-হাদীস থেকেই তাঁদের সব জ্ঞান বের করেছেন। সে কোন্ উৎস থেকে জ্ঞান অর্জন করেছে যা তাঁদের জ্ঞানের সাথে মতভেদ সৃষ্টি করেছে? এটা নিশ্চিত যে এই লোক ইজতেহাদ প্রয়োগের পর্যায়ে পৌঁছায় নি। যখন সে কোনো হাদীসের সম্মুখীন হয় যেটা সে উপলব্ধি করতে

অক্ষম, তখন তার যা করা উচিৎ তা হচ্ছে মুজতাহিদগণ কৃত ওই হাদীসটার ব্যাখ্যা তালাশ করা। ওর মধ্য থেকে তার পছন্দকৃত ব্যাখ্যাটি সে গ্রহণ করতে পারবে। মহান আলেম ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর প্রণীত 'রাওদা' পুস্তকে লিখেছেন যে এ পদ্ধতিটি-ই অনুসরণ করতে হবে। যে সকল উলামা ইজতেহাদের পর্যায় অর্জন করেছেন, শুধু তাঁরাই আয়াত ও হাদীসের অর্থ বুঝতে সক্ষম। অ-মুজতাহিদদের দ্বারা আয়াত ও হাদীসের অর্থ বোঝার চেষ্টা করা অনুমতিপ্রাপ্ত নয়। অতএব, ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব এবং তার দ্বারা ধোকাপ্রাপ্ত ওয়াহহাবীদের জন্যে সঠিক পথে ফিরে আসা এবং তাদের গেমারাহী বর্জন করাটাই উত্তম।

"আর ওয়াহাবীদের দ্বারা মুসলিমদেরকে কাফের আখ্যা প্রদান প্রসঙ্গে একটা হাদীস ইরশাদ ফরমায়: 'যদি কোনো লোক একজন মুসলিমকে কাফের আখ্যায়িত করে, তা হলে দুই জনের একজন কাফের হয়ে যায়। যার প্রতি দোষারোপ করা হয়েছে তিনি মুসলিম হয়ে থাকলে আখ্যাদানকারী কাফের' (হাদীস)। 'তুহফা' গ্রন্থটিকে উদ্ধৃত করে ইমাম রাফী-ই তাঁর কৃত 'আশ-শরহুল কবীর' পুস্তকে লিখেন, 'যে লোক কোনো মুসলিমকে কাফের আখ্যা দেয়, সে যদি তা ব্যাখ্যা (তাবিল) করতে অক্ষম হয়, তবে সে-ই কাফের হয়ে যাবে, যেহেতু সে ইসলামকে কাফের বলবে।' ইমাম নববীও তাঁর প্রণীত 'রাওদা' বইটিতে একই কথা লিখেছেন। অধিকাংশ উলামা বলেছেন যে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হোক বা না-ই হোক, আখ্যাদানকারী কাফের হয় যাবে।

"আর [মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব কর্তৃক] মুসলিমদেরকে হত্যা ও তাদের মালামাল হরণের ব্যাপারে অনুমতি প্রদান সম্পর্কে একটা হাদীস ঘোষণা করে: কাফেররা যতোক্ষণ পর্যন্ত "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" না বলে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমি আদিষ্ট হয়েছি'। হাদীসটা পরিস্ফুট করে যে মুসলিমদের হত্যা করা জায়েয নয়। এই হাদীসটা সুরা তাওবার ষষ্ঠ আয়াতের আলোকে বলা হয়েছিল যা'তে ইরশাদ হয়েছে, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ'যদি তারা তওবা ও সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তবে তাদেরকে তাদের পথে ছেড়ে দাও।[১]' সুরা তওবার ১২ নং আয়াত ঘোষণা করে, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ'তারা তোমাদেরই দ্বীনী ভাই' । [২]একটি হাদীস ইরশাদ

[১]. আল কুর'আন : আত তাওবা, ৯/৪।
[২]. প্রাগুক্ত : ৯/১১।

ফরমায়, 'আমরা বাহ্যিক আবরণ দেখে-ই বিচার করি। আল্লাহ গোপনটা জানেন' (হাদীস)। আরেকটা হাদীস ঘোষণা করেঃ 'মানুষের কলবগুলো বিদীর্ণ করে সেগুলোর গুপ্ত খবর দেখার জন্যে আমি আদিষ্ট হই নি' (হাদীস)। উসামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একজন লোককে হত্যা করে যখন দাবি করেন যে ওই লোক বেঈমান ছিল- যদিও তাকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে শোনা গিয়েছিল তখন হুজূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুমি কি তার হৃদয় বিদীর্ণ করে দেখেছিলে?' (হাদীস)

"কোনো মুজতাহিদের পক্ষে তাঁর মযহাবকে অনুসরণ করার জন্যে মানুষকে বাধ্য করা জায়েয নয়। যদি তিনি বিচারালয়ে একজন কাজী হন, তাহলে তিনি তাঁর ইজতেহাদ অনুযায়ী একটা আইন জারি করে সেটা কার্যকর করার জন্যে আদেশ দিতে পারেন।

"শাফেয়ী উলামাবৃন্দ আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর জন্যে নযর-মানত করার বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 'তুহফা' গ্রন্থটি হতে উদ্ধৃত করে 'হিবা' বইটি লিখেঃ 'যদি কেউ কোনো বেসালপ্রাপ্ত ওলীর জন্যে নযর করে এই নিয়্যতে যে, তার নযরকৃত জিনিসগুলো উক্ত ওলীর জন্যে হবে, তবে তার এই নযর সহীহ হবে না। কিন্তু যদি সে ওই নিয়্যত ছাড়া নযর করে থাকে, তাহলে তার নযর সহীহ হবে এবং তখন নযরকৃত জিনিসপত্র ওই ওলীর মাযারের খাদেমদেরকে, মাযারের সন্নিকটে অবস্থিত মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদেরকে এবং মাযারের আশপাশে বসবাসরত গরিব-মিস্কিনদেরকে দান করতে হবে। নযরকৃত জিনিসগুলো গ্রহণে অভ্যস্ত লোকেরা যদি মাযারের সন্নিকটে সমবেত হয় এবং যদি ওই দেশের প্রথা এই হয় যে নযরকৃত জিনিসগুলো তাদেরকেই দিতে হবে, তবে তাই করতে হবে। যদি ওই ধরনের কোনো প্রথা না থাকে, তাহলে নযরটি অচল হয়ে যাবে। এটা আস্ সামলাওয়ী এবং খায়রুদ্দীন রামলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কাছ থেকেও বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেকেই ভালভাবে জানে, যারা কোনো বেসালপ্রাপ্ত ওলীর জন্যে নযর করে, তাদের কেউই এ কথা চিন্তা করে না যে উক্ত ওলীকেই নযরকৃত জিনিসগুলো দিতে হবে। কারণ প্রত্যেকেই জানে যে, বেসালপ্রাপ্ত বুযূর্গবৃন্দ কোনো জিনিস গ্রহণ অথবা ব্যবহার করেন না এবং নযরকৃত বস্তু গরিবদের কিংবা মাযারের খাদেমদেরকে দান করতে হয়। এ কারণেই এটা একটা এবাদত। বস্তুতঃ শাফেয়ী মযহাবের রীতি অনুযায়ী, মুবাহ, মকরূহ কিংবা হারাম কাজ করার জন্যে নযর করা জায়েয নয়। ফরয কিম্বা ওয়াজিব নয় এমন এবাদত ও সুন্নাতগুলোর ক্ষেত্রেই নযর করা যায়' (আত-তুহ্ফা)।

“কবরে বুসা (চুম্বন) দেয়া এবং মুখ ঘষার ব্যাপারে কিছু উলামা বলেছেন ‘জায়েয’, আবার কেউ বলেছেন ‘না-জায়েয’। যারা ‘না-জায়েয’ বলেছেন, তাঁরা এটাকে মকরূহ বলেছেন। কেউ-ই হারাম বলেন নি।

“হাদীস শরীফের ঘোষণানুযায়ী, আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম ও সালেহীনের ওসীলা করা, অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে কোনো কিছু চাওয়ার সময় তাঁদেরকে মধ্যস্থতাকারী বানানো জায়েয। আমরা আমাদের বইয়ের (ফতওয়াঃ শায়খ মুহাম্মদ বিন সুলাইমান মাদানী) প্রারম্ভে এ বিষয় সংক্রান্ত হাদীসগুলো উদ্ধৃত করেছি। আল্লাহর রহমতপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সওয়াবদায়ক কাজের ওসীলা বা মধ্যস্থতা গ্রহণ জায়েয প্রতীয়মানকারী বহু হাদীস রয়েছে। সওয়াবদায়ক কাজের মধ্যস্থতা যখন জায়েয, তখন সালেহীনের মধ্যস্থতা অবশ্যই জায়েয হবে।

“আল্লাহ ভিন্ন অন্য কিছুর নামে কসম করা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হলো, এটা কুফর হবে যদি ওই বস্তুটি অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় হয় এবং আল্লাহর সঙ্গে শরীক হয়। এ বিষয়টি ব্যক্ত করেছে হাকিম ও ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণিত এবং আল মানাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর গ্রন্থে উদ্ধৃত একটি হাদীস যা ঘোষণা করে, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারও নামে কসম করবে সে কাফের হয়ে যাবে’ (হাদীস)। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামার ওপর নির্ভর করে ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন যে, এটা মকরূহ এবং মুসলিমগণের ইজমা একটা দলিল বটে। সুরা নিসার ১১৪ নং আয়াত ঘোষণা করে,

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.

> ’আমি কাফেরদের সঙ্গে সেই ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো, যে তাওহিদ ও হেদায়তে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে রসূলের সঠিক পথকে প্রত্যাখ্যান করে এবং বিশ্বাসীদের পথ হতে বিচ্যুত হয়।[১]

এ আয়াত থেকে আরও বোঝা যায় যে প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্যে ‘আহল আস্ সুন্নাত ওয়াল জামাত’-এর পথ অনুসরণ করা অপরিহার্য। এটা ভুলে যাওয়া উচিৎ নয় যে ভেড়ার পাল-বহির্ভূত মেষ শাবককে নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেলবে। অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বাইরে থাকবে, সে জাহান্নামে যাবে।” মহান আলেম মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমানের দীর্ঘ ফাত্ওয়া থেকে

---

১. আল কুর‘আন : আন নিসা, ৪/১১৪।

গৃহীত এই বিষয়ের ওপর সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিটি এখানে শেষ হলো। যাঁদেরকে আল্লাহ পাক হেদায়েত দান করেছেন, তাঁদের জন্যে এতোটুকুই যথেষ্ট। শায়খ মুহাম্মদ সুলাইমান ১১৯৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। গোমরাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নজদী ১১১১ হিজরীতে নজদের মরুভূমিতে জন্মগ্রহণ করে এবং ১২০৬ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করে। হযরত শায়খ মুহাম্মদ সুলাইমান এই গোমরাহ ব্যক্তির অজ্ঞতার মুখোশ উন্মোচিত করেন এবং তার ধ্যান-ধারণা ও মুজতাহিদ হওয়ার দাবি খন্ডন করেন। তিনি প্রত্যেকটি মুসলিম রাষ্ট্রে এই বিষয়টি প্রমাণ ও প্রচার করে দেন যে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব কিছুই জানে না এবং সে কোনো আলেম-এ-ইসলামের কাছ থেকে ফয়েয-ও পায় নি এবং মুসলিমদেরকে মুশরিক আখ্যায়িত করে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গিয়েছে।

"হানাফী আলেম আবদুল আযীম মক্কী তাঁর 'আল ক্বাওলুস-সাদিদ' গ্রন্থে ইবনে হাযম মুহাম্মদ আলীর গোমরাহীমূলক মন্তব্যগুলো লিপিবদ্ধ করে সেগুলো খন্ডন করেন। ইবনে হাযম সবাইকে ইজতিহাদ প্রয়োগ করার জন্যে আদেশ দেয় এবং বলে যে অন্যদেরকে অনুসরণ করা হারাম। সে তার কথার সমর্থনে সুরা নিসার ৫৯ আয়াতের খোদায়ী আদেশটি পেশ করে:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ.

> 'যদি তোমরা কোনো বিষয়ে একমত হতে না পারো, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা ডিক্রি করেছেন, তা অনুসরণ করো'।[১]

হযরত আবদুল আযিম তার উত্তরে বলেন: 'আলহামদু লিল্লাহ। আমরা মহান ইসলামী আলেম ইমামুল আযম আবু হানিফাকে অনুসরণ করার বাইরে নই। ওই মহান ইমাম ও তাঁর শিষ্যগণ এবং গত দশ শতক ধরে আগত মহান উলামা, উদাহরণস্বরূপ, শামস আল আয়েম্মা যাঁরা পৃথিবীর মধ্যে নূর বিতরণ করেছেন, তাঁদেরকে অনুসরণ করার সম্মান আমাদেরকে দেয়া হয়েছে'(আবদুল আযিম)।

"ইবনে হাযম একজন আন্দালুসীয় ছিল। সে যাহিরীয়া মযহাবভুক্ত ছিল, যেটা দাউদ ইসফাহানী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং যেটা খুব তাড়াতাড়ি বিস্মৃত হয়েছিল। ইবনুল আহাদ যাহাবী এবং ইবনে হিল্লীগান বলেন, 'এমন কি যারা ইবনে হাযমকে সম্ভাষণ জানাতো, তারাও তাকে ঘৃণা করতো। তারা তার ধ্যান-ধারণা অপছন্দ করতো। তারা সবাই একমত হয়েছিল যে ইবনে হাযম একজন গোমরাহ। তারা

---

[১]. প্রাগুক্ত : আন নিসা, ৪/৫৯।

তার প্রশংসা করতে পারতো না। সুলতানদের তারা তার সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিল। তারা মুসলিমদরেকে তার থেকে দূরে সরে থাকার জন্যে বলেছিল।' ইবনুল আরিফ বলেন, 'ইবনে হাযমের জিহ্বা এবং আল হাজ্জাজের তরবারি একই অত্যাচার সাধন করেছিল।' হাদীসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বহু গোমরাহ ও শয়তানী খেয়াল ছিল ইবনে হাযমের। নিষ্ঠুর আল হাজ্জাজ ১ লক্ষ ২০ হাজার নিরপরাধ মানুষকে কারণ ছাড়াই হত্যা করে। আর ইবনে হাযমের জিহ্বা হাদীসে বর্ণিত ভালো সময়ের পরবর্তী সময়ে আগত শত-সহস্র মুসলিমকে ভ্রান্তির দিকে টেনে নিয়ে যায়। কারণ সে ৪৫৬ হিজরীতে মারা যায়।

"আল্লাহ তা'আলা আমার মুসলিম ভ্রাতাদেরকে ওয়হহাবীদের গোমরাহ পথ থেকে রক্ষা করুন। তিনি চার মযহাবের উলামার সঠিক ইজতেহাদসমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিশ্বাস ও আমল আমাদের প্রতি বর্ষণ করুন। তিনি যেন তাঁদের মযহাবের অনুসারী হিসেবে আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম, সিদ্দিকীন, শহীদান ও সালেহীনবৃন্দের সঙ্গে শেষ বিচারের দিনে আমাদের একত্রিত করেন, আমিন। ('আশাদ্দুল জ্বিহাদ' পুস্তকের উদ্ধৃতি এখানে সমাপ্ত হলো। মওলানা দাউদ ইবনে সুলাইমান বাগদাদী কৃত 'আশাদ্দুল জ্বিহাদ' ১২৯৩ হিজরীতে প্রণীত হয়। বোম্বে নগরীতে প্রথমে মুদ্রিত হয় ১৩০৫ হিজরী সালে)

৩২/ ওসমান যাকি নামের এক ওয়াহাবী ব্যক্তি তুর্কী ভাষায় একটি বই লিখে যার নাম 'মাসাইল-এ-মুহিম্মীয়া জওয়াব-এ-নুমান' [জরুরি সমস্যাগুলোর ব্যাপারে নুমানের উত্তর]। লেখকের পিতা হচ্ছে সিরাণের মুদাররিস (প্রভাষক) ওসমান আফেন্দী ইবনে মুস্তফা। এটা বোঝা যায় যে, এই যুবক হিজাযে গিয়ে ওয়াহহাবীদের ফাঁদে পা দেয় এবং তাদের মিথ্যা ও বানায়োট কথায় ধোকাপ্রাপ্ত হয়ে সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হয়। এই ক্ষতিকর, গোমরাহীতে পরিপূর্ণ বইটি তুর্কী হাজীদের কাছে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। যারা দ্বীনি জ্ঞানে অজ্ঞ, তারা এর ভ্রান্ত ও মিথ্যা কথাগুলোকে সঠিক মনে করে এবং ফলস্বরূপ বিভ্রান্ত হয়ে যায়। ওয়াহহাবীদের দ্বারা যারা ধোকাপ্রাপ্ত হয়, তাদের হজ্ব ও অন্যান্য এবাদত আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় নয়। হজ্ব পালন করার সময় যদি তারা ওয়াহহাবীদের আক্বিদা পোষণ করে, তাহলে তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে।

ওহাবী পুস্তকটিতে লেখা হয়েছে, "কুরআনে করীম এবং রাব্বুল আলামীনের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি সালাত কায়েম করে না, সে কাফের ও মুশরিক। দোয়ায়ে কুনুত পাঠ না করে সালাতুল বিতর এক রাক্আতে পড়া-ই যথেষ্ট। এমন কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

পর্যন্ত শাওয়াল মাসের নতুন চাঁদ সম্পর্কে জানতেন না। অতএব, যারা বলে যে 'অমুকে গায়েব জানেন এবং বিপদে সাহায্য করেন', তাদের উচিৎ আল্লাহকে ভয় করা এবং মানুষের সামনে লজ্জিত হওয়া। কেননা, কুরআন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের বিশ্বাসকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। এই সকল বেয়াদব লোকেরা বলে যে তারা আমাদের রসূল-এ-করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে কথা বলে এবং তাঁর আদেশ অনুযায়ী চলে। তারা যে গাধার থেকে হীন, তা-ই তারা প্রকাশ করে। যদি তাদের এই বিশ্বাসটি সত্য হতো, তাহলে সাহাবাগণের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকতো না, যাঁরা হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে কথা বলে নিজেদের বিপদ-আপদ দূর করতেন। 'ওসীলা' সংক্রান্ত আয়াতটির অর্থ হচ্ছে এই যে যা আদিষ্ট হয়েছে তা আমাদের করা উচিৎ এবং নিষেধসমূহ পরিহার করা উচিৎ এবং নফল পালন করা উচিৎ। এটা 'মৃত'দের কাছ থেকে সাহায্য কিংবা বরকত চাইতে পরামর্শ দেয় না, যেটা মুশরিকী ও গর্ধভসুলভ আচরণ ছাড়া আর কিছু নয়। ইসলামে এ ধরনের কিছুই নেই। ইসলাম এ ধরনের লোকদেরকে 'কাফের' ও 'মুশরিক' আখ্যায়িত করে থাকে।

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে একটা ফরয নামায বাদ দেয়, সে একজন কাফের। তার কাযা নামাজ গ্রহণ করা হবে না।

"অমুক অমুকের কথা কাউকেই শেষ বিচারের দিনে রক্ষা করবে না। যারা কুরআন কিংবা সুন্নাতে বিশ্বাস না করে অমুক অমুকের কথানুযায়ী এবাদত করে, তারা জাহান্নামে যাবে। কবরে তথাকথিত মহান ব্যক্তিদের সম্পর্কে কোনো ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হবে না, বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। আল্লাহ পাক আদেশ দেন, 'তোমরা যা জানো না, তা যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে শেখো।' কিছু লোক দায়িত্ব এড়ানোর জন্যে বলে, 'আয়াত ও হাদীসসমূহের প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য বা গোপন অর্থ রয়েছে। আমরা গোপন অর্থ বুঝতে অক্ষম।' বিশ্বাসীরা যা উপলব্ধি কিংবা পালন করতে অক্ষম তা আল্লাহ আদেশ করেন নি। তাই 'উমর রিদার' বই থেকে এ বিষয় সম্পর্কে জানো এবং তাঁর শক্তিশালী দূরবীনের সাহায্যে বিষয়টি পর্যালোচনা করো।

"সুরাতুল বাক্বারার ২৩৮ নং আয়াতে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন বিপদের সময় আমরা সকলে হেঁটে হেঁটে নামায পড়ি। দোয়া-এ-ক্বুনুত পাঠ করার আদেশ

হাদীসে দেয়া হয় নি। কুনুত ছাড়া সালাতুল বিতর নামায পড়া সহীহ্। যে ব্যক্তি শুধুমাত্র ফরয ও এক রাকাত সালাতুল বিতর নামায পড়ে, তাকে দোষারোপ করা যায় না। যারা সুন্নাত নামাযসমূহ পড়ে তাদের জন্যে সওয়াব রয়েছে; কিন্তু যারা তা পড়ে না, তাদের জন্যে গুণাহ নেই।

"হে আমার ভ্রাতাগণ আয়াত ও হাদীস যা বলে তাই আমি বলছি। নিজের মনগড়া কিছু বলছি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি মিথ্যা ও যাদুর দোষারোপ করা কুকুরের ঘেউ ঘেউ করার মতোই ব্যাপার। আর যারা কুরআন হাদীসের আদেশ বর্ণনাকারীদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকে, তারা বাস্তবতা থেকে পলায়নপর ভীরু কাপুরুষের মতোই।

"মাওলিদ ও দালাইল পাঠ, তরীকা, ইসক্বাত এবং তালকিন হচ্ছে সাম্প্রতিককালের আবিষ্কার। এগুলো কুসংস্কার এবং হারাম। এগুলো যারা প্রবর্তন করেছিল তারা নিজেদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করেছিল। আর যারা এগুলোকে গ্রহণ করেছে, তারা এগুলোর প্রবর্তনকারীদেরকে পূজা করার অবস্থায় আছে। ইসলামে কোনো কিছুই গোপন রাখা হয় নি। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, 'আমার উম্মাত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। যারা আমাকে এবং আমার সাহাবীদেরকে অনুসরণ করবে তারা বেহেশতী হবে, আর বাকি সবাই জাহান্নামে যাবে। সব ত্বরীকতই অচল।

"যে সব জিনিস নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় ছিল না সেগুলো নির্মূল করতে হবে। কাদেরী, শাযিলী, মাওলাউইয়ী, নকশবন্দী, রিফা'ই, তিজানী, খালেদী, উওয়াইসী এবং অন্যান্য তরীকাগুলো একমাত্র সঠিক পথ হতে বিচ্যুতির এবং কুরআনের প্রতি অবাধ্যতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মুসলিম ভিন্ন অন্যান্য নাম বা খেতাব বর্জন করা উচিৎ। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ের মতো সব মুসলিমকে ভাই ভাই হয়ে যেতে হবে। কবর অথবা 'মৃত'জনের রূহের কাছে সাহায্য প্রার্থনা কিংবা বরকত আদায়ের মতো অনৈসলামী কাজ সংঘটন করে মুসলমানদের উচিৎ নয় কাফের ও মুশরিকে পরিণত হওয়া। যিকর, তসবীহ ও তাকবীর ইত্যাদির জন্যে আমাদের ধর্ম তসবীহ কিংবা টাককা (খানকাহ) এবং গুম্বজবিশিষ্ট মাযার নির্মাণ করার আদেশ দেয় না, বরং মাযার ধ্বংস করার জন্যে আদেশ দেয়। আল্লাহ ইরশাদ ফরমান: 'আমার কাছে প্রার্থনা করো, আমি তা কবুল করবো। তিনি বলেন নি, 'আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম অথবা আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কাছে চাও।' অর্থাৎ, তিনি এ কথা বলেন নি 'মৃতজনের ওসীলা করো', কিংবা 'কবর ও 'মৃত'জনের রূহের কাছে সাহায্য চাও।'

আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম আমাদের কোনো ক্ষতি অথবা উপকার করতে সক্ষম হবেন না। কুরআন আমাদেরকে যা করতে নিষেধ করে তা করাটা আল্লাহর প্রতি কুফর সংঘটনেরই নামান্তর। যারা 'মৃত'দের কাছে সাহায্য চায়, তারা কাফের ও মুশরিক। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব সালাওয়াৎ পাঠ করেছেন (আমাদেরকে পাঠ করতে শেখাবার জন্যে) সেগুলো তো ওহী বা ঐশী প্রত্যাদেশ। ওগুলো ছাড়া অন্যান্য সালাওয়াৎ বিদয়াত বৈ কিছু নয়। বিদয়াত কখনো ওহী থেকে উৎকৃষ্ট হতে পারে না। দালাইল (-এ-খাইরাত) পুস্তকের লেখক নিজেকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে একটা নতুন প্রথা প্রবর্তন করে। সে কয়েকটি বিশেষ দিনে বইটি পাঠ করার জন্যে নির্দেশ (প্রেসক্রিপশন) দেয়। আল্লাহর কাছে তওবা করার পরিবর্তে তারা শায়খ (পীর)-দের সামনে তওবা করে। সাহাবা-এ-কেরাম কোনো তৃরীকা, মাওলিদ কিংবা সালাওয়াৎ আবিষ্কার কিংবা প্রবর্তন করেন নি। পরবর্তীরা মানুষদেরকে দেশরক্ষা ও শত্রু দমনের জন্যে সালাত-এ-মুনজিয়া এবং সালাত-এ-নারিয়া ইত্যাদির মতো বিদয়াতসমূহ পালন করতে আদেশ দেয়। ইস্কাতের কথা চিন্তা করে মুসলিমরা কোনো এবাদত পালন করে না। 'মৃত'জন তলক্বিন শুনতে পায় না, আর এ ধরনের কোনো সংজ্ঞা-ও ইসলামে নেই।" (জওয়াব-এ-নুমান)

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে যদি বে-নামাযী ব্যক্তি সালাতকে আদিষ্ট আমল হিসেবে বিশ্বাস না করে এবং যদি সে সেটাকে বে-দরকারি/অপ্রয়োজনীয় মনে করে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি আলস্য বশতঃ নামাজ পড়ে না, সে কাফের হবে না। সে বরং একজন ফাসিক্ব বা পাপিষ্ঠ হবে। হানাফী মযহাবে তিন রাকাত সালাতুল বিতর পড়া ওয়াজিব। 'মারাক্ব-ইউল-ফালাহ্' ও আবু দাউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর 'সুনান' এবং আল মানাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর 'কানয্ আদ দাক্বাইক্ব' ইত্যাদি পুস্তকে লেখা আছে যে আমাদের নবী-এ-মক্ববুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাত সালাতুল বিতর পড়তেন। আর দোয়া কুনুত পাঠ করা ওয়াজিব; ইমাম আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম মুহাম্মদ শায়বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতে এটা সুন্নাত। আবু দাউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর উদ্ধৃতি দিয়ে আল মানাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন: "সালাতুল বিতর পালনকালে হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া-এ-কুনুত পাঠ করতেন।" কুনুত হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ দোয়াটি পাঠ করা সুন্নাত; এটা সর্বসম্মতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়টির সপ্রমাণকারী হাদীসটি আশ-শার্ণব্লালীর কৃত 'মারাক্ব-ইউল-ফালাহ্' গ্রন্থে

লিপিবদ্ধ রয়েছে। যে ব্যক্তি কোনো ওয়াজিব কিংবা সুন্নাতকে অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করে বাদ দেয়, সে কাফেরে পরিণত হয়। যে ব্যক্তি সেগুলোকে দরকারি মনে করে, কিন্তু আলস্যবশতঃ একবার একটা ওয়াজিব কিংবা প্রত্যেক বার একটা সুন্নত পালনে অনীহা প্রদর্শন করে, তাহলে সে পাপিষ্ঠ হবে। এই ওয়াহহাবী হানাফী মুসলিমদেরকে নিজেদের মযহাব ত্যাগপূর্বক ওয়াহহাবীদের মতো লা-মযহাবীতে রূপান্তরিত করতে চায়। যে লোক লা-মযহাবী হয়ে যায়, সে আহল-এ-সুন্নাত থেকে বিচ্যুত হয়। আর যে লোক আহল্ আস্ সুন্নাত থেকে বিচ্যুত হয়, সে বিখ্যাত 'আল বাসাইরু লি মুনকিরিত্ তাওয়াসসুলি বি আহলিল মাকাবীর'(আরবী) বইয়ের ভাষ্যানুযায়ী হয় বিদয়াতী, নয়তো কাফেরে পরিণত হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হাকিকি অর্থে) নিজের ক্ষমতায় গায়েব জানেন না। আল্লাহ্তা'লা-ই তাঁকে ওহীর মাধ্যমে তা জানিয়ে থাকেন; আর আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে তিনি জানান এলহাম ও কারামতের মাধ্যমে। হযরত উমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর পারস্যে মুসলিম বাহিনীকে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখা ও তাদের নেতা সারিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে নির্দেশ প্রদান এবং সারিয়া রা:)-এর সেই নির্দেশ শুনতে পাওয়া এমনি ধরনের একটি ঘটনা। আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (হাকিকি অর্থে) নিজেদের ক্ষমতায় গায়েব জানেন না, বরং আল্লাহ্ই তাঁদেরকে তাঁর যা ইচ্ছা তাই জানিয়ে থাকেন। তিনি আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর রূহ মুবারককে শ্রবণ ও দর্শনক্ষমতা দান করে থাকেন। কুরআন ও হাদীস্ই এই কথা বলে। ২৬৮ পৃষ্ঠায় ওহাবী পুস্তকটি একটি হাদীস উদ্ধৃত করে:

إِنَّ اللهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا

"এই পৃথিবী আমার কাছে ছোট হয়ে গিয়েছে। আমি পূর্ব এবং পশ্চিমকে এমনিভাবে দেখছি যেন তারা আমার হাতের মধ্যে অবস্থিত একটা আয়নার ভেতরে বিরাজমান" (হাদীস)।

হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের মধ্যে ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য বিরোধ সম্পর্কে যাকে ইচ্ছা জানিয়েছিলেন; দুনিয়াবী এবং বেসাল-পরবর্তী উভয় জীবনেই তিনি তা জানিয়েছিলেন। তিনি তাঁদেরকে আল্লাহর বিধিতে সমর্পিত হতে বলেছিলেন এবং তাঁদের অনেককেই শাহাদাৎপ্রাপ্তির শুভসংবাদ দিয়েছিলেন।

তাবরানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রেওয়ায়াতকৃত এবং 'কানয আদ দাক্বাইক্ব' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ একটি হাদীসে ইরশাদ হয়েছেঃ "ষাট হিজরীতে হুসাইন শহীদ হবে" (হাদীস)। একইভাবে তিনি হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আলী (কঃ) এবং আরও বহু সাহাবীর শাহাদাৎপ্রাপ্তি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। সাহাবীদের জন্যে শহীদ হওয়ার কথাটি শুভ-সংবাদ ছিল। তাঁরা শহীদ হবার জন্যে দোয়া করতেন, শহীদ না হবার জন্যে নয়। 'তিনি কেন তাঁর সাহাবা-এ-কেরামকে সাহায্য করলেন না?' এ প্রশ্নটি অজ্ঞতা বৈ কিছু নয়। এটা অনেকটা নিম্নরূপ শোনায় উহুদের জ্বিহাদে আল্লাহ্ কেন তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সাহায্য করলেন না? 'সাহাবাদের মধ্যে যদি তিনি (হুজূর-দঃ) বিরোধ দেখতে সক্ষম হতেন এবং তাঁদের কথা শ্রবণ করতে সক্ষম হতেন তাহলে তিনি তাঁদের দুঃখ মোচন করে দিতেন'- কথাটির অর্থ হলো, আল্লাহ্ উহুদের জ্বিহাদে মুসলিমদের ট্র্যাজেডী ও মহাবিপদ দেখতে সক্ষম হন নি এবং তিনি মুসলিমদের সাহায্য প্রার্থনা ও দোয়া শুনতে পান নি (নাউজুবিল্লাহ্)। ওয়াহাবীদের এ রকম উদ্ভট ও বাজে মন্তব্যে বিশ্বাস করা থেকে আল্লাহ্ আমাদেরকে পানাহ্ দিন, আমীন দ্বীনের মহান ইমামগণ কাযা এবং ক্বদর (ভাগ্য) সম্পর্কে জানতে পারার পর সেটা পরিবর্তন করতে চেষ্টা করেন না, বরং তাতে সম্মতি দেন। একটা হাদীস ঘোষণা করে, 'ইযা তাহাই-ইয়্যারতুম ফীল উমূরে ফাস্তাঈনূ মিন আহলিল্ কুবূর;' অর্থাৎ, 'যখন তোমরা তোমাদের বিষয়সমূহে বিপদগ্রস্ত হও, তখন মাযারস্থ আউলিয়ার সাহায্যপ্রার্থী হবে' (হাদীস)। নিজেদের স্বার্থের পরিপন্থী সমস্ত হাদীস ওয়াহহাবীরা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সূর্যকে কাদা দিয়ে প্লাস্টার করা যায় না, আর সত্যকেও গোপন করা যায় না। তারা তখনি ক্রোধে দিগ-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'এটা শির্ক, ওটা গর্ধভসুলভ আচরণ' ইত্যাদি। আর যখনই তাদেরকে সুস্পষ্ট দলিল প্রদর্শন করা হয়, তখনই তারা তা খন্ডন করতে ব্যর্থ হয়।

ওয়াহাবীটি সুন্নী উলামাবৃন্দকে আক্রমণ করেছে এই কথা বলে যে, 'অমুক অমুকের কথা'। অথচ আহলে সুন্নতের উলামাগণ কুরআন-হাদীস্ থেকে যা উপলব্ধি করেছেন এবং সাহাবা-এ কেরামের কাছ থেকে যা শুনেছেন তাই তাঁদের বইপত্রে লিপিবদ্ধ করেছেন।। তাঁরা নিজেদের অভিমত ও ধ্যান-ধারণার ওপর নির্ভর করেন নি। তাঁরা প্রত্যেকটি বিষয়কে কুরআনের আয়াত, হাদীস্ ও আসার-এ-সাহাবা-এ-কেরাম (সাহাবীগণের বাণী) দ্বারা সপ্রমাণ করেছেন। যারা কুরআন ও সুন্নাত মান্য করতে চায় এবং সাহাবাগণের পদাংক অনুসরণ করতে চায়, তাদেরকে আহলে সুন্নত উলামাবৃন্দের বইপত্র পড়তে হবে। এছাড়া তাদের আর

কোনো গত্যন্তর নেই। হাদীসে প্রশংসিত শ্রেষ্ঠ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ উলামাগণ কুরআন-হাদীসের অর্থ সঠিকভাবে বুঝতে পারেন নি এবং শ্রেষ্ঠ শতাব্দীর দশ শতাব্দী পরে নজদের মরুভূমিতে আগত বর্বর ওহাবীরা তা বুঝতে পেরেছে এ কথাটা একমাত্র যিনদিক কিংবা পাগলেরাই বলতে পারে। [হাদীসটি ওয়াহহাবী পুস্তক 'ফাতহ আল মাজীদ'-এর ৪৯২ পৃষ্ঠায়ও লিপিবদ্ধ আছে] ওয়াহহাবীদের এসব অযৌক্তিক লেখনী প্রমাণ করে যে তারা কুরআন ও হাদীসের অর্থ মোটেও বুঝতে পারে নি। তারা আয়াত ও হাদীসকে যেমন ইচ্ছা তেমনিভাবে তফসীর করে ইসলামের সঙ্গে তামাশা করছে। কিন্তু কবরে ওহাবীবাদ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করা হবে না, বরং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কেই প্রশ্ন করা হবে। আহলে সুন্নাত উলামাবৃন্দ কর্তৃক লিখিত উত্তরগুলো যারা সেখানে প্রদান করতে ব্যর্থ হবে এবং যারা ওয়াহহাবীদের প্রচারিত মিথ্যা দ্বারা ধোকাপ্রাপ্ত হবে, তারা জানান্নামে যাবে। আল্লাহ ঘোষণা করেন, 'তোমরা যা জানো না, তা যারা জানেন, তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও' (আয়াত)। আয়াতটির আদেশ মান্য করে প্রত্যেক মুসলিমেরই উচিৎ আহলে সুন্নাতের কিতাবসমূহ পাঠ করে নিজ ধর্ম সম্পর্কে জানা। যে ব্যক্তি আহলে সুন্নাতের উলামার বইপত্র পড়বে না, সে প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত আয়াতটি অমান্য করবে। সে সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে এবং ওয়াহহাবীদের ধোকায় পড়ে জাহান্নামে যাবে। ইমাম দায়লামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম মানাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণিত একটি হাদীস ঘোষণা করে, "আল্লাহর রহস্যগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে 'বাতিনের' জ্ঞান। এটা তাঁর একটা আদেশ বিশেষ" (হাদীস)। এ হাদীসটিতে আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ইলম আল বাতিন' সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং বলেন যে এটা আল্লাহর আদেশ; অথচ ওয়াহহাবীরা বলে যে আহলে সুন্নাতের উলামাবৃন্দ 'ইলম আল বাতিন' উদ্ভাবন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের জন্যে শরীয়তের আদেশ-নিষেধ জারি করেছেন এবং সেগুলো প্রত্যেকেরই বোধগম্য ও আমলযোগ্য। সেগুলো মান্য করা সবার জন্যে ফরয। কিন্তু সবাই বাতেনী জ্ঞান ও মুতাশাবিহ্ আয়াত বুঝতে সক্ষম নয়। এটা উপলব্ধি করা এবং অন্তর্নিহিত অর্থ পূর্ণ করার দায়িত্ব একমাত্র 'উলামা আর রাসিখিন'-এর জন্যেই সুনির্দিষ্ট। 'উলামা আর রাসিখিন' হচ্ছেন সেই সকল মহান উলামা যাঁরা তাসাউফের পথে অগ্রসর হয়েছেন এবং পূর্ণতা অর্জন করেছেন। ওয়াহহাবীরা 'এলম-এ-বাতেন'কে অস্বীকার করে এ কারণে যে, তারা ওই ধরনের জ্ঞানের শাখা সম্পর্কে কখনো শোনেনি এবং ওই সব উলামায়ে রাসিখীন সম্পর্কেও কিছু জানে নি। আর উমর রেযার বই সম্পর্কে বলা

যায়, একমাত্র ওয়াহহাবীরাই তার গোমরাহ্ লেখনীতে বিশ্বাসী, যেগুলো সে বিভিন্ন ওয়াহহাবী পুস্তক থেকে অনুবাদ করেছে [তুর্কী ভাষায়]।

সুরাতুল বাক্বারায় (২৩৮ নং আয়াত) বিবৃত হয়েছে যে শত্রুর মোকাবিলা করার সময় অথবা ডুবে যাবার কিংবা জ্বলে পুড়বার কিংবা হিংস্র জন্তু কর্তৃক আক্রান্ত হবার ভয় থাকলে একটা সুবিধাজনক দিকে (ক্বিবলা বানিয়ে) নামায পড়া যায়। ফিক্বাহর বইপত্রে লেখা আছে যে মহাবিপদের সমূহ সম্ভাবনার সময় জামাতে নামায পড়া জরুরি নয়। সে সময় একাকী-ও নামায পড়া যায়, হোক সেটা দাঁড়িয়ে কিংবা (জন্তুর ওপর) চড়ে। শুধুমাত্র এই সব বিপদ থেকে পালাবার সময়েই এবং নামাযের সঠিক সময় হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনার সময়েই (জন্তুর পিঠে) চড়ে নামায পড়া যায়। সংশ্লিষ্ট আয়াত, যেটা 'ইমদাদ' নামক পুস্তকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেটার অর্থ হচ্ছে এই যে সালাত একটা সুবিধাজনক দিকে (মুখ করে) পড়তে হবে। তফসীর কিতাবসমূহে এবং 'জওহারা' নামক ফিক্কাহর পুস্তকে স্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে আয়াতে উল্লিখিত 'রিজালান' শব্দটির অর্থ 'দাঁড়ানো', 'হাঁটা' নয়। ওয়াহাবী পুস্তকটি হানাফী মুসলিমদেরকে ধোকা দিয়ে তাঁদেরকে হেঁটে হেঁটে নামায পড়ার কুমন্ত্রণা দিচ্ছে এবং আয়াতটির বিকৃত ব্যাখ্যা করার জন্যে মোটেও ভয় পাচ্ছে না। যে ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয় মনে করে সুন্নাত নামাযগুলো বর্জন করে, সে কাফেরে রূপান্তরিত হবে। যে ব্যক্তি সেগুলোকে দরকারি মনে করে কিন্তু সব সময়ই বর্জন করে, সে ফাসিক্বে পরিণত হবে। যদিও ওহাবীটি লিখেছে যে সে কুরআন-হাদীসের কথাই লিখেছে, তবুও সে প্রকৃতপক্ষে সে সব কথাতে নিজের মনগড়া কথা সন্নিবেশিত করেছে। আহলে সুন্নাতের উলামাবৃন্দ নিজেদের মনগড়া তফসীর করেন নি, বরং রাসূল-এ-করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা-এ-কেরামের তফসীর তালাশ করে বের করে সেই সব সঠিক অর্থ উদ্ধৃত করেছেন তাঁদের বইপত্রে। ওহাবীটি এ কথা অস্বীকার করতে পারে নি; 'ফাতহুল মাজীদ' পুস্তকের ৩৮৮ পৃষ্ঠায় সে লিখেছে: "ইমামুল আযম হযরত আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, إِذَا قُلْتُ قَوْلًا وَكِتَابُ اللهِ يُخَالِفُهُ فَاتْرُكُوْا قَوْلِيْ لِكِتَابِ اللهِ– 'আল্লাহর কিতাব', রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত এবং সাহাবাগণের আসারের সঙ্গে যদি আমার কোনো মন্তব্যের অসঙ্গতি তোমরা দেখতে পাও, তবে আমার মন্তব্য পরিহার করে তাঁদেরটা গ্রহণ করবে' আর ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

إِذَا وَجَدْتُمْ فِيْ كِتَابِيْ خَلَافَ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخُذُوْا سُنَّةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَعُوا مَا قُلْتُ-

–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো কিছু যদি তোমরা আমার কিতাবে খুঁজে পাও, তাহলে আমার ভাষ্য বর্জন করে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নতকে গ্রহণ করবে।

এই উদ্ধৃতিটিও প্রমাণ করে যে আহলে সুন্নাতের উলামাবৃন্দ কী রকম শক্তভাবে কুরআন-হাদীসকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। এই কারণেই যারা কুরআন-হাদীসের সঠিক অর্থ শেখতে চায় তাদের উচিৎ আহলে সুন্নাতের উলামাবৃন্দ কর্তৃক লিখিত 'কালাম' ও 'ফিকাহ'-এর বই-পুস্তক পাঠ করা। যেহেতু আহলে সুন্নাতের উলামায়ে কেরামের বইপত্র কুরআন-হাদীস যা আদেশ করেছে তা-ই ব্যক্ত করেছে, সেহেতু ওয়াহহাবীটির লেখনী অনুযায়ী যারা সেই সব কিতাব থেকে দূরে সরে থাকছে তারা আর কেউ নয় ওয়াহহাবী শয়তানেরা ছাড়া, যারা বাস্তবতা থেকে পলায়ন করছে।

রাসূল-এ-আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাওলিদ পাঠ করে মুসলিমগণ তাঁর জন্ম বৃত্তান্ত, মিরাজ শরীফ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা এবং প্রশংসা ও স্মৃতিচারণ করে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভালোবাসা প্রত্যেক মুসলিমের জন্যে অপরিহার্য। যে ব্যক্তি তাঁকে ভালোবাসে, সে সব সময় তাঁকে স্মরণ করে এবং তাঁর নাম বার বার উচ্চারণ করে প্রশংসা করে থাকে। আদ্-দায়লামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণিত এবং 'কানযুদ দাক্বাইক' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ একটা হাদীস ঘোষণা করে:

"যে ব্যক্তি প্রেমাস্পদকে খুব ভালোবাসে সে তাকে ঘন ঘন স্মরণ করে" (হাদীস)। সকল ওলামা-এ-ইসলাম তাঁদের বইপত্রে লিখেন যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অত্যধিক মহব্বত রাখা অত্যন্ত জরুরি। এমন কি ৩৩৬ পৃষ্ঠার ওহাবী পুস্তকটিও একথা ব্যক্ত করে: "একটা হাদীসে ঘোষিত হয়েছে

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ ، وَوَالِدِهِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

‘কোনো মুসলিমের ঈমানই পূর্ণ হতে পারে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত না সে তার সন্তান, পিতা-মাতা ও অন্যান্যদের থেকে আমাকে বেশি ভালোবাসে।[১] অর্থাৎ,

أَيْ الإِيْمَانُ الوَاجِبُ، وَالْمُرَادُ كَمَالِهِ، حَتَّى يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ أُحِبُّ إِلَىَ العَبْدِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، بَلْ وَلَا يَحْصُلُ هَذَا الكَمَالُ إِلَّا بِأَنْ يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ أُحِبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ–

‘তার বিশ্বাস সম্পূর্ণ নয়’, এ কথাই হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝিয়েছিলেন। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালোবাসে, তার জন্যে তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভালোবাসাটা ওয়াজিব। তাকে আল্লাহর সালেহ বান্দাদেরকেও ভালোবাসতে হয়।”[২]

মাওলিদের রাতে হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে সব সময় দাওয়াত করে খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন এবং এ পৃথিবীতে তাঁর তশরীফ আনার ঘটনাবলী বর্ণনা করতেন। খলীফা থাকাকালীন হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-ও সমস্ত আসহাব-এ-কেরামকে মাওলিদের রাতে সমবেত করে রাসূল-এ-করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুনিয়াতে তশরীফ আনার সময় যে সব অলৌকিক ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে আলোচনা করতেন। খ্রিস্টানরা জন্ম দিবস উদযাপনের প্রথা মুসলমানদের কাছ থেকে শিখেছে। সমগ্র বিশ্বের মুসলিমগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-সম্পর্কিত সমস্ত বইপত্র পাঠ করে সেই মহাসম্মানিত রাত্রিটি উদযাপন করেছেন, যেটাতে হুজূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পৃথিবীতে তশরীফ

---

[১]. বুখারী : আস সহীহ, বাবু হুব্বি রাসূলিল্লাহ দ. , ১/১২ হাদীস নং ১৫।
ক. মুসলিম : আস সহীহ, বাবু উযুবি মুহাব্বতি রাসূলিল্লাহ দ.,১/৬৭ হাদীস নং ৪৪।
খ. নাসায়ী : আস সুনান, আলামাতুল ঈমান, ৮/১৪ হাদীস নং ৫০১৩।
গ. ইব্‌ন মাজাহ : বাবু ফিল ঈমান, ১/২৬ হাদীস নং ৬৭।
ঘ. আহ্‌মদ : আল মুস্‌নাদ, মুস্‌নাদু আনাস বিন মালিক রা., ৩/১৭৭ হাদীস নং ১২৮৩৭।
ঙ. দারেমী : আস সুনান, ৩/১৮০১ হাদীস নং ২৭৮৩।
চ. ইব্‌ন হিব্বান : আস সুনান, ১/৪০৫ হাদীস নং ১৭৯।
ছ. হাকিম : আল মুস্তাদরাক, ২/৫২৮ হাদীস নং ৩৮০৫।
জ. বায়হাক্বী : শু'য়াবুল ঈমান, ২/৫০১ হাদীস নং ১৩১১।
ঝ. বাগাবী : শরহুস সুন্নাহ, ১/৫০ হাদীস নং ২২।
ঞ. আবূ ইয়ালা : আল মুস্‌নাদ, ৬/২৩ হাদীস নং ৩২৫৮।
[২]. ফাতহুল মাজীদ : ১/৩৩৬।

এনেছিলেন। এই রাত্রি উদযাপনের সময় মুসলিমগণ হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাগণের অনুরূপ আনন্দ অনুভব করেছেন। ইসলামী উলামাবৃন্দ এই রাতটিকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। পৃথিবীর সকল প্রাণী-ই এই রাতে আনন্দিত হয়। মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, যে সব জায়গায় মাওলিদ পাঠ করা হয়, সেগুলো বালা-মুসীবত ও ধ্বংস থেকে রক্ষা পাবে। সুর করে কবিতা বা ক্বাসিদা আকারে মওলুদ পাঠ করা অত্যধিক উপকারী।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বহু সাহাবী কবি ছিলেন, যাঁরা শত্রুদের কুৎসার জবাব দিতেন এবং হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা করতেন। হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন হযরত হাসসান বিন সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর কবিতা। হযরত হাসসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্যে তিনি মসজিদে একটা মিম্বর স্থাপন করেন, যেখানে উঠে হযরত হাসসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু শত্রুদের সমালোচনা করতেন এবং হুজূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা করতেন। হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় বলতেন, "হাসসানের কথাগুলো শত্রুদের জন্যে তীরের আঘাতের চেয়েও মারাত্মক" (হাদীস)। অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, "যদি আল্লাহ পাক তাঁর কোনো বান্দাকে লেখা কিংবা বক্তৃতার গুণ মন্‌জুর করেন, তবে তার উচিৎ আমার প্রশংসা করা এবং শত্রুদের সমালোচনা করা" (হাদীস)। মুসলিম দেশসমূহে পঠিত মাওলিদ এক ধরনের এবাদত বৈ আর কিছু নয়, যেটা হাদীসটিতে প্রদত্ত আদেশের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। মাওলিদ পাঠে ওয়াহহাবীদের বিরোধিতা এ কথা-ই পরিস্ফুট করে যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা-এ-কেরাম যা করেছিলেন তা তারা অপছন্দ করে এবং হাদীসের আদেশ তারা মানতে নারাজ। 'দালাইলুল খায়রাত' হচ্ছে একটা সালাওয়াৎ ও দোয়া-সম্বলিত বই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সালাওয়াৎ পাঠ করতে কুরআন আমাদেরকে আদেশ করেছে। ওহাবীরা কুরআনের এই আদেশটির বিরোধিতা করে চলেছে। মুসলমানগণ যে কোনো ভাষায় দু'আ করতে পারেন; তাঁদেরকে এ কারণে কাফের আখ্যা দেয়া যায় না। আয়াত ও হাদীসগুলোতে বিবৃত দু'আ গুলো পরিবর্তন না করেই পাঠ করতে হবে। পরিবর্তন করাটা মারাত্মক গুনাহ। যে সব দোয়া আয়াত ও হাদীস থেকে গৃহীত হয় নি, সেগুলো সালাৎ (নামায) ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে পাঠ করা যাবে। শরীয়ত এটা নিষেধ করে না। সেগুলো পড়া যাবে না বলে ওয়াহাবীরা ডাহা মিথ্যা কথা বলেছে। আল্লাহ্ কিংবা তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জিনিস নিষেধ করেন নি, তাকে হারাম এবং বিশেষ করে শির্ক ও কুফর বলাটা-ই কুফর।

যে ব্যক্তি তা বলে, সে কাফের ও মুরতাদ হয়ে যাবে আল্লাহর আসনে না বসিয়ে হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অতিমাত্রায় প্রশংসা করা এবং তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে তা'যিম (সম্মান) করা এবং তাঁর প্রতি বর্ষিত আল্লাহর নেয়ামতসমূহ বর্ণনা করে তাঁর কাছে শাফায়াত চাওয়া একটা মহামূল্যবান এবাদত। এর প্রতি ওহাবীদের বিরুদ্ধাচরণ তাদের চরম অজ্ঞতা ও বিশ্রী একগুঁয়েমি-ই প্রকাশ করে বিশেষ করে ওই ওয়াহহাবী বলে, "এই বইটির (দালাইলুল খায়রাত) লেখক এটিকে ৭ ভাগে বিভক্ত করে বলেছে, 'দৈনিক একভাগ পাঠ করলে এক সপ্তাহের মধ্যে বইটি সমাপ্ত হবে।' এই মন্তব্যটি শির্ক। এটা অনেকটা আল্লাহর গদিতে বসে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার আদেশ দেয়ার মতো-ই ব্যাপার। এ আচরণে প্রতিভাত হয় যে, সে [দালাইলুল খাইরাতের লেখক] বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা থেকে নিজেকে বড় মনে করে।" ওই ওহাবীর এই উক্তিটি মারাত্মক আহাম্মকী ৩৩৫ পৃষ্ঠায় ওয়াহহাবী পুস্তকটি লিখে যে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক আল্লাহকে ভালোবাসার দশটি কারণ রয়েছে এবং পুস্তকটি সবগুলো কারণই একে একে ব্যাখ্যা করে। 'দালাইলুল খাইরাত'-এর লেখকের প্রতি শির্কের দোষারোপ অনেকটা ওহাবীদের প্রতি শেরকের দোষারোপের মতোই, যেহেতু তারা ঈমানের ছয়টি নীতিকে বর্ধিত করে দশটিতে উন্নীত করেছে।

ওয়াহাবীরা 'দালাইলুল খাইরাত' পুস্তকটিকে মারাত্মকভাবে আক্রমণ করে থাকে। বইটির লেখক হচ্ছেন আহলে সুন্নাতের মহান আলেম এবং নিখুঁত ওলী হযরত মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান জাযুলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি বইটির প্রারম্ভে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সালাওয়াৎ পাঠের গুরুত্ব ও উপকারিতা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং এরপর হাদীসসমূহ থেকে গৃহীত ও সাহাবা-এ-কেরাম কর্তৃক পঠিত সালাওয়াৎ যেগুলো তিনি নিজেই সংগ্রহ করেছিলেন, সেগুলো লিপিবদ্ধ করেন।

তরীকত অর্থ পথ। এর মানে তাসাউফের পথ। ইমাম-এ-রাব্বানী আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং মাসুম ফারুকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন যে তরীকৃতসমূহ বিদয়াত নয়, বরং সেগুলো হযরত রাসূল-এ-করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। ওয়াহহাবীরা তরীকতগুলোকে আক্রমণ করে, কারণ তারা তরীকত কিংবা তাসাউফ সম্পর্কে কিছুই জানে না; না জেনে-শুনেই তারা মুসলিমদেরকে দোষারোপ করে থাকে। ইমাম মা'সুম ফারুকী সিরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর কৃত 'মাকতুবাত' কিতাবের ১ম খন্ডের ১৭৭ নং চিঠিতে তরীকত সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেন:

"কাশফ ও রু'এয়া-এর ওপর নির্ভর করবে না। একমাত্র যে সব জিনিসে আস্থা স্থাপন করতে হবে এবং যেগুলো মানুষকে দোযখ থেকে রক্ষা করবে, সেগুলো হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাত। আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতকে তোমার সর্বশক্তি নিয়োগ করে আঁকড়ে ধরো এ দুটোর সঙ্গে তোমার সব কাজকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো যিকর শরীয়তের একটা আদেশ। ঘন ঘন যিকির পালন করো তোমার প্রত্যেকটা মুহূর্তকে যিকিরে ব্যস্ত রাখো

"সুরাতুল আনফালের ৪৫ নং আয়াত ঘোষণা করে: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 'হে বিশ্বাসীরা ঘন ঘন অন্তর ও জিহ্বা দ্বারা আল্লাহর যিকির করো তোমরা সাফল্য অর্জন করবে।[১]' সুরা-এ জু'মার ১০ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ' হে বিশ্বাসীরা আল্লাহকে বেশি পরিমাণে স্মরণ করো এতে তোমরা দু'জাহানে কামিয়াব হবে।[২] সুরাতুল আহযাবের ৪১ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (41) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا 'হে ঈমানদাররা তোমরা আল্লাহকে সব সময় গভীরভাবে স্মরণ (যিকির) করো।[৩] 'তাফসীর-এ-তিব্ইয়ান' কিতাবটিতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর কথা উদ্ধৃত হয়েছে, যিনি বলেন: 'আল্লাহ তাঁর প্রতিটি আদেশেরই একটি সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যা অতিক্রম করলে ক্ষমার চোখে দেখেন। যাদের ওজর আছে, তাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দেন। কিন্তু যিকির পালনের আদেশটি অন্যান্য আদেশগুলোর মতো নয়। আর এ এবাদতের জন্যে কোনো সীমা কিংবা ওজর নেই। যিকিরকে অবহেলা করার কোনো ওজর নেই। তিনি আমাদেরকে অন্তর ও জিহ্বা দ্বারা দাঁড়িয়ে, বসে, অথবা শুয়ে, যে কোনো জায়গায়, যে কোনো অবস্থায় যিকির পালন করতে আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন তাঁকে কখনো ভুলতে না।' সুরা বাক্বারার ১৫২ আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেন: 'فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ' আমাকে স্মরণ করো আমিও তোমাদেকে স্মরণ করবো।[৪] 'তফসীর-এ-তিব্ইয়ানে' উদ্ধৃত একটা হাদিস-এ-কুদসী ঘোষণা করে: 'আমি আমার সেই বান্দার সঙ্গে আছি, যিনি আমার সম্পর্কে চিন্তা করেন' (হাদীস)। আল্ বায়হাকী বর্ণিত হাদীসগুলোতে

[১]. আল কুর'আন :আল আনফাল, ৮/৪৫।
[২]. আল কুর'আন : আল জু'ময়া, ৬২/১০।
[৩]. আল কুর'আন : আল আহযাব, ৩৩/৪১।
[৪]. আল কুর'আন : আল বাক্বারা, ২/১৫২।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান: 'তারাই সর্বোচ্চ পর্যায়ে আছে, যারা আল্লাহর যিকির পালন করে'; 'আল্লাহর যিকিরের প্রতি ভালোবাসাই তাঁর প্রতি ভালোবাসার লক্ষণ'; 'অন্তরের অসুখের ওষুধ হচ্ছে আল্লাহর যিকির"; 'যিকির সাদকা ও রোজা হতেও উত্তম' এবং 'আল্লাহ তাঁর অধিক স্মরণকারীকে ভালোবাসেন।' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময়ই যিকর পালন করতেন। আল্লাহকে অধিক স্মরণ করার পথই হচ্ছে তাসাউফ। তাসাউফকে কীভাবে দোষারোপ করা যায়?

"আল্লাহ-ওয়ালাগণ সবাই একমত হয়েছেন যে এ পথের (নকশবন্দীয়া তরীকায়) সর্বোচ্চ পর্যায় হচ্ছে আল্লাহকে জানার গুণটি। এ মা'রেফতের মানে আল্লাহর মাঝে বিলীন হওয়া। অর্থাৎ, আল্লাহকে জানার অর্থ হচ্ছে এ কথা উপলব্ধি করা যে, একমাত্র তিনি-ই অস্তিত্বসম্পন্ন এবং অন্যান্য সব কিছু অস্তিত্বহীন। তরীকত অথবা তাসাউফ এ ধরনের উপলব্ধির দিকে নিয়ে যায়। দুটো পংক্তি

তোমার সত্তাকে অস্তিত্বহীন জানো, এটাই হচ্ছে পূর্ণতা,তাঁর (মওলার) মাঝে বিলীন হও, মিলনের পথটিই তা।

"এই লয়প্রাপ্ত হওয়াকে 'ফানা' বলে। ফানা দুই প্রকার । ওগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে 'ফানা আল ক্বলব', যেটাতে ক্বলব আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই ভুলে যায়। ক্বলব আর তখন চেষ্টা করেও আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুকে স্মরণ করতে পারে না। সেটা তখন আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে জানেও না, ভালোবাসেও না। দ্বিতীয় ধরনের ফানা হচ্ছে 'ফানা আন্ নফস'। নফসের ফানা হচ্ছে সেটার লয়প্রাপ্ত হওয়া; তখন কোনো ব্যক্তি নিজেকে 'আমি' বলতে অপারগ হয়। আ'রিফের (খোদা সম্পর্কে জ্ঞানীর) সত্তা ও তাঁর লক্ষণসমূহ অদৃশ্য হয়ে যায়। তিনি তখন আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোনো কিছুকে চেনেনও না, কিংবা মহব্বতও করেন না। তাঁর সঙ্গে তাঁর সত্তার অথবা অন্য কোনো সত্তার সম্পর্ক থাকে না। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর মহব্বতই হচ্ছে মানুষকে ধ্বংসের পথের দিকে প্রেরণকারী বিষ। ওই ধরনের একজন আরিফের কলব্ একটা উজ্জ্বল আয়নাসদৃশ। তিনি তাঁর প্রত্যেকটি কাজে শরীয়তকে মান্য করেন। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালন করা তাঁর জন্যে সহজ ও সুখকর হয়। 'উজব' (নিজের এবাদতের অহমিকা) কিংবা 'রিয়া' (প্রদর্শনোদ্দেশ্যে নিফাকসহ কৃত কার্য)-এর মতো কোনো দোষ আর তখন তাঁর মধ্যে বর্তমান থাকে না। তাঁর সব এবাদত ও কাজই খালেস অর্থাৎ, আল্লাহর ওয়াস্তে হয়। তাঁর নফস যদিও আল্লাহর শরীয়তের প্রতি অবাধ্য ও শত্রুভাবাপন্ন

ছিল, তবুও সেটা 'ইতমিনান'(প্রশান্তি) অর্জন করে এবং প্রকৃত ও পূর্ণ মুসলমানে পরিণত হয়।

"কোনো তরীকতে যোগ দেয়া অথবা তাসাউফ-এর পথে অগ্রসর হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো ব্যক্তির নিজেকে অস্তিত্বহীন জানা এবং আল্লাহর একজন সম্পূর্ণ ও একান্ত বান্দাতে পরিণত হওয়া। এ পথে অগ্রসর হওয়াকে বলে 'সায়ের' ও 'সুলুক।' এ পথের শেষপ্রান্তে রয়েছে 'ফানা' ও 'বাকা', অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া সব কিছুকে ভুলে যাওয়া এবং শুধুমাত্র আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেয়া। যিনি 'ফানা' ও 'বাকা' অর্জন করেন, তাঁকে আ'রিফ বলা হয়। আ'রিফ হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি একজন মানুষের সাধ্য অনুসারে পূর্ণতাপ্রাপ্ত বান্দায় রূপান্তরিত হতে সক্ষম। নফস-উদ্ভূত শৈথিল্য এ অবস্থায় অদৃশ্য হয়ে যায়। তরীকতে যোগ দেয়ার উদ্দেশ্য আল্লাহর বান্দা হওয়াকে এড়ানো কিংবা অন্যদের থেকে নিজেকে শ্রেয় বানানো অথবা রূহ, ফেরেশতা, জ্বিন ও নূরসমূহ দেখা নয়। সুন্দর, মনোরম বস্তুসমূহ যা সবাই দেখতে পায় (এ পৃথিবীতে) সেগুলো থাকতে ওই সব বস্তুর তালাশ করার যথার্থতা কোথায়? ওই সব বস্তু এবং এগুলোর সবই আল্লাহতা'আলা সৃষ্টি করেছেন। ওগুলোর সবই অস্তিত্ববিহীন ছিল, পরে সৃজিত হয়েছে। আল্লাহর সাক্ষাৎ পাওয়া এবং তাঁর 'জামাল' (চেহারা) দর্শন করা একমাত্র পরবর্তী জগত, অর্থাৎ, বেহেশতেই সম্ভবপর হবে; এটা এ জগতে ঘটতে পারে না। এ বিষয়টি আহলে সুন্নাতের উলামা ও মুতাসাউয়ীফগণ সর্বসম্মতভাবে ব্যক্ত করেছেন। পৃথিবীতে শুধুমাত্র 'ইকান'-ই অর্জন করা সম্ভব।

"তরীকত, অর্থাৎ, তাসাউফের পথে অগ্রসর হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ পৃথিবীতে শরীয়ত অর্জন করা। শরীয়ত তিনটি অংশের সমষ্টি। সেগুলো হলো, এলম, আমল ও এখলাস। তাসাউফের সাহায্যেই কোনো ব্যক্তি তৃতীয় অংশটি অর্জন করতে পারে। একমাত্র আখেরাতেই আল্লাহর সাক্ষাৎ, সান্নিধ্য ও দর্শন পাওয়া যাবে। অতএব, তোমার উচিৎ সর্বশক্তি নিয়োগ করে শরীয়তকে আঁকড়ে ধরা। 'আল আমরু বিল মা'রুফ ওয়ান্ নাহি আনিল মুনকার' (সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ) পালন করার অভ্যাস করো। বিস্মৃত সুন্নাতগুলো পুনঃপ্রবর্তন করতে সচেষ্ট হও স্বপ্নগুলোর ওপর নির্ভর করবে না নিজেকে দেশের শাসক কিংবা কুতুব হিসেবে স্বপ্ন দেখা কি যথার্থ? এ দুটো পথ মূল্যবান, যদি এগুলো জাগ্রত অবস্থায় অর্জন করা যায়। জাগ্রত অবস্থায় একজন শাসক হওয়া এবং নিজের খেদমতে সমগ্র পৃথিবীর সৃষ্টিকে পাওয়াটা কি প্রকৃতই একটা মাহাত্ম্য/গুণ? সেটা কি কোনো ব্যক্তিকে কবর আযাব ও পুনরুত্থানের পরে আযাব থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করবে? একজন জ্ঞানী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কখনো ওই ধরনের মূল্যহীন জিনিসে

'কলব'-কে নিবদ্ধ করেন না, বরং আল্লাহর পছন্দকৃত এবং অনুমোদিত সকল জিনিস পালনে তৎপর হন। তিনি 'ফানা'-এর পর্যায় অর্জন করার চেষ্টা করেন।" [১]

'মকতুবাত' গ্রন্থের প্রথম খন্ডের ৩০৬ নং চিঠিতে ইমাম-এ-রব্বানী আহমদ ফারুকী আস্-সিরহিন্দী (মুজাদ্দেদে আলফে সানী- রহ:) বলেন: "ফানার অর্থ 'মা-সিওয়া' [আল্লাহ ভিন্ন সব কিছু, যেমন পৃথিবী, সৃষ্টিসমূহ]-কে ভুলে যাওয়া। আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য বস্তুর ভালোবাসা অন্তর থেকে দূর করার জন্যে ফানা অর্জন করা দরকার। যখন সৃষ্টিসমূহ বিস্মৃত হয়, তখন সেগুলোর প্রতি ক্বলবের সম্পৃক্ততাও নির্মূল হয়ে যায়। বেলায়াতের পথে সৃষ্টির প্রতি মহব্বত দূর করার জন্যে ফানা আবশ্যক। কিন্তু নবুয়্যতের পথে তা অপ্রয়োজনীয়। কারণ নবুয়্যতের পথটিতে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা নিহিত রয়েছে। যখন এ ভালোবাসা বিরাজ করে, তখন সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা বিরাজ করতে পারে না। সৃষ্টিকে ভালোবাসা খারাপ। কিন্তু সৃষ্টিকে জানা খারাপ নয়।"

মা'সুম ফারুকী তাঁর 'মকতুবাত' কিতাবের প্রথম খন্ডের ৯৩ নং চিঠিতে বলেন: "ফানা বাতিনে [অর্থাৎ, ক্বলবে] সংঘটিত হয়। ফানা অর্জনের পরও আ'রিফ আগের মতোই তাঁর স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও বন্ধুদেরকে চেনেন। ক্বলবের জানাটা যাহিরের (মস্তিষ্কের) জানা থেকে পৃথক। যখন ক্বলব দেখা ও জানা থেকে মুক্ত হয়ে যায় [অর্থাৎ, ফানা অর্জন করে], তখন যাহির আগের মতোই দেখে এবং জানে।"

সব তরীকতেই হুজূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ফয়েয (আধ্যাত্মিক দান, প্রেরণা) গ্রহণ করা হয়। সকল সাহাবী-ই এই উৎস থেকে মা'রেফতের নূর গ্রহণ করেছিলেন। উত্তরসূরীগণ আসহাব-এ-কেরাম থেকে মা'রেফত অর্জন করেন। বর্তমানকাল পর্যন্ত টিকে গিয়েছে যে ফয়েয, সেটা হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আলী (ক:) থেকে এসেছে। অন্যান্য সাহাবীদের ফয়েয কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত টিকে ছিল। যে ব্যক্তি ফয়েয অর্জন করতে চায়, তার কোনো পুণ্যবান মুরশিদ আল কামেলের সোহবতে যাওয়া উচিৎ এবং তাঁকে ভালোবেসে তাঁরই তত্ত্বাবধানে তাসাউফের পথে অগ্রসর হওয়া উচিৎ। এমন কি ওয়াহ্হাবী পুস্তকটিও ৩৩৫ পৃষ্ঠায় এ প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয় এবং লিখে যে مُشَاهِدَةُ بَرّه وَإِحْسَانه وَنعَمه الظَاهِرة والبَاطِنة –আল্লাহকে ভালোবাসার দশটি কারণের মধ্যে নবমটি হচ্ছে আল্লাহর নিষ্ঠাবান আশেক্বদের সোহবতে

[১]মা'সুম ফারুকী সিরহিন্দী কৃত 'মকতুবাত', প্রথম খন্ড, ১৭৭ নং চিঠি।

(সান্নিধ্যে) থেকে তাঁদের বরকতময় বক্তব্য/বাণী শ্রবণ করা এবং তাঁদের উপস্থিতিতে কম কথা বলা। আল্লাহর এই ধরনের সালেহ্ বান্দাকে বলা হয় মুরশিদ আল কামেল। ইমাম তাবরানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণিত ও 'কানয্ আদ্ দাক্বাইক' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ একটি হাদীস ঘোষণা করে: "প্রত্যেক জিনিসেরই একটা উৎস আছে। তাক্ওয়ার উৎস হচ্ছে আ'রিফগণের ক্বলবসমূহ" (হাদীস)। ইমাম দায়লামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রওয়ায়াতকৃত হাদীসগুলো ইরশাদ ফরমায়: "সালেহীন (আউলিয়া-বুযূর্গানে দ্বীন)-কে স্মরণ করলে পাপ দূরিভত হয়"; "আ'লিমগণের সান্নিধ্যে থাকা এবাদত বিশেষ"; "কোনো আলেমের মুখের দিকে তাকানো এবাদত"। আবু হিব্বান বর্ণিত অপর এক হাদীস ঘোষণা করে: "যিকর সাদাকা হতেও বরকতময়" (হাদীস)। আদ্ দায়লামী রওয়ায়াতকৃত আরেকটি হাদীসে ঘোষিত হয়েছে: "নফল রোজা হতেও যিকর উত্তম" (হাদীস)। 'কানয্ আদ্ দাক্বাইক্ব' গ্রন্থটি লিখে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রত্যেকটি কদমেই যিকর করতেন; বইটি এরপর একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দেয়: "আল্লাহর যিকরকারীর ক্বলবে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে না" (হাদীস)। আদ-দায়লামী ও আল মানাবী বর্ণিত একটা হাদীস ঘোষণা করে: "প্রত্যেক রোগেরই ওষুধ আছে। ক্বলবের ওষুধ হচ্ছে আল্লাহর যিকর" (হাদীস)। তরীকতের অর্থ হচ্ছে যিকর পালন, আরেফীনকে স্মরণ করা ও ভালোবাসা এবং শরীয়তকে আঁকড়ে ধরা। এ সকল হাদীস ও অনুরূপ হাদীসসমূহ এবং যিকর সংক্রান্ত আয়াতগুলো তাসাউফের আদেশ দেয়।

বিভিন্ন নামের তরীকার অস্তিত্ব দেখে যেন ওয়াহহাবীরা বিচলিত না হয়। তাসাউফের প্রত্যেক মুর্শিদের অনুসারীরা তাঁদের মুর্শিদের নাম ঘন ঘন ব্যবহার করে থাকেন, যাঁর থেকে তাঁরা ফয়েয অর্জন করেন; ফলে ওই সব নামেই তরীকার নাম হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, একটা দেশের স্কুলে একই বিষয় পড়াবার ব্যবস্থা থাকলেও প্রত্যেকটা স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ ভিন্ন ভিন্ন। তাই শেখাবার পদ্ধতিও ভিন্ন। প্রত্যেক হাইস্কুল পাশ ছাত্র অনুরূপ জ্ঞান ও অনুরূপ অধিকার অর্জন করেন। তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের শিক্ষকদেরকে অহরহ স্মরণ করেন এবং প্রশংসা করেন। ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষক দ্বারা ভিন্ন পদ্ধতিতে অনুরূপ বিষয় শেখাটা তাঁদের কারও জন্যেই দূষণীয় নয়। তরীকতের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র কলব্ হতে তাঁদের কাছে ফয়েয ও মা'রেফাত এসেছে। ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষক ও ভিন্ন ভিন্ন নাম তাঁদের জন্যে দূষণীয় হতে পারে না।

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক অথবা তাঁর সালেহ্ বান্দাগণ কোনো শরীয়ত অমান্যকারী, দুনিয়াবী স্বার্থান্বেষী ও নফসানিয়াতের পূজারী বদকার লোককে পছন্দ করেন না।

যখন এই ধরনের একজন লোক নিজেকে তরীকতের অনুসারী ও কারামতসম্পন্ন বলে দাবি করে, তখন তাকে বিশ্বাস করা উচিৎ নয় এবং তরীকতগুলোকে এই ধরনের লোকের কারণে দোষারোপ করা উচিৎ নয়। আমাদের ভুলে যাওয়া উচিৎ নয় নিম্নের প্রবাদঃ 'হীরে মাটিতে পড়ে গেলেও তার মূল্য হারায় না।'

'ইসকাত' ও 'তালকিন' বিদয়াত নয়। এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে মাওলানা হামদ-আল্লাহ্ দাজউয়ী আস-সাহারানপুরীর প্রণীত 'আল-বাসাইরু লি মুনকিরিত্ তাওয়াসসুলি বি আহলিল মাক্বাবির' বইটি পড়ুন। আল্ বুখারী, মুসলিম শরীফ ও ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক 'মুসনাদ' গ্রন্থে উদ্ধৃত একটা হাদীস ইরশাদ করেঃ "ইন্তেকালপ্রাপ্তদের কাছে কলেমায়ে তাওহিদ তলকিন [বারংবার শিক্ষা] দাও" (হাদীস)।

আহল আস্ সুন্নাতের উলামাবৃন্দ সাহাবা-এ-কেরামের কাছ থেকে ইসলাম সংক্রান্ত শিক্ষাসমূহ গ্রহণ করে নিয়ে তাঁদের বইপত্রে লিখেছেন। আর আমরা তাঁদের বইপত্র থেকে ইসলামী জ্ঞান ও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। ওয়াহাবীরা এসব শিক্ষাকে কলুষিত করতে চায় এবং ইসলামকে পরিবর্তন করতে চায়। তারা মুসলিমদেরকে ধোকা দেবার জন্যে কুরআনের আয়াত ও হাদীসগুলোর বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে 'মুসলমান' নামধারী লোকেরা তিয়াত্তরটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হবে। এদের বাহাত্তরটি দল দোযখে এবং একটি দল যাঁরা সাহাবা-এ-কেরামের পদাংক অনুসরণ করবেন, তাঁরা বেহেশতে যাবেন। নাজাতপ্রাপ্ত এই সম্প্রদায়ের মুসলিমদের নাম আহলে সুন্নাত; কারণ আহলে সুন্নাতের উলামাবৃন্দ প্রত্যেকটি বিষয়েই সাহাবা-এ-কেরামের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করেছেন এবং তাঁদের প্রত্যেকটি কাজেই কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরেছেন শক্তভাবে। আহল আস সুন্নাত ওয়াল জামাত অর্থ সেই সকল মুসলিম যাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর জামাত [সাহাবা-এ-কেরাম]-এর পথের ওপর আছেন। ওয়াহহাবীরা যদি ভ্রান্ত বাহাত্তরটি দলকে সমালোচনা করতো, তাহলে সঠিক কাজটি করতো। কিন্তু তা না করে তারা ইসলাম ও সুন্নী জামাতকে আক্রমণ করেছে। যেহেতু একটা আয়াত ঘোষণা করেঃ "বাজে, বদকার লোকেরা একে অপরের সাথে সহযোগিতা করে" এবং যেহেতু তারা নিজেরাই গোমরাহ, সেহেতু ওহাবীরা অন্যান্য গোমরাহদের সঙ্গে একতাবদ্ধ হয়ে আহলে সুন্নাতকে আক্রমণ করে থাকে। সকল মুসলিমের উচিৎ ভ্রাতৃসুলভ মনোভাব নিয়ে একতাবদ্ধ হওয়া। কিন্তু তাঁদেরকে আহলে সুন্নাতের সঠিক পথের ওপর একতাবদ্ধ হতে হবে। আমাদের আকা ও মওলা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে গোমরাহ লোকেরা একতাবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে বাহাত্তরটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হবে। মুসলিমদের উচিৎ নয় ওয়াহহাবী হয়ে যাওয়া এবং ওয়াহহাবীদের উচিৎ সঠিক পথে, অর্থাৎ, আহলে সুন্নাতের পথে প্রত্যাবর্তন করা। ফলে তারা নাজাত পাবে। আমাদের হুজুর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যখন তোমাদের বিষয়গুলোতে বিপদগ্রস্ত হও, তখন মাযারস্থ (আউলিয়া)-দের সাহায্যপ্রার্থী হবে' (হাদীস)। সব সাহাবায়ে কেরাম-ই এই হাদীসের আদেশ পালন করে রওযা-এ-আকদস যিয়ারত করেছিলেন। তাঁরা নিজেদের হাজত (প্রয়োজন) পূরণের উদ্দেশ্যে হুজূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইসতিগাসা (সাহায্য প্রার্থনা) করেছিলেন। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও ওসীলাকে আঁকড়ে ধরতেন এবং প্রিয় বান্দাদের তাওয়াসসুল করতেন। 'কানয আদ্ দাকাইক' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ইবনে আবি শায়বা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর রওয়ায়াত অনুযায়ী, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গরিব সাহাবীদের ওয়াস্তে আল্লাহর সাহায্য কামনা করতেন তখনি, যখন তিনি বিপদ-আপদগ্রস্ত হতেন। এটা ইমাম-এ-রাব্বানী আহমদ আল ফারুকী আস্ সিরহিন্দী (মোজাদ্দেদে আলফে সানী)-এর 'মকতুবাত' কিতাবেও উদ্ধৃত হয়েছে। ইসলামী উলামা, আউলিয়া ও সুলাহা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই হাদীসটির অনুসরণ করেছেন। ওয়াহহাবীরা এ হাদীসটি এবং অনুরূপ হাদীসগুলোর বিরোধিতা করে, আর দাবি করে যে ইসলামে এ ধরনের কিছুই নেই। তারা মিথ্যা ও কুৎসা রটনা করতে এবং মুসলিমদেরকে 'কাফের-মুশরিক' আখ্যা দিয়ে ইসলামকে কলুষিত করতে অপতৎপর, অথচ তারাই কাফেরে পরিণত হয়েছে।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে যিকর পালন ও তসবিহ্ পাঠ এবং 'আল্লাহু আকবর' বলতে আদেশ দিয়েছেন, আর নবী-এ-আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পালন করে আমাদেরকেও পালন করতে আদেশ দিয়েছেন। একজন বৃদ্ধা মহিলাকে একটা সুতোয় বাঁধা খেজুরের বিচির তসবিহ পাঠ করা হতে তিনি বারণ করেন নি। কিন্তু ওয়াহহাবীরা দাবি করে যে ইসলামে এ ধরনের কিছুই নেই। কী রকম গোস্তাখ্ ও আহাম্মক তারা তাদের জানা উচিৎ যে সূর্যকে কাদা দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না আল্লাহর নূরও তাদের বিষাক্ত নিশ্বাসে নিভে যাবে না। শরীয়ত মাযার-রওযা ধ্বংস করার নির্দেশ দিয়েছে বলে তারা মিথ্যা রটাচ্ছে। সাহাবা-এ-কেরাম কি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা শরীফ ধ্বংস করে দিয়েছিলেন? না, তাঁরা তা করেন নি, বরং তাঁরা তা নির্মাণ করেছিলেন। আর তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা

শরীফ যিয়ারত করেছিলেন অবনত মস্তকে, অশ্রুসিক্ত নয়নে এবং করুণাপ্রার্থী অন্তর নিয়ে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন: "আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মান্য করো"। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেন: "মাযারস্থদের সাহায্যপ্রার্থী হও" (হাদীস)। আদ্ দায়লামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম মানাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণিত একটা হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: "যদি মাযারস্থ (আউলিয়া) না থাকতেন, তাহলে দুনিয়াবাসী জ্বলে পুড়তো" (কানয্ আদ্ দাক্বাইক্ব দ্রষ্টব্য)। মুসলিমগণ কোনো কবর কিংবা বেসালপ্রাপ্তজনের সাহায্য প্রার্থনা করেন না [হাক্বিক্বি অর্থে]। তাঁরা বেসালপ্রাপ্তজনের মাধ্যমে বা মধ্যস্থতায় আল্লাহর সাহায্যপ্রার্থী হন, যাতে তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয়। আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় সালেহ্ বান্দাদের ওসীলায় কৃত এসব দোয়া সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর করে থাকেন। একজন মুসলিম কোনো ওলীর রূহ্ থেকে ফায়েয্ ও মারেফাত চান এবং ফলস্বরূপ তিনি তা পান; এতে তিনি সাহায্যও পেয়ে যান নিজের বিপদ-আপদ দূর করার জন্যে। মুসলিমগণ একদিকে যেমন দুনিয়াবী উন্নতির জন্যে কাজ করেন, ঠিক তেমনি অপর দিকে আল্লাহর সালেহ বান্দাগণের মাধ্যমে তাঁরই সাহায্যপ্রার্থী হন।

৩৩/ ওয়াহহাবী লা-মাযহাবী লেখক তবুও তাসাউফে বিশ্বাস করে না। সে বলে, "সাহাবাগণের সময় কোনো মযহাব কিংবা কোনো তরীকত ছিল না। ইয়াহুদ (ইহুদীদের) দ্বারা পরবর্তীকালে তরীকত উদ্ভাবিত হয় এবং ইসলামের মধ্যে সন্নিবেশিত হয়।"

এ সব কথার খন্ডন সবচেয়ে ভালোভাবে হয়েছে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথীর 'ইরশাদ-উত্ তালেবীন' নামক পারসিক কিতাবে, যার থেকে নিম্নের দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি গৃহীত হয়েছে:

"কিছু লোক আউলিয়ায় বিশ্বাস করে না। আর কিছু লোক আছে যারা বলে, 'আউলিয়া আগে ছিলেন, এখন নেই।' আবার আরও কিছু লোক আছে যারা বলে, 'আউলিয়া কখনো গুণাহ করেন না। তাঁরা গায়েব জানেন। তাঁরা যা চান তা-ই সাথে সাথে সংঘটিত হয়। এবং যা চান না, তা সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্য হয়ে যায়' এবং এ কথা বলেই তারা আউলিয়ার মাযার-রওযায় হাজত-মকসুদ পূরণের আবেদন জানায়। যারা এ রকম চিন্তা করে, তারা তাদের সময়কার আউলিয়াদেরকে বিশ্বাস করে না, যখনি তারা দেখে যে আউলিয়া সম্পর্কে তারা যা ধারণা করে রেখেছে তা এ সব (জীবিত) আউলিয়ার ক্ষেত্রে সত্য নয়; ফলে তারা

তাঁদের কাছ থেকে ফায়েয পাওয়া হতে বঞ্চিত হয়। এমনও কিছু লোক আছে যারা এতোই অজ্ঞ যে, তারা একজন মুসলিম ও একজন কাফেরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে অক্ষম; অথচ তারা আউলিয়া হওয়ার দাবি করে। আর কিছু আহাম্মক লোক আছে যারা ওই সব অজ্ঞ লোকদেরকে আউলিয়া মনে করে এবং নিজেদেরকে ওই সব লোকদের মুরিদ হিসেবে সংশ্লিষ্ট করে। উপরন্তু, আরো কিছু লোক আছে যারা আউলিয়ার 'সাকর', অর্থাৎ, আল্লাহর এশকে বিলীন থাকা অবস্থায় কথিত মন্তব্যসমূহকে পেশ করে তাঁদেরকে কাফের আখ্যা দেয়। আবার আরও কিছু লোক আছে যারা আউলিয়ার ওই সব মন্তব্য থেকে ভুল অর্থ বের করে ভ্রান্ত বিশ্বাস তৈরি করে নেয়; ফলে তারা আহলে সুন্নাতের উলামাবৃন্দ কর্তৃক বের করা কুরআন-হাদীসের সঠিক অর্থকে অবিশ্বাস করে এবং বিচ্যুত হয়। আরও কিছু লোক আছে যারা ইলম আয্ যাহির, যেটা আল্লাহ হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রকাশ্যে প্রচার করার জন্যে আদেশ দিয়েছিলেন, সেটা শিক্ষা করে, কিন্তু মা'রেফত বা ইলম আল বাতিন, যেটা আল্লাহতা'আলা হুজূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর যাঁকে যাঁকে ইচ্ছা তাঁকে তাঁকে শেখাবার আদেশ দিয়েছিলেন, সেটা তারা শিক্ষা করে না, এমন কি বিশ্বাসও করে না। আর কিছু লোক আছে যারা আউলিয়াকে তা'যিম বা শ্রদ্ধা করে না। এই কারণেই আমি আমার মুসলিম ভ্রাতাদের কাছে বেলায়াত কী জিনিস তা ব্যাখ্যা করার ইচ্ছা পোষণ করি। এই বিষয়ে আমি আমার আরবী 'ইরশাদ-উত-তালেবীন' গ্রন্থটি রচনা করেছিলাম। এখন আমি ফারসীতে তা পুনরায় রচনা করেছি। এ বইটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায় প্রমাণ করে যে বেলায়াত সত্য। দ্বিতীয় অধ্যায় তাসাউফের পথে পালনীয় আদব (আচার-আচরণ) নিয়ে ব্যাপৃত। তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হচ্ছে মুরশিদ কর্তৃক পালনীয় আদবসমূহ। চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে এ পথে অগ্রসরমান হবার সময় পালনীয় আদবসমূহ। পঞ্চম অধ্যায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণের জ্ঞান ও অন্যান্যদেরকে আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণের ব্যাপারে সাহায্য করা নিয়ে ব্যাপৃত।

"প্রথম অধ্যায়: বেলায়াত ও তাসাউফের জ্ঞান ইসলামী জ্ঞানেরই একটা শাখা বিশেষ। মানুষের মধ্যে যাহেরী পূর্ণতা বা মাহাত্ম্যের মতো বাতেনী পূর্ণতা বা মাহাত্ম্যও রয়েছে। যাহেরী মাহাত্ম্যের অন্তর্গত হচ্ছে আহলে সুন্নাতের উলামাবৃন্দ কর্তৃক বের করা কুরআন-হাদীসের জ্ঞান অনুযায়ী বিশ্বাস করা এবং ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব পালন ও হারাম, মুশতাবিহাত [সন্দেহজনক বস্তু], বিদয়াত ইত্যাদি বর্জন। বাতেনী মাহাত্ম্য হচ্ছে একজন মানুষের কলব্ ও রূহের আরোহণ (উন্নতির দিকে)। আল্

বুখারী ও মুসলিম হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন,

إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ يَمْشِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِّ مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: «الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِّ وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَلِقَائِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الآخِرِ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِّ مَا الإِسْلاَمُ؟ قَالَ: «الإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَّ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِّ مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: الإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَّ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِّ مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: " مَا المَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا.

‘আমার (হযরত উমরের) অপরিচিত এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাযির হন এবং হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করেন, ”ইসলাম কী?” নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেন: ”কলেমা শাহাদৎ (মুখে) বলা, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া, রমযান মাসে রোজা রাখা, যাকাত দেয়া এবং সামর্থ্য থাকলে হজ্জে যাওয়া।” ”আপনি সত্য বলেছেন” ওই ব্যক্তি উত্তর দেন। উপস্থিত সাহাবা-এ-কেরাম তাঁকে প্রশ্ন করতে এবং উত্তর শ্রবণে সম্মতিসূচক মন্তব্য করতে দেখে বিস্মিত হন। এরপর ওই ব্যক্তি পুনরায় প্রশ্ন করেন: ”ঈমান কী?” হুজূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেন: ”ঈমান হচ্ছে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, নবী ও শেষ দিনে এবং আল্লাহর এরাদা (ইচ্ছে) হলে ভালো-খারাপের উদ্ভব হয় এতে বিশ্বাস করা।” আবারও প্রশ্নকারী মন্তব্য করেন, ”আপনি সত্য বলেছেন।” এরপর তিনি আবার প্রশ্ন রাখেন, ”এহসান কী?” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেন, ”আল্লাহর এবাদত এমনভাবে পালন করা যেন তুমি (এবাদতকারী) তাঁকে দেখছ, এ কথা জানা যে তাঁকে না দেখলেও তিনি তোমাকে দেখছেন।” এরপর ওই ব্যক্তি আবার প্রশ্ন করেন, ”শেষ দিন

> কী?” এবার হুজূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ”সেই সম্পর্কে আপনি যা জানেন, তার বেশি আমি জানি না।” ”তাহলে শেষ দিনের আলামতগুলো কী কী?” ওই ব্যক্তি আবার প্রশ্ন রাখলেন। হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক এক করে সবগুলো আলামত বর্ণনা করলেন এবং ওই ব্যক্তি চলে যাবার পর তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ”ইনি জিবরীল আলাইহিস্ সালাম ফেরেশতা। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শেখাতে এসেছিলেন।[১]

“হাদীস আল জিবরীল থেকে প্রতিভাত হয় যে, ঈমান ও এবাদত ছাড়াও ’এহসান’ নামক একটা মাহাত্ম্য বা গুণ রয়েছে, যাকে আমরা বেলায়াত বলে থাকি। যখন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা একজন ওলীর অন্তরকে ছেয়ে ফেলে, তখন সেটা তাঁর মাশুকের (প্রেমাস্পদের) মুশাহাদা (পর্যবেক্ষণ)-এ নিজেকে হারিয়ে ফেলে। এই হাল (ভাবোন্মত্ততা)-কে বলা হয় ‘ফানা আল কলব’। এ মুশাহাদার অর্থ আল্লাহকে দেখা নয়। আল্লাহ পাককে পৃথিবীতে দেখা যাবে না। কিন্তু ওলীর মধ্যে এমনি একটা হালের উদ্ভব হয় যেন তিনি আল্লাহকে দেখছেন। এর প্রতি কারও আকাঙ্ক্ষার ফলশ্রুতিতে ’হাল’টি আবির্ভূত হয় না। অতএব, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালটির দিকে ইশারা করেছেন এ কথা বলে ‘আল্লাহর এবাদত এমনিভাবে করা যেন সে ব্যক্তি তাঁকে দেখছে।’

”দ্বিতীয়তঃ আমরা বলি যে একটা হাদীস ঘোষণা করে, ‘মানবের মধ্যে একটা গোস্তের টুকরো আছে। যদি এটা সালেহ্ (পুণ্যবান) হয়, তবে সমগ্র দেহ-ই সালেহ্ বনে যাবে; আর যদি এটা ফাসিদ (বদ, পাপী) বনে যায়, তবে সমস্ত দেহ-ই ফাসিদ বনে যাবে। এই মাংসের টুকরোটি হচ্ছে কলব্ (হৃদয়)।’ এই অন্তরের (আত্মার) পবিত্রতা যা দেহের পবিত্রতার জন্যে একান্ত জরুরি, তাকে

---

[১]. বুখারী : আস সহীহ, ৬/১১৫ হাদীস নং ৪৭৭৭।

ক. মুসলিম : আস সহীহ, বাবু মা‘রিফাতিল ঈমান ওয়াল ইসলাম ওয়াল ক্বদর, ১/৩৬ হাদীস নং ৮।

খ. আবূ দাউদ : আস সুনান, বাবু ফিল ক্বদরি, ৪/২২৩ হাদীস নং ৪৬৯৫।

গ. নাসায়ী : আস সুনান, বাবু না‘তিল ইসলাম, ৮/৯৭ হাদীস নং ৪৯৯০।

ঘ. আহ্মদ : আল মুস্নাদ, মুস্নাদু ওমর ইব্নুল খাত্তাব, ১/৫১ হাদীস নং ৩৬৭।

ঙ. বায্যার : আল মুস্নাদ, ১/২৭৩।

চ. ইব্ন হিব্বান : আস সহীহ, ১/৩৭৫ হাদীস নং ১৫৯।

ছ. ত্ববরানী : মু‘জামুল আওসাত্ব, ৫/২৩৭ হাদীস নং ৫১৯১।

জ. বায়হাক্বী : আস সুনানুল কুবরা, ১০/৩৪২ হাদীস নং ২০৮৭১।

ঝ. বাগাবী : শরহুস সুন্নাহ, ১/৯।

ঞ. ইব্ন মাজাহ : আস সুনান, বাবু ফিল ঈমান, ১/২৪ হাদীস নং ৬৪।

মুতাসাউয়ীফগণ 'ফানা আল কলব' বলেন। যখন কলব আল্লাহর এশকে বা প্রেমে ফানা (লয়প্রাপ্ত) হয়ে যায়, তখন তা তার (কলবের) প্রতিবেশী নফসের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, যেটা আম্মারা-এর তথা কুপ্রবৃত্তির অবস্থা থেকে তখন রক্ষা পায়। এরপর এটা 'আল হুব্বু ফিল্লাহ ওয়াল বুগদু ফিল্লাহ' অর্জন করে, অর্থাৎ, আল্লাহ যা পছন্দ করেন এটাও তা-ই পছন্দ করে, আর তিনি যা অপছন্দ করেন, এটাও তা-ই অপছন্দ করে। এমতাবস্থায় সমগ্র দেহ-ই শরীয়ত মান্য করার ইচ্ছে পোষণ করে।

"প্রশ্ন: ক্বলব সালেহ্ হওয়ার জন্যে ঈমান ও আমল ছাড়া কি আর কোনো কিছুর প্রয়োজন আছে?"

"উত্তর: হাদীসটি বলে যে ক্বলব যখন সালেহ হয়ে যায়, তখন দেহ-ও সালেহ হয়। দেহের পুণ্যবান হওয়া শরীয়তের পায়রবীর (অনুসরণের) মধ্যে নিহিত। শরীয়ত অমান্যকারী এমন বহু লোক আছে যাদের ক্বলবসমূহ বিশ্বাস অর্জন করেছে। এটা জ্ঞাত, যে সব বিশ্বাসীদের নেক আমলের চেয়ে বদ আমল বেশি, তারা জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে [হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফায়াত ও আউলিয়ার শাফায়াতপ্রাপ্তরা জান্নাতে যাবে]। তাহলে ক্বলবের ঈমান দেহের 'সালেহ' হওয়ার কারণ হতে পারে না। অতএব, ক্বলব 'সালেহ' হওয়ার মানে ক্বলবের ঈমান নয়। এ কথাও বলা যাবে না যে, ক্বলবের ঈমান ও দেহের পবিত্রতা মিলে ক্বলবের পবিত্রতা সৃষ্ট হয়েছে; কারণ, দেহের পবিত্রতাকে তার নিজের পুণ্যবান অবস্থার কারণস্বরূপ মনে করাটা অযৌক্তিক। শেষ কথা হলো, ক্বলবের পবিত্রতা অন্তরের ঈমান ও এবাদত ভিন্ন আরেকটা বস্তুর অস্তিত্বের দিকে ইঙ্গিত করে। আর এটাই হচ্ছে মুতাসাউয়ীফগণের বর্ণিত 'ফানা আল ক্বলব' নামক হাল (ভাব)।

"তৃতীয়তঃ, আমরা একটা ঐকমত্যের কথা বলতে চাই যা'তে ঘোষিত হয়েছে যে প্রত্যেক সাহাবী-ই সকল অ-সাহাবী মুসলমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যদিও এমন বহু ইসলামী উলামা আগমন করেছেন এবং পুররুত্থান দিবস পর্যন্ত আরও আগমন করবেন যাঁদের জ্ঞান ও কাজকর্ম কয়েকজন সাহাবীর সমান হবে। তাছাড়া হাদীসে ঘোষিত হয়েছে, 'যদি অন্যরা উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও সাদাকাস্বরূপ দান করে, তবুও তারা আমার সাহাবীদের আল্লাহর ওয়াস্তে দানকৃত অর্ধ 'সা' পরিমাণ যবের সমান সওয়াব পাবে না' (হাদীস)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সোহবত (সান্নিধ্য) থেকে সৃষ্ট সাহাবাগণের অন্তরের বাতেনী কামাল (অভ্যন্তরীণ মাহাত্ম্য, পূর্ণতা)-এর কারণেই তাঁদের এবাদতের এতো উচ্চমর্যাদা ছিল। তাঁদের

বাতেন, অর্থাৎ, ক্বলবসমূহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র কলব্ থেকে নূরপ্রাপ্ত হয়ে নূরানী হয়ে যায়। যখন হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে জ্ঞানের নয়-দশমাংশ বিলুপ্ত হয়েছে এবং তাঁর আশপাশের তরুণ বয়সীদের মাঝে বিচলিতভাব লক্ষ্য করে তিনি আরও বলেন, 'তোমাদের জ্ঞাত ফিকাহ্ ও কালাম-শাস্ত্রের জ্ঞানকে আমি বুঝাই নি। আমি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র কলব্ মুবারক থেকে নিঃসৃত এলম-এ-বাতেনের [মা'রেফতের] নয়-দশমাংশ জ্ঞানকে বুঝিয়েছি।' যে সব মুসলমান সাহাবা-এ-কেরামের পরে বাতেনের এই নূর অর্জন করতে পেরেছেন, তাঁরা তাঁদের পীর-মুর্শিদের সোহবতের কারণেই তা পেরেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কলব মুবারক থেকে উৎসারিত নূর (জ্যোতি) পীর-মুর্শিদগণের মাধ্যমেই তাঁরা অর্জন করেছেন। অবশ্য পীর-মুর্শিদগণের সোহবতে অর্জিত নূর হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সোহবত হতে অর্জিত নূরের সমান হতে পারে না। এটাই সাহাবাগণের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। এই ব্যাখ্যা থেকে এও বোঝা যায় যে, যাহিরী (বাহ্যিক) পূর্ণতার পাশাপাশি বাতেনী (অভ্যন্তরীন) পূর্ণতাও রয়েছে এবং এই পূর্ণতার বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। এটা পরিস্ফুট হয়েছে নিম্নোক্ত হাদীস-এ-কুদসীতে, যেখানে আল্লাহ্তা'লা ইরশাদ ফরমান: 'আমি আমার বান্দার নিকটবর্তী হই, যে বান্দা আমার একটু নিকটবর্তী হয়। যদি আমার বান্দা আমার সন্নিকটে আসে, তবে আমিও তার খুব কাছে যাই। আমার বান্দা নফল এবাদত পালন করে আমার এতো নিকটবর্তী হয় যে আমি তাকে অত্যন্ত ভালোবাসি। আমি যখন তাকে ভালোবাসি, তখন তার দোয়া আমি কবুল করি। সে তখন আমার সাথে (অর্থাৎ, আমার কুদরত দ্বারা) দেখে, শোনে এবং চলাফেরা করে" (হাদীস-এ-কুদসী)। 'নাফিলা' (নফল) এবাদত যেটার জন্যে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন, সেটা হচ্ছে তাসাউফের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্যে কর্মোদ্যম।

"চতুর্থতঃ আমরা বলি যে, পৃথিবীর তিনটি বড় মহাদেশে এক সহস্রাধিক বছর ধরে আগত শত-সহস্র মুসলমান বিদ্বান বলেছেন ও লিখেছেন যে, তাসাউফের পথে শিক্ষা গ্রহণকালে এবং মুর্শিদ আল কামেলগণের সোহবত লাভের ফলে তাঁদের কলবসমূহে কিছু হালের আবির্ভাব ঘটেছে। কেউই কখনো এ কথা ধারণা করতে পারবে না যে ওই ধরনের একটা ব্যাপক সর্বসম্মতি কোনো মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যাঁরা এই সর্বসম্মতি দিয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশের জীবনী-ই বইপত্রে লিপিবদ্ধ আছে। আর এটা নিশ্চিতভাবে পরিদৃষ্ট হয়েছে যে, তাঁরা সবাই মুত্তাকী, পরহেযগার ও জ্ঞান বিশারদ ছিলেন। এই ধরনের পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং অতি উত্তম

ব্যক্তিত্বদের পক্ষে মিথ্যা কথা বলা একেবারেই অসম্ভব। এই ধরনের খাঁটি, পূর্ণতাপ্রাপ্ত শত-সহস্র মুসলিম সর্বসম্মতভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁদের কলবসমূহ তাঁদেরই পীর-মুর্শিদগণের সোহবতে হুজূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র কলব মোবারক থেকে নিঃসৃত নূর (জ্যোতি) অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে এবং ঈমান ও ফিকাহ্ জ্ঞান ছাড়াও তাঁদের পীর-মুর্শিদগণের সোহবতে তাঁদের কলবসমূহে আরেকটি হালের উদ্ভব হয়েছে, আর এই হালের পরেই আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহর ভালোবাসাপ্রাপ্তদের প্রতি এবং আল্লাহর আদেশগুলোর প্রতি ভালোবাসা তাঁদের কলবে (অন্তরে) স্থান দখল করেছে, আর এবাদত ও সওয়াবদায়ক কাজ করাটা তাঁদের কাছে পছন্দনীয় হয়েছে এবং আহলে সুন্নাতের উলামাবৃন্দ কর্তৃক রওয়ায়াতকৃত সঠিক আকিদা-বিশ্বাসগুলো তাঁদের কলবে আসন গেঁড়েছে। অন্তরে আবির্ভূত এ হালটি নিশ্চয়ই পূর্ণতা ও মাহাত্ম্যসম্পন্ন এবং পূর্ণতা-সৃষ্টিকারী একটি হাল।

পঞ্চমতঃ আমরা বলি যে, আউলিয়াবৃন্দ কারামতের অধিকারী। আল্লাহ তাঁর রীতি-বহির্ভুত যে সব অলৌকিক ঘটনাবলী সৃষ্টি করেন, তা-ই হচ্ছে কারামত; অর্থাৎ, স্বাভাবিক ও বৈজ্ঞানিক আইন-কানুনবহির্ভূত ঘটনাবলী-ই হচ্ছে কারামত। তবে প্রত্যেক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন লোকই যে ওলী হবে, এমন কোনো কথা নেই। আল্লাহ কর্তৃক ঘৃণিত কাফেরদের কাছ থেকেও অলৌকিক ক্রিয়া সংঘটিত হতে পারে। কোনো কাফেরের দ্বারা সংঘটিত অলৌকিক ক্রিয়াকে 'সিহর' (যাদু) বলে। কারামতের সঙ্গে 'তাকওয়ার' (খোদাভিরুতার)-ও অধিকারী হয়ে থাকেন একজন ওলী। আল্লাহকে ভয় করার এবং শরীয়তকে আঁকড়ে ধরার মানে হচ্ছে তাক্ওয়া।

"বেলায়াত কী? এখন আমরা বেলায়াতের অর্থ ব্যাখ্যা করবো। বেলায়াত মানে আল্লাহর নিকটবর্তী থাকার অবস্থা। আল্লাহর সঙ্গে মানুষের সান্নিধ্যের দুইটি শ্রেণী রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে প্রত্যেক মানুষের কাছে আল্লাহর উপস্থিতি। আল্লাহতা'আলা সুরা ক্বাফ-এর ১৬ নং আয়াতে ইরশাদ করেন, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ 'মানুষের হৃদযন্ত্রের (বড়) শিরাটির চেয়েও আমি বেশি নিকটবর্তী তার।'[১] সুরা হাদিদ-এর চতুর্থ আয়াতে তিনি ঘোষণা করেন, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ 'তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে আছেন।'[২] দ্বিতীয় ধরনের নৈকট্য হচ্ছে সালেহীন ও ফেরেশতাদের প্রতি আল্লাহর নৈকট্য। সুরা নাজম-এর

---

[১]. আল কুর'আন : ক্বাফ, ৫০/১৬।
[২]. প্রাগুক্ত : আল হাদীদ, ৫৭/৪।

শেষ আয়াতটি ইরশাদ ফরমায়: فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا—وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ 'সেজদা করো এবং আল্লাহর নিকটবর্তী হও।[১]' উপরোক্ত হাদীস-এ-কুদসী ঘোষণা করে: 'নাফিলা এবাদত পালন করে আমার বান্দা আমার এতো নিকটবর্তী হয় যে তাকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি' (হাদীস)। এ আয়াত ও হাদীসটিতে উল্লিখিত নৈকট্য একমাত্র ওই সকল মহান সালেহীনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। এই নৈকট্যকেই বেলায়াত বলে, অর্থাৎ, ওলিত্ব থাকাকালীন অবস্থাই হচ্ছে বেলায়াত। এই ধরনের নৈকট্য অর্জনের জন্যে আহলে সুন্নাতের এ'তেক্বাদের (আকিদা-বিশ্বাসের) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশ্বাস রাখা একান্ত অপরিহার্য। وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ সুরা আল-ই-ইমরানের ৬৮ নং আয়াত ইরশাদ ফরমায়: 'আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা ঈমান আনে'।[২]কিন্তু তিনি ওই সব বিশিষ্ট বিশ্বাসীদেরকে আরও বেশি ভালোবাসেন। প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্যে আল্লাহর ভালোবাসাকে বলা হয় 'বেলায়াত আম্মা'। আর বিশিষ্ট ঈমানদারদের জন্যে তাঁর মহব্বতকে 'বেলায়াত খাসসা' বলা হয়। হাদীস-এ-কুদসীটিতে ইশারাকৃত মহব্বত এই ধরনের ভালোবাসা। আর এ ধরনের ভালোবাসার মাত্রা রয়েছে। আমাদের আরও জানা উচিৎ যে আক্বল (মস্তিষ্ক, বুদ্ধি) দ্বারা আল্লাহর সিফাতসমূহ (গুণাবলী) বোঝা যায় না, যেমনিভাবে বোঝা যায় না তাঁর সত্তাকে। আল্লাহতা'আলার সত্তা মোবারক অথবা তাঁর কোনো সিফাতের অনুরূপ কোনো কিছু-ই নেই। অতএব, আল্লাহর সাথে মানুষের উক্ত দু'ধরনের নৈকট্য মানবের বিচার-জ্ঞান দ্বারা জানা ও উপলব্ধি করা একেবারেই অসম্ভব। এটা সময় অথবা স্থানের নৈকট্যের মতো নয়। আল্লাহর বান্দাদের কাছে তাঁর নৈকট্য কোনো বস্তুগত নৈকট্য নয়, যেটা বিচার-বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি অথবা ইন্দ্রিয়গুলো দ্বারা অনুভব করা যায়। এটা শুধু আল্লাহ্ কর্তৃক কিছু বিশিষ্ট বিশ্বাসীদের প্রতি বর্ষিত মারেফত নামক জ্ঞানের দ্বারা-ই বোঝা যায়। এই জ্ঞানকে বলা হয় 'এলমুল হুযূরি'। আমাদের জ্ঞান হচ্ছে ইলম আল্ হুসূলি (হাসিল করা জ্ঞান)।

[১]. প্রাগুক্ত : আন নাজম, ৫৩/৬১।
[২]. প্রাগুক্ত : আলে ইমরান, ৩/৬৮।

"যেহেতু আল্লাহর সাথে তাঁর বান্দাদের উক্ত দু'ধরনের নৈকট্যের কথা আয়াত ও হাদীসসমূহে বিবৃত হয়েছে, সেহেতু উভয়ের প্রতির বিশ্বাস স্থাপন করা আমাদের জন্যে ওয়াজিব। আল্লাহ্ কর্তৃক আমাদেরকে [সব সময় সব স্থানে] দেখার বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা যেমন আমাদের জন্যে অপরিহার্য, ঠিক তেমনি উক্ত দু'ধরনের নৈকট্যের প্রতি বিশ্বাস রাখাও আমাদের জন্যে একান্ত আবশ্যক। আল্লাহ্ পাকের দর্শন (ক্ষমতা) যেমনভাবে পদার্থ বিদ্যায় ব্যাখ্যাকৃত আলোর প্রতিফলনের সাহায্যে নয়, ঠিক তেমনিভাবে তাঁর নৈকট্যও কোনো একক দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। কয়েকটি হাদীসে পরিমাপের উদ্দেশ্যে নয়, বরং শুধু তুলনা দেয়ার খাতিরেই বিঘত, যব-শস্যের দৈর্ঘ্য, মিটার, এক হাত সমান দৈর্ঘ্য ইত্যাদি এককের ব্যবহার করা হয়েছে।

"প্রশ্ন: বেলায়াত মানুষের কাছে আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দার মধ্যকার অবোধগম্য হাল হওয়া সত্ত্বেও এয়াক্বিন শব্দটা দ্বারা কেন এটাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে?

"উত্তর: আমরা উত্তর দেবার আগে দুটো বিষয় আলোচনা করবো:

১) আউলিয়ার 'কাশফ' (দিব্যদৃষ্টি) ও মানুষের প্রত্যক্ষকৃত 'রূ-ইয়া' (স্বপ্ন) আর কিছু না, খিয়াল (মস্তিষ্ক)-এর দর্পণে প্রত্যক্ষকৃত বস্তুসমূহের যিল (প্রতিকৃতি, ছায়া) ছাড়া। কারো ঘুমন্ত অবস্থায় এর উদ্ভব হলে একে বলা হয় রূ-ইয়া। আর জাগ্রত অবস্থায় সংঘটিত হলে তাকে বলা হয় কাশফ। খিয়ালের দর্পণ যতো পরিষ্কার ও নির্মল হবে, ততোই কাশফ কিংবা রূ-ইয়ার সত্যতা এবং নির্ভরযোগ্যতা বাড়বে। সুতরাং কোনো নবী আলাইহিস্ সালাম-এর স্বপ্ন (রূ-ইয়া) একদম নির্ভরযোগ্য এবং অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য। কারণ, সকল নবী আলাইহিস্ সালাম-ই মা'সুম, অর্থাৎ, তাঁরা কখনো কোনো ভুল করেন না। তাঁদের খিয়াল অত্যন্ত খাঁটি এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তাঁদের বাতেন অথবা অন্তরও অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। অধিকাংশ আউলিয়ার স্বপ্নও সঠিক। কারণ তাঁদের মস্তিষ্ক এবং অন্তরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সোহবতে অর্জিত নূরের দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, যে সোহবত তাঁরা সাহাবাদের মতো হয় সরাসরি পেয়েছেন, নয়তো সাহাবাগণের পরে আগত পীর-মুর্শিদগণের মতো পথপ্রদর্শকের মাধ্যমে পেয়েছেন; তাঁদের খেয়াল ও ক্বলব শরীয়তকে মান্য করেও নির্মল হয়েছে। মওলানা জালালুদ্দিন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর মসনবী শরীফে এই সূক্ষ্ম বিষয়টি সুন্দরভাবে খোলাসা করেছেন:

'আউলিয়াকে যে সব আকৃতি (যিল) খুঁজে বেড়ায় তুমি চেনো তাকে?
সেগুলো খোদাতা'আলার বাগানের সৌন্দর্যের দর্শনশক্তি বটে'

"আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম-কে মান্য করার কারণে আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বাতেনগুলোকে নির্মল করা হয়েছে এবং তাই তাঁদের বাতেনসমূহ উজ্জ্বল দর্পণসমূহের অনুরূপ। কোনো কোনো সময় তাঁদের বাতেনগুলোর পূর্বতন কালো দাগগুলো কালো দাগের মতো রূপ ধারণ করে দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাঁদের মস্তিষ্কের দর্পণগুলো আবছা হয়ে যায়; ফলে তাঁদের কাশফ ও স্বপ্নগুলোতে তখন ভুল-ত্রুটি ঘটে। এই আবছা হওয়াটা হারাম অথবা মুশতাবিহাত সংঘটনের কারণে কিংবা (মুবাহ পালনে) সীমা অতিক্রম করার কারণে ঘটে থাকে; কিংবা এটা ঘটার আরেকটা কারণ হলো অজ্ঞ ও গোমরাহ লোকদের দ্বারা কালিমা লেপন। অজ্ঞ ও গোমরাহ লোকদের অধিকাংশ স্বপ্নই ভ্রান্ত এবং তাদের বাতেনগুলো কাল হওয়ার কারণে তারা খুব বেশি ভুল করে।

২) আল্লাহর সকল সৃষ্টিকেই 'আলম' বলে। আলম তিন প্রকার: 'আলম আশ শাহাদাৎ' আমাদের জ্ঞাত বস্তুগত জগত; 'আলম আল-আরওয়া', রূহের অ-বস্তুগত ও পরিমাপ-অযোগ্য (ধারণাতীত) জগত; এবং 'আলম আল মিসাল', যেখানে বস্তুগত কিংবা অ-বস্তুগত কিছুই নেই। আলম আল মিসালে প্রথম ও দ্বিতীয় আলমে অবস্থানরত সকল বস্তুরই মিসাল (উপমা) আছে; এমন কি আল্লাহ এবং চিন্তাধারা ও অর্থের মিসালও রয়েছে। আল্লাহর আসলে কোনো মিসাল নেই। কিন্তু এ কথা বলা হয়েছে যে তাঁর মিসাল আছে। যদি কোনো জিনিসের সঙ্গে অন্য আরেকটি জিনিসের যাত (সত্তা) কিংবা মৌলের এবং সিফাতের ক্ষেত্রে সাযুজ্য থাকে, তাহলে উভয়কেই উভয়ের মিসাল বলা হয়। আল্লাহতা'আলার পবিত্র সত্তা কিংবা তাঁর সিফাতসমূহের কোনো মিসাল নেই এবং ওই ধরনের কোনো মিসালের অস্তিত্ব থাকতেই পারে না। যদি কোনো বস্তুর সঙ্গে অপর কোনো বস্তুর শুধুমাত্র সিফাতের ক্ষেত্রে সাযুজ্য থাকে এবং যাতের সঙ্গে না থাকে, তবে পূর্ববর্তী বস্তুকে পরবর্তী বস্তুর মিসাল বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন সূর্যকে 'অসীম' বলা হয়, তখন 'অসীম' শব্দটা সূর্যেরই একটা মিসাল হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহতা'আলা ইরশাদ করেন, مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ 'কোনো বিশ্বাসীর কলবে আল্লাহর নূর ফানুসের ভেতরে প্রদীপের মতোই'।[১] একটা হাদীসে আল্লাহ সম্পর্কেও মিসাল দেয়া হয়েছে, 'তিনি এমনই এক হাকিম (হুকুমদাতা) যে, তিনি একটা ঘর নির্মাণ করে সেটাকে পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন' (হাদীস)। অতএব, এ কথা বলা হয়েছে যে আল্লাহকে স্বপ্নে দেখা যাবে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম দুর্ভিক্ষের বছরগুলোকে রুগ্ন এবং সমৃদ্ধির বছরগুলোকে

---

[১]. প্রাগুক্ত : আন নূর আয়াত ২৪/৩৫।

স্বাস্থ্যবান গরু ও গমের (শষ্যের) শীষের মতো তাঁর স্বপ্নে দেখেছিলেন। সহীহ বুখারী শরীফে একটা হাদীস ইরশাদ ফরমায়: 'আমি স্বপ্নে বহু লোককে আমার কাছে আসতে দেখি। তারা জামা পরিহিত ছিল। কারও কারও জামা তাদের বুক পর্যন্ত ছিল, আর কারও কারও জামা আরও লম্বা ছিল। আমি উমরকে দেখি। তার জামা মাটি পর্যন্ত ঝুলানো ছিল।' সাহাবা-এ-কেরাম হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এর ব্যাখ্যা দিতে আরজ করার পর তিনি বলেন, 'জামা মানে জ্ঞান' (হাদীস)। এ সব আয়াত ও হাদীস পরিস্ফুট করে, যে জিনিসের কোনো মিসাল নেই এবং যে জিনিস বস্তুগত নয়, সে জিনিসও স্বপ্নে অথবা কাশফের মাধ্যমে দেখা যেতে পারে।

"উপরোক্ত দুটো বিষয় ব্যাখ্যা করার পর আমরা বলি যে, বেলায়াত নামক একটা অবোধগম্য হাল রয়েছে। আলম আল-মিসালে দুটো বস্তুগত দেহের নৈকট্য হিসেবে এ হালকে কাশফের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করা হয়। কাশফে বেলায়াতের হালের অগ্রগতি অনেকটা আল্লাহর দিকে হাঁটার মতো অথবা তাঁর এক সিফাত থেকে আরেক সিফাত অতিক্রম করার মতো মনে হয়। যেহেতু আউলিয়ার এসব অবোধগম্য হালের পরিবর্তন (অতিক্রান্তি) আলম-এ-মিসালেই পরিদৃষ্ট হয়েছে, সেহেতু এসব হালকে 'কুরব-এ-ইলাহী' (খোদার নৈকট্য) হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে এবং পরিবর্তনগুলোকে 'সায়ের ইলাল্লাহ' ও 'সায়ের ফিল্লাহ' ইত্যাদি নামে ভূষিত করা হয়েছে।

"তাসাউফের পথে একবার ফানা অর্জিত হলে এরপর আর কোনো প্রত্যাবর্তন নেই। যারা ফিরে এসেছে, তারা ফানা অর্জন করার আগেই তা করেছে। এই ফকির (মওলানা সানাউল্লাহ পানিপথী) এটা সুরা বাক্বারার ১৪৩ তম আয়াত থেকে বের করেছি, যেটা ঘোষণা করে–

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ.

–আর আল্লাহর ক্ষেত্রে এটা শোভা পায় না যে তিনি তোমাদের ঈমানকে ব্যর্থ করবেন। তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।[১]

নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান: 'আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের ঈমান ফেরত নেন না। কিন্তু তিনি উলামা-এ-হাক্কানীবৃন্দের বেসালের মাধ্যমে এলম (জ্ঞান) উঠিয়ে নেন' (হাদীস)। এ হাদীসটি-ও প্রতিভাত করে যে আল্লাহ্ প্রকৃত ঈমান ও বাতেনী এলম ফেরত নেন না।

---

১. প্রাগুক্ত : আল বাক্বারা, ২/১৪৩।

"সম্পূর্ণ তাক্বওয়া একমাত্র আউলিয়ার মাঝেই প্রস্ফুটিত হয় এবং সেটা হিংসা-দ্বেষ, ঔদ্ধত্য, মুনাফেকী ও প্রসিদ্ধির লোভের মতো নফসানী খায়েশকে পুরোপুরিভাবে বিতাড়িত না করে অর্জন করা সম্ভব নয়। এটা পুরোপুরিভাবে বিতাড়নের জন্যে প্রয়োজন 'ফানা আন-নফস', অর্থাৎ, নফসের লয়প্রাপ্তি। আল্লাহ ভিন্ন অন্য সব জিনিসের এশক-মহব্বত ক্বলব তথা অন্তর থেকে দূর না করা পর্যন্ত পূর্ণ ঈমান ও সম্পূর্ণ তাক্বওয়া অর্জন করা অসম্ভব। আর এটা একমাত্র 'ফানা আল ক্বলব'-এর মাধ্যমেই সম্ভব। হাদীসটিতে ফানা আল ক্বলবকে 'ক্বলবের পবিত্রতা' (সালেহ্ ক্বলব) আখ্যায়িত করা হয়েছিল। আল বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত একটা হাদীস ইরশাদ ফরমায়: '

> لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ، وَوَالِدَيْهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
>
> একজন মুসলিমের ঈমান কখনো পূর্ণ হতে পারে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত না সে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং অন্য সবার চেয়ে আমাকে বেশি ভালোবাসে'।[১]

অপর এক হাদীস ইরশাদ করে:

> ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: مَنْ يَكُنِ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا للهِ، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ بِهِ فِي النَّارِ.
>
> –তিন শ্রেণীর লোক ঈমানের ফল আস্বাদন করে: যে ব্যক্তি সব বস্তুর চেয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বেশি ভালোবাসে; যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ যাঁদের ভালোবাসেন তাঁদেরকে ভালোবাসে; এবং

---

[১]. বুখারী : আস সহীহ, বাবু হুব্বি রাসূলিল্লাহ ১/১২ হাদীস ১৪।
ক. মুসলিম : আস সহীহ, বাবু উজুবি মুহাব্বতি রাসূলিল্লাহ ১/৬৭ হাদীস ৪৪।
খ.ইব্‌ন মাজাহ : আস সুনান, বাবু ফিল ঈমান ১/২৬ হাদীস ৬৭।
গ. আহমদ : আল মুসনাদ ৩/১৭৭।
ঘ. আদ দারেমী : আস সুনান ৩/১৮০১ হাদীস ২৭৮৩।
ঙ. নাসায়ী : আস সুনান আলামাতুল ঈমান ৮/১১৪ হাদীস ৫০১৩।
চ.ইব্‌ন হিব্বান : আস সহীহ ১/৪০৫ হাদীস ১৭৯।
ছ. হাকিম : আল মুস্তাদরাক, ২/৫২৮ হাদীস ৩৮০৫।
জ. বায়হাক্বী : শুয়াবুল ঈমান ২/১২৯ হাদীস ৫৮৮।

যে ব্যক্তি ঈমান অর্জন করে আগুনে জ্বলে পোড়ার চেয়েও কুফর (অবিশ্বাস)-কে বেশি ভয় পায়'।[১]

একদিন রাবেয়া বসরী (তাবেয়ীনদের মধ্যে বিখ্যাত মহিলা ওলী) তাঁর দুই হাতে দুটো পাত্র বহন করছিলেন, যার একটা ছিল পানিতে পূর্ণ, অপরটি আগুনে প্রজ্জ্বলিত। মানুষেরা তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করার পর তিনি উত্তর দেন, 'আমি দোযখের আগুন নিভিয়ে দিয়ে বেহেশতে আগুন জ্বালাবো। এভাবে আমি মুসলিমদেরকে দোযখের ভয়ে এবং বেহেশতের আশায় আল্লাহর এবাদত করা হতে রক্ষা করবো।' আর এটাই হচ্ছে বেলায়াত (ওলিত্ব)।

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেন, 'আমার আসহাবদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো' (হাদীস)। সুরা হুজুরাতের ১৩ আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেন, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ 'মুত্তাক্বীরা (খোদাভীরু মুসলমান)-ই সম্মান পাওয়ার যোগ্য।[২] তাই ইসলামী উলামাবৃন্দ সর্বসম্মতভাবে বলেছেন যে এই উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মুত্তাক্বী (আল্লাহকে ভয়কারী) হচ্ছেন সাহাবা-এ-কেরাম। কেননা, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সোহবত লাভ করেই আসহাব-এ-কেরাম বেলায়াতের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন। সুরা তওবার ১০০ নং আয়াতে আল্লাহতা'আলা সাহাবা-এ-কেরামকে প্রশংসা করছেন: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ'যারা বিশ্বাসে পূর্ববর্তী এবং যারা প্রথমে হিজরত করেছে'।[৩] তিনি সুরা ওয়াক্বিয়ার ১০ নং আয়াতে ইরশাদ ফরমান: وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10) أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ'যারা বিশ্বাসে অগ্রজ, তারাই হবে (আখেরাতে) অগ্রবর্তী' (আর তাঁরাই মুক্বারাবিন বা আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত)।[৪] সুরা আল-ই-ইমরানের ১০২ নং আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ ফরমান: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ 'হে ঈমানদাররা আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর নিষেধকৃত বস্তু থেকে

---

[১]. মা'মার বিন রশীদ : আল জামে, ১১/২০০ হাদীস নং ২০৩২০।
ক. আবূ দাউদ : আস সুনান, ৩/৪৬৫ হাদীস নং ২০৭১।
খ. আবূ ইয়ালা : আল মুস্নাদ, ৬/২৩ হাদীস নং ৩২৫৬।
গ. বায়হাক্বী : শু'য়াবুল ঈমান, ২/১২৯ হাদীস নং ৫৮৮।
[২]. আল কুর'আন : আল হুজুরাত, ৪৯/১৩।
[৩]. প্রাগুক্ত : আত তাওবা, ৯/১০০।
[৪]. প্রাগুক্ত : আল ওয়াক্বিয়া, ৫৬/৯-১০।

দূরে সরে থাকো।[১]’ তাক্বওয়ার মানে হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করা। এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক, সুন্নাত, নফল ও সওয়াবদায়ক অন্যান্য আমল পালন করে হারাম পরিহার করাই হচ্ছে তাক্বওয়া। অর্থাৎ, ‘যাহেরী আমল এবং বাতেনী ঈমান ও নৈতিকতার মধ্যে আল্লাহ যা অপছন্দ করেন, তা অবশিষ্ট রাখা চলবে না।’ আয়াতে প্রদত্ত আদেশটি প্রতিভাত করে যে এটা ওয়াজিব। একমাত্র বেলায়াতের মাধ্যমেই পূর্ণ তাক্বওয়া অর্জন করা যায়। নফসের উপরোক্ত শয়তানী প্রভাব হারাম। এ সকল কু-প্রভাব দূর না করা পর্যন্ত পূর্ণ তাক্বওয়া অর্জন করা অসম্ভব; আর এ সকল কু-প্রভাব ’ফানা আন্ নফস’-এর মাধ্যমেই খর্ব করা সম্ভব। তাক্বওয়া হচ্ছে পাপ বর্জন করা। হাদীসটাতে এটাকে ‘দেহের পকা’ (সালেহ) বলা হয়েছে। দেহের পবিত্রতার জন্যে ক্বলবের পবিত্রতা একান্ত আবশ্যক। মুতাসাউয়ীফগণ ক্বলবের পবিত্রতাকে‘ফানা আল ক্বলব’ আখ্যায়িত করেছেন।

“আমরা ব্যাখ্যা করেছি যে বেলায়াত হচ্ছে ক্বলব ও নফসের বিলোপ সাধন। তাসাউফপন্থী উলামা বলেছেন যে বেলায়াতের সাতটি পর্যায় রয়েছে, যার মধ্যে পাঁচটি হলো কলব, রূহ, সির্র, খফি ও আখফা নামক পাঁচ লতিফার বিলোপ সাধন; ষষ্ঠটি নফসের লয়প্রাপ্তি; সপ্তমটি দেহের পদার্থসমূহের নির্মলকরণ। দেহের পদার্থগুলোর লয়প্রাপ্তিকে ‘দেহের পবিত্রতা’ আখ্যায়িত করা হয়েছে।

”শুধু নাফিলা এবাদত পালন করে তাক্বওয়া অর্জন করা যায় না। তাক্বওয়া হচ্ছে ফরয ও ওয়াজিব পালন করে হারাম বর্জন করা। এখলাসবিহীন ফরয এবং ওয়াজিব পালন করা মূল্যহীন। সুরা যুমারের ২-৩ নং আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেন: أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ–فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ’এখলাসের সাথে আল্লাহর এবাদত পালন করো। এখলাসপূর্ণ এবাদত কি তাঁর জন্যেই খাস নয়?’[২] ফানা আন্ নফস অর্জনের আগে হারাম বর্জন করা সম্ভব নয়। এটা পরিস্ফুট যে, একমাত্র ফরয পালন করেই কোনো ব্যক্তি বেলায়াতের পূর্ণতা অর্জন করতে পারে। তবুও বেলায়াত আল্লাহর-ই একটা নেয়ামত বিশেষ; তাঁর যাঁদেরকে ইচ্ছা তাঁদেরকেই এটা তিনি দিয়ে থাকেন এবং এটা পরিশ্রম করে অর্জন করা যায় না। মানুষদেরকে তাদের ক্ষমতানুযায়ী কাজ করতে আল্লাহ আদেশ করেছেন। সুরা তাগাবুনের ১৬ নং আয়াতে তিনি আদেশ দেন: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ’তোমাদের

---

[১]. প্রাগুক্ত : আলে ইমরান ২/১০২।
[২]. প্রাগুক্ত : আল যুমার, ৩৯/২-৩।

সর্বশক্তি নিয়োগ করে হারাম কাজ পরিহার করো'।[১] এটা স্পষ্ট যে, প্রত্যেকের সাধ্যানুসারে এই ক্ষেত্রে চেষ্টা করা জরুরি।

"বেলায়াতের পর্যায়সমূহ অসীম। শায়খ সাদী সিরাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ কথা ব্যক্ত করেন নিম্নোক্ত পংক্তিতে:

'তাঁর (খোদার) সৌন্দর্য অসীম
সাদীর কথাও অন্তহীন
রোগীর তেষ্টা মেটায় না জল পান
নিঃশেষও করে না মহাসাগরের জলের পরিমাণ'।। (গুলিস্তাঁ)

"অনুরূপভাবে, তাক্বওয়ার পর্যায়গুলোও অসীম। একটা হাদীস ঘোষণা করে, 'আমি-ই আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালোভাবে জানি, সবচেয়ে বেশি ভয় পাই' (হাদীস)। কোনো ব্যক্তি যতোই বেলায়াতের পর্যায়গুলোর ভেতর দিয়ে অগ্রসর হবেন, ততোই তাঁর আল্লাহ-ভীতি বৃদ্ধি পাবে। সুরা হুজুরাতের ১৩ নং আয়াতে ঘোষিত হয়েছে: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ 'আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি-ই সর্বশ্রেষ্ঠ, যে নাকি আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায়'।[২] যেহেতু তাক্বওয়ার পর্যায়গুলো অসীম, সেহেতু বেলায়াতের পর্যায়গুলোর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা ওয়াজিব। নিজের বাতেনী এলম বৃদ্ধি কামনা করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে ফরয। সুরা তা'হা-এর ১১৪ নং আয়াত এ বিষয়টি ব্যক্ত করে: وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا 'হে হাবীব, আপনি সব সময় দোয়া করার মুহূর্তে বলবেন: এয়া আল্লাহ্, আমাকে এলম দান করুন।[৩]কোনো ওলী বেলায়াতের কোনো পর্যায় অর্জনের পর সেই স্তরে থেকে যাবার এবং আরও অগ্রসর না হবার ইচ্ছা পোষণ করা তাঁর জন্যে হারাম। হযরত বাক্বীবিল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কবিতায় বলেন:

'আল্লাহর পথে তুমি পর্যবেক্ষণশীল হবে, অবশ্যই হবে
মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেটাই হতে চাইবে, অবশ্যই চাইবে
যদি সাগর পরিমাণও তোমার মুখে ঢালা হয়,
তবুও তেষ্টা তোমার মেটা উচিৎ নয়,
বরং এরপর আরও কামনা করবে।।

---

[১]. প্রাগুক্ত : আত তাগাবুন, ৬৪/১৬।
[২]. প্রাগুক্ত : আল হুজুরাত, ৪৯/১৩।
[৩]. প্রাগুক্ত : ত্বহা, ২০/১১৪।

”মওলানা জালালুদ্দিন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন:
‘হে ভ্রাতা, এ পথের কোনো শেষ নেই,
যতো দীর্ঘ পথই পার হও না কেন,
আরও অগ্রসর হতে হবেই।’
খাজা বাক্বি বিল্লাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ
’তুমি পান করাও আমায় যতোই,
তোমার প্রতি আমার এশক বৃদ্ধি পায় ততোই’

”যেহেতু বাতেনী জ্ঞানের পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করা ওয়াজিব এবং যেহেতু একজন মুর্শিদ আল কামেলের মধ্যস্থতা ছাড়া খুব কম মানুষই আল্লাহর নৈকট্য পেয়েছেন, সেহেতু একজন মুরশিদ-এ-কামেলের তালাশ করা ওয়াজিব। অতএব, মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ

‘মুর্শিদ ছাড়া আর কেউই মানুষদেরকে হেদায়েত দিতে পারে না,
তাই এমন কাউকে খুঁজে বের করো,
এবংঋউ তাঁকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো,
কিন্তু তরীকতের ভন্ড লোকেরা যেন করতে না পারে প্রতারণা।’

“কোনো মুর্শিদের পার্থক্য নির্ণয়কারী প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তাঁকে আহলে সুন্নাতের আক্বিদাসম্পন্ন হতে হবে এবং সম্পূর্ণভাবে শরীয়তকে মান্য করতে হবে। যে ব্যক্তির কথা ও কাজ শরীয়তের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং নিজের স্ত্রী-কন্যাদের দ্বারা হাত ও চুলের বেপন্দা অবস্থায় বাইরে যাওয়াকে যে ব্যক্তি রহিত করে না, সে কখনো মুর্শিদ হতে পারে না। এমন কি সে যদি আকাশেও উড়তে পারে, তবুও সে মুর্শিদ হতে পারে না। মুসলিম মহিলাদের জন্যে চুল ও পা ইত্যাদি অঙ্গের বেপন্দা অবস্থায় বাইরে যাওয়া এবং প্রথাগতভাবে অপরিচিত লোকদের সামনে নিজেদের প্রদর্শনী দেয়া হারাম। আহলে সুন্নাতের উলামাবৃন্দের বইপত্র যে ব্যক্তি মান্য করে না, সে কখনো মুর্শিদ হতে পারে না। ওই ধরনের একজন ভন্ড ইমাম উপকারী হওয়ার পরিবর্তে দ্বীনের জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর। সুরা ইনসান কিংবা সুরা দাহরে আল্লাহ তা’আলা ঘোষণা করেন, ‘ফিসক্ব সংঘটনকারী কিংবা কাফেরকে মান্য করবে না’ (সুরা দাহর, ২৪ আয়াত)। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা’আলা প্রথমে ফাসিককে এবং পরে কাফেরকে মান্য করতে নিষেধ করেছেন; কারণ একজন মুসলিম খুব কমই একজন কাফেরের সাক্ষাৎ পান, কিন্তু তিনি সব সময় হয়তো একজন ফাসিকের তাবেদারী করতে পারেন। তাছাড়া এ আয়াতটি প্রতিভাত করে যে একজন কাফেরের চেয়ে একজন ফাসিকের সাহচর্য অনেক

বেশি ক্ষতিকর হতে পারে। সুরা কাহফ-এর ২৮ আয়াত ইরশাদ ফরমায়: وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا 'আমার যিকর হতে গাফেল (উদাসীন) অন্তর-বিশিষ্ট নফসানীয়াতের পূজারী এবং সীমা লংঘনকারী ব্যক্তিকে মান্য করবে না'।[১] এ আয়াতখানা থেকে বোঝা যায় যে নফসের অনুসরণ ক্বলবের গাফলাতেরই একটা লক্ষণ মাত্র। দেহের ফিসক্ব সংঘটন ইঙ্গিত করে যে ক্বলব-ই ফাসিক।

"কোনো মুর্শিদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য যা হাদীসে বিবৃত হয়েছে, তা হচ্ছে তাঁকে দেখা এবং তাঁর সাথে কথা বলার ফলে আল্লাহকে স্মরণ হয়। ক্বলবে আল্লাহ্ ছাড়া আর কো;নো কিছুকে পছন্দনীয় মনে হয় না তখন। ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর রওয়ায়াত অনুযায়ী হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আউলিয়াবৃন্দের বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করে ইরশাদ ফরমান: 'আউলিয়াকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়।' এই হাদীস ইবনে মাজা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-ও বর্ণনা করেছেন। ইমাম বাগাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রওয়ায়াতকৃত একটা হাদীস-এ-কুদসীতে আল্লাহ ঘোষণা করেন: 'যখন আমার উল্লেখ করা হয়, তখন আমার আউলিয়ার কথা স্মরণ হয়; আর যখন তাদেরকে উল্লেখ করা হয়, তখন আমার কথা মনে পড়ে।' কিন্তু আল্লাহকে স্মরণ করতে হলে কোনো ওলীর সাথে সম্পৃক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যে ব্যক্তি কোনো ওলীকে অস্বীকার করে এবং তাঁকে ওলী হিসেবেই বিশ্বাস করে না, তার সঙ্গে ওই ওলীর কোনো সম্পর্কই নেই। যে ব্যক্তি অবিশ্বাস করে, সে এই নেয়ামত অর্জন করতে পারে না।

দুটো পংক্তি:

> 'যে লোককে আল্লাহ নেয়ামত দেন না,
> সে যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও দেখে,
> তবুও সে ফায়েয অর্জন করতে পারে না।'

"প্রত্যেক ওলীরই তা'সির (প্রভাব বিস্তার) করার এ ক্ষমতাটি রয়েছে। কোনো কোনো পীর-মুর্শিদ প্রভাব বিস্তারে আরও অনেক বেশি ক্ষমতাশালী এবং তাঁরা তাঁদের মুরীদদেরকে তাসাউফের পথের উচ্চপর্যায়গুলোতে উন্নীত করতে সক্ষম। ওই ধরনের পীর-মুর্শিদদেরকে বলা হয় মুর্শিদ আল কামেল ওয়াল মুকাম্মেল (নিজে পূর্ণ এবং অন্যদেরকেও পূর্ণতা দিতে পারেন)।

---

[১]. প্রাগুক্ত : আল কাহাফ, ১৮/২৮।

"কোনো ওলীকে প্রথম দর্শনে এবং কয়েকবার সাক্ষাতের পরও অজ্ঞ ও মিথ্যাবাদী লোকেরা চেনতে পারে না। তাদের উচিৎ তাদেরই আস্থাভাজন কাউকে জিজ্ঞাসা করা। সুরা নাহলের ৪৩ নং এবং সুরা আম্বিয়ার ৭ নং আয়াতে আল্লাহতা'আলা ঘোষণা করেন: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 'তোমরা যা জানো না, তা যারা জানেন তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করে শো[খো।[১]' একটা হাদীস ঘোষণা করে: 'অজ্ঞতা হতে নাজাত পাওয়ার উপায় হচ্ছে জ্ঞানীদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে শেখা' (হাদীস)। যে ব্যক্তি পীর-মুর্শিদ হিসেবে জ্ঞাত কোনো লোকের সোহবতে কয়েক বছর থাকার পরও নিজের কৃলবকে ভালোর দিকে পরিবর্তিত হতে দেখে না, তার উচিৎ ওই ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করা।

"ইমাম-এ-রব্বানী আহমদ আল-ফারুকী আস্ সিরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ঘোষণা করেন, 'হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বেসালের পরে সাহাবা-এ-কেরাম পর পর চারজন খলিফাকে নির্বাচন করেন। দুনিয়াবী বিষয়গুলোর ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে তাঁরা খলিফা নিযুক্ত করেন নি। তাঁদের বাতেনগুলোর পূর্ণতাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই তাঁরা তা করেছিলেন।'

"প্রশ্ন: কাফেরদের দ্বারা মূর্তি পূজাকে শিরক হিসেবে জানানোর জন্যে সুরা আরাফের আয়াতখানা ('আল্লাহ ছাড়া যে সব বস্তুর নিকট তোমরা প্রার্থনা করো, সেগুলো তোমাদের মতোই বান্দা। কাউকে সাহায্য করার ক্ষমতা তাদের নাই') নাযেল হয়েছে। আউলিয়াকে মূর্তি (মিনদুনিল্লাহ)-এর সঙ্গে তুলনা দেয়া কি ঠিক হবে?

"উত্তর: আয়াতটি বলে 'আল্লাহ ছাড়া', যার অর্থ: 'আল্লাহ ছাড়া সব কিছু' তবে ঝএকটা হাদীস ঘোষণা করে: 'আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম-কে স্মরণ (যিকর) করা এবাদত। সালেহীন (পুণ্যবান বান্দাগণ)-কে উল্লেখ করাতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত। মৃত্যুর কথা স্মরণ করা সাদাকা দেয়ার মতো। কবরের কথা স্মরণ তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে' (হাদীস)। হাদীসটি আবু নাসর দায়লামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কৃত 'মুসনাদ আল ফেরদউস' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। ইমাম দায়লামী আরেকটা হাদীস উদ্ধৃত করেন, যেটা ঘোষণা করে: 'আলীকে উল্লেখ ইবাদত বিশেষ (হাদীস)। এ সব হাদীসে 'যিকর' শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে তাদের উচ্চমর্যাদা, মহৎ গুণাবলী, হাল (আত্মিক উৎকর্ষ, ভাব) ও সন্দর নৈতিকতা সম্পর্কে আলোচনা করা। এভাবে তাঁদেরকে ভালোবাসার মানে

[১]. প্রাগুক্ত : আন নাহল, ১৬/৪৩।
ক. প্রাগুক্ত : আল আম্বিয়া, ২১/৭।

আল্লাহকেই ভালোবাসা। যারা এ সকল সালেহীন সম্পর্কে জানতে পারেন, তাঁরা তাঁদের মতোই হতে চেষ্টা করেন। আযান ও এক্বামতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম আল্লাহর নামের পরে উল্লেখ করা একটা এবাদত। সুরা এনশেরাহতে ইরশাদ হয়েছে, 'আপনার জন্যেই আপনার যিকিরকে আমি উচ্চমর্যাদা দিয়েছি' (আয়াত)। এই উৎকর্ষ একমাত্র রাসূল-এ-করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্যে নির্দিষ্ট। যদি কেউ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলে 'আলী ওলী-আল্লাহ' ওর সাথে যোগ করে, তবে তার জন্যে তাযির (শাস্তি)-ই বিহিত। নবী-এ-মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামের উল্লেখ শুধুমাত্র শরীয়তের প্রদর্শিত সীমারেখার অভ্যন্তরেই জায়েয।

"আসমত (নিষ্পাপ হওয়া) আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম-এর জন্যেই খাস। এর অর্থ, জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে কোনো কবীরা (বড়) অথবা সগীরা (ছোট) গুনাহ কখনো সংঘটন না করা। আউলিয়া 'আসমত'-এর অধিকারী বলাটা কুফর (তবে তাঁরা 'মাহফুয' তথা হেফাযতপ্রাপ্ত অনুবাদক)। অ-সাহাবী আউলিয়ার থেকে প্রত্যেক সাহাবী-ই উচ্চ মর্যাদাসম্পন। বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, 'রাসূল-এ-আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশে অশ্বে উপবিষ্ট হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ঘোড়ার নাকের মধ্যে যে ধুলিকণা প্রবেশ করেছে, তা উয়াইস ক্বরনী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও উমর বিন আব্দুল আযিয হতেও উত্তম।'

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা কোনো ওলীর রওযা শরীফ যিয়ারতের সুন্নাতগুলো হচ্ছে ওযু সহকারে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম [কিংবা ওই ওলী]-এর প্রতি সালাওয়াৎ পাঠ করা; সালাত, সিয়াম, সাদাকা ও কুরআন তেলাওয়াতের মতো সওয়াবদায়ক কাজের সওয়াবগুলো তাঁর প্রতি বখশিয়ে দেয়া, যাতে কোনো ব্যক্তির ক্বলব (তাঁকে ভালোবাসার জন্যে) তৈরি থাকে, তাঁকে ভালোবাসার উদ্দেশ্যে আল্লাহর কাছে আবেদন জানানো। যদি কোনো ব্যক্তি ওই ওলীর যিয়ারত করে, তবে সে তাঁর সঙ্গে নিজেকে সংশ্লিষ্ট (মানসুব) করেছে; তার উচিৎ ক্বলব থেকে দুনিয়াবী চিন্তা দূর করা এবং ওই ওলীর কাছ থেকে ;ফায়েয আশা করা।

"যারা দুনিয়াবী খ্যাতি ও ধন-সম্পদের স্বার্থে কোনো তরীকতের সঙ্গে নিজেদেরকে সংশ্লিষ্ট করে, তারা হচ্ছে শয়তানের চেলা। তারা মুসায়লামা আল কাযযাবের মতোই।

"আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত নেয়ামত, বরকত ও উচ্চ মর্যাদাসমূহ তাঁর মুরিদদের কাছে প্রকাশ করা কোনো ওলীর জন্যে জায়েয। একটা হাদীস ঘোষণা করে: 'আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত নেয়ামতসমূহ প্রকাশ করা সেগুলোর জন্যে শুকরিয়া আদায়েরই: দিকে আকর্ষণ (জাযব) করেন। এমতাবস্থায় এই সালেককে বলা হয় 'সালেক-এ-মজযুব'। আর সালেকে মজযুবের এ অগ্রগতিকে বলা হয় 'সায়ের-এ-আফাকী' (ঊর্ধ্বগমন); কারণ মুর্শিদে কামেল এই সালেকের নির্মলতা 'আলম-এ-মিসাল'-এর মধ্যে দেখে বুঝতে পারেন তখন। এ সায়ের (অগ্রগতি, ভ্রমণ) ভীষণ কষ্টকর এবং দীর্ঘকাল ধরে চলে। আল্লাহ পাক হযরত শাহ-এ-নক্বশবন্দ বাহাউদ্দীন আল বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে সুলুকের আগে জযবা নেয়ার জন্যে এলহাম (ঐশী প্রত্যাদেশ) দিয়েছিলেন। এই সাধনায় তাওয়াজ্জুহ্ সহকারে প্রথমে মুরিদকে প্রত্যেক লতিফায় যিকির পালন করানো হয় এবং প্রত্যেক লতিফার মাঝে লয়প্রাপ্তি ঘটে থাকে। এর নাম 'সায়ের-এ-আনফুসী'। সায়ের-এ আফাক্বীর অধিকাংশই সায়ের-এ-আনফুসীর সাথে সংঘটিত হয়। এরপর আসে নফস ও দেহকে নির্মল করার জন্যে রিয়াযত। এ অবস্থায় সালেককে বলা হয় 'মজযুব-এ-সালেক'। এ সায়ের সহজ এবং খুব তাড়াতাড়ি এর অগ্রগতি হয়। যারা ত্রুটিপূর্ণ এবং অজ্ঞ, হয় তারা মোটেও এগোয় না, নয়তো সামান্য এগোতে সক্ষম হয় নিজেদের এবাদত দ্বারা। কারণ তাদের এবাদতের সওয়াব যৎসামান্য। পঞ্চাশ বছর ধরে এবাদত করার পর হয়তো তারা বেলায়াতের সর্বনিম্ন পর্যায়ে উপনীত হতে পারে। অতএব, 'মুজাহাদা' (চেষ্টা) ও 'রিয়াযত' (সাধনা) করে বেলায়াত অর্জন করা যায় না। সুন্নাতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হলে এবাদত ও রিয়াযত সহায়ক হয়। সুতরাং বিদয়াত বর্জন করা অত্যাবশ্যক। একটা হাদীস ঘোষণা করে: 'নিজে আমল না করে কথা (উপদেশ) বললে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। (উত্তম) নিয়্যত ছাড়া সম্পাদিত কর্মও মকবুল (গ্রহণীয়) নয়। সুন্নাতের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হলে সেগুলোর কোনোটাই গ্রহণীয় হবে না।' অর্থাৎ, সেগুলোর কোনোটাই সওয়াব পাবে না। এবাদত ও রিয়াযত কষ্টদায়ক এবং সুকঠিন হওয়া উচিৎ নয়, বরং সুন্নাতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিৎ।

"প্রশ্ন: 'আমরা দেখি, যারা অত্যধিক রিয়াযত করে, তারা বেশ ভালোভাবে অগ্রসর হয় এবং তারা কাশফ-কারামত প্রদর্শন করতে পারে। আপনি এর কী ব্যাখ্যা দেবেন?

"উত্তর: বৈষয়িক ক্ষেত্রে রিয়াযতের মাধ্যমে কাশফ, কারামত ও তাসাররুফ অর্জন করা যায়। এ উদ্দেশ্যেই প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক ও হিন্দুস্তানী পুরোহিতরা কঠিন ব্রত পালন করতো। ওই ধরনের ফলাফলের প্রতি আল্লাহ-ওয়ালাগণ কোনো গুরুত্বই

আরোপ করেন না। একমাত্র সুন্নাতকে মান্য করেই নফসকে ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করা যায় এবং (অভ্যন্তরীণ) শয়তানকে হত্যা করা যায়।

"প্রশ্নঃ 'আপনার (উপরোক্ত) উত্তরের ইঙ্গিত অনুযায়ী, যে সব তরীকতে শুধুমাত্র রিয়াযত পালন করা হয়, সেগুলোর অনুসারীরা ওলী হতে পারে না। এটা কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

"উত্তরঃ সব তরীকত-ই সুন্নাতকে অনুসরণ করে। যদিও তাদের কোনো কোনোটার মধ্যে কিছু বিদয়াত পরিবেশিত হয়েছে, তবুও বহু ক্ষেত্রে তাদের দ্বারা সুন্নাতের অনুসরণ করাটা বিদয়াতের ক্ষতিকে অচল করে দিতে পারে। বিদয়াতের এই পরিবেশনা তাদের ইজতেহাদের ভুলের কারণেই হয়েছে। একজন মুজতাহিদের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমাযোগ্য। অজ্ঞ এবং মিথ্যাবাদীদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমাযোগ্য নয়, আর ওই ধরনের লোকেরা সব সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

"ত্রুটিযুক্ত কিংবা পূর্ণতাপ্রাপ্ত যে কোনো ব্যক্তি-ই আরও বেশি পূর্ণতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছ থেকে প্রচুর ফয়েয অর্জন করতে পারেন। কোনো পূর্ণতাপ্রাপ্ত শিক্ষকের (পীরের) সোহবতেই শুধুমাত্র বেলায়েত অর্জন করা সম্ভব। ত্রুটিযুক্ত অজ্ঞ লোকদেরকে ইজতিবার মাধ্যমে বেলায়াত অর্জনের জন্যে আকৃষ্ট করা যায় না, কারণ আল্লাহতা'আলার সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্কই নেই। একজন মুর্শিদ আল-কামেল আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত ফয়েয বিচ্ছুরণ করে মানুষদেরকে বেলায়েত অর্জনে সাহায্য করতে পারেন, যেহেতু তাঁর যাহির (বাহ্যিক দিক) খালক্ব (সৃষ্টি জগত)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং তাঁর বাতেন (অভ্যন্তর দিক) হক্ক (আল্লাহ)-এর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। সুরা ইসরার ৯৫ আয়াত ঘোষণা করেঃ

قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا.

–পৃথিবীতে হাঁটার জন্যে যদি ফেরেশতারা থাকতো, তাহলে আমি নবী হিসেবে একজন ফেরেশতাকেই পাঠাতাম।[১]

এই কারণেই হুজূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে তাঁর সঙ্গে বাহ্যতঃ কোনো সম্পর্ক না থাকার জন্যে প্রত্যেকে রওযায়ে আকদস থেকে ফয়েয অর্জন করতে সক্ষম নয়। তাই হক্কানী উলামা ও মুর্শিদগণের মাযার-রওযা থেকে ফয়েয অর্জিত হয়েছে। এঁরাই হলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-

[১]. আল কুর'আন : আল ইসরা, ১৭/৯৫।

এর ওয়ারিশ; হাদীস অনুযায়ী, এঁরাই যাহেরী ও বাতেনী এলমে শিক্ষিত, আর এঁরা-ই হলেন 'আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম-এর উত্তরাধিকারী' (হাদীস)।

"যে ব্যক্তি পূর্ণতা অর্জন করেন এবং ওলী হন, তিনি মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহর কাছ থেকে ফয়েয গ্রহণ করেন এবং এবাদত করে অগ্রসর হন। 'সাজদা করে নিকটবর্তী হোন'- আয়াতটি বেলায়তের এ অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করে। এই ধরনের একজন ওলী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আউলিয়ার মাযার-রওযা থেকে ফয়েয অর্জন করতে পারেন।

"সোহবতের কার্যকারিতার জন্যেই আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম মানুষের মধ্য হতে (মানুষের আকৃতিতে) প্রেরিত হয়েছিলেন। কেননা, ফেরেশতাদের মাধ্যমেও এ'তেকাদ ও ফিক্বহ'র জ্ঞান শেখা যায়। হাদীস আল জিবরীল [মওলানা পানিপথী কৃত এই বইটিতে সর্বপ্রথমে যে হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে, তা-ই হচ্ছে হাদীস-এ-জিবরীল] এই বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করে, যেখানে হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ফেরেশতা জিবরীল তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শেখাতে এসেছিলেন।' মুর্শিদের সঙ্গে একটা সম্পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা অত্যাবশ্যক, যাতে সোহবত কার্যকর হয় এবং তাঁর কাছ থেকে ফয়েয অর্জন করা যায়। আর বেলায়ত অর্জন করতে হলে এই প্রভাব একান্ত প্রয়োজন।

"নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা কোনো ওলীর রূহ্ মুবারক থেকে ফয়েয গ্রহণ করে বেলায়তের গুণাবলী অর্জন করেছেন এমন উচ্চ গুণাবলীসম্পন্ন ব্যক্তি খুব কমই হয়েছেন। এই ধরনের ব্যক্তিদেরকে বলা হয় 'ওয়াইসী'। সাহাবায়ে কেরামের সোহবতেও ফয়েয ছিল; কিন্তু এক সোহবত যথেষ্ট ছিল না, বহু সোহবতের প্রয়োজন ছিল। সাহাবাগণের পরবর্তী সময়ে আগত আউলিয়ার সোহবত তখনি কার্যকর হবে, যখন ওর সঙ্গে যুক্ত হবে রিয়াযত।

"আল্লা তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করার সময়েই তার মধ্যে আল্লাহকে জানার ও নৈকট্য লাভের সামর্থ্য (ইসতিদাদ) দিয়েছিলেন। ব্যক্তি বিশেষে এই সামর্থ্যের তারতম্য ঘটে থাকে।

"ফরয ও ওয়াজিব আমল পালন এবং হারাম ও মুশ্তাবিহাত পরিহার করার পর আল্লাহর যিকির পালন করাই সবচেয়ে কার্যকর নফল এবাদত। প্রত্যেকের তা পালন করা উচিত। একটা হাদীসে ইরশাদ করে, 'জান্নাতবাসীরা যে জিনিসের জন্যে সবচেয়ে বেশি অনুশোচনা বোধ করে, তা হচ্ছে তাদের দ্বারা এ পৃথিবীতে আল্লাহর যিকর হতে বিরত থাকার সময়টুকু' (হাদীস)। 'ফানা আন্ নাফস' অর্জনের আগে নাফিলা এবাদত পালন করে এবং কুরআন তেলাওয়াত করে

আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্তি অসম্ভব। একটা হাদীস ঘোষণা করে, 'সর্বশ্রেষ্ঠ যিকর হচ্ছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।' অতএব, অবসর সময়ে প্রত্যেকের উচিৎ এ কলেমা তাওহিদের বার বার যিকর করা। বাকি অবসর সময়টুকুতে প্রত্যেকের উচিৎ পরকালের ধ্যানমগ্ন সালেহীনগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এবং তাঁদের সোহবত লাভ করা। যদি কেউ সালেহীনগণের সাক্ষাৎ না পায়, তবে তার উচিৎ নয় বিদয়াতী, ফাসিক ও মুরতাদদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা, বরং তার উচিৎ সালেহীনের বইপত্র পড়া। দ্বীনের ক্ষেত্রে অজ্ঞ, দুনিয়াবী স্বার্থান্বেষী লোকদের কিংবা লা-মযহাবীদের সঙ্গে কৎফংধথা বলা তার উচিৎ নয়। ওই ধরনের লোকদের সঙ্গে কথা বলা তার বাতেনের জন্যে ক্ষতিকর। যিকির ও নাফিলা এবাদতের চেয়ে আউলিয়ার সোহবত লাভ করা অনেক বেশি উপকারী। যখন তাঁরা একে অপরের সাক্ষাৎ পেতেন, তখন সাহাবীগণ সব সময়ই বলতেন, 'আপনি কি কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে অবস্থান করবেন, যাতে আমি আমার ঈমানকে চাঙ্গা করে নিতে পারি?' হযরত মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন:

> 'আউলিয়ার উপস্থিতিতে ব্যয়িত সামান্য কিছু সময়,
> এক'শ বছরের তাক্বওয়ার চেয়েও কল্যাণময়।'
> খাজা ওবায়দুল্লাহ্ আহরার বলেন:
> 'যে কোনো সময় নাফিলা সালাত করা যায় আদায়,
> কিন্তু আমাদের সোহবত আর ফিরে পাওয়া নাহি যায়।'

"কোনো এক লোককে হযরত বায়েযীদ বোস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মসোহবত লাভের জন্যে পরামর্শ দেয়া হয়। সে বলে, 'আমি সব সময় আল্লাহর সোহবতে আছি।' তখন তাকে উত্তরে বলা হয়, 'বায়েযীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সোহবত তোমার জন্যে আরও অনেক বেশি উপকারী।' এর অর্থ হলো, ওই লোকের নিজ ইস্তিদাদ বা সামর্থ্য অনুপাতে এবং আল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্কের অনুপাতে সে আল্লাহর কাছ থেকে ফয়েয পাচ্ছে বটে, কিন্তু বায়েযীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সোহবতে সে তাঁর বেলায়াতের উচ্চমর্যাদার অনুপাতে আল্লাহর কাছ থেকে ফয়েয পাবে।

"একজন বাজে সঙ্গীর সঙ্গে কখনো কথা বলো না, সে একটি বিষাক্ত সাপের থেকেও খারাপ; পাপ তোমার প্রাণ নাশ করবে মাত্র, কিন্তু বদ সঙ্গী তোমার প্রাণ ও ঈমান সংহার করবে।" (মাওলানা সানাউল্লাহ পানিপথী কৃত পারসিক কিতাব 'ইরশাদুত্ তালেবীন' ১ম অধ্যায়ের উদ্ধৃতি শেষ হলো)

৩৪/ হযরত আবদুল গণী নাবলুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন: ”এবাদত পালনে প্রত্যেকের উচিৎ মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা; তাতে শিথিল হওয়াও যেমন উচিৎ নয়, ঠিক তেমনি মাত্রাতিরিক্ত এবাদত পালন করাও উচিৎ নয়। সুরা বাক্বারার ১৮৫ আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেন: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ। 'আল্লাহ তোমাদের জন্যে সহজ চান; তিনি তোমাদেরকে তকলিফ দিতে চান না।[১] এ কারণেই তিনি অসুস্থদেরকে এবং মুসাফিরদেরকে সিয়াম সাধনা না করার ব্যাপারে এক্তেয়ার দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে ভারী ও কষ্টদায়ক দায়িত্ব পালন করবার আদেশ দেন নি। যদি কোনো ব্যক্তির পক্ষে দুটো কাজের মধ্য থেকে একটাকে বেছে নিতে হয়, তাহলে তার জন্যে হাল্কা ও সহজতর কাজটা বেছে নেয়াই উত্তম। একদিন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শোনেন যে কেউ একজন ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে মসজিদে নামাজ পড়ছে। তিনি মসজিদে গিয়ে ওই লোকের দুই কাঁধ ধরে বললেন, ‘আল্লাহ এই উম্মতকে সহজ কাজ করতে দেখতে চান এবং তিনি কঠোর পরিশ্রমকে স্বীকৃতি দেন না’ (হাদীস)। এই উম্মতের জন্যে আল্লাহতা'আলা সহজ জিনিসগুলো আদেশ করেছেন। এই শরীয়তকে অনুসরণ করা খুবই সহজ। সুরাতুল মায়েদার ৮৭ নং আয়াত ঘোষণা করে: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ 'হে ঈমানদারেরা আল্লাহ যেসব সুন্দর জিনিসকে তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন, সেগুলোকে হারাম বলো না। আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।[২] একটা হাদীস ঘোষণা করে: 'আল্লাহ যেমনভাবে তোমাদেরকে আদিষ্ট বিষয়গুলো পালন করতে দেখতে পছন্দ করেন, তেমনিভাবে তাঁর অনুমতিপ্রাপ্ত বিষয়গুলোও পালিত হতে দেখতে পছন্দ করেন' (হাদীস)। জরুরাত বা প্রয়োজনের সময় ফরয পরিত্যাগ করা এবং হারাম সংঘটন করা একটা রূখসাত বা অনুমতি বিশেষ। অর্থাৎ, এর জন্যে কোনো আযাব দেয়া হবে না। এমন কি জরুরি অবস্থার সময়ও শরীয়ত পালনকে বলা হয় ‘আযিমাত’। কখনো কখনো ওই রকম আযিমাত পালন করা ভাল। উদাহরণস্বরূপ, প্রাণনাশের আশংকায় ঈমান গোপন না করা; যদি কেউ নিহত হয় তবে সে শহীদের মর্যাদা পাবে। আর কখনো কখনো রূখসাত পালন করা উত্তম; উদাহরণস্বরূপ, মুসাফিরের পক্ষে রোযা না রাখা।

---

[১].আল কুর‘আন : আল বাক্বারা, ২/১৮৫।

[২]. প্রাগুক্ত : আল মায়িদা, ৫/৮৭।

"শরীয়তের আমলকে এড়ানোর জন্যে রুখসাতের এবং চার মযহাবের সহজ পদ্ধতিগুলোর তালাশ করা এবং কারো বিষয়সমূহ সেগুলোর দ্বারা সহজেই সমাধা করা জায়েয নয়। এ রকম কাজকে বলা হয় 'তলফিক'। কিন্তু জরুরি প্রয়োজনের সময় মযহাব পরিবর্তন করা কিংবা অন্য আরেকটি মযহাব অনুযায়ী কিছু কাজ সম্পন্ন করা জায়েয। ফরয পরিত্যাগ কিংবা হারাম সংঘটন করার জন্যে ভাঁওতার আশ্রয় নেয়া হারাম। একে বলা হয় 'হিলা-এ-বাতিলা'। কিন্তু কোনো বিষয় ফরয অথবা হারাম হয়ে যাবার আগে তা হওয়াকে রহিত করা জায়েয। এই রহিতকরণকে বলা হয় 'আল হিলাত্ আশ্ শরীয়ত'। 'মুখতার' গ্রন্থের শরাহ (ব্যাখ্যা) 'ইখতিয়ার' পুস্তকে লেখা আছে: 'যদি রিয়াযত কিংবা স্বল্প পানাহার কাউকে ফরয পালনে (শারীরিকভাবে) দুর্বল করে ফেলে, তাহলে এটা না-জায়েয। কাজ করে নিজের ও স্ত্রী-সন্তানের জীবন ধারণের জন্যে উপার্জন করা এবং ঋণ পরিশোধ করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে ফরয। যে ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে কাজ করে, সে যদি মারা যায় তাহলে সে আযাব ভোগ করবে না। একটা হাদীস ঘোষণা করে, طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ 'প্রত্যেকের জন্যে নিজ নিজ জীবিকা অন্বেষণ করা ফরয' (হাদীস)। এর চেয়ে বেশি আয়ের জন্যে কাজ করা অনুমতিপ্রাপ্ত নয়। হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম গমের চাষ করতেন এবং রুটি বানাতেন। হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম একজন কাঠমিস্ত্রির কাজ করতেন। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম ছিলেন কাপড়ের ব্যবসায়ী। দাউদ আলাইহিস্ সালাম করতেন লোহার কাজ। সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম থলে সেলাই করতেন। আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কাপড়ের ব্যবসা করতেন। হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু করতেন জুতো প্রস্তুত ও জুতো মেরামত। হযরত উসমান যিন্নুরাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন খাদ্য আমদানিকারক। হযরত আলী (ক:) করতেন কায়িক পরিশ্রম। কোনো ব্যক্তির পক্ষে স্ত্রী-সন্তানের এক বছরের খোরাকি ওইভাবে উপার্জন করা মুবাহ (বৈধ)। মুসলিমদেরকে সাহায্য করার জন্যে এবং জিহাদ পালন করার জন্যে কঠোর পরিশ্রম করে উপার্জন করা মুস্তাহাব। একটা হাদীস ঘোষণা করে: 'মানব জাতির মধ্যে সেই ব্যক্তি-ই সর্বশ্রেষ্ঠ, যিনি মানবের জন্যে উপকারী' (হাদীস)। ('ইখতিয়ার' গ্রন্থের উদ্ধৃতির এখানে শেষ হলো)। প্রদর্শনোদ্দেশ্যে এবং গর্ব করার জন্যে উপার্জন করা মকরূহ। 'মুলতাকা' নামক বইয়ে লেখা আছে যে এটা হারাম। কাজ করাতে রিযক বৃদ্ধি পায় না। একমাত্র আল্লাহ-ই রিযিক মঞ্জুর করে থাকেন। কাজ করা আর কিছু নয় সাবাব তথা কারণসমূকে আঁকড়ে ধরা মাত্র, যা সুন্নতও বটে।

"শ্রম প্রদানকারীরা পাঁচ শ্রেণীর হয়ে থাকে। প্রথম শ্রেণীতে রয়েছে তারা যারা বিশ্বাস করে যে কাজের বদলে রিযক অর্জিত হয়। কাফেররা এ রকম বিশ্বাস করে। দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ বিশ্বাস করেন যে আল্লাহ-ই রিযক মঞ্জুর করেন এবং কাজ করাটা কারণসমূহকে আঁকড়ে ধরা ছাড়া আর কিছু নয়, আর তাঁরা কাজ করার সময় আল্লাহকে অমান্য করেন না; তাঁরা হারাম সংঘটন করেন না। এঁরা নিষ্ঠাবান পরহেযগার মুসলমান। তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা যদিও তারা বিশ্বাস করে আল্লাহ-ই রিযক-এর সংস্থান করে দেন, তবুও তারা কাজ করার সময় আল্লাহকে অমান্য করে; ফাসিক ঈমানদাররা এ শ্রেণীভুক্ত। চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরা বিশ্বাস করে যে রিযক আল্লাহ এবং তাদের কর্ম প্রচেষ্টা উভয়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে; মুশরিকরা এ শ্রেণীভুক্ত। পঞ্চম শ্রেণীভুক্ত লোকেরা জানে যে রিযক একমাত্র আল্লাহ-ই মঞ্জুর করে থাকেন, কিন্তু তিনি তা মঞ্জুর করবেন কিনা সে ব্যাপারে তারা সন্দিহান; এরা মুনাফেক।

"তাতারখানিয়া' নামক ফতওয়ার কেতাবে লেখা আছে যে খাদ্য গ্রহণ, বিয়ে-শাদী, হেঁটে বেড়ানো এবং হালাল রিযক অর্জন করার মতো কাজগুলো অবজ্ঞা করে নিজেকে মসজিদে কিংবা ঘরে আবদ্ধ করে রেখে সবসময় এবাদতে নিমগ্ন রাখা 'মাকরূহ-এ-তাহরিমা'।

"প্রশ্ন: ইসলামী উলামাবৃন্দের উপরোক্ত বক্তব্যগুলো মুতাসাউয়ীফগণের মন্তব্যের সঙ্গে খাপ খায় না, যে সব মন্তব্য কঠিন রিয়াযত ও বৈরাগ্যপূর্ণ জীবনকে প্রশংসা করে। এ দুটোর মধ্যে কোনটা উত্তম?

"উত্তর : কোনো কোনো মুতাসাউয়ীফ বলেছেন, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন নিজেকে ক্ষুধার্ত রাখতে পারবে, সে খোদায়ী রহস্য বুঝতে শুরু করবে। সাহল্ ইবনে আবদুল্লাহ প্রতি পনের দিনে একবার আহার করতেন। ইমাম আল্ গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, 'আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রতি ছয় দিনে এক বার আহার করতেন। হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রীতিমত চার'শ রাকাত নামায প্রত্যহ সমাপন করতেন। সাত বছর বয়সেই সাহল্ বিন আব্দুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কুরআনের হাফেজ হয়েছিলেন। তিনি প্রত্যেক দিনই রোজা রাখতেন এবং ১২ বছর যাবৎ শুধু যবের রুটি খেতেন। আবদুল ওয়াহহাব আশ্ শারানী মাগরেব ও এশার ওয়াক্তের মধ্যবর্তী দুই ঘণ্টা সময়ের মধ্যে একবার কুরআন খতম করতেন। এতে বিশ্বাস স্থাপন করার ব্যাপারে কারোরই কালক্ষেপণ করা উচিৎ নয়; আউলিয়ার রূহানী ক্ষমতা রয়েছে, আর রূহ মুহূর্তের মধ্যে বহু কিছু করতে পারে।'

“উলামাগণ ঘোষণা করেন যে কোনো ব্যক্তির উচিৎ নয় মাত্রাতিরিক্ত এবাদত পালন করে নিজেকে কষ্ট দেয়া। এই উম্মতের জন্যে নির্ধারিত সব ধরনের ফরয, ওয়াজিব কিংবা সুন্নাত পালনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত মন্তব্যটি প্রযোজ্য। উলামার ঘোষণানুযায়ী প্রত্যেক মুসলিমকেই আমল করতে হবে। মুতাসাউয়ীফগণের পালিত রিয়াযত হচ্ছে নাফিলা এবাদত। প্রত্যেক মুসলিমের তা পালন করা জরুরি নয়। কুরআন-এ-করীম ইরশাদ ফরমায়: ‘আল্লাহকে খুব বেশি করে ভয় করো।’ আল্লাহ তা’আলা বলেন, ‘যারা ঈমান এনে তওবা করার পর সওয়াবদায়ক কাজ করে, তাঁদের পাপগুলোকে আমি সওয়াবে পরিণত করে দেই। আল্লাহ গুণাহ মাফকারী এবং দয়ালু’ (আল আয়াত)। এ আয়াতটি ওয়াহশীর ক্ষেত্রে নাযেল হয় যিনি হযরত হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে হত্যা করেছিলেন। আয়াতখানা শ্রবণের পর ওয়াহশী বলেন, ’গুণাহ মাফের জন্যে কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়; আমার ভয় হয় আমি সে সব শর্ত পূরণ করতে পারবো না। এর থেকে কি সহজ কোনো পন্থা নেই?’ অতঃপর ‘শির্ক ছাড়া বান্দাদের আর যে কোনো পাপ আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছানুযায়ী মাফ করে দেবেন’- আয়াতটি নাযেল হয়। এতে ওয়াহ্শী বলেন, ‘আল্লাহ যদি আমাকে ক্ষমা না করার ইচ্ছা করেন, তাহলে আমি কী করবো?’ এরপর আল্লাহ ইরশাদ করেন, ‘হে আমার বান্দারা যারা নিজেদের নফসের প্রতি জুলুম করেছো আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হয়ো না আল্লাহ প্রত্যেকটি পাপই ক্ষমা করে থাকেন। তিনি গাফুরুর রাহীম’ (আল আয়াত)। এরপর ওয়াহশী বলেন, ‘এই শুভ সংবাদই আমার জন্যে যথেষ্ট’, এবং তিনি ইসলাম কবুল করেন। কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর সবার জন্যেই এ আয়াতটি শুভ সংবাদ। যাদেরকে ওযু করার জন্যে পানি খুঁজে না পেয়ে তায়াম্মুম করতে হয়, তাদের জন্যে আল্লাহ প্রথমে ঘোষণা করেন, ’পরিষ্কার মাটি দ্বারা তোমাদের হাত ও মুখ মসেহ করো’ (আয়াত)। কিন্তু পরে তিনি ঘোষণা করেন, ‘পরিষ্কার মাটি-মিশ্রিত হাত দ্বারা তোমরা তোমাদের হাত-মুখ মসেহ্ করো’ (আল-আয়াত)। মানুষদেরকে মাটি দ্বারা মসেহ করতে নিষেধ করে তিনি আদেশটিকে সহজ করে দিয়েছেন। আল্লাহ যখন তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জানালেন যে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাইলেই আল্লাহতা’আলা মক্কার পার্শ্ববর্তী পাহাড়গুলোকে স্বর্ণে পরিণত করে দিতে পারেন, তখন হুজূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর ওয়াস্তে এবং জ্বিহাদ পালনের জন্যে ওই পরিমাণ স্বর্ণ খরচ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি কষ্ট স্বীকার করতে চেয়েছিলেন। তবে তাবুকের যুদ্ধের আগে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের সাহায্য চান: ‘আমি তাকে জান্নাতের শুভ সংবাদ দিচ্ছি, যে ব্যক্তি এই

সৈন্যবাহিনীর চাহিদা মেটাবার জন্যে সচেষ্ট হবে।' বইপত্রে লিপিবদ্ধ আছে, রাসূল-এ-করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু দিন যাবৎ রোযা ভাঙ্গেন নি এবং (ক্ষুধার জ্বালা অনুভব না করার জন্যে) তাঁর পবিত্র তলপেটে ইট বেঁধে রেখেছিলেন। এটাও লিখিত আছে যে শেষ রাতে নামায পড়তে পড়তে তাঁর পা মোবারক ফুলে গিয়েছিল। তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণও অত্যধিক এবাদত করতেন। যেহেতু তিনি তাঁর উম্মতের প্রতি অত্যন্ত করুণাশীল ছিলেন, সেহেতু তাদেরকে কঠিন কাজ করতে দেখতে চান নি। তিনি তাঁর উম্মতকে 'রুখসাত' পালন করার আদেশ দিয়ে নিজে 'আযিমাত' পালন করেছেন। ইসলাম শুধু আদেশ-নিষেধের ধর্ম নয়; এটা রুখসাত ও আযিমাত-সমূহের সমষ্টি। 'আল্লাহ্ যে সব সুন্দর জিনিসকে তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন, সেগুলোকে হারাম বলো না'-এ আয়াতটির অর্থ, 'যে সব রুখসাতকে অনুমতি দেয়া হয়েছে, সেগুলোকে অস্বীকার করো না। রুখসাতকে হারাম না জেনে পরিহার করা তোমাদের জন্যে ভাল এবং এটা যুহদের পরিচায়ক। সেগুলোকে ব্যবহার করা ফিসক নয়।' 'যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে কবুল করে নেয় না, তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই'- হাদীসটির অর্থ, 'যে ব্যক্তি আমার জায়েয দেয়া জিনিসগুলোকে কবুল না করে কঠিন কাজ করে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।'

"তাসাউফের মহান ইমামগণ আযিমাতগুলো পছন্দ করেছেন বটে, কিন্তু তাঁরা রুখসাত পালনের অধিকারকে অস্বীকার করেন নি। হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মতো তাঁরাও সবাইকে রুখসাত পালন করার জন্যে আদেশ দিয়েছেন। তাসাউফ মানে কুরআন ও সুন্নাহ মান্য করা, বিদয়াত পরিহার করা, মহান মুতাসাউয়ীফগণের প্রতি তাযিম প্রদর্শন করা, প্রত্যেকের প্রতি ক্ষমাশীল হওয়া এবং রুখসাত নয় বরং আযিমাত অনুসারে সব কাজ সম্পন্ন করা। আহল-এ-সুন্নাতের উলামাবৃন্দ একটা হারাম সংঘটন থেকে বাঁচার জন্যে সত্তরটা হালাল পরিত্যাগ করতেও রাজি, কারণ তাঁরা আযিমাত ও ওয়ারা-এর সঙ্গে কর্ম সম্পাদন করে থাকেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঘোষণা করেন, 'আমরা একটা হারাম সংঘটনের চেয়ে সত্তরটা হালাল বর্জন করতেও রাজি আছি।'

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে আদেশ করেছিলেন, 'এবাদতের ব্যাপারে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যাতে হতে পারো, তার জন্যে ওয়ারা-এর সাথে তা পালন করো' (হাদীস)। এ হাদীস থেকে এ কথা বোঝা যায় যে ইসলাম শুধু রুখসাতের একটা পদ্ধতি কিংবা সব বিষয়ে মধ্যম পন্থা নয়, বরং আযিমাত, যুহদ ও ওয়ারাও ইসলামী ব্যবস্থা।

"রিয়াযত ও ক্ষুধা তাদের জন্যেই মাকরূহ তাহরিমা যারা তা সহ্য করতে পারে না এবং যাদের শরীর ও মস্তিক এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কারণ, কোনো ব্যক্তির পক্ষে নিজেকে বিপদগ্রস্ত করাটা হারাম। যাঁদের রূহানী ক্ষমতা এই বিপদকে রহিত করতে সক্ষম, তাঁদের জন্যে রিয়াযত পালন করা জায়েয এবং উপকারী।

"এ দিক থেকেও একজন মুরশিদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়: মুরিদের শারীরিক অবস্থা, চারিত্রিক ও রূহানী ক্ষমতা দেখে মুরশীদ তাকে তার সামর্থ্য অনুপাতে রিয়াযত পালনের আদেশ দেন এবং তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন। একজন মুরশিদ-এ-কামেল যেমন দ্বীনী ও রূহানী জ্ঞানের বিশারদ, ঠিক তেমনি শরীর-বিদ্যাতেও তিনি একজন বিশারদ। তিনি আমাদের আকা ও মাওলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন ওয়ারিশ ও সহকারী। মুরশিদগণ কর্তৃক প্রশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে কাউকেই কোনো ক্ষতি কিংবা বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে দেখা যায় নি। তাঁরা সবাই উন্নতি করেছেন এবং পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁদের কেউই তাসাউফের পথে অগ্রসর হওয়ার সময় শরীয়ত মান্য করাতে কোনো রকম শিথিলতা প্রদর্শন করেন নি। একটা ফরযকে অবহেলা করার মতো কোনো কাজ সংঘটন করা হারাম। মুরশিদ-এ-কামেল তাঁর মুরিদেরকে এই ধরনের হারাম সংঘটন করা থেকে রক্ষা করেন। এই কারণেই (মুরশিদের) অনুমতি নিয়ে নাফিলা এবাদত পালন করা জরুরি।

"রাসুল-এ-মক্বুবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের প্রতি অত্যন্ত করুণাশীল। তিনি মি'রাজ রজনীতে দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযকে পাঁচ ওয়াক্তে কমিয়ে আনার জন্যে আরয করেছিলেন। তিনি তাঁর সাহাবাদেরকে কঠোর রিয়াযত পালন করার অনুমতি দেননি যাতে তাঁর উম্মতের জন্যে ভারী আদেশ-নিষেধ জারি না হয়। এ কথা ধারণা করা যায় না যে তিনি তাঁর উম্মতকে উপকারী এবাদতগুলো সম্পর্কে জানান নি, কিংবা তিনি তাদেরকে তা পালন করা থেকে নিবৃত্ত করেছেন। তিনি সব এবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম উপকারী এবাদতগুলো তাদেরকে জানিয়েছেন এবং নিজে তা পালন করে উম্মতকে দিয়েও তা পালন করিয়েছেন। তিনি প্রকাশ্যে রূখসাতগুলো আমল করে তার উম্মতকেও পালন করতে আদেশ দিয়েছেন এবং উম্মতের যাতে উপকার হয় সেই অনুযায়ী তাদেরকে কঠোরতা কিংবা শিথিলতা ছাড়াই প্রকৃত বান্দা হওয়ার আদেশ দিয়েছেন। তবে তাঁর সাহাবা-এ-কেরামের মধ্যে শ্রেষ্ঠদেরকে তিনি গোপন এলম (মা'রেফত) এবং এবাদত শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআন ঘোষণা করে: 'আল্লাহকে ভয় করো। তিনি তোমাদেরকে বহু বিষয় শিক্ষা দেবেন' (আয়াত)। এগুলো খোদায়ী

মারেফাত ও গোপন এলম। একটা হাদীস ইরশাদ ফরমায়: 'জ্ঞানের সূক্ষ্ম ও গোপন ভিত্তিসমূহ আছে। শুধু আল্লাহ্-ওয়ালাগণই তা জানেন; তাঁরা যদি তা প্রকাশ করে দেন, তাহলে অজ্ঞরা তাঁদেরকে বিশ্বাস করবে না' (হাদিস)।

“ইমাম ক্বসতলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কৃত 'আল মাওয়াহিব' পুস্তকটিতে উদ্ধৃত মি'রাজের হাদীসটি ঘোষণা করে: 'আমার রব (খোদাতা'আলা) আমাকে তিনটি ভিন্ন ধরনের জ্ঞান শিখিয়েছেন। প্রথমটি কারও কাছে প্রকাশ করতে তিনি আমাকে নিষেধ করেছেন, কারণ আমি ছাড়া আর কেউই এই জ্ঞান বুঝতে পারবে না। তিনি বলেন, দ্বিতীয় ধরনের জ্ঞানটি আপনার যাকে ইচ্ছা তাকে জানাতে পারবেন; আর তৃতীয়টি আপনার সকল উম্মতকে শিক্ষা দেবেন' (হাদীস)। এটা নিশ্চিত যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা ঘোষণা করেন নি 'আল্লাহ আমাকে যে এলমটা জানিয়েছেন সেটাই একমাত্র এলম যা সমস্ত উম্মতকে জানানোর জন্যে আদেশ দেয়া হয়েছে।' তিনি বলেছেন যে, আরও দুটো সত্য এলম আছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দ্বিতীয় যে জ্ঞানটা তাঁর যাকে ইচ্ছা তাকে শেখাবার অনুমতি দেয়া হয়েছে, সেটা হচ্ছে বেলায়াত বা তাসাউফের এলম। এ জ্ঞানটা বাতেন ও শরীয়তের বাস্তবতা নিয়ে ব্যাপৃত, আর এটা একমাত্র তাকওয়ার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। হযরত খিযির আলাইহিস্ সালাম-এর দিকে ইশারা করে একটা আয়াত ইরশাদ ফরমায়: وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا 'আমি তাকে (খিযিরকে) এলম দান করেছিলাম'।[১] এ আয়াতটি বেলায়াতের জ্ঞানের দিকে ইঙ্গিত করে। শরীয়তের জ্ঞান যেটা সবার কাছে প্রকাশ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, সেটা যেমনভাবে হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র বাণী ও আমলের সংকলন, ঠিক তেমনিভাবে বেলায়াতের মা'রেফতসমূহ-ও তাঁর ক্বলব মোবারক থেকে উম্মতের ক্বলবসমূহে প্রবাহমান। এ কারণেই হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে দুটো জ্ঞানের পাত্র পূর্ণ করেছি। একটা তোমাদের মাঝে বিতরণ করেছি; দ্বিতীয়টি যদি তোমাদেরকে জানাই, তাহলে তোমরা তা বুঝতে না পেরে আমাকে হত্যা করবে।' প্রথম এলমটি হচ্ছে এলম্ আয্ যাহির, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে এলম্ আল্ বাতেন। শুধু আউলিয়া ও সিদ্দিক্বগণই শেষের জ্ঞানটি জানেন।

[১] . আল কুর'আন : আল কাহাফ, ১৮/৬৪।

"এলম আল-বাতেন অর্জন করার জন্যে সূফীগণ রিয়াযত-মুজাহাদা পালন করেন। এলম্ আয্ যাহের-এ যেমন ভন্ড আলেম আছে, ঠিক তেমনি তাসাউফেও ভন্ড এবং বদ নিয়্যত-সম্পন্ন লোক আছে, যারা এই নিয়ামতপূর্ণ পথকে নিজেদের দুনিয়াবী স্বার্থে ব্যবহার করে থাকে। তাদের দ্বারা ধোকাপ্রাপ্ত না হওয়ার জন্যে তাদের মতো মিথ্যুকদেরকে চেনে রাখা অত্যাবশ্যক। অতএব, প্রত্যেকের উচিৎ শরীয়তকে ভালভাবে শিক্ষা করা, যেহেতু সত্য-মিথ্যা যাচাই করার একমাত্র কষ্টিপাথর হচ্ছে শরীয়ত। যে ব্যক্তি শরীয়তের তাবেদারী করে, তার পক্ষে তাসাউফ-এর পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করা অতি উত্তম এবং উপকারী। তবে এ পথে অগ্রসর হওয়ার জন্যে একজন মুর্শিদ-এ-কামেলের তত্ত্বাবধান একান্ত অপরিহার্য। একজন মুরশিদ আল কামেল হচ্ছেন ক্বলব ও রূহের বিশেষজ্ঞ। তিনি তালেবের (ভক্তের) ক্বলবের রোগের ডায়াগনোসিস করে তার জন্যে যথাযথ রিয়াযত ও যিকির বেছে নেন এবং তা পালন করতে তাকে আদেশ দেন। আল্লাহতা'আলা ঘোষণা করেন: 'তাদের কলবসমূহ রোগাক্রান্ত।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সোহবত সেই ব্যাধি নিরাময় করে এবং সাহাবাগণের জন্যে তখন আর কোনো রিয়াযতের প্রয়োজন ছিল না; কারণ তাঁরা হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সোহবতের মাধ্যমে তাঁর পবিত্র ক্বলব মুবারক থেকে ফয়েয গ্রহণ করে তাসাউফের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন; ফলে তাঁদের পরে আগত সকল ওলীগণের চাইতে তাঁরা শ্রেষ্ঠ হতে সক্ষম হয়েছিলেন। যাঁরা সাহাবা-এ-কেরামের পরে আগমন করেছেন তাঁরা যেহেতু হুজূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সোহবত লাভের সুযোগ পান নি, সেহেতু তাঁরা ক্বলবের ব্যাধি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে কঠিন রিয়াযত পালন করেছেন। ইলম্ আয্ যাহিরের থেকে পৃথকভাবে ইলম আল বাতিনের উদ্ভব হয় না; যাঁরা উভয় এলম অর্জন করতে সক্ষম হন, তাঁদেরকেই 'উলামা আর রাসিখীন' বলা হয়। শুধু এ সকল উলামা-ই হচ্ছেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তরাধিকারী। যাঁরা রিয়াযতের মাধ্যমে ক্বলবের রোগ নিরাময় করেন, তাঁরা বাতেন অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গেই রিয়াযত ছেড়ে দেন। তাঁরা শুধু ফরয ও সুন্নাত পালন করেন এরপর। তাঁরা সাহাবা-এ-কেরামের মতোই তাঁদের বাতেন তথা ক্বলব দ্বারা আল্লাহর এবাদত পালন করেন। এমন কি তাঁদের কৃত ব্যবসা-বাণিজ্যও তাঁদের বাতেনী এবাদতকে বিপর্যস্ত করতে পারে না। তাঁরা এক মুহূর্তের জন্যেও আল্লাহকে ভোলেন না। তাঁদেরকে কুরআনে প্রশংসা করা হয়েছে এই বলে: 'ক্রয়-বিক্রয় তাঁদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে বিরত রাখে না' (আয়াত)। সাহাবা-এ-কেরাম রিয়াযত পালন করে খুব সহজেই এবং খুব তাড়াতাড়ি এই উচ্চ

পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন। হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রথম সোহবতেই এই পর্যায়ে উন্নীত হন। যদি সাহাবা-এ-কেরামকে কঠোর রিয়াযত পালন করার অনুমতি দেয়া হতো, তাহলে শরীয়তের উলামাগণ এবং আয়েম্মা-এ-মযাহীবগণ তাঁদের বইপত্রে সাহাবাগণের রিয়াযতের কথা লিপিবদ্ধ করতেন এবং তখন সকল মুসলিমকেই সাহাবা-এ-কেরামের অনুরূপ রিয়াযত পালন করতে হতো।

"মুহাদ্দীস মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ হাকিম নিশাপূরী কৃত 'মুসতাদরাক' গ্রন্থে উদ্ধৃত একটা হাদীস ঘোষণা করে: 'দাজ্জালের সময়কার ঈমানদার (বিশ্বাসী)-দের দ্বারা (আল্লাহর) প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণাই হবে তাদের খাদ্য, যেমনভাবে তা হয়ে থাকে ফেরেশতাদের খাদ্য। আল্লাহ তাদের ক্ষুধা মিটিয়ে দেবেন যারা ওই সময় প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করবে' (হাদীস)। এটা প্রতিভাত করে যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে এমনই একটা হালের মধ্যে রাখতে পারেন, যেটাতে বান্দার পানাহারের প্রয়োজন হয় না এবং আরও প্রতিভাত করে যে তিনি সকল বিশ্বাসী বান্দাকেই সে সময় এই হাল মন্‌জুর করবেন। দাজ্জালের শয়তানী ক্রিয়াকলাপের মধ্যে একটা হবে এই যে, সে যেখানেই যাবে সেখানেই বলবে 'আমার এবাদত করো এবং আমাকে মান্য করো।' যদি মানুষেরা তাকে মান্য করে, তবে সে আকাশ ও পৃথিবীকে আদেশ দেবে এবং তখন বৃষ্টি হবে আর শষ্য ফলবে। কিন্তু যদি মানুষেরা তাকে না মানে তাহলে সে বৃষ্টি হতে নিষেধ করবে এবং এর কারণে শস্যও ফলবে না, আর মানুষেরা ক্ষুধা দ্বারা আক্রান্ত হবে। উপরোক্ত হাদীসটি ব্যক্ত করে যে দাজ্জালের এই বদমায়েশী ঈমানদারদের ক্ষতি করতে পারবে না; তারা আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণার মাধ্যমে ক্ষুধা হতে রক্ষা পাবে।

"কারও উচিৎ নয় এ কথা ধারণা করা যে যুহদ, ধৈর্য, রিয়াযত ও ক্ষুধা শরীয়তের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। কারণ, কেবলমাত্র দেহের প্রতি ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক জিনিসগুলোকেই শরিয়ত নিষেধ করেছে। এসব রিয়াযত সূফীগণের জন্যে ক্ষতিকর নয়। শরীয়তের প্রত্যেকটি আদেশের মতো এগুলোও নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত দ্বীন ইসলামের অংশ বটে। এসব রিয়াযতকে এবং এগুলোর সংঘটনকারী আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে অস্বীকার করা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের একটা অংশকে অস্বীকার করারই নামান্তর।

"কারও উচিৎ নয় এ কথা ধারণা করা যে যেহেতু সূফীগণ কঠিন রিয়াযত পালন করে থাকেন, সেহেতু তাঁরা নবীগণের কিংবা এমন কি সাহাবাগণের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

আবার কোনো ওলীর কুৎসা রটনা করাও কারো উচিৎ নয়। আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে অসমর্থ কোনো ব্যক্তির উচিৎ নিজের সেই সব ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে জানা, যেগুলোর কারণে সে আউলিয়ার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে। একটা হাদীস ঘোষণা করে: 'শুভ সংবাদ সেই ব্যক্তর প্রতি, যে নাকি নিজের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে চিন্তা করতে করতে অন্যান্যদের দোষ তালাশ করার সময় পায় না' (হাদীস)। সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ আত-তুসতারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন: 'একজন মুসলিমকে সন্দেহের চোখের দেখা হচ্ছে সর্ব নিকৃষ্ট পাপ। অধিকাংশ লোকই এটাকে গুনাহ হিসেবে মনে করে না এবং এর থেকে তওবা-ও করে না।' শরীয়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত কোনো যুক্তি ছাড়াই যদি কেউ শুধু একজন ওলীর কুৎসা রটনা করে, তবে তার দ্বারা (অন্যান্য) সকল আউলিয়ার প্রতি প্রদর্শিত তাযিম ও কৃত প্রশংসা কোনো কাজে আসবে না। যে ব্যক্তি সকল ওলিকে গ্রহণ ও স্বীকার করে নেয় না, সে ওলি হতে পারে না। যদি কেউ সন্দেহের চোখে দেখে কোনো ওলী-আল্লাহকে অন্তরে মর্মাহত করে, তবে সে বস্তুতপক্ষে ইসলামেরই একটা অংশকে গালমন্দ করবে। হযরত শায়খ আবুল মাওয়াহিব শাযিলী বলেছেন: 'যে ব্যক্তি তার সময়কার আউলিয়াকে তাযিম করে না, তাকে সাথেই সাথেই আউলিয়ার তালিকা থেকে বরখাস্ত করা হয়।' শায়খুল আকবর হযরত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ঘোষণা করেন, 'তাসাউফের মহান ইমামগণের অধিকাংশই বলেছেন যে আউলিয়া ও সে সকল উলামা যারা তাঁদের এলমকে আমল করেন, তাঁদের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হওয়া কুফরের জন্ম দেয়।' হযরত আলী খাওয়াস বলেছেন যে কোনো ওলী কিংবা আলেমের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে প্রত্যেকের দূরে থাকা উচিৎ। কোনো ওলী কিংবা আলেমের বিরাধিতা করা গোমরাহী, যেটা একজন ব্যক্তিকে তার ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

"আল্লাহ তা'আলার ওলী হচ্ছেন সেই সকল উলামা যাঁরা তাঁদের এলমের আ'মিল (আমলকারী)। কৃলব কিংবা জিহ্বা দ্বারা কোনো জীবিত কিংবা বেসালপ্রাপ্ত ওলীকে অস্বীকার করা একটা নিশ্চিত কুফর। মুসলমানদের সকল মযহাবের ঐকমত্য (ইজমায়ে উম্মত) অনুসারে যে ব্যক্তি কোনো ওলীকে অস্বীকার করে, সে কাফেরে পরিণত হয়; কেননা এটা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীয়ত ও দ্বীন ইসলামকে অস্বীকারেরই নামান্তর। একজন অজ্ঞ ও বোকা লোক হয়তো তার অস্বীকৃতি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল নাও থাকতে পারে এবং সে হয়তো ভাবতে পারে যে সে কোনো 'কুসংস্কার' কিংবা 'বিদআত' কিংবা তার দৃষ্টিতে অবাঞ্চিত কোনো জিনিসকে অস্বীকার করছে, কিন্তু আউলিয়াকে ফাসিক, কাফির,

অথবা যিনদিক আখ্যা দিয়ে এবং তাদের কথা ও আমলকে ভুল বুঝে সে নিজের ধ্বংস ডেকে আনছে তবে বাস্তবিকভাবে সে যা কিছুর সমালোচনা করছে তার থেকে আল্লাহর আউলিয়া বহু ঊর্ধ্বে। তাঁদের কথা ও আমল শরীয়তের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং সেগুলো তা'আত (পায়রবী) ও কুরবাত (নৈকট্য)। কিন্তু আউলিয়ার এলম এবং সিদ্দিকগণের মা'রেফতকে বুঝতে ব্যর্থ হয়ে ওই অজ্ঞ ব্যক্তি একগুঁয়ে মনোভাব গ্রহণ করেছে। তার কৃলব মৃত এবং সে সত্যকে প্রত্যক্ষ করতে পারছে না। তাই সে কুফর, বিচ্যুতি, গোমরাহী ও মুনাফেকীর গভীর গর্তে পতিত হয়েছে। সে মনে করছে যে সে একজন তাওহীদপন্থী, তা'আত-সম্পন্ন ব্যক্তি, যে নাকি মনুষ্য জাতিকে নূর বিচ্ছুরণের মাধ্যমে নূরানী [জ্যোতির্ময়] করে দেবে। পরকালে তাকে তার কুফরের জন্যে মর্মন্তুদ আযাব দেয়া হবে এবং সে তার আত্যাচার ও কুৎসার জন্যে চরম শাস্তি পাবে। সে কিন্তু নিজেকে এবং তার মতাদর্শে বিশ্বাসী লোকদেরকে কাফের আখ্যায়িত করছে না, যেহেতু তারা সবাই এই অস্বীকৃতিতে একজোট হয়ে আছে এবং নিজেদেরকে মুসলিম মনে করছে। পক্ষান্তরে, মুসলিমগণের কাছে তারাই কাফের। কারণ, আল্লাহর আউলিয়া ও তাঁদের হালগুলোকে মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন। বেলায়তে যারা অস্বীকার করে তাদের জন্যে সেটাকে না বোঝার এবং না জানার কোনো ওজর নেই, যেহেতু শরীয়তকে না জানার কোনো ওজর নেই। তাদের দ্বারা আউলিয়াকে ভুল বোঝা বস্তুতপক্ষে ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মূর্তিপূজারীদের দ্বারা হুজূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্য ধর্মকে অস্বীকার করার অনুরূপ। অমুলিমদের যেমনভাবে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কোনো ওজর নেই, ঠিক তেমনিভাবে (বেলায়ত) সম্পর্কে ওই সব লোকের অজ্ঞতারও কোনো ওজর নেই।

"শরীয়তের একটা আইনকে অস্বীকার করার মতো আল্লাহর আউলিয়াকে অস্বীকার করাও কুফর। শরীয়ত অস্বীকারকারী মুরতাদ (ধর্মত্যাগী)-এর প্রতি যে শাস্তি দেয়া হবে, সেই একই শাস্তি আউলিয়ার অস্বীকারকারীর ওপরও বর্তাবে। কিন্তু তাকে প্রথমে তার অস্বীকৃতি ও গোমরাহী থেকে তওবা করার সুযোগ দেয়া হবে।

"আল্লাহ তাঁর আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম ও আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে অন্যান্য মানুষের চেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন জ্ঞান করেছেন এবং তাই তিনি তাঁদেরকে এমন সব নেয়ামত দান করেছেন যেগুলো অন্যান্যদের দেন নি। প্রত্যেক মানুষের ক্ষমতার আওতাধীন কাজ যখন সে করতে চায়, তখন আল্লাহ এরাদা (ইচ্ছা) করলে তা সৃষ্টি করে দেন। মানুষ যা চায় তা যদি তিনি এরাদা না করেন, তাহলে তিনি তা সৃষ্টি করে দেন না। মানুষের কিছু বিশেষ ইচ্ছা তিনি সব সময় এরাদা করেন এবং সৃষ্টি করে দেন; উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ তার হাত তুলতে কিংবা

চোখ টিপতে চায়, তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গেই তা এরাদা করেন এবং সৃষ্টি করে দেন; এ ধরনের ইচ্ছা খুব কম সময়ই তিনি সৃষ্টি না করার এরাদা করে থাকেন। মানুষের আরও কিছু ইচ্ছা আছে যেগুলো তিনি খুব কমই সৃষ্টি করার এরাদা করেন এবং সাধারণতঃ তিনি এরাদা ও সৃষ্টি করেন না। এ পৃথিবীতে আমাদের অধিকাংশ ইচ্ছাই এই ধরনের। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের জন্যে এ অবস্থা এক রকম নয়, যা প্রত্যক্ষ করা হয়। অতএব, আল্লাহ তাঁর আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম ও আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর অধিকাংশ ইচ্ছা-ই সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি করে দেন। এ যেন হাত তোলা কিংবা চোখ টেপার মতোই ইচ্ছা। এটা তাঁদের প্রতি আল্লাহর এক বড় নেয়ামত। এ ক্ষেত্রে আউলিয়ার একে অপরের মধ্যে পার্থক্য বিরাজমান এবং কোনো ওলী-ই একজন নবী আলাইহিস্ সালাম-এর পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছুতে পারেন না। আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দুনিয়াবী কোনো কিছু আশা করেন না, কারণ তাঁদের কেউই দুনিয়াকে মূল্যবান মনে করেন না। আর দুনিয়ার যা-ই কিছু তাঁরা কামনা করেন, তা-ও আল্লাহ ও আখেরাতের ওয়াস্তে হয়ে থাকে” [১]।

আল্লাহর আউলিয়াবৃন্দ বহু শতাব্দী আগেই কারামতস্বরূপ ওয়াহাবীদের আগমন সম্পর্কে এ মর্মে জানতে পেরেছিলেন যে, ওহাবীরা আউলিয়াকে অস্বীকার করে মুরতাদ হয়ে যাবে। মুসলিমগণ যাতে ওহাবীদের ধোকায় পড়ে পথভ্রষ্ট না হন, সেই জন্যে তাঁরা প্রয়োজনীয় সব কিছু লিখে রেখে গিয়েছেন। আউলিয়াকে বিশ্বাস করার জন্যে এই কারামত কি যথেষ্ট নয়?

৩৫/ হযরত আবদুল গণী নাবলুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরও লিখেছেন:

”যারা ইলম আয্ যাহিরের সামান্য কিছু জিনিস শিখতে পেরেছে অথচ ইলম আল্ বাতিনের কিছুই জানে না, তারা যখন তাসাউফের বইপত্র পড়ে তখন তারা আ'রিফগণের কথাবার্তাকে কুফর ও গোমরাহী মনে করে। মা'রেফাতের জ্ঞানকে না বুঝতে পেরেই তারা তা অবিশ্বাস করে বসে। ফলে তারা হযরত মুহিউদ্দীন ইবনে আরবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, শায়খ উমর ইবনিল ফরিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইবনে সাবঈন ইশবিলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, আফিফউদ্দীন তালামসানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, হযরত গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, মওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, সাইয়েদ আহমদ আল বদাউয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, শায়খ আহমদ তিজানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, আবদুল ওয়াহহাব শারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং শারাফ আদ্ দীন আল বুসীরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতো মহান তাসাউফের

---

[১]. হাদিকাতুন নাদিয়া : ১/১৯০, ইস্তাম্বুল ১৯২০ সংস্করণ।

ইমামগণকে অস্বীকার ও ঘৃণা করে থাকে। এলম আল্ বাতেনকে অবিশ্বাস করে তারা প্রকৃতপক্ষে হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শরীয়তের অভ্যন্তরীন দিকগুলোকে অবিশ্বাস করে। এই ধরনের লোকদেরকে বলা হয় আহল-এ-বিদা' কিংবা আহল-এ-দালালাত। যদিও তাদেরকে দেখতে লাগে ঈমানদারদের মতোই, তবুও তারা আসলে মুনাফেক। আস্ সৈয়ুতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও খতিব বর্ণিত একটা হাদীস ঘোষণা করেঃ 'দ্বীনি জ্ঞান দু'ভাগে বিভক্ত; ওর একটি ভাগ কলব্ (অন্তর)-এর জন্যে প্রয়োজনীয় এলম দ্বারা গঠিত। দ্বিতীয়টা হচ্ছে যাহিরী এলম, যেটা মৌখিকভাবে প্রকাশ করা যায়' (হাদীস)। ইমাম সৈয়ুতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম দায়লামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণিত অপর এক হাদীস ইরশাদ ফরমায়: 'এলম-এ-বাতেন হচ্ছে আল্লাহর রহস্যগুলোর মধ্যে একটা রহস্য বিশেষ। এটা তাঁর আদেশও বটে। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাঁকে ইচ্ছা তাঁকে তাঁর কলবের মধ্যে এটা মঞ্জুর করে থাকেন' (হাদীস)। ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইলম-এ-যাহিরের অধিকারী, সে ইলম আল্ বাতিন অর্জন করতে সক্ষম। যে ব্যক্তি এলম আয্ যাহির-এর অধিকারী, সে যদি তার এলমের আ'মিল তথা আমলকারী হয়, তবে আল্লাহ তাকে ইলম আল্ বাতিন মঞ্জুর করেন।' আলী ইবনে মুহাম্মদ ওয়াফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর আ'রিফানা (ঐশী জ্ঞানসমৃদ্ধ) মন্তব্যসমূহ শ্রবণ করে ইমাম উমর বুলকিনি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আশ্চর্যান্বিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এ সব জিনিস কোত্থেকে শিখেছেন?' আলী বিন মুহাম্মদ ওয়াফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রত্যুত্তরে একটা আয়াত তেলাওয়াত করেন, যেটা ঘোষণা করেঃ 'আল্লাহকে ভয় করো। যাঁরা আল্লাহকে ভয় করেন, তাঁদেরকে আল্লাহ তাঁদের অজ্ঞাত বিষয়সমূহ শিক্ষা দেন' (আল আয়াত)। হযরত আবু তালেব মক্কী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু লিখেছেনঃ 'দেহ ও কলব যেমন এক সঙ্গে থাকে, ঠিক তেমনি এলম আয্ যাহির এবং এলম আল্ বাতেন-ও এক সঙ্গে থাকে, পৃথক হয় না। বাতেনী জ্ঞান আ'রিফের কলব থেকে অন্যান্যদের কলবে প্রবাহিত হয়। যাহেরী জ্ঞান একজন আলেমের প্রভাষণের মাধ্যমে শিখতে হয়।' এটা কান পর্যন্ত পৌঁছে, কিন্তু কলবে প্রবেশ করে না। একটা হাদীস ঘোষণা করেঃ

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-

'উলামাবৃন্দ হচ্ছেন আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম-এর উত্তরাধিকারী'।[১]

---

[১]. ইব্ন মাজাহ : আস সুনান, বাবু ফাদ্বলিল উলামা ১/৮১ হাদীস নং ২২৩।
ক. আবূ দাউদ : আস সুনান, বাবুল হাছছি আলা তৃলাবিল ইল্ম ৩/৩১৭ হাদীস নং ৩৬৪১।
খ. তিরমিযী : আস সুনান, বাবু মা জা'আ ফি ফদ্বলিল ফিক্বহ, ৫/৪৮ হাদীস নং ২৬৮২।

হাদীসে উল্লেখিত 'উলামা' কিন্তু সে সব আলেম নয়, যারা এলমুয্ যাহির অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে কেবল, বরং হাদীসটিতে সেই সকল উলামাকে বোঝানো হয়েছে যাঁরা তাঁদের এলমের ওপর আমল করেছেন এবং তাকওয়া ও আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম-গণের প্রতি মন্‌জুরকৃত সকল এলম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। যেহেতু শুধুমাত্র এলম আয্ যাহেরের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ তাদের নিয়্যতে খালেস হয় নি এবং যেহেতু শাহ্‌ওয়াতের (কামভাবের) কবল থেকে এখনও রক্ষা পায় নি, সেহেতু বাতেনী এলমের নূর তাদের কলব্ ও মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে পারে নি। দোযখের আগুন-ই তাদের কলব ও মস্তিষ্ককে পরিষ্কার করে দেবে। ইমাম মানাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কথা উদ্ধৃত করেন: 'আখেরাত সংক্রান্ত জ্ঞান দু'ধরনের। প্রথমটি কাশফের মাধ্যমে অর্জন করা যায় এবং একে বলা হয় 'ইলমুল মুকাশাফা' কিংবা 'এলমুল বাতেন'। অন্যান্য সব জ্ঞান কেবলমাত্র এই জ্ঞান অর্জন করার বাহন। দ্বিতীয় ধরনের জ্ঞানকে বলা হয় 'ইলমুল মু'আমল'। অধিকাংশ আ'রিফের মতানুযায়ী, যারা এলম আল বাতেনের কোনো অংশ অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাদের জন্যে কাফের হয়ে মরার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এই এলমের ন্যূনতম অংশ হচ্ছে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক এতে বিশ্বাস করা। বিদয়াতী অথবা দাম্ভিকদের ভাগ্যে এটা জোটে না। আর যারা দুনিয়ার মোহাচ্ছন্ন হয়েছে এবং নফসানীয়াতের অনুসরণ করেছে, তারাও এলম আল্ বাতেন অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে, যদিও তারা অত্যন্ত উচ্চ শিক্ষিত ছিল। এলম আল্ বাতেন এমন এক নূর যা নির্মল কলবসমূহে দেখা দেয়। আমাদের নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: 'এমন কিছু এলম আছে যেগুলো অত্যন্ত গোপনীয়; একমাত্র মা'রেফতের ব্যক্তিবর্গই সেগুলো জানেন' (হাদীস)। এ হাদীসটি এলম আল্ বাতেনের দিকে ইশারা করে। ইলম আয্ যাহির যা ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতে ইলম আল বাতেন অর্জনের একটা মাধ্যমবিশেষ, সেটাই হচ্ছে বর্তমান সময় পর্যন্ত আমলকৃত ও জ্ঞাত (শরীয়তের) এলম। দুনিয়াবী খ্যাতি ও ধন-সম্পদ অর্জনের জন্যে যে এলম বর্তমানে শেখা হয়, সেটা কিন্তু এলম আয্ যাহির নয়। 'এলম আল হাল' নামক জ্ঞান, যা কোনো ব্যক্তি কর্তৃক শরীয়তের আদেশ-নিষেধ মেনে চলার জন্যে একান্ত আবশ্যক, সেটা অল্প সময়ে খুব সহজেই শিক্ষা করা যায়; আর 'এলম আল হাল' আমলের মাধ্যমেই এলম আল্ বাতেনের উদ্ভব হতে পারে।

---

গ. ইব্‌ন হিব্বান : আস সহীহ, যিকরু ওয়াসফিল উলামা, ১/২৮৯ হাদীস নং ৮৮।

ঘ. বায়হাক্বী : শু'য়াবুল ঈমান, ৩/২২২।

ঙ. দারেমী : আস সুনান, ১/৩৮৪ হাদীস ন ং ৩৫১।

“ধর্মীয় পদে সমাসীন যে সকল ব্যক্তি এলম আল বাতেন অর্জন করতে পারে নি, তারা তাদের অজ্ঞাত এই এলমকে অবিশ্বাস করে থাকে। এলম আল বাতেন সম্পর্কে তারা যা জানে এবং বলে, তা হয় তাদের মতো অজ্ঞদের কান-কথার উদ্ধৃতি, নয়তো এলম আল বাতেন বিশারদদের বইপত্র থেকে মুখস্থকৃত বাণীসমূহ। তাদের কলুষিত কলব-গুলো উন্মুক্ত (ফাতাহ) হয় নি এবং রহমানী নূর (ঐশী জ্যোতি) অর্জন করতে পারে নি। এ সকল অজ্ঞ ব্যক্তি যারা এলম আল বাতেনের বিশারদের মতো কথা বলে বোঝাতে চায় যে তারা তা-ই, তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের মস্তিষ্কের দাস ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা যেমন তাদের সংকীর্ণ মস্তিষ্ক দ্বারা কুরআন-হাদীসকে ভুল বুঝে থাকে, ঠিক তেমনি সেই সকল মহান উলামার কথাকেও ভুল বুঝে থাকে। তারা মিথ্যা ও ক্ষতিকর তাফসীর-পুস্তক প্রণয়ন করে মুসলিমদেরকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যায়। ‘আল্লাহ যদি কাউকে নূর মঞ্জুর না করেন, তবে সে মুনাওওয়ার হতে পারে না’- আয়াতটি এ সকল অজ্ঞদের দিকে ইশারা করে” [১]।

মাওলানা আব্দুল গণী নাবলুসী আরও লিখেছেন:

”জামাত (মুসলিম সমাজ) হচ্ছে রহমত, অর্থাৎ, সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ঐক্য আল্লাহর রহমত এনে থাকে। ফুরকাত (বিভক্তি) হচ্ছে আযাব, অর্থাৎ, মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্যুতি আল্লাহর তরফ থেকে আযাব নিয়ে আসে। অতএব, সঠিক পথের ওপর দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রত্যেক মুসলিমেরই একতাবদ্ধ হওয়া উচিৎ, এমন কি যদি তাঁরা একটা ছোট সম্প্রদায়ও হয়ে থাকেন, তবুও তা করতে হবে। সাহাবা-এ-কেরামের পথই হচ্ছে সঠিক পথ। যাঁরা এ পথের অনুসরণ করেন, তাঁদেরকে বলা হয় আহল্ আস্ সুন্নাত ওয়াল জামা’আত। সাহাবা-এ-কেরামের সময়ের পরে আগত গোমরাহ দলগুলো যেন আমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে। ইমাম বায়হাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন: ‘যখন মুসলমানরা পথচ্যুত হবে, তখন তোমাদের উচিৎ তোমাদের পূর্বে আগত মানুষদের সঠিক পথটির অনুসরণ করা। যদি তোমরা নিঃসঙ্গ হয়েও পড়ো, তবুও তোমাদের উচিৎ নয় ওই পথ ছেড়ে দেয়া’ নাজমুদ্দিন আল গাযযী লিখেছেন: ’আহল-এ-সুন্নাত ওয়াল জামায়াত হচ্ছেন সেই সকল উলামা যাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা-এ-কেরামের সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। আস্ সওয়াদ আল আযম, অর্থাৎ, অধিকাংশ উলামা-এ-ইসলাম এই সঠিক পথটিকে অনুসরণ করেছেন। তিয়াত্তরটি সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে

১. প্রাগুক্ত : পৃষ্ঠা ৬৪৮।

পরিত্রাণপ্রাপ্ত ফিরকাহ্ আন্ নাজিয়া সম্প্রদায়টি-ই হচ্ছে এই সঠিক জামাত। কুরআন ইরশাদ ফরমায়: وَلَا تَفَرَّقُوا 'তোমরা দলবিভক্ত হয়ো না।[১]' আয়াতটির অর্থ, এ'তেকাদ তথা বিশ্বাসে দলবিভক্ত হয়ো না। অধিকাংশ উলামাই, উদাহরণস্বরূপ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আয়াতটির ব্যাখ্যা এভাবেই করেছেন এবং বলেছেন যে এর অর্থ, 'তোমাদের নফস ও গোমরাহ ধ্যান-ধারণাকে অনুসরণ করে সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হয়ো না।' এ আয়াতের মানে এটা নয় যে ফিক্হ'র জ্ঞানের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য থাকা উচিৎ নয়। বরং আয়াতটা এ'তেক্বাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে ফিতনা সৃষ্টিকারী মতপার্থক্যকে নিষেধ করেছে। ইজতেহাদ নিঃসৃত জ্ঞানের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য কোনো ফিৎনা নয়, যেহেতু ওই ধরনের মতপার্থক্যের ফলে শরীয়তের সূক্ষ্ম শিক্ষাসমূহ, অধিকারসমূহ ও ফরযসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়েছে। দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে ব্যাখ্যাদানকারী এ সব শরীয়তের শিক্ষাগুলোর ব্যাপারে সাহাবা-এ-কেরামও একে অপরের সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করেছিলেন, কিন্তু ই'তেক্বাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ ছিল না। একটা হাদীস ঘোষণা করে,

اِخْتِلَافُ أُمَّتِيْ رَحْمَةٌ–

'আমার উম্মতের মধ্যে মতপার্থক্য আল্লাহর-ই রহমত'।[২]

চার মযহাবের মধ্যে বিরাজমান মতানৈক্য এই ধরনের এখতেলাফ। তাদের অস্তিত্বই আল্লাহর রহমত ও হেদায়ত। তাঁরা সবাই সওয়াব অর্জন করেছেন। চার মযহাবের প্রত্যেকটির অনুগামীদের অর্জিত সওয়াবের সমপরিমাণ সওয়াব ওই মযহাবের ইমামকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত দেয়া হতে থাকবে। উলামাবৃন্দ কর্তৃক শরীয়তের বিভিন্ন শাখার ওপর পৃথক বিশেষায়িত শিক্ষা গ্রহণ-ও অনুরূপ একটা উদাহরণ; ফলে বহু উলামা হাদীস, তফসীর, ফিকাহ এবং প্রাথমিক আরবী এলমসমূহে বিশেষায়িত শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। মুতাসাউয়ীফগণ কর্তৃক রিয়াযত পালনে ও শিষ্যদেরকে প্রশিক্ষণ দানে বিভিন্ন পদ্ধতির অনুসরণ এবং বিভিন্ন তরীকার গঠনও এই হাদীসটির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। হযরত নাজমুদ্দিন আল কুবরা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: 'মানুষের সংখ্যার মতোই আল্লাহর নৈকট্য অর্জনেরও বিভিন্ন রাস্তা রয়েছে।' এই মন্তব্যটিও ছাত্রদেরকে শিক্ষা দেয়ার পদ্ধতিগুলোর পার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করে, কিন্তু এটা এ'তেক্কাদের কোনো পার্থক্যের দিকে ইশারা করে না। সকল আউলিয়ার ই'তেকাদ একই। তাঁরা সবাই

---

১. আল কুর'আন : সূরা আলে ইমরান,৩/১০৩।
২. আহমদ : আল মুসনাদ, হাদীসু নু'মান ইব্ন বশীর ৩০/৩৯১।

আহল-এ-সুন্নাত ওয়াল জামাতের ই'তেকাদ পোষণ করেন। কিন্তু ই'তেকাদে মতপার্থক্য এর ঠিক উল্টো, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

وَ الجَمَاعَةُ بَرْكَةٌ وَ الفِرْقَةُ عَذَابٌ–

'জামাআত হচ্ছে রহমত; ফুরকাত (দলবিভক্তি) আযাব'।[১]

হযরত আবদুল গণী নাবলুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরও লিখেছেন:

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন: 'যে যাকে ভালোবাসে, সে তার সঙ্গে অবস্থান করবে' (হাদীস)। আল মুসলিমের বর্ণনা অনুযায়ী, কেউ একজন হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আখেরাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পর তিনি তাকে প্রশ্ন করেন, 'আখেরাতের জন্যে তুমি কী প্রস্তুতি নিয়েছো?' তখন ওই ব্যক্তি বলেন, 'আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যে (অন্তরে) ভালোবাসা পয়দা করেছি।' এরপর হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তুমি তাঁদের সঙ্গে থাকবে যাঁদেরকে তুমি ভালবাসো' (হাদীস)। এ হাদীসের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং জীবিত কিংবা বেসালপ্রাপ্ত সাদাকাদাতা সালেহীনদেরকে ভালোবাসার মূল্য ও উপকারিতা সম্পর্কে এ হাদীসটি বর্ণনা দেয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভালোবাসার মানে হচ্ছে শরীয়তের আদেশ-নিষেধগুলো মান্য করা এবং শরীয়তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। সালেহীনকে ভালোবাসার উদ্দেশ্যে এবং তাঁদের কাছ থেকে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে তাঁরা যা করেন তা করা আবশ্যক নয়। কারণ, যখন কেউ তাঁদের অনুরূপ কিছু করেন, তখনই তিনি তাঁদের একজন হয়ে যান। একটা হাদীস ঘোষণা করে: 'কোনো ব্যক্তি হয়তো একটা জামাতকে ভালোবাসতে পারে, কিন্তু সে তাদের একজন নাও হতে পারে' (হাদীস)। 'তাদের সঙ্গে থাকা'র মানে এই নয় যে, তাঁদের উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হওয়া।' অপর এক হাদীস ইরশাদ ফরমায়, 'যে ব্যক্তি যে জামাতকে ভালোবাসে, সে তার সাথে পুনরুত্থিত হবে' (হাদীস)। হযরত আবু যারর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করলেন,

[১]. বায়হাক্বী : শু'য়াবুল ঈমান, ৪/১০২ হাদীস নং ৪৪১৯ এবং ২/১০৩।

قَالَ أَبُو ذَرٍّ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ بِأَعْمَالِهِمْ ؟

'ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো ব্যক্তি, যে নাকি একটা জামাতকে ভালোবাসে, সে যদি তাদের অনুরূপ কিছু করতে না পারে, তাহলে তার কী অবস্থা হবে?'

হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন,

أَنْتَ يَا أَبَا ذَرٍّ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ

'হে আবু যারর তুমি যাঁদেরকে ভালোবাস, তাঁদের সঙ্গে থাকবে'।[১]

তবে হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, 'এসব হাদীসকে তোমাদের ভুল বোঝা উচিৎ নয়। তোমরা সালেহীনের নৈকট্য একমাত্র তাঁদের ভাল কাজগুলো সম্পাদন করেই পেতে পারো। যদিও ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা তাদের নবীদেরকে ভালোবাসে, তবুও তারা তাঁদের সঙ্গে থাকবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাঁদের ভাল কাজগুলোর কয়েকটি নতুবা সবগুলোই সম্পাদন করে।' সংক্ষেপে, যে ব্যক্তি কোনো একটি জামাতকে ভালোবাসে, সে নিম্নোক্ত তিনটি শ্রেণীর যে কোনো একটির অন্তর্গত: (১) যে ব্যক্তি তাঁদের সকল ভাল কাজ ও আচার-ব্যবহারকে বরণ করে নেয় নিজের জীবনে; (২) যে ব্যক্তি তাঁদের কোনোটাই গ্রহণ করে নেয় না; এবং (৩) যে ব্যক্তি তাঁদের কিছু কিছু ভাল কাজ গ্রহণ করে বাকিগুলো ছেড়ে দেয়, অথবা বাকিগুলোর উল্টোটা করে। যে ব্যক্তি তাঁদের সবগুলো কাজ করে (অর্থাৎ ১ম শ্রেণীভুক্ত), সে তাঁদেরই একজনে পরিণত হয় এবং তাঁদের মধ্যে অবস্থান করে। তাঁদের জন্যে তার ভালোবাসা তাকে সম্পূর্ণভাবে তাঁদেরই মতো বানিয়ে দেয়। সে ভালোবাসার সর্বোচ্চ পর্যায় অর্জন করতে পেরে নিশ্চিতভাবে তাঁদেরই একজন হয়ে গিয়েছে। আর যে ব্যক্তি যাঁদেরকে ভালোবাসে তাঁদেরকে যদি সে কখনো অনুসরণ না করে, অথবা যদি তাঁদের অনুরূপ না হয় (২নং শ্রেণীভুক্ত), তবে সে কখনো তাঁদের একজন হতে

---

[১]. আহ্মদ : আল মুসনাদ, ৫/১৫৬ হাদীস নং ২১৪১৬।
ক. দারেমী : আস সুনান, ৩/১৮৩৪ হাদীস নং ২৮২৯।
খ. আবু দাউদ : আস সুনান, ৪/৩৩৩ হাদীস নং ৫১২৬।
গ. বায্যার : আল মুসনাদ, ৯/৩৭৩।
ঘ. ইব্ন হিব্বান : আস সহীহ, ২/৩১৫ হাদীস নং ৫৫৬।
ঙ. বুখারী : আদাবুল মুফরাদ ১/৮৫।

পারবে না। ইমাম গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন যে হযরত হাসান আল বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই ধরনের লোকদেরকেই বুঝিয়েছেন। আর যে ব্যক্তি তার ভালোবাসাপ্রাপ্ত মানুষদের কিছু কিছু কাজকে অনুসরণ করে (৩নং শ্রেণীভুক্ত), সে তাঁদের একজন হতে পারে না, যদি সে তাঁদের মতো একই ঈমান-সম্পন্ন না হয়। সে যখন বলে যে সে ভালোবাসে, সে তখন মোটেও নিষ্ঠাবান নয়। তার কলবে (অন্তরে) তাঁদের জন্যে ভালোবাসা নয়, বরং শত্রুতাভাব বিরাজ করে। ঈমানের বিরুদ্ধে শত্রুতার মতো আর এতো বড় কোনো শত্রুতা নেই। এর বড় নজির হচ্ছে ইহুদী-খ্রীষ্টানদের এ কথা বলা যে, তারা তাদের নবীদেরকে ভালোবাসে। আর যে ব্যক্তি দাবি করে যে সে তার ভালোবাসাপ্রাপ্তদের মতোই ই'তেকাদ (বিশ্বাস) রাখে, কিন্তু তাঁদেরকে সম্পূর্ণভাবে তা'আত ও এবাদতে অনুসরণ করে না, তবে তার এই ভালোবাসার দাবি অচল, যদি সে ওই সব কাজকে ঘৃণা করার কারণে তাঁদেরকে অনুসরণ না করে থাকে (৩ এর ক)। সে তার দাবিকৃত ভালোবাসাপ্রাপ্তদের সঙ্গে থাকতে পারে না। কিন্তু যদি সে তার নফসানীয়াতকে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম হয়ে ওই সব কাজকে মান্য করতে না পারে, তবে তার ভালোবাসাপ্রাপ্তদের সঙ্গে থাকার ব্যাপারে কেউই তাকে বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না (৩ এর খ)। হাদীসগুলো এই দ্বিতীয় শ্রেণীটির (৩ এর খ) দিকে ইশারা করেছে এবং সেই ব্যক্তিকে বুঝিয়েছে, যে নাকি কোনো একটা জামাতকে ভালোবাসে অথচ সম্পূর্ণভাবে তাদের মতো হতে পারে না। আবু যাররকে উদ্দেশ্য করে কথিত হাদীসটি এ কথা পরিস্ফুট করে এবং মুসলিমদেরকে উৎফুল্ল করে [পরকাল সম্পর্কে]। হযরত মুহাম্মদ ইবনে সাম্মাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় দোয়া করেছিলেন: 'ইয়া আল্লাহ আমি সব সময় আপনাকে অমান্য করেছি। কিন্তু আমি তাঁদেরকে ভালোবেসেছি, যাঁরা আপনাকে মান্য করেছেন। আমার এ ভালোবাসার ওয়াস্তে আমাকে আপনি ক্ষমা করে দিন।' হযরত নাজমুদ্দিন আল গাযযী সালেহীনের প্রতি নিষ্ঠুর লোকদের ভালোবাসাকে তৃতীয় শ্রেণীর প্রথম দলের (৩ এর ক) সঙ্গে তুলনা দিয়েছেন; অর্থাৎ, যারা তাদের ভালোবাসাপ্রাপ্তদের মতোই বিশ্বাস পোষণ করে, কিন্তু তাঁদের কাজকর্ম ও আচার-ব্যবহারকে অনুসরণ করতে চায় না; তিনি বলেন যে সালেহীনের প্রতি নিষ্ঠুর লোকদের এই ভালোবাসাটি তাদের কোনো উপকারে আসে না। কিন্তু আমাদের কাছে নিষ্ঠুর লোকদের ভালোবাসা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত (৩ এর খ); অর্থাৎ, তারা তাদের ভালোবাসাপ্রাপ্তদের অনুরূপ ই'তেকাদ রাখে, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে তাঁদের অনুরূপ হতে পারে না। মুহাম্মদ ইবনে সাম্মাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-ও তাঁর দোয়ায় এ দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন। নিষ্ঠুর লোকেরা তাদের

নফসকে অনুসরণ করে যুলুম করে বটে, কিন্তু তারা সালেহীনকে ভালোবাসে এবং তাঁদের দোয়া অর্জন করতে চেষ্টা করে।” [১]

হযরত আব্দুল গনী নাবলুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অতঃপর লিখেন:

”রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন,

أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ.

–যে যাকে ভালোবাসে, সে তার সঙ্গে থাকবে।[২]

যদি আমরা সালফে সালেহীন তথা আহলে সুন্নাতের উলামাকে ভালোবাসি, তাহলে আমরা এ শুভ সংবাদের নেয়ামতসমূহ অর্জন করতে পারবো, এমন কি যদি আমরা তাঁদের মতো নাও হয়ে থাকি। যে ব্যক্তি আল্লাহর ভালোবাসাপ্রাপ্তদেরকে ভালোবাসে এবং তাঁদেরকেও ভালোবাসে যারা আল্লাহকে মহব্বত করেন হোন তাঁরা জীবিত কিংবা বেসালপ্রাপ্ত তবে সে বিশাল নেয়ামত ও পুণ্য অর্জন করতে সক্ষম হবে। তাঁদেরকে ভালোবাসার উদাহরণ হচ্ছে তাঁদের প্রশংসা করা এবং তাঁদের শত্রুদের ও অজ্ঞ লোকদের কুৎসা রটনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া। দুনিয়াতে আসক্ত এমন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে তারাই, যারা আল্লাহতা'আলার ভালোবাসাপ্রাপ্ত আউলিয়াকে গালমন্দ করে। দুনিয়ার মোহ সকল বদ কাজ সংঘটনের দ্বার উন্মুক্ত করে এবং কোনো ব্যক্তিকে বিদ্বেষ, চুরি, ঘুষ ও অহমিকার মতো হারাম কাজ করতে প্ররোচিত করে। দুনিয়ার প্রতি মোহ থেকেই উদ্ভব হয় ধর্মীয় পদে সমাসীন অজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের দম্ভ (তাকাব্বরী)। হযরত শায়খুল আকবর মুহিউদ্দিন ইবনে আরবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বয়ং বলেছেন যে তাসাউফের মহান ইমামগণের প্রতি তাঁর এশক এবং তাঁদের পক্ষে সোচ্চার হবার কারণেই তাঁর ক্বলব উন্মুক্ত (ফাতাহ) হয়েছে, অর্থাৎ, তিনি বাতেনী এলম হাসিল করেছেন। তাঁর প্রণীত ‘রুহুল কুদ্দুস’ পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে: ’আলহামদু লিল্লাহ আমি সব সময়ই ধর্মীয় পদে সমাসীন অজ্ঞ লোকদের বিরুদ্ধে মুতাসাউয়ীফদের পক্ষ সমর্থন করেছি এবং আমি আমার ইনতেকাল পর্যন্ত তাই করে যাবো। আমার এই কাজটির জন্যেই আমাকে ক্বলব-এর এলম মঞ্জুর করা হয়েছে। যে ব্যক্তি

[১]. প্রাগুক্ত : ২/১১।
[২]. আহমদ : আল মুস্নাদ, ৩/১৭৩।
ক. দারেমী : আস সুনান, ৩/১৮৩৪ হাদীস নং ২৮২৯।
খ. বুখারী : আস সহীহ, ৫/১২ হাদীস নং ৩৬৮।
গ. মালেক : মুয়াত্ত্বা, ১/৩২৮ হাদীস নং ৯৩০।
ঘ. খুযাইমা : আস সহীহ, ৩/১৪৯ হাদীস নং ১৭৯৬।
ঙ. বাগাবী : শরহুস সুন্নাহ, ১৫/১০০ হাদীস নং ৪২৯৭।

তাঁদের নাম উল্লেখ করে তাদেরকে আক্রমণ ও গালমন্দ করে, সে শুধু নিজের অজ্ঞতাই পরিস্ফুট করে। এই ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত বিধ্বস্ত হবে।'

"হযরত মুহিউদ্দীন ইবনে আরবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর রচিত 'শরহে ওয়াসিয়াত আল ইউসুফিয়া' গ্রন্থে বলেন যে হজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তিনি একবার স্বপ্নে দেখলেন, যিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'আল্লাহর এই নেয়ামত তুমি কীভাবে পেয়েছ তা জানো কি?' হযরত ইমাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উত্তর দিলেন: 'না, আমি জানি না, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: 'তুমি এসব অর্জন করেছ তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার কারণে যাঁরা নিজেদেরকে আল্লাহ-ওয়ালা বলেছিলেন।'

"যে ব্যক্তি নিজের দোষ তালাশ করে এবং নিজেকে সংশোধন করতে সচেষ্ট হয়, সে কখনো অন্যদের দোষ তালাশ করার সময় পায় না। সে সব সময় ওই সব মুসলিমদের দিকে তাকায় যারা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। আরেক কথায়, সে যতো জন মুসলিমের সাক্ষাৎ পায়, সবাইকেই তার চেয়ে ভাল মনে করে। সে বিশ্বাস করে, যে ব্যক্তি নিজেকে ওলী হিসেবে দাবি করে, সে সত্যই বলছে। যে ব্যক্তি অন্যদের দোষ তালাশ করে এবং নিজের দোষ দেখে না সে ওই ওলীকে বিশ্বাস করে না।[১]

"হযরত নাজমুদ্দিন আল গাযযী তাঁর প্রণীত 'হুসন-উত-তানাব্বুহ' গ্রন্থে লিখেন: 'যাঁরা আউলিয়া, সেই সকল সুলাহাকে তোমাদের উচিৎ ভালোবাসা এবং তাঁদের সাক্ষাৎ ও সোহবত লাভ করে বরকত অর্জন করা।[২] হযরত শাহ আল কারমানী বলেন, 'আউলিয়াকে ভালোবাসার মতো এতো মহামূল্যবান আর কোনো এবাদত নেই। আউলিয়ার প্রতি ভালোবাসা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার জন্ম দেয়; আর আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন, যে তাঁকে ভালোবাসে।' আবু উসমান খাইরী বলেন, 'যে ব্যক্তি আউলিয়ার সোহবত গ্রহণ করে, সে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের রাস্তা খুঁজে পায়।' হযরত এয়াহইয়া ইবনে মুয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'কোনো নিষ্ঠাবান মানুষ যিনি আউলিয়ার সোহবত অর্জন করেন, তিনি সব কিছু ভুলে যান। তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। তিনি কখনো অন্যভাবে আল্লাহর নৈকট্য পেতে পারেন না।' হযরত মুহাম্মদ ইবনে ইরাক তাঁর লিখিত 'আস সাফিনাতুল ইরাক্বিয়া' পুস্তকে লিখেন: 'হযরত মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন বাজলি নামের একজন ফকিহ্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখে তাঁকে কোন্ আমলটি

[১]. শরহে ওয়াসিয়াত আল ইউসুফিয়া।
[২]. হুসন-উত-তানাব্বুহ।

সবচেয়ে উপকারী তা জিজ্ঞাসা করেন। হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেন: "আল্লাহর আউলিয়ার মধ্যে কোনো ওলীর উপস্থিতিতে থাকা।" আর যখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "যদি আমরা জীবিত কাউকে খুঁজে না পাই?" তখন হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, "তিনি জীবিত-ই হোন কিংবা বেসালপ্রাপ্ত-ই হোন, তাঁকে ভালোবাসা এবং স্মরণ করা এক-ই ব্যাপার"।' [১]

"মোল্লা বিরগিউয়ী সব সময় দোয়া করতেন: 'হে শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী হে দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হে আমার আল্লাহ যিনি পাপসমূহ গোপন করে রাখেন এবং যিনি সবচেয়ে সুবিবেচক আমাদের মতো পাপীদেরকে আপনার হাবীব ও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অন্যান্য আম্বিয়া (আঃ), ফেরেশতাকুল, সাহাবা-এ-কেরাম ও তাবেয়ীনদের ভালোবাসার ওয়াস্তে ক্ষমা করে দিন; আমাদের গুনাহ মাফ করুন।' আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর সাহাবা-এ-কেরাম ও তাবেয়ীনগণের ভালোবাসার ওয়াস্তে আল্লাহর কাছে দোয়া করা জায়েয ও বৈধ এবং তাঁদেরকে ওসীলা করাও বৈধ, যাতে করে দোয়াসমূহ কবুল হয়। এভাবে দোয়া করা আর কিছুই নয় শুধু তাঁদের শাফায়াত কামনা করা ছাড়া, যেটা আহল-এ-সুন্নাতের উলামাবৃন্দের মতে জায়েয। মু'তাযিলা সম্প্রদায় একে স্বীকার করে নি। কোনো ওলীর মধ্যস্থতায় প্রেরিত দোয়া আল্লাহর কাছে তাঁর কারামত হিসেবেই গৃহীত হয় এবং এতে প্রতিভাত হয় যে বেসালের পরও আউলিয়ার দ্বারা কারামত সংঘটিত হয়। বিদয়াতী গোমরাহ লোকেরা এতে বিশ্বাস করে না।

"ইমাম মানাউয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর কৃত 'জামিউস সাগির' গ্রন্থের ব্যাখ্যায় (শরাহ) ইমাম সুবকী রহ:)-এর কথা উদ্ধৃত করেন, যিনি বলেন: 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দোয়ায় ওসীলা করা এবং তাঁর শাফায়াত কামনা করে সাহায্য চাওয়া খুব ভাল। সালাফ আস্ সালেহীন এবং তাঁদের পরে আগত উলামাবৃন্দের কেউই এর বিরোধিতা করেন নি, একমাত্র ইবনে তাইমিয়া ছাড়া, যে এর বিরোধিতা করে সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে। সে এমন একটা পথের অনুসারী হয় যেটা তার পূর্ববর্তী কোনো আলেমই অনুসরণ করেন নি। মুসলিম জগতে তার গোমরাহীর জন্যে সে কুখ্যাত হয়।' আমাদের 'উলামাবৃন্দ' বলেছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটা খাস মাহাত্ম্য হিসেবে তাঁর মাধ্যমে দোয়া করাই শুধু জায়েয, অন্যদের মাধ্যমে নয়। তবে ইমাম কুশাইরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, 'হযরত মারূফ আল-

[১].সাফিনাতুল ইরাক্বিয়া।

কারখী (রঃ) তাঁর মুরীদদেরকে বলেছিলেন যেন তারা তাঁর মাধ্যমে দোয়া করেন এবং এও বলেছিলেন যে তিনি আল্লাহ ও তাদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীস্বরূপ। কারণ, আউলিয়া হচ্ছেন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী এবং একজন উত্তরাধিকারী তাঁর পূর্বসূরীর সকল মাহাত্ম্যই অর্জন করে থাকেন'।"[১]

মাওলানা আবদুল গণি নাবলুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর প্রণীত 'কাশফুন্ নূর মিন আসহাবিল কুবুর' পুস্তকে লিখেছেনঃ

"আল্লাহ তা'আলা তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদেরকে কারামত মঞ্জুর করেছেন। কারামত হচ্ছে সেই আধ্যাত্মিক ক্ষমতা যা আল্লাহ কর্তৃক আদতের [সাধারণের] এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বাইরে আউলিয়া নামের বান্দাদের জন্যে সৃষ্টি করা হয়। আল্লাহতা'আলা তাঁর ক্ষমতায় বা ইচ্ছায়, অর্থাৎ, যখন ইচ্ছা তখন তাঁর ওই সকল বান্দাদের মধ্যে এ সব অলৌকিকতা সৃষ্টি করেন। তাঁদের ক্ষমতাও আল্লাহ পাক-ই সৃষ্টি করে থাকেন। এসব অলৌকিকতা সৃষ্টিতে বান্দাগণের (নিজস্ব) ক্ষমতা অথবা এরাদা কোনো তা'সির (প্রভাব বিস্তার) করে না। তাঁদের এরাদা (ইচ্ছা) ও ক্ষমতা শুধু কারামত সৃষ্টির কারণ হয়ে থাকে। যদি কেউ এ কথা বলে এবং বিশ্বাস করে যে কোনো লোক যখন ইচ্ছা তখন তার নিজ ক্ষমতাবলে একটা কারামত তৈরি করতে সক্ষম, তবে সে কাফের হয়ে যাবে।

"কোনো ওলী যাঁর কাছ থেকে একটা কারামত সংঘটিত হয়েছে, তিনি জানেন যে এই কারামতটা একমাত্র আল্লাহর এরাদা ও ক্ষমতাবলে সৃষ্ট হয়েছে এবং তাঁর নিজের এরাদা ও ক্ষমতা কোনো তাসির করেনি। একইভাবে প্রতিটি মুহূর্তে তিনি জানেন যে দর্শন, শ্রবণ, স্বাদ গ্রহণ, গরম কিংবা শক্ত বস্তু অনুভব করা, চিন্তা করা, স্মৃতিস্থ ও স্মরণ করার মতো তাঁর শারীরিক চেতনাসমূহ এবং তাঁর অভ্যন্তরীণ ও বহিঃঅঙ্গগুলোর নড়াচড়া, সংক্ষেপে তাঁর সমস্ত ক্রিয়া-ই আল্লাহ তা'আলার এরাদা, ক্ষমতা এবং সৃষ্টির ফসল। এটাই হচ্ছে একজন ওলী হওয়ার অর্থ; অর্থাৎ, যে ব্যক্তি জানেন এবং বিশ্বাস করেন যে এসব জিনিস এভাবেই ঘটে থাকে, তিনি আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত। তাঁর এই জ্ঞানটি সমস্ত অস্তিত্বকেই প্রতিটি মুহূর্তে ছেয়ে রাখে। আল্লাহ তা'আলা মাঝে-মধ্যে তাঁর ওলীকে গাফলাত (বে-খেয়াল) দান করেন এবং এই জ্ঞান সম্পর্কে ওলীকে স্মৃতিচ্যুত করেন। এ সময়ের মধ্যে তাঁর ওলিত্ব চলে যাওয়া সত্ত্বেও যেহেতু তিনি আগে ওলী ছিলেন, সেহেতু তাঁকে এখনও ওলী বলা হবে। অনুরূপভাবে, যেহেতু ঈমানসম্পন্ন একজন ব্যক্তিকে মুমিন বলা

[১].আল-হাদিকাতুন নাদিয়া ২/ ১২৪।

হয়, সেহেতু তাঁকে তখনও মুমিন বলা হবে যখন তিনি ঘুমাচ্ছেন কিংবা গাফলাত অবস্থায় আছেন। গাফলাতের সময়টাই হচ্ছে ওলীর নিকৃষ্টতম হাল। 'আপনি নিশ্চিতভাবে মৃত, তারাও মৃত'- আয়াতটাতে আল্লাহ কর্তৃক উল্লেখিত 'মৃত' অবস্থাটাও এ ধরনের অবস্থার অনুরূপ। অতএব, আউলিয়ার সমস্ত কিছু যে আল্লাহ থেকে নিঃসৃত, এ কথা উপলব্ধি করার হালকে তাঁরা 'মওত ইখতিয়ারী' (ইচ্ছাকৃত মৃত্যু) নামে আখ্যা দিয়েছেন। একটা হাদীস শরীফ ইরশাদ ফরমায় :

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ.

–যে ব্যক্তি নিজেকে চেনেছে, সে তার রবকেও চেনেছে।[১]

যে ব্যক্তি বোঝতে পারে যে, তার সমস্ত কাজ এবং দৃশ্যমান কিংবা গোপন ক্ষমতাসমূহ তার নিজের থেকে নিঃসৃত নয়, বরং এরাদা ও ক্ষমতার অধিকারী অন্য কোনো সত্তার দ্বারা তা'সিরকৃত, সে প্রকৃতপক্ষে এই ক্ষমতার মালিক আল্লাহকে-ই চেনতে পারে। একজন মুসলিম যিনি আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট সমস্ত ফরয যথাযথভাবে পালন করেন এবং নাফিলা এবাদত তথা হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন ধারণ ও আহওয়ালের এবং এবাদত পালনের রীতি-নীতি পালন করেন, তিনি আল্লাহর নৈকট্য পেয়ে একজন ওলীতে পরিণত হন। এটা প্রতীয়মান হতে থাকে যে তাঁর চেতনাসমূহ এবং ক্রিয়া তাঁর থেকে নিঃসৃত নয়, বরং আল্লাহ থেকে নিঃসৃত। এটা যে সত্য, তা ঘোষণাকারী হাদীস শরীফটি তাসাউফের কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ আছে।

"আরেফীনের মতানুসারে, কোনো ব্যক্তির পক্ষে ওলী হতে হলে তাঁকে এটা জানতে হবে যে তিনি মওত এখতেয়ারী নামক অর্থে মৃত। আউলিয়ার মধ্যে কারামতের উদ্ভবের জন্যে তাঁদেরকে এই অর্থে মৃত হতে হবে। এটা যে ব্যক্তি বুঝতে পারেন, তিনি কি কখনো একথা বলতে পারেন যে কারামত কোনো বেসালপ্রাপ্ত জনের মধ্যে সংঘটিত হয় না? অজ্ঞ ও গাফেল লোকেরাই মনে করে যে তারা তাদের সমস্ত কাজকর্ম নিজেদের ইচ্ছা ও ক্ষমতায় সম্পাদন করে থাকে, আর তাই তারা এ কথা ভুলে যায় যে সব জিনিস আল্লাহ-ই সৃষ্টি করেন।

"ফিকাহর বই-পুস্তকও বর্ণনা দেয় যে আউলিয়া তাঁদের বেসালের পরও কারামতের অধিকারী হয়ে থাকেন। হানাফী মযহাবে কোনো কবরের ওপর পা দেয়া, বসা, নিদ্রা যাওয়া কিংবা ওযু ভেঙ্গে ফেলা মাকরুহ, যেহেতু এ ধরনের কাজের অর্থ বিশ্বাসঘাতকতা ও বেয়াদবি। একটা হাদীস শরীফ ইরশাদ ফরমায়:

[১]. হিলইয়াতুল আউলিয়া ওয়া তৃবকাতুল আসফিয়া : ১৩/২০৮।

'আমি কবরে পা রাখার চেয়ে আগুনে পা দেয়াকে সমীচীন মনে করি।' এসব কথা ব্যক্ত করে যে মৃত্যুর পরেও মানুষদেরকে তা'যিম করা জরুরি; অর্থাৎ, আমাদের দ্বীন প্রচার করে যে বেসালপ্রাপ্ত জন কারামতের অধিকারী। আমরা আগেই ব্যাখ্যা করেছি যে কারামত হচ্ছে আদত বা সাধারণের বাইরে সম্পাদিত একটা কর্মবিশেষ। যেহেতু মানুষের দ্বারা পৃথিবীতে হাঁটা এবং বসা হচ্ছে আদত, সেহেতু একজন মু'মিনের কবরের ওপর না পদার্পণ করা এবং না বসা হচ্ছে একটা কারামত; অর্থাৎ, তাঁর প্রতি মঞ্জুরীকৃত একটা নেয়ামত। আমাদের ধর্ম, যা প্রত্যেক মু'মিনকে তাঁর ইন্তেকালের পরে ওই ধরনের কারামত মঞ্জুর করে থাকে, তা প্রতিভাত করে যে এলম ও ইরফানের অধিকারী আউলিয়ার জন্যে আরও মহামূল্যবান কারামত মঞ্জুরীপ্রাপ্ত হয়ে আছে।

"আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় বাকী কবরস্থান যিয়ারত করে ক্ববরগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া করতেন। এটাও পরিষ্কার করে যে বেসালপ্রাপ্তজন কারামতের অধিকারী, কারণ তিনি সেখানে দোয়া করতেন না, যদি তিনি জানতেন যে একজন মু'মিনের কবরের পাশে পঠিত দোয়া কবুল করা হবে না। একজন মু'মিনের কবরের পাশে পঠিত দোয়া গৃহীত হওয়ার বিষয়টাই প্রমাণ করে যে একজন মুমিন হচ্ছেন কারামতসম্পন্ন ব্যক্তি। যখন প্রত্যেক মু'মিনের জন্যেই এই রকম কারামত রয়েছে, তখন আউলিয়ার জন্যে তো আরও অনেক বেশি কারামত থাকার বিষয়টি সত্য।

"যখন কোনো মু'মিন ব্যক্তি ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁকে গোসল দেয়া, কাফন পরানো এবং দাফন করা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের দ্বীন এ সব কাজ করতে আমাদেরকে আদেশ দেয়। এ আদেশটাও প্রতীয়মান করে যে একজন মু'মিন তাঁর ইন্তেকালের পরও কারামতের অধিকারী। মৃত কাফের এবং জন্তু-জানোয়ারদের এ ধরনের কোনো কারামত নেই।

"মৃত্যুর সময় একজন মু'মিনের দেহ নাজাসাত বা না-পাক হয়ে যায়। তাঁকে এই নাজাসাত থেকে পরিষ্কার করার জন্যে গোসল দিতে আদেশ দেয়া হয়েছে। এই আদেশটাও প্রতিভাত যে ইন্তেকালের পরে একজন মুমিন কারামতের অধিকারী থাকেন।

"জামিউল ফাতাওয়া নামক পুস্তকটিতে লেখা আছে যে শায়খ, সাইয়েদ ও উলামাগণের মাযার-রওযার ওপর ইমারত কিংবা গুম্বজ নির্মাণ করা মাকরূহ নয়। পুস্তকটি আরও বলে, যে ব্যক্তি মুন্দাকে গোসল দেয়, তাকে পাক-সাফ হতে হবে এবং তার জন্যে জুনুব (নাপাক) হওয়াটা মাকরূহ। এটাও পরিস্ফুট করে যে,

এনতেকালের পরও প্রত্যেক মু'মিন কারমাতের অধিকারী হন না। শুধু আউলিয়া-ই জীবিতাবস্থায়ও কারামতের অধিকারী হয়ে থাকেন। ইমাম নাসাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'উমদাতুল এ'তেকাদ' গ্রন্থে লিখেন: 'কোনো মু'মিন ঘুমন্ত অবস্থায় যেমন একজন মু'মিন থাকেন, ঠিক তেমনি তাঁর ইন্তেকালের পরও তিনি মু'মিন থাকেন; একইভাবে আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম-গণও তাঁদের বেসালের পরে নবী থাকেন। কারণ রুহ-ই হচ্ছেন কোনো নবী কিংবা মু'মিন। যখন কোনো মানুষ মারা যায়, তখন তার রূহের মধ্যে কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় না।' 'মানুষ' মানে 'দেহ' নয়, বরং 'রূহ'। দেহ হচ্ছে রূহের অস্থায়ী বাসস্থান। বাসগৃহ নয়, বরং যারা সেখানে বসবাস করেন তাঁরাই হলেন মূল্যবান। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মানুষের আকৃতিতে দেখা দিতেন, বিশেষ করে দিহ্-ইয়া নামের জনৈক সাহাবীর সুরতে। কিছু কিছু সাহাবাও তাঁকে মানুষের আকৃতিতে দেখেছেন। এ কথা বলা যাবে না জিবরীল আলাইহিস্ সালাম যখন মানবের আকৃতি ত্যাগ করে নিজের আকৃতি ধারণপূর্বক রূহের অপর রূপ হয়ে যান, তখন তিনি অস্তিত্ববিহীন হয়ে গিয়েছিলেন। এ কথাই বলা হয়ে থাকে যে, তিনি তাঁর আকৃতি পরিবর্তন করেছিলেন। মানুষের রূহও অনুরূপ আচরণ করে থাকে। যখন কোনো মানুষ ইন্তেকাল করে, তখন তার রুহ্ এক আলম (জগত) হতে আরেক আলমে গমন করে। রূহের মধ্যে এ ধরনের পরিবর্তন কারামতের অনুপস্থিতিকে প্রতীয়মান করে না।

"বেসালের পরেও যে আউলিয়া কারামতসম্পন্ন, তা বর্ণনাকারী বহু ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে বিভিন্ন কেতাবে। উদাহরণস্বরূপ, মহান ওলী মুহিউদ্দীন ইবনে আরবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কিতাব 'রূহুল কুদ্দুস'- এ লিপিবদ্ধ আছে হযরত আবু আব্দুল্লাহ ইবনে যাইনিল যুরী আল ইশবিলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বিভিন্ন কারামতের বর্ণনা। এক রাতে ইমাম গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বিরূপ সমালোচনা ও হেয় প্রতিপন্নকারী একখানা কিতাব পড়তে পড়তে আবুল কাসিম ইবনে হামদিন নামের এক ব্যক্তি অন্ধ হয়ে যায়। সে সাথে সাথে সাজদা দিয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় এবং ওই বইটি আর কোনো দিন না পড়ার ওয়াদা করে। আল্লাহ কবুল করে তাকে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন। এটা ইমাম গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর একটা কারামত হিসেবেই প্রতীয়মান হয়, যা তাঁর বেসালের পরে ঘটেছিল।

"ইমাম আল ইয়াফী-ই তাঁর রচিত 'রাওদুর রিয়াহিন' নামক পুস্তকে লিখেন: 'কবরস্থ ব্যক্তিদের হাল বা অবস্থা দেখাবার আবেদন জানিয়ে একবার কোনো এক ওলী দোয়া করেন। এক রাতে তাঁকে বহু কবর দেখানো হয়। (মৃতদের) কেউ

কেউ তক্তায়, আবার কেউ কেউ রেশমের বিছানায় শায়িত কিংবা সুগন্ধিযুক্ত ফুলের মধ্যে অবস্থান করছিল; কেউ কেউ অত্যন্ত উৎফুল্ল, আবার কেউ কেউ ক্রন্দনরত ছিল। তিনি একটা কণ্ঠস্বরকে বলতে শুনলেন যে, তাদের এসব অবস্থা প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে তাদের কর্মসমূহেরই প্রতিদান। নম্র মেজাজী ব্যক্তিবর্গ, শহীদগণ, এমন কি নাফিলা এবাদত পালনকারী রোযাদারগণ, আল্লাহর ওয়াস্তে একে অপরের মহব্বতকারীগণ, পাপিষ্ঠ ও পাপ সংঘটনের পরে তওবাকারীগণের সবারই অবস্থা বিভিন্ন ধরনের ছিল। কোনো কোনো আউলিয়াকে নিদ্রিত অবস্থায় এবং কোনো কোনো আউলিয়াকে জাগ্রত অবস্থায় কবরস্থদের হালসমূহ প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। 'কিফায়াত আল মু'তাকাত' নামক গ্রন্থে লেখা আছে যে, কয়েকজন আউলিয়া তাঁদের পিতাদের কবর যিয়ারত করে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

"লালকাই তাঁর প্রণীত 'আস সুন্নাত' গ্রন্থে এয়াহইয়া ইবনে মুঈনের কথা উদ্ধৃত করেন, যিনি বলেনঃ 'আমার এক বন্ধু যিনি কবরস্থানে কাজ করতেন এবং যাঁর ওপর আমার আস্থা ছিল, তিনি বলেছেন যে তিনি বহু বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর কাছে যে ঘটনাটা সব চেয়ে বিস্ময়কর ঠেকেছে, তা হচ্ছে একজন ইন্তেকালপ্রাপ্ত মুসলিম কর্তৃক মুয়াযযিনের দেয়া আযানের পুনরায় আবৃত্তি।

"আবু নুয়াইম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'হিলইয়া' পুস্তকে লিখেছেন যে সাইদ এবনে জুবাইর বলেছেন,

أَنَا وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَدْخَلْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ لَحْدَهُ وَمَعِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ أَوْ رَجُلٌ غَيْرُهُ شَكَّ مُحَمَّدٌ قَالَ: فَلَمَّا سَوَّيْنَا عَلَيْهِ اللَّبِنَ سَقَطَتْ لَبِنَةٌ فَإِذَا أَنَا بِهِ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ فَقُلْتُ لِلَّذِي مَعَهُ: أَلَا تَرَى؟ قَالَ: اسْكُتْ فَلَمَّا سَوَّيْنَا عَلَيْهِ وَفَرَغْنَا أَتَيْنَا ابْنَتَهُ فَقُلْنَا لَهَا: مَا كَانَ عَمَلُ أَبِيكَ ثَابِتٍ؟ فَقَالَتْ: وَمَا رَأَيْتُمْ؟ فَأَخْبَرْنَاهَا فَقَالَتْ: كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ خَمْسِينَ سَنَةً فَإِذَا كَانَ السَّحَرُ قَالَ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ أَعْطَيْتَ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ الصَّلَاةَ فِي قَبْرِهِ فَأَعْطِنِيهَا فَمَا كَانَ اللهُ لِيَرُدَّ ذَلِكَ الدُّعَاءَ. ،"

'আমরা সাবিত আল বনানীকে দাফন করছিলাম। এমন সময় হামিদ আত্ তাওয়িলের পার্শ্বস্থ কবর হতে একটা পাথর সরে যায়। আর আমি হামিদকে কবরের মধ্যে নামায পড়তে দেখি। জীবদ্দশায় হামিদ আত্

তাওয়ীল সব সময় দোয়া করতেন: হে আল্লাহ তুমি যদি তোমার কোনো বান্দাকে কখনো কবরে নামায পড়ার নেয়ামত দিয়ে থাকো, তাহলে আমাকেও দিও'।[১]

"ইমাম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, হাকিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও বায়হাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ضَرَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِبَاءَهُ عَلَى قَبْرٍ وَهُوَ لَا يَحْسَبُ أَنَّهُ قَبْرٌ، فَإِذَا فِيهِ إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ حَتَّى خَتَمَهَا، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي ضَرَبْتُ خِبَائِي عَلَى قَبْرٍ وَأَنَا لَا أَحْسَبُ أَنَّهُ قَبْرٌ، فَإِذَا إِنْسَانٌ يَقْرَأُ بِسُورَةِ تَبَارَكَ حَتَّى خَتَمَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هِيَ الْمَانِعَةُ، هِيَ الْمُنْجِيَةُ، تُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে তিনি এবং আরও কয়েকজন সাহাবী এক সফরকালে কোনো এক জায়গায় একটা তাঁবু ফেলেন। সেখানে একটা কবরের উপস্থিতি সম্পর্কে তাঁরা জানতেন না। তাঁরা কেউ একজনকে সূরাতুল মূলক প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াৎ করতে শুনেন। যথন তাঁরা মদীনা মুনায়ারায় পৌঁছুলেন, তখন হুজূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ কথা জানালেন, যিনি বল্লেন, এই সূরাটি বেসালপ্রাপ্তজনকে আযাব থেকে রক্ষা করে।[২]

আবুল কাসিম সাদীও এটা বর্ণনা করেন তাঁর 'ইফসাহ' পুস্তকে এবং আরও বলেন, 'এটা প্রমাণ করে যে একজন ইন্তেকালপ্রাপ্ত মুসলিম তাঁর কবরে কুরআন তেলাওয়াৎ করতে পারেন'।

"ইবনে মানদা রওয়ায়াত করেন: তালহা হযরত উবায়দ-আল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে উদ্ধৃত করেন যে, এক বিকেলে তিনি (উবায়দ-আল্লাহ) অরণ্যে অবস্থান

[১]. আবূ নু'য়াইম ইস্পাহানী : হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/৩১৯।

[২] . তিরমিযী : আস সুনান, বাবু মা জা'আ ফি ফদ্বলিল সূরাতিল মুলূক, ৫/১৬৪ হাদীস নং ২৮৯০।

ক. বায়হাক্বী : শু'য়াবুল ঈমান, ২/৪৯৫ হাদীস নং ৯৪৯।

করছিলেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হিশামের কবরের পাশে বসার পর কবরের ভেতর থেকে খুব সুন্দরভাবে কুরআন পাঠ করার শব্দ শুনতে পেলেন। পরে এ কথা তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জানালেন। হুজূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 'হে উবায়দ-আল্লাহ যখন আল্লাহ রূহদেরকে নিয়ে যান, তখন তাদেরকে বেহেশতে রাখা হয়। প্রত্যেক রাতে তাদেরকে তাদের কবরে রাখা হয় সকাল পর্যন্ত' (হাদীস)।

"যখন কোনো মানুষ মারা যায়, তখন তার রূহ মারা যায় না। শরীর থেকে রূহ ভিন্ন বস্তু। কবরে দেহের সঙ্গে এর সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় না, এমন কি দেহ মাটি হয়ে গেলেও নয়। অজ্ঞ যারা আহল-এ-সুন্নাতের উলামার বইপত্র পড়েনি এবং লা-মযহাবী ও বাহাত্তরটি ভ্রান্ত দলের অনুসারীরা যারা হাদীসের বর্ননা অনুযায়ী জাহান্নামে যাবে, তারা জানে না যে রূহ দেহ হতে ভিন্ন জিনিস। তারা ধারণা করে যে মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে যেমন তার দেহের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়, ঠিক তেমনি রূহের অস্তিত্ব-ও বুঝি বিলীন হয়ে যায়, যেন তা দেহের-ই একটা সিফাত (গুণ) কিংবা সম্পত্তি। তারা বলে যে অন্যান্য মানুষের মতো আউলিয়াও মৃত্যু বরণ করেন এবং মাটিতে রূপান্তরিত হন, আর তাঁদের সত্তা ও রূহানীয়্যাতের অস্তিত্ব লয়প্রাপ্ত হয়। তারা বেসালপ্রাপ্তজনের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না, বরং অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকে। আউলিয়ার মাযার-রওযা যিয়ারত করে তাঁদের কাছ থেকে বরকত আদায় করা এবং তাঁদের তাওয়াসসুল করাকে ওই সব লোকেরা অস্বীকার করে। একদিন আমি হযরত শায়খ আরসালান দামেস্কীর মাযার শরীফ যিয়ারত করতে যাচ্ছিলাম। পথে এক গোমরাহ লোক আমাকে জিজ্ঞসা করলো: 'মাটিকে কি যিয়ারত করতে হবে?' আমি এতে খুবই আশ্চর্যান্বিত হলাম। মুসলিম হিসেবে পরিচয়দানকারী একজন লোকের এ ধরনের কথাবার্তা আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করেছিল।

"একটি হাদীস শরীফ ঘোষণা করে: إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ 'কবর হয় বেহেশতের বাগানগুলোর মধ্যে একটা বাগান, নয়তো দোযখের গর্তগুলোর মধ্যে একটা গর্ত'।[১] এ হাদীসটি বলে যে কোনো ইন্তেকালপ্রাপ্তজনের রূহ হয় তার কবরে রহমতপ্রাপ্ত হয়, নয়তো আযাব ভোগ করে থাকে। উপরোক্ত হাদীসে (এর বাইরে) আর কোনো অর্থই সংযোজন করা যায়

---

[১]. তিরমিযী : আল জামেউ, ৪/২২০ হাদীস নং ২৪৬০।
ক. ত্ববরানী : আল মু'জামুল আওসাত্ব, ৮/২৭৩।
খ. ইব্ন আসাকীর : আল মু'জাম, ২/৮৬৭ হাদীস নং ১০৯১।

না। এর অর্থ এই যে, রূহ দুনিয়াতে থাকাকালে ঈমান এবং আমল-সম্পন্ন হওয়ার কারণে হয় নির্মল হয়েছে, নয়তো কুফর ও বিদ্রোহী হওয়ার কারণে ময়লা হয়ে গিয়েছে। এই হাদীস শরীফটি সুস্পষ্টভঅবে ব্যাখ্যা করে যে রূহসমূহ পচে যাওয়া লাশের সঙ্গে একত্রিত হয়; এবং আরও প্রতিভাত করে যে মু'মিনের কবরসমূহ বরকতময় ও শ্রদ্ধার যোগ্য। এটা আশংকা করা হয় যে যদি কেউ কোনো আলেম (এ হক্কানী/রব্বানী)-এর কুৎসা রটনা করে কিংবা তাঁর প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হয়, তবে সে কাফের হয়ে যেতে পারে।

"জীবিত কিংবা ইন্তেকালপ্রাপ্ত উভয়ই আল্লাহর সৃষ্টি। তাঁদের কেউই কোনো কিছুর ওপর (নিজ হতে) তা'সির করতে পারেন না। একমাত্র আল্লাহ-ই সব বস্তুর ওপর তা'সির করে থাকেন। কিন্তু জীবিত কিংবা ইন্তেকালপ্রাপ্ত একজন মু'মিন বান্দার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব; কারণ জীবিত কিংবা ইন্তোকলপ্রাপ্ত উভয় মু'মিনই আল্লাহ তা'আলার শা'এর (স্মৃতিচিহ্ন) এবং মহান আল্লাহ পাক তাঁদেরকে সম্মান দেখাতে আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন কুরআনে: وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ 'কৃলবস্থ তাকওয়া থেকেই নিঃসৃত হয় আল্লাহর শা'এরের প্রতি তা'যিম বা সম্মান'।[১] শা'এর মানে হচ্ছে সে সব জিনিস যেগুলো আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সুলাহা (পীর/বুযূর্গ) ও উলামা জীবিত কিংবা বেসালপ্রাপ্ত উভয়েই হলেন আল্লাহর শা'এর। বিভিন্ন উপায়ে আউলিয়া ও উলামাকে তা'যিম প্রদর্শন করা যায়। এগুলোর একটা হচ্ছে তাঁদের জন্যে কাঠের খাটিয়া বানিয়ে দেয়া এবং তাঁদের মাযার-রওযার ওপর গুম্বজ নির্মাণ করা। তাঁদের পাগড়িগুলোর বিশালতা এবং তাঁদের কাপড়গুলোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পরিমাণ মাফিক হওয়াটাও তাঁদের প্রতি তা'যিম প্রদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়। 'জামিউল ফাতাওয়া' নামক কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে যে আউলিয়া, উলামা ও সাইয়্যেদগণের মাযার-রওযার ওপর ইমারত এবং গুম্বুজ নির্মাণ করা মাকরূহ নয়। 'মুদমারাত' নামক পুস্তকটি লিখে, 'মহান আলেম আবু বকর মুহাম্মদ বিন ফাদল বলেছেন: "আমাদের দেশের কবরে ইট ব্যবহার করা জায়েয। বস্তুতঃ কাঠ তো ব্যবহার হয়ে আসছেই"।[২]' হযরত তিমুরতাশী বলেছেন, 'এই মন্তব্যটি পরিস্ফুট করে যে এগুলো (ইট ও কাঠ) মরদেহের নিচে এবং দুই পাশে স্থাপন করতে হবে। মরদেহের ওপর এগুলোকে স্থাপন করা মোটেও মকরূহ নয়। কারণ এভাবে মরদেহকে বন্য প্রাণীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যায়।' এ কারণেই কবরসমূহ

[১]. আল কুর'আন : আল হজ্জ : ২২/৩২।
[২]. মুদমারাত।

খোলা হতে রক্ষা করার জন্যে সেগুলোর ওপর ইট দ্বারা ছেয়ে দেয়া হয়। ’তানউয়ীর-উল-আবসার’ নামক গ্রন্থে লিখা আছে: ‘কবর সমূহের ওপর কোনো ইমারত নির্মাণ করা উচিৎ নয়। কিন্তু এ কথাও বলা হয়েছে যে নির্মাণ করা জায়েয। আর এ কথাটাই বেছে নিতে হবে।’[১]

”যাইলা-ঈ তাঁর প্রণীত ‘শরহে কানয’ নামক পুস্তকে লিখেন: ‘কবরের (মাথার দিকের) ওপর একটা পাথরের ফলক স্থাপন করে কবরের এবং ইন্তেকালপ্রাপ্ত জনের সনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে তাতে তাঁর নাম লেখাকে জায়েয বলা হয়েছে।’[২]

“এ কথা বলা হয়েছিল যে আউলিয়ার মাযার-রওযার ওপরে চাদর চড়ানো ও পন্দা ঝুলানো মাকরূহ। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে তাঁদেরকে কুৎসা রটনা হতে রক্ষা করার জন্যে এবং তাঁদের প্রতি তা’যিম বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে এগুলো করা জায়েয। সালাফ আস্ সালেহীনের সময়ে এগুলো করা হয়নি সত্য, কিন্তু সে সব দিনে প্রত্যেকেই মাযার-রওযার প্রতি তা’যিম প্রদর্শন করতেন। ফিকাহর কিতাবসমূহে লেখা আছে যে বিদায় হজ্বের পরে পেছনের দিকে হেঁটে মসজিদুল হারাম ত্যাগ করতে হয়, কেননা এই আচরণে কাবার প্রতি তা’যিম প্রদর্শিত হয়। সালাফ-এ-সালেহীন পেছনের দিকে হেঁটে মসজিদ ত্যাগ করতেন না, কিন্তু কাবার প্রতি তাঁদের তা’যিম তো ত্রুটিযুক্ত ছিল না। কাবার ওপর আচ্ছাদন পূর্বে ছিল না এবং এর অনুমতিপ্রাপ্ত (মাশরু) হওয়ার ফাতওয়াটা পরে জারি করা হয়। একইভাবে, মাযার-রওযার ওপরে আচ্ছাদন দেয়াও জায়েয হয়ে গিয়েছে, যেহেতু আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কা’বার থেকেও বেশি শ্রদ্ধেয়। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কেননা আল্লাহর দান ও সম্মানের বিষয়বস্তু দ্বারা আউলিয়াগণ সম্মানিত। কাবা এ সম্মান থেকে বঞ্চিত। হ্যাঁ, আউলিয়া বেসালপ্রাপ্ত হয়েছেন। বেসালপ্রাপ্তজন পাথরের মতোই নড়াচড়া করতে পারে না। কিন্তু কাবাও তো পাথর [দ্বারা নির্মিত]। তাঁদের সবার প্রতি সম্মান দেখানো আমাদের জন্যে জরুরি। কাবার ওপর কিসওয়া (আচ্ছাদন) স্থাপন করার আদেশ দেয়া হয়েছিল। কাবাকে রেশমের কাপড় দ্বারা আচ্ছাদিত করাও জায়েয হিসেবে বর্ণিত হয়েছিল। যদিও আউলিয়ার মাযার-রওযা কাবা নয় এবং কাবার প্রতি আদিষ্ট প্রথাগুলো যদিও তাঁদের ক্ষেত্রে পালন করার আদেশ দেয়া হয়নি, তবুও তাঁরা সম্মানযোগ্য। আমাদের দ্বারা কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়া, তাওয়াফ করা, তা’যিম করা সবই আল্লাহর উদ্দেশ্যে,

---

[১]. তানউয়ীর-উল-আবসার।

[২].যাইলা-ঈ : শরহে কানয।

কাবার উদ্দেশ্যে নয়; যদিও সেটা পাথরের তৈরি। কাবার প্রতি তা'যিম আসলে আল্লাহর-ই প্রতি তা'যিম।

"কোনো মুসলিমকেই এ কথা বলতে শোনা যায়নি যে আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মাযার-রওযা কাবারই মতো, আর তাই তাঁদেরকে তওয়াফ করা কিংবা তাঁদের দিকে ফিরে নামাজ পড়া সহীহ। যে ব্যক্তি এ রকম ধারণা পোষণ করবে, তার জন্যে কুফরের আশংকা রয়েছে। প্রত্যেক মুসলিমই জানেন যে একমাত্র কাবা-ই হচ্ছে কিবলা এবং কাবা মক্কা নগরীতে অবস্থিত। তবুও মুসলিমগণ আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মাযার-রওযাকে তা'যিম করেন। তাঁরা আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম-এর মাযারকে সম্মান করেন, কেননা তাঁরা বিশ্বাস করেন যে সেগুলো আল্লাহতা'আলার ভালোবাসাপ্রাপ্ত [সুলাহা]-দের মাযার-রওযা। আমরা বিশ্বাস করি যে সকল মু'মিনই এ বিশ্বাস পোষণ করেন। মু'মিনদের উচিৎ একে অপরের প্রতি ভাল ধারণা রাখা এবং একে অপরকে তা'যিম করা। ইমাম আস সৈয়ুতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর প্রণীত 'জামিউস সগির' কিতাবে বর্ণিত হাদীস শরীফটি ইরশাদ ফরমায়: 'মু'মিনদের সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখা সুন্দর এবাদত' (হাদীস)। সূরা হুজুরাতের ১২নং আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا.

–'হে ঈমানদাররা সন্দেহকে যতোটুকু পারো এড়িয়ে চলো; কারণ কিছু কিছু সন্দেহ পাপযুক্ত। একে অপরের দোষ-ত্রুটির তালাশ করো না এবং একে অপরের কুৎসা রটনা করো না'।[১]

মু'মিনগণ যে সব কাজ ভাল নিয়্যতে সম্পাদন করেন, সেগুলোকে আমাদের গ্রহণ করা উচিৎ। আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মুনাফেকদের সম্পর্কে জানিয়েছিলেন, যারা কাফের হওয়া সত্ত্বেও মু'মিন হওয়ার ভান করেছিল। কিন্তু রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রতি মু'মিন হিসেবেই আচার-ব্যবহার করতেন, যেহেতু মানুষদেরকে তাদের বাহ্যিক আবরণ দেখে যা প্রতীয়মান হয় তা হিসেবেই গ্রহণ করতে তিনি আদিষ্ট হয়েছিলেন। তিনি সব সময় বলতেন যে একমাত্র আল্লাহ-ই সত্য এবং মানুষের অন্তঃস্থিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওয়াকেফহাল আছেন। একটা হাদীসে তিনি ঘোষণা করেন, 'যখন তারা বলে

---

১. আল কুর'আন : আল হুজুরাত, ৪৯/১২।

আশহাদু আন লা-ইলাহা ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মদান রাসূলুল্লাহ, তখনই তাদের জানমাল অস্পর্শযোগ্য [অর্থাৎ নিরাপদ]। একমাত্র আল্লাহ-ই তাদের ভেতরটা জানেন। আর সেই অনুযায়ী তিনি তাদেরকে বিচার করেন' (হাদীস)। একজন মুসলিম যা দেখেন তা যখন তিনি বুঝতে পারেন যে পরবর্তীকালে আবির্ভূত, তখন তাঁর উচিৎ নয় তা অস্বীকার করে প্রত্যাখ্যান করা; শরীয়তের দৃষ্টিতে সেটা বিশ্রী কিনা এবং শরীয়তের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা বের না করার আগে তাঁর উচিৎ নয় লাফ দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। প্রত্যেকের উচিৎ এ হাদীস শরীফের দিকে খেয়াল রাখা 'যারা (সুন্নাহর) একটা সুন্দর পথ উন্মুক্ত করে তাদের জন্যে সওয়াব রয়েছে এবং তাদের অনুসারীদের সওয়াবও তারা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত পেতে থাকবে' (হাদীস)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে যে জিনিসের অস্তিত্ব ছিল না এবং যা এই উম্মত দ্বারা পরবর্তীকালে প্রবর্তিত হয়েছে, সেটা যদি শরীয়তের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ না হয়, তবে তাকে বলা হয় সুন্নাত। আমাদের শরীয়ত যে সব জিনিস ওর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, সেগুলোকে সুন্নাত হিসেবে চিহ্নিত করে এবং তা-ই এগুলোকে বিদয়াত-এ-হাসানা বলা হয়।

"আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মাযার-রওযায় তেলের প্রদীপ, মোমবাতি ইত্যাদি জ্বালানো তাঁদেরকে তা'যিম করার উদ্দেশ্যেই করা হয়ে থাকে। এ ধরনের নিয়্যত শরীয়তে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। বিশেষ করে যিয়ারতকারী ও ওই ওলীর খেদমতগার গরিব লোকদের জন্যে কুরআন পাঠ করা খুব ভাল। মাযারের দিকে মুখ না করে তাহাজ্জুদের নামায আদায়কারীদের জন্যে (ওই স্থান) আলোকোজ্জ্বল করার নিয়্যত করাও সুন্নত। আমার পিতা ইসমাইল নাবলুসী তাঁর কৃত 'শরহে দুরার' গ্রন্থের ব্যাখ্যায় বলেনঃ 'কবরস্থানে সালাত আদায় করা মকরূহ, যেহেতু তা ইহুদীদের মতোই। যদি নামায পড়ার জন্যে কবরস্থানের মধ্যে কোনো পরিষ্কার জায়গা নির্ধারণ করা যায়, যেটা কোনো কবরমুখো নয়, তবে সেখানে নামায পড়া জায়েয হবে। 'হানিয়্যা ফতওয়া' ও 'হাওয়ী' কিতাবগুলোতে একই কথা লেখা হয়েছে। কবর যদি পেছনে থাকে, তবে তা (নামাজ আদায়) মকরূহ হবে না। কবর যদি কিছুটা দূরে থাকে, তা হলে সালাত মকরূহ হবে না, ঠিক যেমনি নামাযে রত কোনো নামাযীর সালাত মকরূহ না হয় মতো পর্যাপ্ত দূরত্ব বজায় রেখে সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়া জায়েয।'

"আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর রূহসমূহ যেসব জায়গায় অবস্থিত, সেই সব জায়গা থেকে বরকত আশা করা এবং মাযার-রওযাকে হাত দ্বারা স্পর্শ করাও জায়েয। 'জামিউল ফাতওয়া' গ্রন্থে লেখা আছেঃ মাযার-রওযাকে হাত দ্বারা স্পর্শ করাটা সুন্নাত অথবা মুস্তাহাব হিসেবে বর্ণিত হয়নি। আমাদের কাছে এটা মাকরুহ

নয়। আমলসমূহের সওয়াব নিয়্যতের ওপর নির্ভরশীল। যে আমল শরীয়তে নিষিদ্ধ নয় সেটা যদি ভাল নিয়্যতে করা হয়, তাহলে সেটা ভাল হিসেবেই বিবেচিত হবে। আল্লাহ প্রত্যেকের নিয়্যত সম্পর্কে ভালই জানেন এবং তিনি সেই অনুযায়ী গ্রহণ কিংবা প্রত্যাখ্যান করে থাকেন।

“আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর প্রতি ভালোবাসা ও তা'যিম প্রকাশের উপায় হিসেবে তেল, মোমবাতি, ঝাড় ইত্যাদি জিনিস তাঁদের মাযার-রওযায় প্রদান করার মানত করাও জায়েয। যিম্মী তথা অমুসলিম নাগরিকদের দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাস, অর্থাৎ, মসজিদুল আকসার জন্যে তেল ও মোমবাতি প্রদানের নযর সম্পর্কে ফিকাহর আলেমগণ বলেন: 'তাদের এই নযরটি সহীহ। কেননা, আমাদের এবং তাদের উভয়েরই মতানুযায়ী এটা তা'আত (আনুগত্য) ও কুরবাত (নৈকট্য)।' 'কিতাবুল আওফাফ'-এ যিম্মীদের কৃত ওয়াকফ ব্যাখ্যাকালে আহমদ হাসসাফ বলেন: 'যদি কোনো যিম্মী বলে, “আমি আমার চাষযোগ্য জমি ওয়াকফস্বরূপ দান করলাম”, তাহলে এর ফসলগুলো মসজিদুল আকসায় প্রজ্জ্বলিত তেল ও মোমবাতির পেছনে খরচ করা উচিৎ, কেননা আমাদের এবং তাদের উভয়েরই মতানুসারে আমলটি কুরবাত। বায়তুল মুকাদ্দাস হচ্ছে একটা মসজিদ। তাই ওটা করা জায়েয, যেহেতু রাত্রিতে মসজিদটাকে আলোকিত করা এর প্রতি তা'যিম প্রদর্শন করারই একটা উপায়। সালেহীন ও আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মাযার-রওযাও অনুরূপ স্থান।

“আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম-এর মাযারের সন্নিকটে বসবাসকারী গরিব লোকদেরকে দেয়ার নিয়্যত করে আউলিয়ার জন্যে টাকা-পয়সা নযর (মানত) করাও জায়েয। আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর জন্যে মানত করাটা আসলে মাজাযী বা রূপক অর্থে, কারণ নযরকারীর নিয়্যত হচ্ছে গরিবদেরকে সাদাকা দেয়া। ফিকহ্ কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ আছে যে গরিবদেরকে যে জিনিস উপহারস্বরূপ দান করা হয়, তা সাদাকায় পরিণত হয়। অতএব, এ উপহারটি ফেরত নেয়া যায় না। ধনীদেরকে সাদাকাস্বরূপ যে জিনিস দান করা হয়, তা উপহারে রূপান্তরিত হয়; তাই সেটা পুনরায় দাবি করা জায়েয। এই ধরনের বিষয়গুলোতে শরীয়ত যে কথাকে নয় বরং নিয়্যতকে বিবেচনা করে, তা-ই প্রতিভাত হয়। নযর আল্লাহর উদ্দেশ্যেই কৃত। যদি এটা অন্য কারও নাম উল্লেখ-পূর্বক করা হয়, তবে বুঝতে হবে যে এটা আল্লাহর উদ্দেশ্যেই কৃত। উদাহরণস্বরূপ, এ কথা বলা জায়েয 'যদি আল্লাহ আমার অসুস্থ [আত্মীয় পরিজন]-কে সুস্বাস্থ্য দেন, তাহলে আপনাকে দশটি স্বর্ণ (মুদ্রা) আমার দেনা।' একইভাবে, ‘আমার কাছ থেকে অমুকের জন্যে দশটি স্বর্ণ (মুদ্রা)-এর নযর হোক’-এই

মন্তব্যটির অর্থ হচ্ছে ওয়াদা। যে লোক এ নযরটি করে, সে ওয়াদা করে যে নিয়তকৃত নযরের প্রাপক যদি ধনী হয়, তবে এটা উপহারস্বরূপ প্রদত্ত হবে; আর যদি প্রাপক গরিব হয়, তবে এটা সাদাকা হিসেবেই দেয়া হবে। বহু লোক একজন যিম্মী কাফেরকে দেয়ার ওয়াদা করা থাকে এ কথা বলে, 'যদি আল্লাহ আমার অসুস্থ আত্মীয়কে সুস্বাস্থ্য দান করেন, তবে তোমাকে দশটি স্বর্ণ (মুদ্রা) আমার দেনা।' এ বাক্যটি পাপযুক্ত নয়, যেহেতু সে সাদাকা দেয়ার ওয়াদা করেছে। আর একজন যিম্মীকে সাদাকা দেয়া জায়েয। কিন্তু তাকে যাকাত দেয়া জায়েয নয়। উপরোক্ত ব্যাখ্যাগুলো বুঝতে সক্ষম হয়েছে এমন একজন লোক কীভাবে কোনো ওলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বেসালের পরে তাঁর উদ্দেশ্যে কথিত 'যদি আল্লাহ আমার অসুস্থ আত্মীয়কে সুস্বাস্থ্য দান করেন, তবে আপনার জন্যে দশটি স্বর্ণ আমার নযর'- এ কথাটিকে অস্বীকার করতে পারে? কোনো ওলীর কাছে অঙ্গীকার করা নিশ্চয়ই অন্য কারও কাছে অঙ্গীকার করার চেয়ে উত্তম। তাঁর বেসালপ্রাপ্ত হওয়ার বিষয়টি কোনো প্রতিবন্ধকতা নয়; কারণ নযরকারী জানেন যে তাঁর দেয়া টাকাটা মাযারের খাদেমদের এবং সেখানে সমবেত গরিবদের মাঝে বণ্টন করা হবে; আর তাই তিনি তাদেরকে উপহার ও সাদাকা দেয়ার ওয়াদা করেন। প্রত্যেক মুসলিমের উচিৎ নযরকারী ব্যক্তির কথার প্রতি এই অর্থ আরোপ করা। যারা বলে যে এ সব হারাম, তাদের কোনো (শরয়ী) সমর্থন কিংবা দলিল নেই। কোনো কিছুকে হারাম বলতে হলে আদিল্লা-এ-আরবা'আ, অর্থাৎ, কুরআনুল কারীম, হাদীস আশ্ শরীফ, এজমা আল উম্মাত কিংবা কিয়াস আল ফুকাহা থেকে একটা দলিল প্রদর্শন করা অত্যাবশ্যক। অ-মুজতাহিদের প্রয়োগকৃত কিয়াস অথবা প্রমাণসমূহের কোনো মূল্যই নেই। কিছু অজ্ঞ লোক বলে, 'কেউ কেউ মনে করে যে যখন আউলিয়ার মাযার-রওযা তা'যিম করা হবে এবং তাঁদের কাছে সাহায্য ও বরকত চাওয়া হবে, তখন তাঁরা যা চাওয়া হবে তাই দেবেন এবং আল্লাহর মতোই তা'সির করবেন। ফলে এ সকল লোক কাফের ও মুশরিকে রূপান্তরিত হয়। অতএব, আমরা আউলিয়ার মাযার-রওযা ধ্বংস করে দিয়ে তাদেরকে বাধা দেই। আউলিয়াকে এভাবে খাটো করলে সবাই জানবে যে তাঁরা অপমান হতে নিজেদেরকে রক্ষা করতে অক্ষম এবং ফলে সবাই কাফের ও মুশরিকে পরিণত হওয়া থেকে বেঁচে যাবে।' গোমরাহ্ (ওয়াহহাবী)-দের এ সব কথাই কুফর এবং সেগুলো ফেরাউনের কথার মতোই শোনায়। কুরআন-এ-করীম ফেরাউনের কথা উদ্ধৃত করে: 'আমায় মুসাকে হত্যা করতে দাও। সে তার আল্লাহকে আবেদন জানিয়ে আমার থেকে আত্মরক্ষা করুক। আমি আশংকা করি যে সে তোমাদের ধর্মকে পরিবর্তন করে ফেলবে এবং পৃথিবীতে ফিতনা সৃষ্টি করবে' (আল

আয়াত)। এ সকল অজ্ঞ লোকেরা অস্বীকার করে যে আল্লাহতা'আলা তাঁর আউলিয়াকে ভালোবাসেন এবং তাঁদের বেসালের পরও দোয়া কবুল করেন। এই লোকেরা ধারণা, সন্দেহ ও কল্পনা দ্বারা পরিচালিত হয়ে কথা বলে থাকে এবং হককে বাতিল থেকে পৃথক করতে অক্ষম।

"তারা মানুষকে মাযার-রওযার প্রতি তা'যিম প্রদর্শনে বাধা দিয়ে এবং মাযার ধ্বংস করে মুসলিমদেরকে শির্ক ও কুফর থেকে রক্ষা করছে তাদের এই কথাটা একটা ধোকা, ডাহা মিথ্যা। যদি তাদের এই কথাটা সত্য হতো, তবে তারা মুসলমোনদের মাঝে তওহীদের এলম শিক্ষা দিতো। তারা প্রামাণ্য দলিলের সাহায্যে সঠিক জ্ঞান প্রচার করে মুসলমানদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করতো।

"সুরা বুরুজের ২০ নং আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেন: وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ 'কেউই তাদেরকে আল্লাহ [-এর শাস্তি] থেকে বাঁচাতে পারবে না' ।[১] এর অর্থ, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো তা'সিরকারী কিংবা সৃষ্টিকারী নেই। যদি তারা [তওহীদের দাবিদার অজ্ঞা ওয়াহহাবীরা] তাদের দাবির ক্ষেত্রে সত্যবাদী হয়, তাহলে কেন তারা আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে অপমান করে? কেন তারা মানুষদের চোখের সামনে আউলিয়ার মাযার-রওযা ধ্বংস করে? কেন তারা মাযার-রওযার ওপরে তা'যিম সহকারে বিছানো মূল্যবান কাপড় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে? মানুষদেরকে শির্ক থেকে রক্ষা করার জন্যে কি এ ধরনের বর্বরোচিত আক্রমণ করা জরুরি? যে ব্যক্তি মুসলমান তিনি এ কথা বলতে পারবেন না যে এক হাজার বছর যাবত উম্মতে মুহম্মদীয়া 'দালালাত'-এ (গোমরাহীতে) নিমজ্জিত ছিলেন; তিনি তাঁদের সম্পর্কে বদ চিন্তা করতে পারবেন না। যদিও রাসূল-এ-করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মুনাফেক, অর্থাৎ, মুসলমান ছদ্মবেশধারী কাফেরদেরকে চেনতেন, তবুও তিনি তাদের কারও পরিচয় প্রকাশ করেন নি। যাঁরা তাদের সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন, তাঁদেরকে তিনি বলতেন: 'আমরা তাদের কথা, কাজ ও বাহ্যিক আবরণের দিকে তাকাই। একমাত্র আল্লাহ-ই তাদের ক্বলব সম্পর্কে জানেন' (হাদীস)।

"একজন কামেল অলীর প্রতি বিশ্বাস রাখা এবং তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে তাঁরই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা শরীয়তেরই একটা আদেশ। চার মযহাবের যে কোনো একটার তকলিদ মেনে আল্লাহর আদিষ্ট এবাদত পালন করা যেমন জরুরি, একজন মুরশিদের প্রদর্শিত পথে কাজ করে তাঁর হিম্মাত (সাহায্য) ও বরকত

[১]. আল কুর'আন: আল বুরূজ, ৮৫/২০।

অর্জন করা এবং তাঁকে ভালোবাসাও ঠিক তেমনি জরুরি। এটা বিশ্বাস করা আবশ্যক যে জীবিত বা মাযারস্থ কোনো মুর্শিদের প্রতি মহব্বত পোষণকারীদের বাঁচাতে তিনি এগিয়ে আসবেন। কারণ, বাস্তবে আল্লাহ-ই তা'সির প্রদান করে থাকেন। তিনিই বেসালপ্রাপ্ত কিংবা জীবিত [মুরশিদ]-কে তা'সির করার ক্ষমতা দান করতে সক্ষম। কেননা, একজন মুর্শিদ নিজ [ক্ষমতা] থেকে তা'সির করতে পারেন না; তিনি আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তা'সির করে থাকেন। মুরশিদ হচ্ছেন একটা কারণ বা মাধ্যম বিশেষ। যে ব্যক্তি এই কারণ [কিংবা মাধ্যম]-কে আঁকড়ে ধরে আল্লাহর কাছে ফায়েয ও সাহায্য চান, তাঁকে তা থেকে বঞ্চিত করা হয় না। একজন জীবিত মুরশিদ নিজ ক্ষমতাবলে কাউকেই আল্লাহপ্রাপ্তি দিতে পারেন না। একমাত্র আল্লাহ-ই তা দিতে পারেন। সুরাতল কাসাসের ৫৬ আয়াতে আল্লাহ পাক মুর্শিদগণের সর্বশ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলছেন: **إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ** আপনি যাকে চান তাকে হেদায়ত দিতে পারবেন না। আল্লাহ যাকে চান, তাকে হেদায়াত দান করেন।[১] সুরা আল-ই-ইমরানের ১২৮ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: **لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ** 'আপনি আর তাদের জন্যে কিছুই করতে পারবেন না'।[২] অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহতা'আলাই সব কিছু করে থাকেন।

"মহান অলী এবং তাসাউফের একজন অভিজ্ঞ ইমাম হযরত মুহিউদ্দীন ইবনে আরবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'একদল মুর্শিদ যাদের কাছ থেকে আমি উপকার পেয়েছি, তারা হলো আমার দেখা ফেয নগরীর ঘরগুলোর ওপর পানি নিষ্কাশনের প্রণালী। বহু লোক সেগুলো থেকে বৃষ্টির পানি গ্রহণ করে উপকার লাভ করছিল। আমার আরেকজন মুর্শিদ হলো মাটিতে শায়িত আমারই ছায়া। ছায়াটি আমার কারণে নয়, বরং সূর্যালেকের কারণে।' 'রূহুল কুদ্দুস' গ্রন্থটিতে এ ধরনের বহু সূক্ষ্ম জ্ঞান বিধৃত হয়েছে। যেহেতু হযরত মুহিউদ্দীন ইবনে আরবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর আল্লাহপ্রাপ্তির আকাঙ্খা খালেস (একনিষ্ঠ) ছিল, সেহেতু তিনি পানি নিষ্কাশন প্রণালী এবং তাঁর ছায়াকে তাঁর পথে অগ্রসর হবার জন্যে আঁকড়ে ধরেছিলেন। মাযারস্থ আউলিয়া কি এ দুটোর থেকে শ্রেষ্ঠ নন? যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর রূহসমূহ তাঁদের মাযারস্থ দেহ মুবারকের সাথে একত্রে অবস্থানরত, সে কি কোনো বেসালপ্রাপ্ত ওলীর কাছে

[১]. আল কুর'আন : আল ক্বাসাস , ২৮/৫৬।
[২]. প্রাগুক্ত : আলে ইমরান, ৩/১২৮।

সাহায্য প্রার্থনাকে অস্বীকার করতে পারবে? রাব্বুল আলামীনকে জানার ব্যাপারে জীবিত গাফেলদের চেয়ে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ বেসালপ্রাপ্ত আউলিয়ার রূহ মোবারকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করাকে কি কখনো অস্বীকার করা যায়? এতে [বেসালপ্রাপ্ত আউলিয়ার সাহায্য প্রদানের বিষয়টিতে] অবিশ্বাসী ব্যক্তিদের যখন কোনো অবিবেচক লোকের কিংবা কোনো কাফেরের কাছ থেকে সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তখন তারা অবনত মস্তকে ওই কাফের কিংবা অবিবেচক লোকের কাছে গমন করে এবং তার মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করে তার কাছে আবেদন-নিবেদন জানায়। তারা তার কাছে নিজেদের বিষয়সমূহের সমাধান চায়। তারা তার সাহায্য কামনা করে। আর যখন তাদের সমস্যাগুলোর সমাধান হয়ে যায়, তখন তাদের প্রত্যেকেই বলে, 'অমুকে আমার সমস্যার সমাধ্যান করেছে। সে আমাকে সাহায্য করেছে।' আউলিয়ার রূহ মোবারক থেকে সাহায্য প্রার্থনাকে যারা শির্ক বলে থাকে, তারা যখন ক্ষুধার্ত হয় তখন তারা তাদের গ্রহণ করা খাদ্যের কাছ থেকে পরিতৃপ্তি আশা করে এবং তারা তেষ্টা মেটাবার জন্যে পানির শরণাপন্ন হয়। যখন তারা ঠান্ডা অনুভব করে, তখন তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ সব মাধ্যমকে আঁকড়ে ধরে। যখন তারা এগুলোর শরণাপন্ন হয়, তখন তারা জানে যে এগুলোর কোনোটার-ই রূহ, চেতনা কিংবা নড়াচড়া করার সামর্থ্য নেই। যখন তারা এ ধরনের জীবনহীন,স্পন্দনহীন জিনিস হতে সাহায্য ও উপকার পায়, তখন যদি তারা বলে, 'আমি খাদ্য ভক্ষণ করে পরিতৃপ্ত হয়েছি; চুলা প্রজ্জ্বলিত ছিল এবং আমি গরমে অবস্থান করেছি' এ রকম কথা বলাটা কোনো ব্যক্তির জন্যে রূপক [মাজাযী, ইসতিয়ারা] হবে; খাদ্য কিংবা চুলা, পরিতৃপ্ত অথবা গরম করে না, বরং আল্লাহতা'আলাই সব কিছু সৃষ্টি করে থাকেন; একমাত্র তিনি-ই সৃষ্টিকর্তা', তাহলে তারা সত্য-ই বলবে। তাদের ওই সব কথা ও কাজকর্ম রূপক অর্থে হবে। কেউই তাদের কথায় খুঁত ধরবে না। তারা বলে, 'এই ওষুধ আমার ব্যথা উপশম করেছে। এই বড়ি আমার ক্ষত নিরাময় করেছে' এবং এ সব কথাকে তারা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বিবেচনা করে। এসব কথার প্রতি তাদের কেউই কোনো রকম প্রতিবাদ করে না। কিন্তু আউলিয়া-এ-আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা প্রসঙ্গে তারা বলে, এই ধরনের কোনো কিছু-ই (শরীয়তে) নেই। এই সব কথা শির্ক সৃষ্টিকারী। এগুলো কোনো ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। অথচ আউলিয়া-এ-আল্লাহ প্রত্যেকটি ওষুধ থেকে শ্রেষ্ঠ। আল্লাতা'আলা তাঁদেরকে অন্য সব নিন্দিষ্ট গুণাগুণ ও তা'সির যেমন প্রদান করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে তিনি তাঁর আউলিয়ার রূহসমূহের মধ্যে মানুষকে সাহায্য প্রদানের তা'সির ক্ষমতা দিয়েছেন, যাতে তাঁরা মানুষের বিপদের সময় তাদেরকে রক্ষা করতে পারেন। বহু বার বহু স্থানে (বেসালপ্রাপ্ত

আউলিয়ার) এই সাহায্য প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। এ সব ঘটনা এবং তাসাউফের পথে অগ্রসর হওয়ার সময় আউলিয়ার সাহায্য প্রদানের ঘটনাসমূহ দ্বারা ইসলামী ইতিহাস ও তাসাউফের কিতাবগুলো পূর্ণ। এ সকল ঘটনা ও বাস্তবতাকে অবিশ্বাস করা যেমন অযৌক্তিক, ঠিক তেমনি এতে বিশ্বাস স্থাপনকারীদের প্রতি আক্রমণ করাও মানবাধিকারের লংঘন। সংক্ষেপে, এটা একটা স্বেচ্ছাচার ও ঔদ্ধত্য বৈ কিছু নয়।

"কোনো জীবিত অলীর কাছ থেকে ইরশাদ লাভের উদ্দেশ্যে এবং নিজের চারিত্রিক দোষ-ত্রুটি দূর করার উদ্দেশ্যে তাঁকে ভালোবাসা এবং তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়াকেও অজ্ঞরা আক্রমণ করে থাকে। আবদুল ওয়াহহাব শারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'মাশারিক-উল-আনোয়ার-ইল-কুদসিয়া ফী বয়ান-ইল-উহুদ-ইল-মুহাম্মদীয়া' পুস্তকে লিখেন: 'মারুফ-ই-কারখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর মুরিদদেরকে বলেছেন, "যখন তোমাদের কোনো আবেদন-নিবেদন থাকে, তখন আমাকে অনুরোধ জানাবে, আল্লাহকে নয়।" আর যখন তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তিনি উত্তর দেন, "যেহেতু তারা আল্লাহকে চেনে না, সেহেতু তাদের দোয়া কবুল করা হবে না। তাদের দোয়া তখনি কবুল করা হবে, যখন তারা আল্লাহকে চেনবে। আমার উস্তাদ মুহাম্মদ হানাফী শাযিলি ও তাঁর মুরিদানবৃন্দকে মিসর হতে হিজাযের পথ পরিক্রমণের সময় একটা নদী পার হতে হয়। ওই সময় কোনো নৌকা অথবা অনুরূপ কিছু সেখানে ছিল না। তিনি বল্লেন, 'তোমরা বলো 'হে হানাফী' এবং তারপর হাঁটতে থাকো। খবরদার 'এয়া আল্লাহ' বলবে না, নতুবা তোমরা পানিতে ডুবে যাবে।' মুরিদদের মধ্যে একজন বললো, 'এয়া আল্লাহ' এবং সে সাথে সাথেই ডুবতে আরম্ভ করলো। যখন সে তার দাড়ি পর্যন্ত নিমজ্জিত হলো, তখন তার মুর্শিদ তার প্রতি দয়াবান হলেন এবং তাঁকে রক্ষা করলেন এবং তিনি বল্লেন, 'হে বৎস। যেহেতু তুমি আল্লাহকে চেনো না, সেহেতু তাঁর পবিত্র নাম উচ্চারণ করার ফলে তোমার কোনো উপকার হয় নি। তাই তুমি পানিতে হাঁটতে সক্ষম হওনি। সাধনা করো (পরিশ্রম করো) আল্লাহর মহত্ব সম্পর্কে আমার কাছ থেকে জানো। ফলে তুমি আর বাহনসমূহের ওপর মনোনিবেশ করবে না"।' [১]

"পারসিক কিতাব 'তাযকিরাতুল আউলিয়া'তে শায়খ ফরিদ আদ-দীন আত্তার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেন: 'হযরত আবুল হাসান-ই-খারকানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মুরিদান তাদের দেশের বাড়িতে যাওয়ার জন্যে অনুমতি চায়। তারা

---

[১]. আবদুল ওয়াহাব শারানী :মাশারিক-উল-আনওয়ার।

তাঁকে তাদের জন্যে দোয়া করতে অনুরোধ জানায়। তিনি বলেন, ”বিপদের সময় ’এয়া আবাল হাসান’ বলবে। সফরকালে মুরিদরা এক রাতে ডাকাত দল কর্তৃক আক্রান্ত হয়। তারা সবাই ‘এয়া আল্লাহ’ বলে চিৎকার করে; শুধু একজন বলেন, ’ইয়া আবাল হাসান’। ডাকাতরা তাঁকে দেখেনি। তারা অন্যান্য মুরিদদের সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে যায়। সকালে মুরিদরা বিস্মিত হয়ে রক্ষাপ্রাপ্তজনকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন: ‘আমি “ইয়া আবাল হাসান” বলি, ফলে আমি ডাকাতদের থেকে বেঁচে যাই।’ তারা সবাই তাদের খাজার (হযরত আবুল হাসানের) কাছে গিয়ে তাঁকে এর রহস্য জানাতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, ’হারাম তোমাদের মুখে প্রবেশ করে এবং হারাম সেখান থেকে নির্গত হয়। তোমরা আল্লাহকে চেনো না। তোমরা “আল্লাহ” বলো রূপকভাবে, স্বভাবগত কারণে। এই ধরনের লোকের দোয়া কবুল হয় না। আল্লাহতা’আলা তার (রক্ষাপ্রাপ্ত মুরিদের) কণ্ঠস্বরকে আবুল হাসানের কাছে শুনিয়েছিলেন। আর আবুল হাসান তাকে রক্ষা করার জন্যে দোয়া করেছিলেন; আবুল হাসান হারাম পানাহার করেন না। তিনি হারাম উচ্চারণও করেন না; (তাই) তাঁর দোয়া কবুল হয়ে যায় এবং সে (ওই মুরিদ) রক্ষা পায়।’

“সেই ব্যক্তি কত সৌভাগ্যবান, যিনি কোনো মুর্শিদে কামেলের সন্ধান পান এবং তাঁর থেকে ফায়েয লাভ করে কল্যাণ অর্জন করেন। আর যে ব্যক্তি একজন মুর্শিদ-এ-কামেলের খোঁজ পায় না, তার জন্যে কোনো বেসালপ্রাপ্ত ওলীর সঙ্গে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করে সাহায্য কামনা করা-ই উত্তম। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউই কারও উপকার অথবা ক্ষতি করতে পারে না। এ বিষয়ে জীবিত লোকেরাও মৃতদের মতোই অক্ষম। এ বিষয়টি যে ব্যক্তি ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হয়, সে আউলিয়ার কারামত ও সাহায্য প্রদানের বিষয়টিকে আক্রমণ করতে পারে না। আল্লাহ তা’আলা তাঁর আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে অত্যন্ত ভালোবাসেন। যারা তাঁদের কুৎসা রটনা করে, এমন কি যারা তাঁদের সম্পর্কে শোনার পরও বিশ্বাস করে না, তাদেরকে তিনি শাস্তি না দিয়ে ছাড়বেন না। যে ব্যক্তি আল্লাহর বন্ধু আউলিয়ার প্রতি যুলুম করেছে, সে প্রকৃতপক্ষে নিজের সত্তার প্রতি-ই যুলুম করেছে।

”শারাফউদ্দীন ইবনে ফরিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি , মুহীউদ্দীন ইবনে আরবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, আফিফউদ্দীন তালামসানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও আব্দুল হাদী সুদী [এবং মোল্লা জামী, মাওলানা রুমী, শায়খ খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি, সুফী শিহাবউদ্দীন সোহরাওয়াদী]-এর মতো তাসাউফের ইমাম এবং আ’রিফগণের লেখা সেমা (সঙ্গীত) ক্বলবকে প্রভাবিত করে। এটা শান্তি ও

সমর্পণের দিকে প্রভাবিত করে (অন্তরকে)। এ ধরনের সেমার বাস্তবতা যাঁরা বুঝতে পারেন, তাঁদের জন্যে তা গাওয়া এবং শ্রবণ করা জায়েয। তবে যারা আল্লাহকে ভুলে থাকে এবং যাদের নফস ইন্দ্রিয় কামনায় দোদুল্যমান তাদের জন্যে তা শোনা জায়েয নয়।

"যদি কেউ নিজেকে ব্যাখ্যা করার সময় এমন কোনো কিছু উচ্চারণ করে, যা নাকি কুফর কিংবা যদি কোনো হারাম সে সংঘটন করে, তবে এ কথা বোঝা যাবে যে সে ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানে না। এ ধরনের লোকদের ছাড়া কোনো মুসলিমের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা কারও পক্ষে উচিৎ নয়। কোনো ব্যক্তির উচিৎ নয় নিজেকে নিজে প্রতারিত করা। কেউ যদি বিশ্বাস না করে যে তার ক্বলবে আল্লাহর প্রতি মহব্বত আসন গাড়তে পারবে, তাহলে তার উচিৎ তাসাউফের উৎস তালাশ করা। কেউ তার নিজের নফসকে বিশ্বাস করতে না পারলে, তার উচিৎ আহল-এ-সুন্নাতের এ'তেক্বাদ ও ফিকাহ বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধির চেষ্টা করা। মুনাফেকের মতো মুতাসাউয়ীফগণের সঙ্গে মেলামেশা করাটা কোনো ব্যক্তির এড়িয়ে চলা উচিৎ। কেননা, আল্লাহ সব কিছু ভালভাবে জানেন।

"জামিউল ফাতাওয়া গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে: 'আমরা এমন কোনো বর্ণনা দেখি নি, যেখানে বর্ণিত হয়েছে যে হাত দ্বারা মাযার-রওযা স্পর্শ করা সুন্নাত কিংবা মুস্তাহাব। তবে আমরা এটাকে নাজায়েযও বলতে পারবো না। যারা বলে যে এটা হারাম, তাদের পক্ষে কোনো প্রামাণ্য দলিল নেই। এগুলোকে হারাম বলতে হলে একজন ব্যক্তিকে আদিল্লা-এ-আরবায়া তথা কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কেয়াস হতে অন্ততঃ একটা সুস্পষ্ট প্রামাণ্য দলিল প্রদর্শন করতে হবে। অ-মুজতাহিদদের কিয়াসের কোনো মূল্যই নেই। কতিপয় অজ্ঞ লোক বলে, 'যদি আউলিয়ার মাযার-রওযাকে তা'যিম করা হয় এবং যদি তাঁদের কাছে সাহায্য ও বরকত প্রার্থনা করা হয়, তাহলে কিছু লোক হয়তো মনে করতে পারে যে তাঁরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন এবং আল্লাহর মতোই তা'সির করতে পারেন; ফলে তারা কাফের ও মুশরিক হয়ে যাবে। এ কারণেই আমরা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাস্বরূপ আউলিয়ার মাযার-রওযা ধ্বংস করে থাকি। তাদেরকে এভাবে খাটো করলে সবাই জানবে যে তাঁরা অপমান হতেও নিজেদেরকে রক্ষা করতে অক্ষম; ফলে সবাই কাফের ও মুশরিক হওয়া থেকে বেঁচে যাবে।' অজ্ঞ লোকদের এ কথাটা কুফর। এটা ফেরাউনের কথার সঙ্গে মিলে যায়। কুরআনে ফেরাউনের কথা উদ্ধৃত হয়েছে: 'আমায় মুসাকে হত্যা করতে দাও। তার রবের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে সে আত্মরক্ষা করুক দেখি। আমি আশংকা করি, সে তোমাদের ধর্মকে পরিবর্তন করে ফেলবে এবং দুনিয়ার মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি করবে' (আল আয়াত)। এ সকল অজ্ঞরা

অস্বীকার করে যে আল্লাহ তাঁর আউলিয়াকে ভালোবাসেন এবং তিনি যাঁদেরকে ভালোবাসেন তাঁদের দোয়া তিনি কবুল করে নেন এবং তাঁদের বেসালের পরও তাঁদের রূহের ইচ্ছা [ও অনিচ্ছা] সৃষ্টি করে দেন। এই অজ্ঞ লোকেরা সন্দেহ ও কল্পনার ওপর ভিত্তি করে কথা বলছে। তারা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারছে না। কোনো মুসলমান কখনো এ কথা বলতে পারেন না যে এক সহস্র বছর ধরে উম্মতে মুহাম্মদীয়া দালালাতে [পথভ্রষ্টতায়] নিমজ্জিত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সব মুনাফেকের পরিচয় উম্মোচিত করেন নি, যারা মুসলিম হওয়ার ভান করতো, যদিও তিনি তাদেরকে চেনতেন। তাদের সম্পর্কে যাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করতেন, তাঁদেরকে তিনি বলতেনঃ 'আমরা তাদের কথা, কাজ ও বাহ্যিক আবরণের দিকে তাকাই। আল্লাহ্ তাদের কলবের ভেতরটা জানেন' (হাদীস)।" (মাওলানা আবদুল গণি নাবলুসী কৃত 'কাশফুন নূর' পুস্তকের অনুবাদ এখানে শেষ হলো)

যদি কোনো মুসলমানের একটা কথা কিংবা একটা কাজ থেকে এক'শটা অর্থ বের করা যায় এবং যদি সেগুলোর একটা অর্থ তাঁকে মুসলিম হিসেবে প্রতীয়মান করে, আর বাকি ৯৯টা কাফের হিসেবে, তবে আমাদেরকে বলতে হবে যে তিনি একজন মুসলিম। অর্থাৎ, কুফর প্রতীয়মানকারী ৯৯টা অর্থকে ধরা হবে না এবং ঈমান প্রতীয়মানকারী অর্থটাকে গ্রহণ করা হবে। অতএব, ওয়াহাবীদের দ্বারা ধোকাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির উচিত নয় মুসলমানদেরকে কাফের ও মুশরিক আখ্যা দেয়া; মুসলমানদের সম্পর্কে তার বদ চিন্তা থাকা উচিৎ নয়। আমাদের এ কথাকে ভুল না বোঝার জন্যে দুটো বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথমতঃ যে ব্যক্তির কথা কিংবা কাজকে পর্যালোচনা করা হচ্ছে, তাঁকে একজন মুসলমান হিসেবে পরিচিত হতে হবে। পক্ষান্তরে, একজন কাফেরের একটা নয় বরং বহু কথা কিংবা কাজ যদি ঈমান প্রতিফলন করে, তবুও তাকে একজন মুসলমান বলা যাবে না। যখন একজন ফরাসী লোক কুরআনের প্রশংসা করেন কিংবা একজন বৃটিশ লোক বলেন যে আল্লাহ এক কিংবা একজন জার্মান দার্শনিক বলেন যে ইসলাম-ই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, তখন এ কথা বলা যাবে না যে তাঁরা মুসলিম হয়ে গিয়েছেন। কোনো কাফেরকে মুসলমান হতে হলে তাকে বলতে হবে "আল্লাহ হাজির-নাযির আছেন। তিনি এক, অদ্বিতীয়। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। তিনি তাঁকে পৃথিবীর শেষ সময় পর্যন্ত আগত সকল মানুষের জন্যে নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, তার সব কিছুতেই আমি বিশ্বাসী" এবং সাথে সাথেই ঈমানের ছয়টি ভিত্তি ও তেত্রিশটি ফরয শিখে নিয়ে তাতে বিশ্বাস করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ বলা হয়েছিল যে "একটা

কথা কিংবা কাজ থেকে এক'শটা অর্থ।" যদি কোনো ব্যক্তির এক'শটা কথা কিংবা কাজের মধ্যে একটা কথা কিংবা কাজ ঈমান প্রতিফলন করে, আর বাকি নিরানব্বইটা যদি কুফর প্রতীয়মান করে, তবে সে-ই লোককে আমরা মুসলমান বলতে আদিষ্ট নই। কারণ, একজন লোকের শুধুমাত্র একটা কথা কিংবা কাজও যদি কুফর প্রতিফলন করে এবং যদি সেটার মধ্যে কোনো ঈমান প্রতিফলনকারী অর্থ না থাকে, তাহলে তাকে কাফের হিসেবে বিবেচনা করা হবে। ঈমান প্রতীয়মানকারী তার অন্যান্য কথা কিংবা কাজ তাকে কুফর থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

# ওহাবীদের প্রতি নসীহত (২য় খন্ড)

ওহাবীদের আরম্ভ ও প্রসার [অধিকাংশ আইয়ুব সাবরী পাশার তুর্কী 'মিরাতুল হারামাইন' গ্রন্থ থেকে সংকলিত]

৩৬/ আরবীয় উপদ্বীপে উসমানীয় তুর্কী সালতানাতের শাসনামলে প্রতিটি প্রদেশই উসমানীয়দের দ্বারা নিয়ুক্ত একজন শাসক কর্তৃক শাসিত হতো। পরবর্তী পর্যায়ে হেজায (মক্কা-মদীনা) ছাড়া বাকি সব রাজ্য জবর-দখলকারীদের শাসনাধীন হয়ে যায় এবং 'শায়খ" শাসিত রাজ্যে পরিণত হয়।

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব কর্তৃক প্রবর্তিত ওহাবীবাদ নামক একটি বিদআতী আন্দোলন অতি সহসাই একটি রাজনৈতিক আকার ধারণ করে ১১৫০ হিজরী/১৭৩৭ ইং সালে এবং আরব ভূখন্ডে তা বিস্তার লাভ করে। পরবর্তীকালে ইস্তাম্বুলে অবস্থিত খলীফার আদেশক্রমে মিশরীয় শাসনকর্তা মুহাম্মদ আলী পাশা মিশরীয় সৈন্যবাহিনীসহ আরব ভূখন্ডকে ওহাবীদের হাত থেকে মুক্ত করেন।

ওহাবীরা সর্বপ্রথম ১২০৫ হিজরী সালে মক্কার আমির (শাসক) শরীফ আফেন্দীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এর আগে তারা গোপনে ওহাবীবাদ প্রচার করে। অতঃপর তারা বহু মুসলমানের ওপর হত্যাকান্ড ও অত্যাচার-নিপীড়ন আরম্ভ করে এবং তাঁদের মালামাল আত্মসাৎ করে।

ওহাবীবাদের প্রবর্তক হলো বণী তামিম গোত্রের মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব। সে ১১১১ হিজরী/১৬৯৯ খৃষ্টাব্দ সালে নজদ মরুভূমির হুরাইমিলা শহরের উবায়না পল্লীতে জন্মগ্রহণ করে এবং ১২০৬ হিজরী/ ১৭৯২ খৃষ্টাব্দ সালে মৃত্যুবরণ করে। ইতিপূর্বে সফর ও ব্যবসার উদ্দেশ্যে সে বসরা, বাগদাদ, ইরান, ভারত ও দামেশক গিয়েছিল, যেখানে তার ধূর্ত ও ভাঁওতাবাজিপূর্ণ বিনয়ী মনোভাব তাকে "আশ শায়খ আন্ নজদী" খেতাবটি অর্জনে সাহায্য করে। সে এ সব এলাকায় বহু বিষয় শিখতে পেরেছিল এবং নিজেকে একজন নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্নে বিভোর হয়েছিল। তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সে একটি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ করাকে যথাবিহিত মনে করে এবং এ লক্ষ্যে সে কিছুকাল মদীনা মুনাওয়ারার এবং পরবর্তীকালে দামেশকের হাম্বলী উলামা-এ-কেরামের দ্বীনী প্রভাষণসমূহ শ্রবণ করে। সে যখন নজদে ফিরে যায়, তখন সে গ্রামবাসীদের জন্যে দ্বীনী বিষয়ে ছোট ছোট বই লেখা আরম্ভ করে। তার ক্ষতিকর ও পথভ্রষ্ট ধ্যান-ধারণা, যা সে মু'তাযিলা ও অন্যান্য বিদআতী সম্প্রদায় হতে গ্রহণ করেছিল এবং এসব পুস্তিকায় সন্নিবেশিত করেছিল, তা বহু অজ্ঞ-মূর্খ গ্রামবাসীকে, বিশেষ করে দারিয়াবাসীদেরকে এবং তাদের মূর্খ নেতা মুহাম্মদ ইবনে সউদকে বিভ্রান্ত

করে। আরব জাতি বংশ-পরিচয়কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতো এবং যেহেতু ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব কোনো উচ্চ মর্যাদা ও খ্যাতিসম্পন্ন পরিবারের সন্তান ছিল না, সেহেতু সে তার ওহাবী মতবাদ প্রচারের জন্যে মুহাম্মদ ইবনে সৌদকে ঘুটিস্বরূপ ব্যবহার করে। সে নিজেকে কাজী (বিচারক) ও ইবনে সৌদকে হাকিম (শাসক) হিসেবে ঘোষণা করে। নিজেদের সংবিধানে সে এ মর্মে একটি আইন সন্নিবেশিত করে যে শুধু তাদের সন্তানেরাই উত্তরাধিকারীস্বরূপ তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে।

যখন "মিরাতুল হারামাইন" গ্রন্থটি ১৩০৬ হিজরী সালে প্রণীত হয়, তখন নজদের আমীর পদে সমাসীন ছিল মুহাম্মদ ইবনে সৌদের বংশধর আবদুল্লাহ ইবনে ফয়সাল এবং কাজী তথা ধর্মীয় বিষয়াবলীর প্রধান ছিল মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাবের বংশধর।

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের পিতা আবদুল ওয়াহাব যিনি মদিনায় একজন নেককার ও প্রকৃত আলেম ছিলেন, তিনি এবং ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের ভাই সোলাইমান ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব এবং তার শিক্ষকগণ তার বক্তব্য, আচার-আচরণ ও মহাভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা, যা সে মদীনায় একজন ছাত্র থাকাকালে তাঁদের সামনে অহরহ পেশ করতো, তা থেকে আঁচ করতে পেরেছিলেন যে সে ভবিষ্যতে গোমরাহ্-যিনদিক হয়ে যাবে এবং ইসলামের ভেতর অন্তর্ঘাতমূলক অপতৎপরতায় লিপ্ত হবে। তাঁরা তাকে তার ভ্রষ্ট ধ্যান-ধারণা শুধরাতে পরামর্শ দেন এবং তাকে এড়িয়ে চলার জন্যে মুসলমানদের প্রতি উপদেশ দেন। কিন্তু তাঁরা যা আশংকা করেছিলেন তা-ই অতি সত্বর বাস্তবে রূপ নেয় এবং সে ওহাবীবাদের নামে তার গোমরাহ মতবাদ প্রচার শুরু করে। বেওকুফ ও অজ্ঞ লোকদেরকে ধোকা দেয়ার জন্যে সে উলামায়ে ইসলামের কিতাবপত্রের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ সংস্কার ও বেদআতের উদ্ভাবন করে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী সত্যপন্থী মুসলমানদেরকে কাফের আখ্যা দিতে পর্যন্ত সে কুণ্ঠিত হয়নি। সে আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিস্ সালাম এবং আউলিয়ায়ে কেরাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম-এর ওসীলায় আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করাকে শিরক (অংশীবাদ) মনে করতো।

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের মতে, যে ব্যক্তি কবরের কাছে দোয়া করার সময় বেসালপ্রাপ্তজনের প্রতি কথা বলে, সে মুশরিকে রূপান্তরিত হয়। সে আরও মত প্রকাশ করে যে আল্লাহ ভিন্ন কাউকে তা'সির বা প্রভাব বিস্তারকারী জ্ঞান করা, যথা- 'অমুক্ত ওষুধ নিরাময় করেছে' অথবা 'আমি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা অমুক ওলী-বুযূর্গের মাধ্যমে হাজত-মকসূদ পূরণ করেছি' ইত্যাদি

বলা শিরক এবং যে মুসলমান ব্যক্তি এ রকম বলবে সে মুশরিক হয়ে যাবে। যদিও নিজের গোমরাহ ও ফিতনাবাজ ধ্যান-ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে ইবনে আব্দুল ওয়াহহাবের পেশকৃত ভুয়া দলিলগুলো মিথ্যা ও কুৎসা ছাড়া আর কিছুই ছিল না, তবু সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে অপারগ অজ্ঞ-মূর্খ লোকেরা এবং গুন্ডা-বদমায়েশ প্রকৃতির লোকেরা সহসা তার ধ্যান-ধারণাকে গ্রহণ করে নিলো, আর তার পক্ষ সমর্থন করলো। তারা নেককার মুসলমানদেরকে কাফের মনে করতে লাগলো।

যখন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নিজের গোমরাহী সহজে দারিয়ার শাসকদের মাধ্যমে প্রচার করার উদ্দেশ্যে তাদের কাছে আবেদন জানালো, তখন তারা নিজেদের রাজ্যসীমা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি লালসায় তাকে স্বেচ্ছায় সাহায্য করতে লাগলো। তারা তার নীতিভ্রষ্ট, পথভ্রষ্ট ধ্যান-ধারণা সর্বত্র প্রচার করার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করলো। তাদেরকে প্রত্যাখ্যানকারী ও তাদের বিরোধিতাকারীদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ ঘোষণা করলো। যখন ঘোষণা করা হলো যে অ-ওহাবীদের জান ও মাল হরণ করা হালাল, তখনই মরুভূমির দুর্নীতিপরায়ণ ভোগবাদী লোকেরা মুহাম্মদ ইবনে সৌদের সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্যে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে দিলো। ১১৪৩ হিজরী সালে মুহাম্মদ ইবনে সৌদ ও মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব যৌথভাবে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে যারা ওহাবীবাদকে গ্রহণ করবে না, তারা কাফের ও মুশরিক এবং তাই তাদেরকে হত্যা করা ও তাদের মালামাল হরণ করা হালাল (বৈধ)। তারা তাদের এ ঘোষণাটি প্রকাশ্যে প্রদান করে আরো সাত বছর পর (অর্থাৎ, ১১৫০ হিজরীতে)। অতঃপর ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব বত্রিশ বছর বয়সে 'এজতেহাদ' প্রয়োগ শুরু করে এবং চল্লিশ বছর বয়সে তার মিথ্যা ও বানোয়াট এজতেহাদ ঘোষণা করে।

সাইয়েদ আহমদ ইবনে যাইনী দাহলান মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যিনি পবিত্র মক্কা নগরীর মুফতী ছিলেন, তিনি তাঁর "আল ফিতনাতুল ওয়াহহাবীয়্যা" নামের পুস্তিকায় ওহাবীদের গোমরাহ ধ্যান-ধারণা ও মুসলমানদের প্রতি তাদের অত্যাচার-নির্যাতনের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি লিখেছেন: "মক্কা ও মদীনা শরীফের আহলে সুন্নাতের উলামায়ে কেরামকে ধোকা দেবার জন্যে ওহাবীরা তাদের লোকদেরকে এ দুটো নগরীতে প্রেরণ করে। কিন্তু মুসলমান উলামাদের প্রশ্নের কোনো উত্তর এ সব লোক দিতে পারে নি। ফলে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে ওহাবীরা মূর্খ ও গোমরাহ। তাদেরকে কাফের (অবিশ্বাসী) ফতোওয়া প্রদান করে একটি রায় লিখিত হয় এবং সর্বত্র বিতরণ করা হয়। মক্কার আমির শরীফ মাসউদ ইবনে সাঈদ ওই ওহাবীদেরকে বন্দী করার আদেশ জারি করেন।

কিছু ওহাবী দারিয়্যায় পালিয়ে যায় এবং সেখানে নিজেদের পরিণতি সম্পর্কে খবর দেয়" ।[১]

চার মযহাবের অন্তর্ভুক্ত হেজাযের উলামাবৃন্দ, বিশেষ করে ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের ভাই শায়খ সোলাইমান ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ও তার শিক্ষকবৃন্দ তার গোমরাহ্ বইপত্র অধ্যয়ন করে মুসলমানদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে দালিলিক প্রমাণভিত্তিক খন্ডনমূলক বইপত্র প্রণয়ন করেন এবং ঘোষণা করে দেন যে ওহাবীবাদ গোমরাহ্ ও ক্ষতিকর (ওহাবীদের প্রতি নসীহত, ১ম খন্ডের ৫ম অধ্যায়ে শায়খ সোলাইমান ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের রচিত 'আস্ সাওয়াইকুল ইলাহিয়্যাতু ফীর রাদ্দিল ওয়াহাবীয়্যাহ্' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য)।

সুন্নী উলামাগণের এ সকল বই-পুস্তক কোনো কাজে আসে নি, বরং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ওহাবীদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলে এবং মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাবকে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করে রক্তপাতের জন্যে উত্তেজিত করে তোলে। মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব 'বানু হানিফা' নামক সেই আহাম্মক গোত্রভুক্ত ছিল, যে গোত্রটি মুসায়লামা কাযযাবের 'নবুয়তে' বিশ্বাস করতো। মুহাম্মদ ইবনে সৌদ ১১৭৮ হিজরী (১৭৬৫ খ্রীঃ) মৃত্যু বরণ করে এবং তার পুত্র আবদুল আযীয তার স্থলাভিষিক্ত হয়। আবদুল আযীয জনৈক শিয়া কর্তৃক দারিয়া মসজিদে ১২১৭ হিজরী (১৮০৩ খ্রীঃ) তলপেটে ছুরিকাহত হয়ে মৃতুবরণ করে। অতঃপর তার পুত্র সৌদ ইবনে আব্দুল আযীয ওহাবীদের নেতা হয়। এই তিন জনই ওহাবীবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে মুসলমানদের রক্ত ঝরাতে এমনভাবে সচেষ্ট ছিল যেন তারা পরস্পর প্রতিযোগিতা করছিল। ওহাবীরা বলে যে ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব এ মতবাদটি প্রচার করেছিল আল্লাহ্ পাকের একত্বে নিজ একনিষ্ঠ বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার জন্যে এবং মুসলিমদেরকে শিরক হতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। তারা অভিযোগ করে যে মুসলমানগণ এর আগে দীর্ঘ ছয়'শ বছর শিরক-এ লিপ্ত ছিল এবং তাই ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব মুসলমানদের ধর্মকে নবায়ন ও সংস্কার করার লক্ষ্যেই ওহাবী মতবাদ প্রবর্তন করে। সে তার ধ্যান-ধারণা সবাইকে গ্রহণ করার জন্যে সূরা আহকাফের ৫ম আয়াত, সুরা ইউনুসের ১০৬ আয়াত এবং রা'দ-এর ১৪নং আয়াত দলিলস্বরূপ উপস্থাপন করে। তবে এ ধরনের বহু আয়াত আছে এবং তাফসীরকার উলামাবৃন্দ সর্বসম্মতভাবে ঘোষণা করেন যে এ সকল আয়াতের সবগুলোই মূর্তি পূজারী অবিশ্বাসীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।

---

[১]. আল ফুতুহাতে আল ইসলামিয়্যা :২/২৩৪ কায়রো ১৯৬৮ ইং সংস্করণ।

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের মতে, যদি কোনো মুসলমান ব্যক্তি নবী-ওলীগণের মাযারের সন্নিকটে কিংবা দূরে অবস্থান করে তাঁদের ইসতেগাসা তথা সাহায্য প্রার্থনা করে, তাহলে সে মূর্তি পূজারী মুশরিকে রূপান্তরিত হবে। আল্লাহতা'আলা মুশরিকদের পরিণতি সূরা যুমারের ৩নং আয়াতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ওহাবীরা নবী-ওলীর তাওয়াসসুলকারী মুসলমানদেরকে "মুশরিক" শব্দটি আখ্যা দেয়ার জন্যে এ আয়াতটিকে দলিল হিসেবে পেশ করে থাকে। তারা দাবি করে থাকে যে পূর্ববর্তী যমানার মূর্তি পূজারী মুশরিকরাও বিশ্বাস করতো যে মূর্তিগুলো সৃষ্টি করতে অক্ষম ছিল এবং একমাত্র আল্লাহতা'আলাই সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। তারা আরো দুইটি কুরআনের আয়াত পেশ করে থাকে যেখানে আল্লাহ্ পাক কাফেরদের কথা উদ্ধৃত করেন:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ

–হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি যখন কাফেরদেরকে জিজ্ঞেস করবেন: কে (সৃষ্টিসমূহ) সৃষ্টি করেছে, তারা জবাব দেবে: আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।[১]

ওহাবীরা দাবি করে থাকে যে মক্কার কাফেররা আয়াতে উদ্ধৃত তাদের কথার জন্যে মুশরিক হয়ে যায় নি, বরং সূরা যুমারে উদ্ধৃত "আমরা মূর্তিগুলোর পূজা করছি যাতে তারা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্যে শাফায়াত বা সুপারিশ করে"- তাদের এ কথার কারণেই মুশরিক হয়েছে। অতএব, মুসলমানগণও আয়াতে উদ্ধৃত একই কথা বলে নবী-ওলীগণের সাহায্য ও শাফায়াত প্রার্থনা করে মুশরিক হয়ে গিয়েছে।

উপরোক্ত আয়াতে করীমার আলোকে মুসলমানদেরকে কাফের-মুশরিকদের সাথে তুলনা করা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাবের পক্ষে অত্যন্ত অযৌক্তিক ও আহাম্মকীপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং তা উদ্ভটও বটে। কেননা, কাফেররা মূর্তিকে পূজা করে থাকে যাতে মূর্তিগুলো সুপারিশ করতে পারে; তারা আল্লাহতা'আলাকে বাদ দিয়ে মূর্তির কাছে প্রার্থনা মুন্জুরের আবেদন জানিয়ে থাকে। অথচ আমরা মুসলমানরা নবী-ওলীগণের পূজা করি না, বরং আল্লাহতা'আলার কাছ থেকেই সকল বস্তু আশা করে থাকি। আমরা নবী-ওলীগণকে ওয়াসিতা (বাহন) কিংবা ওয়াসীলা (মাধ্যম) বানিয়ে নেই। কাফেররা বিশ্বাস করে যে মূর্তিগুলো তাদের ইচ্ছানুযায়ী সুপারিশ করতে সক্ষম এবং আল্লাহতা'আলাকে তাদের চাহিদানুযায়ী সৃষ্টি করতে বাধ্য

---

[১]. আল কুর'আন : সূরা আনকাবুত ২৯/৬১ আয়াত, সূরা যুখরফ ৪৩/৮৭ ।

করতেও সক্ষম। পক্ষান্তরে, মুসলমানগণ আউলিয়ায়ে কেরামের সাহায্যপ্রার্থী হন এ কারণে যে তাঁরা আউলিয়াগণকে আল্লাহতা'আলার প্রিয় বান্দা হিসেবেই জানেন এবং যেহেতু আল্লাহ পাক তাঁর কুরআন মজীদে জ্ঞাত করেছেন যে তিনি তাঁর এ সকল প্রিয় বান্দাদের শাফায়াত ও দোয়া প্রার্থনার অনুমতি দিয়েছেন এবং তিনি তা কবুল করছেন, সেহেতু মুসলমানগণ এ শুভ সংবাদে বিশ্বাস রেখে তাঁদের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। মুসলিমগণ কর্তৃক আউলিয়ার কাছে সাহায্য প্রার্থনা এবং কাফের সম্প্রদায় কর্তৃক তাদের মূর্তির উপাসনা সমতুল্য কোনো বিষয়ই নয়। মুসলমানগণ ও কাফেররা মানব সুরতে একই রকম দেখতে, কিন্তু মুসলমানগণ হলেন আল্লাহতা'আলার বন্ধু এবং তাঁরা চিরকাল বেহেশতে অবস্থান করবেন। অপর পক্ষে, কাফেররা আল্লাহতা'আলার শত্রু এবং তারা চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে। মুসলমানগণ ও কাফেরদের বাহ্যিক সুরত এক রকম হলেও দুইয়ের অবস্থা কিন্তু এক রকম নয়। আল্লাহতা'আলার শত্রু মূর্তিসমূহের প্রতি যারা আবেদন জানায় এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কাছে যাঁরা নিবেদন পেশ করেন উভয়ে দেখতে একই রকম হলেও মূর্তিকে আবেদন জানিয়ে মুশরিক ব্যক্তিবর্গ জাহান্নামে গমন করবে, আর আউলিয়ার কাছে আবেদন জানিয়ে মু'মিনগণ আল্লাহতা'আলাকে দয়ালু ও দাতা এবং ক্ষমাশীল হিসেবে পাবেন।

"আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে যেখানে স্মরণ করা হয়, সেখানে আল্লাহ তা'আলার রহমত তথা করুণা অবতীর্ণ হয়"- এ হাদীসটিও পরিস্ফুট করে যে আউলিয়ায়ে কেরামকে শাফায়াত করার জন্যে আবেদন জানালে আল্লাহ তা'আলা দয়া ও ক্ষমা প্রদর্শন করবেন।

মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন যে নবী-ওলীগণ অর্চনা পাওয়ার যোগ্য নন; তাঁরা খোদা নন কিংবা আল্লহতা'আলার শরীকও নন। মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন যে তাঁরা হলেন আল্লাহতা'আলার প্রিয় বান্দা যাঁরা পূজা-অর্চনা পাওয়ার যোগ্য নন। কিন্তু আমরা আরো বিশ্বাস করি যে তাঁদের দোয়া ও সুপারিশ আল্লাহ তা'আলা কবুল করে থাকেন। মহান প্রভু ইরশাদ ফরমান:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ.

> আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্যে ওসীলা তথা মাধ্যম অন্বেষন করো।[১]

---

১. আল কুর'আন : আল মায়িদা, ৫/৩৫।

তিনি ওয়াদা করেছেন যে তিনি তাঁর পুণ্যবান বান্দাদের দোয়া কবুল করবেন এবং তাঁরা যা চান তা-ই তিনি তাঁদেরকে মঞ্জুর করবেন। মুসলিম শরীফ, বুখারী শরীফ ও 'কানযুদ্ দাকাইক' কিতাবে উদ্ধৃত একটি হাদীস শরীফ ঘোষণা করে:

رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ.

–আল্লাহ তা'আলার এমন কিছু বান্দা আছেন যাঁরা কোনো বিষয়ে কসম করলে আল্লাহ্ পাক তা সৃষ্টি করে দেন; তিনি তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন হতে দেন না।[১]

মুসলমানগণ উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহে বিশ্বাস করেন বিধায় তাঁরা আউলিয়ায়ে কেরামকে ওসীলা হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তাঁদের কাছ থেকে দোয়া ও শাফায়াত তথা আধ্যাত্মিক সাহায্য আশা করে থাকেন।যদিও কিছু সংখ্যক কাফের স্বীকার করতো যে মূর্তিগুলো স্রষ্টা নয় এবং আল্লাহতা'আলাই সকল বস্তুর স্রষ্টা, তবুও তারা দাবি করতো যে তাদের মূর্তিগুলো পূজা-অর্চনা পাওয়ার যোগ্য এবং মূর্তিগুলো তাদের ইচ্ছানুযায়ী আল্লাহতা'আলাকে দিয়ে সৃষ্টি করাতেও সক্ষম। তারা মূর্তিগুলোকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে নিতো। যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো সাহায্য প্রার্থনা করে এবং বলে যে সেই ব্যক্তি আপনাআপনি সাহায্য করতে সক্ষম এবং সে যা চায় তাই ঘটবে, তাহলে সাহায্য প্রার্থনাকারী ওই ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সাহায্য প্রার্থনার সময় বলেন: 'এই বুযূর্গ ব্যক্তির ইচ্ছানুযায়ী আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ হবে না। কেননা তিনি মাধ্যম বা কারণমাত্র। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পছন্দ করেন, যারা কারণসমূহ আঁকড়ে ধরে থাকে। মাধ্যম/কারণসমূহের দ্বারা সৃষ্টি করা তাঁরই একটি রীতি। আমি এই ওলীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি ওই মাধ্যম/কারণকে আঁকড়ে ধরার জন্যেই। কিন্তু আমি একমাত্র খোদা তা'আলার কাছ থেকেই আমার ইচ্ছা পূরণের আশা করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও মাধ্যম/কারণকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। আমি তাঁর সুন্নাত অনুসরণ করেই মাধ্যম/কারণকে আঁকড়ে ধরেছি", সে ব্যক্তি সওয়াব হাসিল করেন। যদি তিনি তাঁর মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে সক্ষম হন, তবে তিনি খোদা তা'আলার ফয়সালা ও কদরে (তকদীরে) আত্মসমর্পণ করেন। আউলিয়ায়ে কেরামের কাছে মুসলমানগণের দোয়া, সাহায্য ও শাফায়াত

[১]. মুসলিম : আস সহীহ, বাবুন নারি ইদখুলুহাল জাব্বারুন, ৪/২১৯১ হাদীস নং ২৮৫৪, হাদীস নং ২৬২২।
ক. বায়হাক্বী : শু'য়াবুল ঈমান, ১৩/৮৮ হাদীস নং ৯৯৯৯।
খ. বাগাবী : শরহুস সুন্নাহ, বাবু ফদ্বলিল ফুক্বারা, ১৪/ ২৬৯ হাদীস নং ৪০৬৯।

প্রার্থনার সাথে কাফেরদের মূর্তি পূজার কোনো সাযুজ্যই নেই। একজন জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনোই এ দুটোকে এক পাল্লায় মাপতে পারবেন না এবং তিনি এ দুটোর পার্থক্য স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন। যা কিছু উপকারী এবং যা কিছু ক্ষতিকর, তার সবই একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করে থাকেন। তিনি ছাড়া আর কেউই উপাসনা পাওয়ার যোগ্য নয়। নবী, ওলি কিংবা সৃষ্টিসমূহ কেউই (আপনা হতে) সৃষ্টি করতে সক্ষম নন। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো স্রষ্টা নেই। একমাত্র আল্লাহতা'আলাই সেই সকল বান্দাদের প্রতি করুণা করেন এবং তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করে দেন যাঁরা তাঁর নবী-ওলী ও নেককার (সালেহীন) বান্দাদেরকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে স্থাপন করে তাঁদের নাম স্মরণ করেন। খোদা তা'আলা ও তাঁর প্রিয় নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই এ কথা বলেছেন, এবং যেহেতু তাঁরা এটা বলেছেন, সেহেতু মুসলমানগণ এ কথায় বিশ্বাস করেন।

তবে মুশরিকরা তাদের মূর্তিগুলোকে ইলাহ্ অথবা মা'বুদ (উপাস্য) জ্ঞান করতো, যদিও তারা জানতো যে মূর্তিগুলো সৃষ্টি করতে অক্ষম। তাদের কেউ কেউ মুশরিক হয়েছে মূর্তিগুলোকে 'ইলাহ' জেনে, আর কেউ কেউ মুশরিক হয়েছে সেগুলোকে মা'বুদ জেনে। তারা আল্লাহর কাছে তাদের মূর্তিগুলো শাফায়াত করবে মর্মে যে কথা বলেছে, তার জন্যে কিন্তু তারা মুশরিক হয় নি, বরং মূর্তিগুলোক তারা পূজা করার জন্যেই তারা কাফের-মুশরিক হয়েছে। সূরা যুমারের আয়াতটি ব্যাখ্যাকালে 'তাফসীরে রুহুল বয়ান' ওহাবীদের এই অভিযোগগুলো রদ করেছে। (আমার প্রণীত বইতে উক্ত উদ্ধৃতি সন্নিবেশিত হয়েছে লেখক)

রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: “এমন এক সময় আসবে যখন কাফেরদের প্রতি অবতীর্ণ আয়াতসমূহ মুসলিমদেরকে অপবাদ দেয়ার জন্যে ব্যবহৃত হবে।” তিনি অন্যত্র ইরশাদ ফরমান: ”আমি আশংকা করি যে কিছু লোক আবির্ভূত হয়ে আয়াতসমূহকে এমন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে যা আল্লাহ তা'আলা অনুমোদন করেন না।” হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত এ দুটো হাদীস ভবিষ্যদ্বাণী করে যে ওহাবী ও লা-মাযহাবী [বর্তমানে ‘সালাফী’- অনুবাদক] সম্প্রদায় আবির্ভূত হবে এবং তারা কাফেরদের প্রতি অবতীর্ণ আয়াতসমূহ মুসলমানদের প্রতি আরোপ করবে, আর ফলস্বরূপ তারা কুরআনুল করীমেরও কুৎসা রটনা করবে। আল্লাহ্ তা'আলা যাঁদেরকে ভালোবাসেন বলে মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন, তাঁদের মাযার/রওযা-ই তাঁরা যিয়ারত করেন। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মধ্যস্থতায় তাঁরা তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ করেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামও অনুরূপ করতেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

তাঁর দোয়ার মধ্যে বলতেন:"হে আমার আল্লাহ আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি তাঁদের ওয়াস্তে যাঁরা আপনার কাছে চাইতেন" (আল হাদীস)। তিনি এ দোয়াটি তাঁর সাহাবীদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তাঁদেরকে এটা ঘন ঘন পড়ার জন্যে আদেশও দিয়েছিলেন। মুসলমানগণ এ কারণেই এভাবে দোয়া করে থাকেন।

হযরত আলী (ক:)-এর মাতা ফাতেমা বিনতে আসাদকে কবরে দাফন করার সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেন:

اغْفِرْ لِأُمِّي فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ، ولَقِّنْهَا حُجَّتَهَا، وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا، بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

–হে আমার আল্লাহ আমার জন্যে মা ফাতেমা বিনতে আসাদকে ক্ষমা করে দিন। তাঁর প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও পূর্ববর্তী নবী আলাইহিস্ সালাম-গণের ওয়াস্তে। নিশ্চয়ই আপনি দয়ালুদের সেরা।[১]"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জনৈক অন্ধ সাহাবী দৃষ্টিশক্তি প্রার্থনা করার পর তিনি তাঁকে দুই রাকআত নামাজ পড়ে নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করার নির্দেশ দেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ ، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ ، يَا مُحَمَّدُ ، إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ ، فَتَقْضِي لِي ، اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ.

–হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি আপনারই প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে, যিনি রহমতের নবী। হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি আপনার মধ্যস্থতায় আমার প্রভুর শরণাপন্ন হলাম যাতে আমার প্রয়োজন পূরণ হয়। হে আল্লাহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমার জন্যে সুপারিশকারী বানিয়ে দিন।[২]

---

[১]. তৃবরানী : আল মু'জামুল কাবীর ২৪/৩৫১ হাদীস নং ২০৮৯২।
[২]. তিরমিযী : আস সুনান, ৫/৪৬১ হাদীস নং ৩৫৭৮।
ক. নাসায়ী : আস সুনান, ৯/২৪৪ হাদীস নং ১০৪২০।
খ. ইব্ন খুযায়মা : আস সহীহ ২/২২৫ হাদীস নং ১২১৯।
গ. হাকিম : আল মুস্তাদরাক, ১/৪৫৮ হাদীস নং ১১৮০।
ঘ. আহ্মদ : আল মুস্নাদ, ৬/১৬৬২ হাদীস নং ১৭৫১৩।

আল্লাহতা'আলার নিষিদ্ধ গাছ হতে ফল খাওয়ার পর বেহেশত হতে সরনদ্বীপ বা শ্রীলংকায় অবতরণ করে হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম দোয়া করেন: "হে আমার খোদা আমার পুত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসার ওয়াস্তে আমাকে আপনি ক্ষমা করে দিন।" প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন: "হে আদম তুমি যদি আসমান ও জমিনে অবস্থিত সকল সৃষ্টির জন্যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করতে, তাও আমি তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করতাম।"

হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে সাথে নিয়ে তাঁর মাধ্যমে বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা করেছিলেন এবং তাঁর দোয়া কবুলও হয়েছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ওই অন্ধ সাহাবীকে পাঠ করার জন্যে প্রদত্ত আদেশের (উপরোক্ত দোয়ার) মধ্যে 'হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনার মধ্যস্থতায়' শব্দগুলো প্রতীয়মান করে যে আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম-এর মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করার সময় তাঁদের নাম উল্লেখ করাও অনুমতিপ্রাপ্ত। সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও তাবেয়ীনদের জীবনীর মধ্যে এ রকম ভুরি ভুরি প্রামাণ্য দলিল আছে যা প্রতিভাত করে যে মাযার-রওযা যিয়ারত করা, মাযারস্থ বুযূর্গানে দ্বীনের নাম উল্লেখ করে তাঁদের শাফায়াত প্রার্থনা করা এবং তাঁদেরকে ওসীলা করা জায়েয।

মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান আফেন্দী যিনি ইমাম ইবনে হাজর মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রণীত 'মিনহাজ' গ্রন্থের ব্যাখ্যামূলক পুস্তক 'তোহফা'-এর ওপর লিখিত তাঁর শরাহ (ব্যাখ্যা)-এর জন্যে সমধিক প্রসিদ্ধ, তিনি দলিলসহ প্রমাণ করেছেন যে ওহাবীবাদ একটি পথভ্রষ্ট ও ক্ষতিকর মতবাদ এবং ওহাবী বই-পুস্তকে কুরআনে পাকের আয়াতসমূহের অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিনি লিখেছেন: "ওহে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব মুসলমানদের কুৎসা রটনা করো না। আমি আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাকে বলছি, যদি কেউ আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোনো স্রষ্টার কথা বলে, তবে তাকে সত্য কথাটি জানিয়ে দাও। দলিল দ্বারা প্রমাণ করে তাকে সঠিক রাস্তা দেখাও মুসলমানদের তো কাফের বলা যায় না। তুমিও তো একজন মুসলমান। লক্ষ কোটি মুসলমানকে কাফের বলার পরিবর্তে একজনকে বলা-ই অধিক সঠিক। এটা নিশ্চিত, যে ব্যক্তি (মুসলমান) সমাজ হতে বিচ্যুত হয়, সে মহা বিপদে পড়েছে। সূরা নিসার ১১৪ নং আয়াত ঘোষণা করে:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا-

–হেদায়ত গ্রহণের পর যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ঈমানদার (বিশ্বাসী)-দের পথ হতে বিচ্যুত হয়, তাকে আমি তার বিচ্যুতির মধ্যে ছেড়ে দেবো এবং এরপর ভয়ংকর দোযখে নিক্ষেপ করবো।[১]

এ আয়াতটি আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'ত হতে বিচ্যুত ওহাবীদের অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা দেয়।" (মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান আফেন্দী)

বহু হাদীস শরীফে বিবৃত হয়েছে যে কবর যিয়ারত করা অনুমতিপ্রাপ্ত। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেউনগণ ঘন ঘন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মোবারক রওযা যিয়ারত করতে যেতেন, আর এ যেয়ারতের প্রথাসমূহ ও ফযীলত বিষয়ে বহু বইপত্র লেখা হয়েছে।

কোনো ওলীর মাধ্যমে দোয়া করা, তাঁর নাম উল্লেখ করে তাঁর আধ্যাত্মিক সাহায্য (রূহানী মদদ) প্রার্থনা করা কোনোক্রমেই ক্ষতিকর নয়। নাম উল্লেখকৃত ওলী নিজ ক্ষমতায় প্রভাব বিস্তার করতে পারেন কিংবা প্রার্থিত বস্তু প্রদান করতে পারেন অথবা গায়েব জানতে পারেন মর্মে বিশ্বাস করা কুফর। মুসলমানদেরকে এ বিশ্বাসের ধারক বলে দোষারোপ করা উচিৎ নয়, কেননা তারা এতে বিশ্বাস করেন না। মুসলমানগণ আল্লাহতা'আলার প্রিয় বান্দাদেরকে আবেদন জানান শুধুমাত্র ওসীলা ও শাফায়াতকারী হবার জন্যে; আর দোয়ার জন্যেও। শুধুমাত্র আল্লাহতা'আলাই প্রার্থিত বস্তু সৃষ্টি করে থাকেন। তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে দোয়া ও শাফায়াত করবার জন্যে আবেদন জানানো হয়, কেননা আল্লাহতা'আলা ইরশাদ করেছেন: "আমি যাঁদেরকে ভালোবাসি, তাঁদের দোয়া আমি কবুল করি।" বেসালপ্রাপ্তদেরকে প্রার্থিত বস্তু মঞ্জুর করার জন্যে আবেদন জানানো হয় না, বরং আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় মধ্যস্থতাকারী হবার জন্যেই আবেদন জানানো হয়। প্রকৃত (হাকিকী) অর্থে তাঁদেরকে প্রার্থিত বস্তু মঞ্জুর করার জন্যে আবেদন-নিবেদন জানানো অনুমতিপ্রাপ্ত নয়। আর মুসলামানগণ তা করেনও না; কিন্তু তাঁদের মধ্যস্থতা গ্রহণ অবশ্যই অনুমতিপ্রাপ্ত। "ইসতেগাসা", "ইসতিশফা" ও "তাওয়াসসুল" শব্দগুলোর অর্থ হলো মধ্যস্থতা গ্রহণ।

---

১. আল কুর'আন : সূরা আন নিসা ৪/১১৪।

হাকিকী অর্থে একমাত্র আল্লাহ পাকই সকল বস্তু সৃষ্টি করে থাকেন। তবে এটা তাঁর একটি বিধান যে তিনি কোনো কিছু সৃষ্টি করার সময় তাঁর কোনো এক সৃষ্টিকে মাধ্যম বা কারণ হিসেবে স্থাপন করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহতা'আলার দ্বারা কোনো বস্তু সৃষ্টি হতে দেখতে চায়, তার উচিৎ সেই বস্তু সৃষ্টির কারণকে ওসীলা করা। আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম-গণ সকলেই কারণসমূহকে আঁকড়ে ধরেছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা কারণসমূহ আঁকড়ে ধরাকে প্রশংসা করেছেন এবং আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম-গণও তা আদেশ করেছেন। দৈনন্দিন ঘটনাবলী এর প্রয়োজনীয়তাকে প্রতীয়মান করে। কোনো ব্যক্তি যা চায়, তা অর্জনের জন্যে তার উচিৎ কারণসমূহকে আঁকড়ে ধরা। এ বিশ্বাস রাখা আবশ্যক যে একমাত্র আল্লাহতা'আলাই তাঁর সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় কারণ বা মাধ্যম সৃষ্টি করে থাকেন এবং মানুষদেরকে সেই সব কারণ বা মাধ্যমকে আঁকড়ে ধরতে উদ্বুদ্ধ করে থাকেন; আর মানুষেরা সেই সব কারণ বা মাধ্যমকে আঁকড়ে ধরলে তিনি কাঙ্ক্ষিত বস্তু সৃষ্টি করে থাকেন। যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস পোষণ করেন, তিনি হয়তো বলতে পারেন: "আমি এই জিনিস অর্জন করেছি অমুক কারণ বা মাধ্যমকে আঁকড়ে ধরে।" এ কথার মানে এই নয় যে ওই কারণ/মাধ্যমটি সৃষ্টি করেছে; বরং এর অর্থ হলো আল্লাহতা'আলা-ই ওই কারণ বা মাধ্যম দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, 'ওষুধ দ্বারা অসুখ নিরাময় হয়েছে', 'হযরত সাইয়েদাহ্ নাফিসার জন্যে কৃত আমার মানতটি দ্বারা আমার অসুস্থ আত্মীয়ের আরোগ্য লাভ হয়েছে', 'এই স্যুপ আমাকে তৃপ্ত করেছে', 'পানিটুকু আমার তৃষ্ণা মিটিয়েছে' এ সব বাক্য ইশারা করে যে কারণগুলোর সবই ওসীলা বা ওয়াসিতা (বাহন)। মুসলমানদের উচ্চারিত অনুরূপ কথাবার্তাকে তাঁরা অনুরূপ অর্থে গ্রহণ করেন বলে বিশ্বাস করাটা একান্ত আবশ্যক। যে ব্যক্তি এ রকম বিশ্বাস করেন, তাঁকে কোনোক্রমেই কাফের আখ্যা দেয়া যায় না। ওহাবীরাও বলে থাকে যে জীবিত ও উপস্থিতজনের কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করা অনুমতিপ্রাপ্ত। তারা পরস্পর পরস্পরের কাছে এবং সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে বহু জিনিস চায়; এমন কি তারা তাদের কাছে আবেদন-নিবেদনও করে থাকে। তাদের মতে, জীবিতদের কাছে প্রার্থনা করা শিরক নয়, কিন্তু বেসালপ্রাপ্ত কিংবা অনুপস্থিতজনের কাছে আবেদন জানানো শিরক। কিন্তু আহলে সুন্নাতের উলামায়ে কেরামের মতে, কোনোটা-ই শিরক নয়। কেননা, এ দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্য-ই নেই। যেহেতু একটি শিরক নয়, সেহেতু অপরটিও শিরক নয়। প্রত্যেক মুসলমানই ঈমান ও ইসলামের মূলনীতিগুলোতে এবং শরীয়ত কর্তৃক প্রচারিত হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম হিসেবে বিশ্বাস করেন। এটা নিশ্চিত, প্রত্যেক মুসলমানই এ মর্মে বিশ্বাস করেন যে একমাত্র

খোদা তা'আলাই সকল বস্তু সৃষ্টি করে থাবেন; আর তিনি ছাড়া কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই। যদি কোনো মুসলমান বলেন, "আমি নামায পড়বো না", তা হলে বুঝতে হবে যে তিনি সেই মুহূর্তের জন্যেই কেবল নামায পড়বেন না; অথবা সেই স্থানেই কেবল নামায পড়বেন না; অথবা তিনি ইতোমধ্যেই নামায পড়ে নিয়েছেন। কারোর পক্ষেই তাঁর প্রতি এ মর্মে কুৎসা রটনা করা উচিৎ হবে না যে তিনি আর কখনো-ই নামায না পড়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। কারণ তাঁর মুসলিম হওয়াটা-ই তাঁকে "কাফের" কিংবা "মুশরিক" হিসেবে আখ্যায়িত হওয়া থেকে রক্ষা করছে। যে মুসলমান ব্যক্তি মাযার-রওযা যিয়ারত করেন এবং বেসালপ্রাপ্তদের কাছে শাফায়াত প্রার্থনা করেন অথবা মৌখিকভাবে বলেন: "হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্যে শাফায়াত করুন", কিংবা "আমার অমুক প্রার্থনা মঞ্জুর করুন", তাঁকে "কাফের" অথবা "মুশরিক" আখ্যা দেয়ার অধিকার কারোরই নেই। তাঁর মুসলমান হওয়াটাই ইঙ্গিত করে যে তাঁর কথা ও কাজ শরীয়ত অনুমোদিত বিশ্বাস ও কর্মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

উপরোক্ত ব্যাখ্যাসমূহের পূর্ণ উপলব্ধি দ্বারাই ওহাবী বিশ্বাস-সম্বলিত বইপত্রের মূলোৎপাটন সম্ভব হবে। উপরন্তু, ওহাবীরা যে গোমরাহ-পথভ্রষ্ট ও মুসলমানদের কুৎসা রটনাকারী এবং ইসলামের অন্তর্ঘাতী শত্রু, তা প্রমাণ করার জন্যে বহু কিতাব প্রণীত হয়েছে (এগুলোর তালিকা দেয়া হয়েছে লেখকের গ্রন্থের ২য় খন্ডে)।

ইয়েমেন দেশের যাবিদ-এর মরহুম মুফতী আল্লামা সাইয়েদ আবদুর রহমান লিখেছেন যে ওহাবীদের গোমরাহী প্রমাণ করার জন্যে নিম্নোক্ত হাদীসটি-ই যথেষ্ট:

يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ إِلَى فُوقِهِ ، قِيلَ مَا سِيمَاهُمْ قَالَ: سِيمَاهُمْ التَّحْلِيقُ.

–পূর্ব আরবে কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে। তারা কুরআন তেলাওয়াত করবে, কিন্তু ওর মর্মবাণী তাদের কণ্ঠনালির নিচে যাবে না (অর্থাৎ- হৃদয়ে পৌঁছুবে না)। তারা ইসলাম ত্যাগ করবে, যেভাবে তীর ধনুককে ত্যাগ করে। তাদের মাথা মুন্ডানো হবে।[১]

[১]. বুখারী : আস সহীহ, বাবু ক্বির'আতিল ফাজির ওয়াল মুনাফিক্ব, ৯/১৬২।
ক. মুসলিম : আস সহীহ, কিতাবুয যাকাত, বাবু যিকরিল খাওয়ারিজ ২/৭৪৪ হাদীস নং ১০৬৪।
খ. আবু দাউদ : আস সুনান, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু কিতালিল খাওয়ারিজ ৫/২৪৩ হাদীস নং ৪৭৬৫।

ওহাবীদের মাথা মুন্ডিত হওয়ায় প্রমাণিত হয় যে হাদীসে তাদের সম্পর্কেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। এ হাদীস দেখার পর ওহাবীদের গোমরাহী সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে আর কোনো বইপত্রের প্রয়োজন পড়ে না। ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের বই-পুস্তকে এ মর্মে আদেশ জারি করা হয়েছে যে ওহাবীরা তাদের মাথা মুন্ডিত রাখবে। বাকি বাহাত্তরটি ভ্রান্ত দলের কোনোটাতে-ই এ রকম আদেশ বিদ্যমান নেই।

এক মহিলা কর্তৃক ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের নিরুত্তর হওয়ার ঘটনা–

ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নারীদেরকেও মাথার চুল ছেঁটে ফেলার আদেশ দিয়েছিল। একজন মহিলা তাকে বললেন: 'দাঁড়ি যেমন পুরুষদের মূল্যবান অলংকার, তেমনি চুলও মহিলাদের অলংকার। আল্লাহ প্রদত্ত এ রহমত হতে মানুষদের বঞ্চিত করা কি কারো পক্ষে শোভনীয়?' ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব ওই মহিলার এ কথার কোনো সদুত্তর দিতে পারে নি।

যদিও ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের প্রবর্তিত গোমরাহ মতবাদটিতে বহু ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট ধ্যান-ধারণা বিরাজমান, তবুও ওহাবীদের ইসলাম হতে বিচ্যুতি মূলতঃ তিন ভাগে বিভক্ত:

প্রথমতঃ তারা বিশ্বাস করে যে আমল (পুণ্য কর্ম) ঈমানের একটি অংশ এবং যে ব্যক্তি একটি ফরয কাজ পরিত্যাগ করে (যথা- আলস্যবশতঃ নামায না পড়া, অথবা কার্পণ্যবশতঃ যাকাত না দেয়া, যদিও সে বিশ্বাস করে যে নামায ও আকাত ফরয), সে কাফের হয়ে যায় এবং তাকে হত্যা করতে হবে, আর তার মালামাল ওহাবীদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ ওয়াহহাবীরা বিশ্বাস করে যে নবী-ওলীগণের রূহ্ মোবারককে ওয়াসীলা বানানো এবং তাঁদের কাছে রূহানী মদদ তথা আধ্যাত্মিক সাহায্য প্রার্থনা করা

---

গ.নাসায়ী : আস সুনান, কিতাবু তাহরীমুদ দাম ৭/১১৯ হাদীস নং ৪১০৩।
ঘ. ইব্ন মাজাহ : আস সুনান, বাবু ফি যিকরি খাওয়ারিজ ১/৬১ হাদীস নং ১৭২।
ঙ. তিরমিযী : আস সুনান, কিতাবুল ফিতান ৪/৪৮১ হাদীস নং ২১৮৮।
চ. আহ্মদ : আল মুস্নাদ ১/৩৫৯ হাদীস নং ৪৪৯।
ছ. ইব্ন আবূ শায়বা : আল মুস্নাদ, ৭/৫৫৯ হাদীস নং ৩৭৯১৭।
জ. বায্যার : আল মুস্নাদ, ৯/২৯৪।
ঝ. ইব্ন হিব্বান : আস সহীহ, ১/২০৫ হাদীস নং ২৫।
ঞ. তৃবরানী : আল মু'জামুল কাবীর, ৫/১৯ হাদীস নং ৪৪৬১।
ট. হাকিম : আল মুস্তাদরাক, ২/১৬০ হাদীস নং ২৬৪৭।
ঠ. বাগাবী : শরহুস সুন্নাহ, ১০/২৩৪ হাদীস নং ২৫৫৮।

শিরক। এ কারণে তারা 'দালাইলুল খাইরাত' নামক দোয়ার বইটি পড়তে নিষেধ করে থাকে।

তৃতীয়তঃ তারা বিশ্বাস করে যে মাযার- রওযার ওপর গম্বুজ নির্মাণ করা, সেখানে এবাদত-বন্দেগীতে ও খেদমতে মশগুল ব্যক্তিদের জন্যে চেরাগ কিংবা মোমবাতি জ্বালানো এবং বেসালপ্রাপ্তদের রূহে সওয়াব বখশিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে নযর-মানত করা শিরক। তাদের মতে, এই তিনটি কাজ-ই আল্লাহ ভিন্ন অপর কারো পূজা করার মতো ব্যাপার।

ওহাবীরা যখন মক্কা ও মদীনা শরীফ আক্রমণ করে, তখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা মোবারক ছাড়া সাহাবা-এ-কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, আহলে বাইত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, আউলিয়ায়ে কেরাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও শহীদগণের মাযার-রওযা ধ্বংস করে দেয়। তারা মাযারগুলোকে সনাক্ত করার অনুপযোগী করে ফেলে। যদিও তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা মুবারককেও ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল, তবুও যারা শাবল হাতে নিয়েছিল তাদের কেউ কেউ পাগল হয়ে গিয়েছিল, আর কেউ কেউ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে তারা আর তাদের বদ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে পারে নি।

ওহাবীরা যখন মদীনা মুনাওয়ারা দখল করে, তখন বদমায়েশ ইবনে সৌদ সকল মুসলমানকে সমবেত করে মুসলমানদের সম্পর্কে জঘন্য উক্তি করেঃ "তোমাদের দ্বীনকে ওহাবী মতবাদ দ্বারা পূর্ণ করা হলো এবং আল্লাহতা'আলা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। তোমাদের বাপ-দাদারা কাফের ও মুশরিক ছিল। তাদের দ্বীনকে অনুসরণ করো না। সবাইকে জানিয়ে দাও যে তারা কাফের ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা মোবারকের সামনে দাঁড়িয়ে সাহায্য প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ। রওযায়ে আকদস অতিক্রমের সময় তোমরা শুধু 'আস সালামু আলা মুহাম্মদ' (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলবে। তাঁকে শাফায়াত করার জন্যে অনুরোধ করা যাবে না।"

৩৭/ ওহাবী মতবাদ প্রচার করার উদ্দেশ্যে মুসলমান নিধনকারী আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সৌদ মক্কা মুয়াযযমায় ওহাবীবাদ প্রতিষ্ঠা করতে তিন জন ওহাবী মৌলবীকে ১২১০ হিজরী সালে সেখানে প্রেরণ করে। মক্কায় অনুষ্ঠিত বাহাসের সভায় আহলে সুন্নাতের আলেমবৃন্দ কুরআনের আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেন যে ওহাবীরা একটি মহাভ্রান্ত প্রথের ওপর বিচরণ করছে। ওহাবী প্রতিনিধিরা এর কোনো জবাবই দিতে পারে নি। সত্যকে স্বীকার করা ছাড়া

তাদের আর গত্যন্তর ছিল না। তারা এ মর্মে একটি দীর্ঘ ঘোষণাপত্র লিখে যে আহলে সুন্নতই সত্য, সঠিক মতাদর্শ এবং ওহাবীবাদ গোমরাহ্-পথভ্রষ্ট একটি মতবাদ। ঘোষণাপত্রে তিন জন ওহাবীই স্বাক্ষর করে। কিন্তু আবদুল আযীয মৌলবীদের কথায় কর্ণপাত করলো না, কেননা সে রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে মাঠে নেমেছিল এবং নেতাগিরির স্বাদ বর্ধিত হারে গ্রহণের কু-মতলব এঁটেছিল। ওহাবী মতবাদের ছত্রছায়ায় সে দিনকে দিন মুসলমানদের ওপর জুলুম-অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করতে লাগলো।

মক্কার মুসলমানদেরকে পরাস্ত করার লক্ষ্যে তিন জন ওহাবী মৌলবী বিশটি দফা পেশ করেছিল। উপরোক্ত তিনটি শ্রেণীতে এই বিশটি দফা সন্নিবেশিত রয়েছে। ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব বলেছে, এবাদত যে ঈমানের একটি অংগ তার সপক্ষে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের এজতেহাদ ছিল। কিন্তু ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সকল এজতেহাদই বইপত্রে লিপিবদ্ধ ছিল এবং মক্কার সুন্নী উলামায়ে কেরাম সেগুলো বিস্তারিত জানতেন। ফলে তাঁরা সহজেই ওই তিন ওহাবীর কাছে প্রমাণ করেন যে ইবনে আব্দুল ওয়াহহাবের দাবি সম্পূর্ণ ভুয়া ও বানোয়াট।

ওই তিন জন ওহাবী মৌলবী তাদের দ্বিতীয় বিশ্বাসটি সম্পর্কে অতিমাত্রায় নিশ্চিত ছিল। তারা বলেছিল, "মক্কার মুসলমানরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং শায়খ মাহজুব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর রওযা যিয়ারত করে বলেন: 'ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' কিংবা 'হে ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু' অথবা 'ওহে শায়খ মাহজুব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'[শায়খ মাহজুব সাইয়্যেদ আবদ আল-রাহমান তাঁর সময়কার মহা জ্ঞানী আলেম; বেসালপ্রাপ্ত হন ১২০৪ হিজরী সালে এবং মু'আল্লা কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়]। অথচ আমাদের ইমাম ইবনে আবদুল ওয়াহাবের ইজতেহাদ অনুযায়ী যারা মুখে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলে কিন্তু আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করে তারা কাফেরে পরিণত হয়। তাদেরকে হত্যা করা এবং তাদের মালামাল বাজেয়াপ্ত করা হালাল।" আহলে সুন্নাতের উলামাগণ প্রত্যুত্তরে বলেন, "আল্লাহতা'আলার প্রিয় বান্দাদের মাযার-রওযা যেযারত করে তাঁদেরকে ওসীলা করা এবং তাঁদের কাছে আধ্যাত্মিক সাহায্য প্রার্থনা করা তাঁদেরকে পূজা করার শামিল নয়। তাঁদেরকে পূজা করার উদ্দেশ্যে যিয়ারত করা হয় না, বরং তাঁদের মধ্যস্থতায় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার জন্যেই যিয়ারত করা হয়। অর্থাৎ, তাঁদেরকে কারণ ও মাধ্যমস্বরূপ

আঁকড়ে ধরা হয়। উলামায়ে আহলে সুন্নাত দলিল দ্বারা প্রমাণ করেন যে কারণসমূহকে আঁকড়ে ধরা অনুমতিপ্রাপ্ত এবং স্থলবিশেষে অপরিহার্য।

আউলিয়ায়ে কেরামের মাযার-রওযা যিয়ারত করে তাঁদের তাওয়াসসুল করা কিংবা তাঁদের রূহানী মদদ কামনা করা যে বৈধ ও অনুমতিপ্রাপ্ত, তা প্রতীয়মানকারী বহু প্রামাণ্য দলিল বিদ্যমান। সূরা মায়েদার ৩৪ নং আয়াত ইরশাদ ফরমান:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ.

'হে মু'মিন সম্প্রদায় আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ওসীলা (মাধ্যম) অন্বেষণ করো'।[১]

সকল তাফসীর কিতাবেই লিপিবদ্ধ আছে, আল্লাহতা'আলা যে বস্তুকে কিংবা ব্যক্তিকে পছন্দ করেন অথবা অনুমোদন করেন, তা-ই ওসীলা। সূরা নিসার ৮০ নং আয়াতে ইরশাদ ফরমান:

مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ، فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ.

–যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তাবেদারি (আনুগত্য) করলো, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহতা'আলার-ই তাবেদারি করলো'[২] (আল-আয়াত)।

এ কারণেই পূর্বোক্ত আয়াতোল্লেখিত 'ওসীলা' হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এটা অধিকাংশ উলামায়ে কেরামেরই অভিমত। সুতরাং, আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম-গণের ওসীলা করা এবং তাঁদের উত্তরাধিকারী উলামা-এ-হক্কানীগণের ওসীলা করা ও তাঁদের সাহায্য দ্বারা আল্লাহতা'আলার সান্নিধ্য অর্জনের চেষ্টা করা অনুমতিপ্রাপ্ত। যদি ওহাবীদের কথানুযায়ী নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রার্থনা জানানো শিরক হতো, তবে যাঁরা সালাত কায়েম করেন (নামায পড়েন), তাঁরা সবাই কাফের হয়ে যেতেন। ওহাবীরা নিজেরাও হযরত মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমানের ওপরে উদ্ধৃত লেখার আলোকে কাফের হয়ে যেতো। কেননা, প্রত্যেক মুসলমানকেই প্রতি ওয়াক্তের নামাযে আত্তাহিয়্যাতু পাঠের সময় "আস্ সালামু আলাইকা ইয়া আইয়ুহান নাবীয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহ" এ বাক্যটি উচ্চারণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সালাত-সালাম পড়তে হয়।

---

১. আল কুর'আন :সূরা আল মায়িদাহ / ৩৪।
২. আল কুর'আন : সূরা নিসা ৪/৮০।

মাযার যিয়ারত করে আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা অত্যন্ত উপকারী। কারণ, ইবনে আসাকির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণিত ও 'কানযুদ্ দাকাইক' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ একটি হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, "এক মু'মিন তার অপর মু'মিন ভাইয়ের আয়নাস্বরূপ।" আদ্ দারু কুতনী বর্ণিত আরেকটি হাদীস ইরশাদ ফরমায়: اَلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ। "এক মু'মিন অপর মু'মিনের আয়না"[১] –এ সকল হাদীস থেকে উপলব্ধি করা যায় যে রূহসমূহ পরস্পরের আয়নাস্বরূপ, যা দ্বারা পরস্পরকে পরস্পর দেখতে পায়। কোনো ওলীর মাযার যিয়ারত করে তাঁর সম্পর্কে ধ্যানমগ্ন ও তাঁকে ওসীলাকারী ব্যক্তির কলবে (অন্তরে) ওই ওলীর রূহ হতে ফয়েয প্রবাহিত হয়। দুই রূহের মধ্যে দুর্বল রূহ শক্তি অর্জন করে। তবে যদি কবরস্থ রূহ দুর্বল হয়, তাহলে যিয়ারতকারীর রূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ কারণেই ইসলামের সূচনালগ্নে কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ করা হয়েছিল; কেননা, তখনকার মৃতরা সবাই জাহেলীয়্যা যুগের মানুষ ছিল। মুসলমানগণ ইন্তেকাল করার পরই কবর যিয়ারত অনুমতিপ্রাপ্ত হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা আউলিয়ায়ে কেরাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মাযার-রওযা যিয়ারতকালে মুসলমানদের উচিৎ তাঁদের কথা চিন্তা করা। একটি হাদীস ইরশাদ করে: "বুযূর্গানে দ্বীনকে যেখানে স্মরণ করা হয়, সেখানে আল্লাহ তা'আলার রহমত অবতীর্ণ হয়" (হাদীস)। এ হাদীস থেকেও বোঝা যায় যে আল্লাহতা'আলা আউলিয়াগণের মাযার শরীফ যিয়ারতকারীদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর রহমতপ্রাপ্ত প্রিয় বান্দাদের দোয়া তিনি কবুল করেন। এটা নিশ্চিত যে, "আউলিয়াগণের মাযার যিয়ারত করা যাবে না এবং তাঁদেরকে ওসীলা হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না" মর্মে ওহাবীদের ভিন্নমতের কোনো শরয়ী ভিত্তি-ই নেই।

مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ وَفَاتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي.

–হজ্জ সমাপন করে আমার রওযা যিয়ারতকারী যেন আমার (প্রকাশ্য) জীবদ্দশায় আমার-ই যিয়ারত করলো।[২]

---

[১]. আবূ দাউদ: আস সুনান, বাবু ফি নাসিহাতি ৪/২৮০ হাদীস নং ৪৯১৮।

ক. বায্যার : আল মুস্নাদ, মুস্নাদু আবূ হামযা আনাস ১২/৩২৭ হাদীস নং ৬১৯৩।

খ. ত্ববরানী : মু'জামুল আওসাত, মিন ইস্মিহি আহ্মদ ২/৩২৫ হাদীস নং ২১১৪।

গ. বায়হাক্বী : আস সুনান আল কুবরা, বাবু মা ফিশ শাফায়াতি ৮/২৯০ হাদীস নং ১৬৬৮১।

[২]. ত্ববরানী : মু'জামুল কাবীর ১২/৪০৬ হাদীস নং ১৩৪৯৭।

এই হাদীসটি ওহাবী ধারণাকে সমূলে উৎপাটিত করে এবং পরিস্ফুট করে যে মাযার যিয়ারত করা অত্যন্ত জরুরি। এ হাদীসটি এর সমর্থনকারী দলিলসহ লিপিবদ্ধ আছে 'কানযুদ্ দাকাইক' গ্রন্থে।

"সেই সব মেয়েলোকের প্রতি লা'নত যারা কবর যিয়ারত করে; আর তাদের প্রতিও লা'নত যারা কবরের ওপর সালাত আদায় করে এবং কবরে মোমবাতি জ্বালায়"- এ হাদীসটিকে ওহাবীরা মাযার-রওযা ধ্বংসের অজুহাত হিসেবে পেশ করে। তারা বলে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যমানায় এ রকম কোনো কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। তারা নিম্নোক্ত হাদীসটি এতদুদ্দেশ্যে উদ্ধৃত করে: "যা আমাদের সময়কার নয় কিন্তু পরবর্তীকালে সন্নিবেশিত হবে, তা আমাদের নয়" (হাদীস)। ওহাবী প্রতিনিধিরা কিন্তু আহলে সুন্নাতের জ্ঞান বিশারদদের সাথে শেষ পর্যন্ত একমত হয়। কেননা, তাদের দ্বিতীয় দফার প্রতি প্রদত্ত জবাবটি তাদের তৃতীয় দফার এই সকল মন্তব্যকে খন্ডন করে।

৩৮/ ১২১০ হিজরী সালে যখন মক্কার সুন্নী উলামাবৃন্দ ওহাবী মৌলবীদেরকে লা-জওয়াব বানিয়ে দেন, তখন ওহাবীবাদ যে ইসলামবিরোধী ও ইসলামের শত্রুদের দ্বারা সৃষ্ট একটি অন্তর্ঘাতী ফিতনা এবং ওহাবীরা যে কাফের, তা প্রতীয়মানকারী আয়াত ও হাদীস-সম্বলিত একটি ঘোষণাপত্র মক্কার সুন্নী উলামাবৃন্দ প্রণয়ন করেন। ওই তিন জন ওহাবী মৌলবী তাদের ধর্মবিশ্বাস হতে তওবা করে ঘোষণাপত্রটিতে সমর্থনসূচক স্বাক্ষর করে। অতঃপর এ ঘোষণাপত্রের কপিসমূহ সকল মূসলমান রাষ্ট্রে প্রেরণ করা হয়। কতিপয় মক্কাবাসী ওহাবী লোক দারিয়ার শাসকের কাছে গিয়ে তাকে জানায় যে ওহাবী প্রতিনিধিরা মক্কার উলামাবৃন্দকে খন্ডন করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং ওহাবীরা ইসলামের শত্রু মর্মে একটি ঘোষণাপত্র সকল মুসলমান রাষ্ট্রে প্রেরণ করা হয়েছে। এতে আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সউদ ও তার অনুসারীরা আহলে সুন্নাতের ওপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয় এবং ১২১৫ হিজরী সালে তারা মক্কা শরীফ আক্রমণ করে। মক্কার আমীর শরীফ গালিব ইবনে মুসা'ইদ ইবনে সাঈদ আফেন্দী তাদেরকে বাধা দেন। উভয় পক্ষে প্রচুর রক্তক্ষয় হয়। শরীফ গালিব আফেন্দী ওহাবীদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে না দিলেও মক্কার আশপাশে অবস্থিত আরবীয় গোত্রগুলো ওহাবীদের কাছে পরাভূত হয় এবং তাদেরকে ওহাবী মতবাদ গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। আবদুল আযীয ১২১৭ হিজরী (১৮০৩ খৃস্টাব্দে) সালে দারিয়্যা মসজিদে জনৈক শিয়া মতাবলম্বী কর্তৃক তলপেটে ছুরিকাহত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর তার পুত্র সউদ তার স্থলাভিষিক্ত হয়। ওই একই বছরের দুই ঈদের মধ্যবর্তী সময়ে সউদ একটি ওহাবী বাহিনীকে তায়েফ নগরীতে পাঠায়। তারা তায়েফীয় নারী ও শিশুদের প্রতি

চরম যুলুম-অত্যাচার চালায়। [এই হৃদয় বিদারক ও অসহনীয় অত্যাচার সম্পর্কে জানতে শায়খ আহমদ যাইনী দাহলান মক্কীর 'খুলাসাতুল কালাম' ও আইয়ুব সাবরী পাশার 'তারিখ-এ-ওয়াহাবিয়ীন' গ্রন্থগুলো পড়ুন]

তায়েফ নগরীর মুসলমান পুরুষ ও নারী এবং শিশুদের প্রতি ওহাবীদের অত্যাচার চালানো হয়েছিল ইসলামের শত্রু উসমান আল মুদায়িকী নামের এক জালেম ওহাবীর আদেশক্রমে। এই লোক এবং মুহসিন নামের আরেক জনকে শরীফ গালিব আফেন্দী দারিয়্যায় প্রেরণ করেছিলেন। তাদের ওপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল এ মর্মে যে তারা ওহাবীদের সঙ্গে মুসলমানদের পূর্বে কৃত চুক্তিনামা বহাল রাখবে, যাতে করে ওহাবীরা মদীনা শরীফ আক্রমণ করে অত্যাচার-নিপীড়ন করা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু উসমান ছিল এক বদমায়েশ ওহাবী দালাল, যে নাকি তার ভ্রান্ত আকিদা শরীফ গালিব আফেন্দী থেকে গোপন করেছিল। সে তার সঙ্গী মুহসিনকে উচ্চ ও আকর্ষণীয় পদের প্রলোভন দেখিয়ে পথিমধ্যে ধোকা দেয়। দারিয়্যায় পৌঁছে তারা উভয়েই সউদ ইবনে আব্দুল আযীযের কাছে নিজেদের চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করে দেয়। সউদ যখন দেখলো যে তারা উভয়েই তার দাসে পরিণত হয়েছে, তখন সে ওহাবী লুটেরাদেরকে তাদের অধীনে দিল। অতঃপর তারা তায়েফের কাছে 'আবিলা' নামক স্থানে গমন করে এবং সেখান থেকে শরীফ গালিব আফেন্দীর কাছে এ মর্মে একটি চিঠি প্রেরণ করে যে সউদ ও তারা (দুই বিশ্বাসঘাতক বদমায়েশ ওহাবী) পূর্ববর্তী চুক্তির কোনো তোয়াক্কা করে না এবং সৌদ মক্কা মু'য়ায্যামা আক্রমণ করতে প্রস্তুত হচ্ছে। শরীফ গালিব আফেন্দী তাদেরকে নরম ভাষায় উপদেশ দিয়ে চিঠিপত্র লিখেন। কিন্তু ইসলামের শত্রু বদময়েশ উসমান চিঠিগুলো ছিঁড়ে ফেলে। আমীরের প্রেরিত মুসলমানদেরকে সে আক্রমণ করে বসে এবং তাঁদের পরাভূত করে। শরীফ গালিব আফেন্দী তায়েফ দুর্গে পশ্চাদপসারণ করেন এবং আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ১২১৭ হিজরী সালের শাওয়াল মাসের শেষ দিকে ওই হিংস্র ওহাবী উসমান তার সৈন্যবাহিনীকে তায়েফের সন্নিকটস্থ 'মালিস' এলাকায় স্থাপন করে। সে 'বিশা' অঞ্চলের বদমায়েশ আমীর সালিম ইবনে শাকবানের সাহায্য প্রার্থনা করে। এ লোকটির পাষাণ হৃদয়ে ইসলামের প্রতি আরো গভীর শত্রুতা প্রোথিত ছিল। সেলিমের বাহিনীতে যোগদানকারী প্রায় বিশ জন মরু গোত্রপতি ছিল, যাদের প্রত্যেকের অধীনে পাঁচ'শ করে ওহাবী গুন্ডা বদমায়েশ ছিল। আর সেলিমের নিজস্ব বাহিনীতে ছিল এক হাজার ওহাবী দাঙ্গাবাজ শয়তান।

শরীফ গালিব আফেন্দী ও তায়েফীয় মুসলমানগণ সাহসিকতার সাথে মালিসে ওহাবী দাঙ্গাবাজদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। তাঁরা ইবনে শাকবানের

পনের'শ লুটেরাকে হত্যা করেন। সালিম ইবনে শাকবান ও তার বাহিনী মালিস হতে পলায়ন করে। কিন্তু তারা আবার ফিরে আসে এবং মালিস আক্রমণ করে। তারা শহরটি লুট করে। শরীফ গালিব আফেন্দী সামরিক সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে জেদ্দা গমণ করেন। অধিকাংশ তায়েফীয়-ই শংকাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁদের স্ত্রী-সন্তান নিয়ে তায়েফ দুর্গে অবস্থান গ্রহণকারী মুসলমানগণ একের পর এক অগ্রসরমান ওহাবী দলগুলোকে পরাভূত করেন; তবুও তাঁরা সন্ধির সাদা পতাকা উত্তোলন করতে বাধ্য হন। কেননা, শত্রুরা নিয়মিতভাবে বাইরে থেকে সাহায্য পাচ্ছিল। তাঁরা আত্মসমর্পণ করতে রাজি হন এ শর্তে যে তাঁদের জান ও ইজ্জতকে হেফাযত করা হবে। যদিও শত্রুরা দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং তাদের অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছিল অথবা পালিয়ে গিয়েছিল, তবুও সন্ধির উদ্দেশ্যে প্রেরিত তায়েফীয় দূত, যে নাকি একজন নিচু জাতের বদমায়েশ লোক ছিল, সে ওহাবীদের পালিয়ে যেতে দেখে তাদের উদ্দেশ্যে চীৎকার করে বলে, 'শরীফ গালিব আফেন্দী ভয়ে পালিয়ে গেছেন। আর তায়েফীয়দেরও কোনো শক্তি অবশিষ্ট নেই তোমাদেরকে প্রতিরোধ করার। তারা আমাকে পাঠিয়েছে এ কথা জানাতে যে তারা দুর্গটি সমর্পণ করবে এবং তারা তোমাদের কাছে ক্ষমাও প্রার্থনা করেছে। আমি ওহাবীদের পছন্দ করি। ফিরে এসো। তোমরা অনেক রক্তপাত করেছ। এটা ঠিক হবে না যদি তোমরা তায়েফ জয় না করে চলে যাও। আমি শপথ করছি যে তাফেীয়রা অবিলম্বে দুর্গটি সমর্পণ করবে। তোমরা যা চাও তা-ই তারা স্বীকার করে নেবে।" এটা শরীফ গালিব আফেন্দীর মারাত্মক ভুল ছিল যে তায়েফকে এমন মর্মান্তিকভাবে হারাতে হয়েছিল। তিনি যদি তায়েফে অবস্থান করতেন, তাহলে মুসলমানদেরকে ওই বিপর্যয় বরণ করতে হতো না। যেহেতু "বিশ্বাসঘাতকরা ভীতু", সেহেতু ওহাবীরা প্রথমাবস্থায় বিশ্বাস করে নি যে তায়েফীয়রা এতো সহজেই আত্মসমর্পণ করবেন। কিন্তু দুর্গের ওপর সন্ধির পতাকা দেখতে পেয়ে তারা বিষয়টি তদন্ত করার জন্যে একজন ওহাবী প্রতিনিধিকে দুর্গে প্রেরণ করে। তায়েফীয় মুসলমানগণ একটি রশি দ্বারা ওই প্রতিনিধিকে টেনে দুর্গে তুলে নেন। অতঃপর প্রতিনিধি বলে, "তোমাদের জীবন রক্ষা করতে চাইলে তোমাদের সকল মালামাল এখানে এনে সমর্পণ করো।" ইব্রাহীম নামের জনৈক মুসলমানের সাহায্যে তাঁদের সকলের মালামাল সেখানে স্তুপ করা হয়। প্রতিনিধি এরপর বলে, "এটা যথেষ্ট নয়। এর দ্বারা তো আমরা তোমাদেরকে ক্ষমা করতে পারি না। তোমাদের আরো জিনিসপত্র দিতে হবে।" সে একটি নোট বই তাঁদের দিয়ে বলে, "যাঁরা মালামাল দেবেন না, তাঁদের নাম এখানে তালিকাবদ্ধ করবে। পুরুষরা যেখানে যেতে চায় যেতে পারবে; নারী ও

শিশুদেরকে শেকলাবদ্ধ করা হবে।" যদিও তায়েফীয় মুসলমানগণ তাকে আরেকটু নরম ও বিবেচনাশীল হওয়ার জন্যে আবেদন-নিবেদন জানাতে লাগলেন, তবুও সে তার রুক্ষতা ও নিপীড়ন বাড়িয়ে দিল। ইব্রাহীম আর সহ্য করতে না পেরে একটি প্রস্তর তার বুকে নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করলেন। এ ঘটনার ফলে ওহাবীরা দুর্গ আক্রমণ করে বসলো, যার দরুণ তারা কামানের গোলা ও গুলীকে এড়িয়ে দুর্গের ফটক ভেঙ্গে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হলো। তারা যাদের সামনে পেল সেই ভাগ্যাহত নর-নারী ও কোলের শিশুদের তারা হত্যা করলো। রাস্তাগুলো রক্তের বন্যায় প্লাবিত হলো। ওহাবী মরদুদ চক্র প্রত্যেকটি ঘর লুট করলো। তারা সূর্যাস্ত পর্যন্ত উন্মত্ত অবস্থায় তাদের আক্রমণ পরিচালনা করতে লাগলো। তবে দুর্গের পূর্বদিকের প্রস্তরনির্মিত ঘরগুলো দখল করতে ব্যর্থ হওয়ায় তারা সেগুলো অবরোধ করলো এবং এক ঝাঁক গুলি সেদিকে বর্ষণ করলো। একজন ওহাবী শয়তান চিৎকার করে বললো: "আমরা তোমাদের ক্ষমা করলাম। তোমরা তোমাদের স্ত্রী-সন্তান নিয়ে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারো।" কিন্তু মুসলমানগণ আত্মসমর্পণ করলেন না। ইত্যবসরে ওহাবীরা স্থান ত্যাগ করতে আগ্রহী মুসলমানদেরকে একটি পাহাড়ে সমবেত করে সেই সকল খাঁটি মুসলিম পরিবারগুলোকে ঘিরে ধরে রাখলো যাঁরা বহু আদর-যত্নের মধ্যে বড় হয়েছিলেন এবং যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন নারী ও শিশু। তাঁদেরকে ওহাবীরা বারোটি দিন খাদ্য ও পানি না দিয়ে এবং পাথর মেরে ও আঘাত করে হত্যা করলো। ওহাবীরা তাঁদের প্রত্যেককে পর্যায়ক্রমে প্রহার করে বলেছিল, "তোমাদের মালামাল কোথায় লুকিয়ে রেখেছ বলো।" যারা তাদের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছেন তাঁদেরকে তারা কর্কশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলেছে, "তোমাদের মরণের দিন সামনে আসছে"

বর্বর ইবনে শাকবান বারোটি দিন প্রস্তর নির্মিত ঘরগুলো দখল করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর ওয়াদা করে যে যাঁরা বের হয়ে এসে অস্ত্র সমর্পণ করবেন, তাঁদেরকে ক্ষমা করা হবে। মুসলমানগণ তার কথায় বিশ্বাস করে বেরিয়ে আসেন, কিন্তু তাঁদেরকেও পেছনে হাত বেঁধে ওই পাহাড়টিতে অবরুদ্ধ মুসলমানদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তিন'শ সাতষট্টি জন মুসলমান নর-নারী ও শিশুকে ওই পাহাড়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। শহীদানদের মরদেহের ওপর ওহাবীরা পশু দ্বারা পদ দলন করায় এবং দাফন না করে মাংসভোজী জন্তু ও পাখিদের জন্যে লাশগুলো ফেলে রেখে যায়। তারা ফটকের সামনে সকল লুণ্ঠিত মালামাল স্তুপ করে এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যসামগ্রীর এক-পঞ্চমাংশ সউদের খেদমতে পেশ করে এবং বাকি অংশ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়। ওহাবীদের দ্বারা ও বৃষ্টির কারণে গণনাতীত অর্থ ও মালামাল হারিয়ে যাওয়ার পর মুসলমানদের হাতে খুব অল্প পরিমাণ অর্থ

অবশিষ্ট থাকে; মাত্র চল্লিশ হাজার স্বর্ণ রিয়াল। দশ হাজার রিয়াল মহিলা ও শিশুদের মাঝে বিরতণ করা হয় এবং বাকি মালামাল খুব অল্প দামে বিক্রি করা হয়।

ওহাবীরা কুরআন, হাদীস ও অন্যান্য দ্বীনী কিতাব যেগুলো তারা বিভিন্ন পাঠাগার, টাক্কা (খানকাহ) ও ঘর-বাড়ি থেকে বের করে এনেছিল, সেগুলো মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তারা স্বর্ণ মোড়ানো চামড়ার কুরআনের মোড়ক দ্বারা স্যান্ডেল তৈরি করে এবং সেগুলো নিজেদের নোংরা পায়ে পরে। এ সব চামড়ার মোড়কে কুরআনের আয়াত ও দোয়া-কালাম লেখা ছিল। ওই সকল মহামূল্যবান কিতাবের পাতাসমূহ এতো বেশি পরিমাণে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল যে তায়েফের রাস্তাগুলোতে পা রাখার মতো আর কোনো খালি জায়গা-ই ছিল না। যদিও ইবনে শাকবান ওহাবী দস্যুদেরকে কুরআন মজীদ ছিঁড়তে মানা করেছিল, তবুও ওহাবী দস্যুরা যাদেরকে লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে মরুভূমি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং যারা কুরআন সম্পর্কে কিছুই জানতো না, তারা যতোগুলো কুরআনের কপি পেয়েছিল তার সবই ছিঁড়ে ফেলেছিল এবং পদ দলিত করেছিল। শুধু তিন কপি কুরআন ও এক কপি সহীহ্ বুখারী শরীফ সারা তায়েফ নগরীতে রক্ষা পায়।

## একটি মু'জেযা

ওহাবীরা যখন তায়েফ ধ্বংস করে, তখন আবহাওয়া শান্ত ছিল। কোনো বাতাস বইছিল না। ওহাবী দস্যুরা চলে যাওয়ার পরপরই একটি ঝড় শুরু হয় এবং কুরআন-হাদীস ও দ্বীনী কিতাবপত্রের পাতাগুলোকে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়। সহসা মাটিতে আর কোনো পাতাই অবশিষ্ট রইলো না। কেউই জানে না ওগুলোকে কোথায় নেয়া হয়েছে।

খরতাপময় সূর্যের নিচে পাহাড়ে শাহাদাতপ্রাপ্তদের দেহগুলো ১৬ দিনেই নষ্ট হয়ে গেল; পরিবেশও দুর্গন্ধময় হয়ে গেল। মুসলমানগণ ইবনে শাকবানের কাছে নিজেদের মৃত আত্মীয়-স্বজনকে দাফন করার অনুমতি প্রার্থনা করতে লাগলেন কান্নাকাটি করে। অবশেষে সে রাজি হলো। অতঃপর মুসলমানগণ দুইটি বড় গর্ত খুঁড়ে তাঁদের শাহাদতপ্রাপ্ত পিতা, মাতা, ভাই, বোন, আত্মীয়-পরিজন ও সন্তানদেরকে এক সাথে সেখানে দাফন করলেন। তখন আর সনাক্ত করার মতো কোনো মরদেহ অবশিষ্ট ছিল না; কারণ বহু মরদেহেরই অর্ধেক নয়তো এক-চতুর্থাংশই অবশিষ্ট ছিল মাত্র হিংস্র প্রাণী ও পক্ষীর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায়। ওহাবীরাও দুর্গন্ধে অস্বস্তি বোধ করছিল বিধায় মরদেহগুলোকে দাফন করার

অনুমতি দিয়েছিল। মুসলমানগণ সর্বত্র খুঁজে খুঁজে ওই সব মরদেহ দাফন করতে সমর্থ হলেন।

ওহাবী দুর্বৃত্তরা শহীদ মুসলমানদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ ও বে-আদবি প্রদর্শনের জন্যেই মরদেহগুলাকে পচার আগে দাফন করতে দেয় নি। কিন্তু একটি পংক্তিতে যেমন বলা হয়েছে:

"তোমাদের পতনের জন্যে দুঃখ করোনা, পতনই আনবে উত্থান, কোনো ইমারত ধ্বংসের মুখোমুখি হলেই করা হয় তার সংরক্ষণ।"

ঠিক তদ্রূপ আল্লাহর কাছেও শহীদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় তখনই, যখন তাঁদের মরদেহকে দাফন করা হয় না এবং হিংস্র জীব-জন্তুর শিকার হবার জন্যে ফেলে রাখা হয়।

ইসলামের শত্রু ওহাবী দস্যুরা মুসলমান নিধনযজ্ঞ ও তাঁদের মালামাল লুট করার পর সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, আউলিয়া-এ-কেরাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম ও উলামায়ে হাক্কানীবৃন্দের মাযার-রওযাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু যখন তারা মহান সাহাবী এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয় সাথী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর পবিত্র দেহকে খুঁড়ে বের করে আগুনে পোড়াবার অসৎ উদ্দেশ্যে তাঁর মাযারে প্রথম শাবলের আঘাত হানলো, ঠিক তখনি তারা মাযার থেকে নিঃসৃত সুগন্ধির ঘ্রাণ পেয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। তারা বললো, "এ কবরটিতে একটি বড় শয়তান আছে। এটাকে খুঁড়তে সময় নষ্ট না করে আমাদের উচিৎ হবে এটাকে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়া।" যদিও তারা বহু বারুদ ব্যবহার করে চেষ্টার ত্রুটি করলো না, তবুও ওই বারুদ বিস্ফোরিত হলো না এবং তারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে স্থান ত্যাগ করলো। এরপর মাযারটি কিছু বছর মাটির সাথে সমান অবস্থায় পড়েছিল। অতঃপর সাঈদ ইয়াসিন আফেন্দী খুব সুন্দর একটি ফলক স্থাপন করে বরকতময় মাযারটিকে বিস্মৃতি হতে রক্ষা করেন।

ওহাবী বদমায়েশরা সাঈদ আবদুল হাদী আফেন্দী এবং আরো বহু আউলিয়ার মাযার-রওযা খুঁড়তে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকেই কারামত প্রদর্শন করে ওহাবীদেরকে বাধা দেন। ওহাবীরা নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে অস্বাভাবিক অসুবিধার সম্মুখীন হওয়াতে এ অপচেষ্টা পরিত্যাগ করে।

উসমান আল মুদায়িকী ও ইবনে শাকবান মাযারগুলোর সাথে মসজিদ ও মাদ্রাসাও ধ্বংস করার আদেশ জারি করেছিল। আহলে সুন্নতের মহান আলেম ইয়াসিন

আফেন্দী তাদের বলেছিলেন, “তোমরা কেন মসজিদ ধ্বংস করতে চাও, জামাতে নামাজ আদায়ের জন্যে যা নির্মাণ করা হয়েছে? যদি তোমরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর মাযার এখানে অবস্থিত হওয়ার কারণে এ মসজিদটি ধ্বংস করতে চাও, তাহলে আমি তোমাদেরকে বলছি, তাঁর মাযারটি বড় মসজিদের বাইরে অবস্থিত। অতএব, মসজিদটি ধ্বংস করা প্রয়োজনীয় নয়।” উসমান আল মুদায়িকী ও ইবনে শাকবান নিরুত্তর হয়ে গেল। কিন্তু ওহাবীদের মধ্যে জনৈক ‘যিনদিক’ মাতু একটি উদ্ভট মন্তব্য পেশ করলো, “যা সন্দেহজনক, তা-ই ধ্বংস করতে হবে।” অতঃপর ইয়াসিন আফেন্দী জিজ্ঞেস করলেন, “মসজিদ সম্পর্কে কি কোনো সন্দেহ আছে?” ওহাবী বদমায়েশটি নিরুত্তর হয়ে গেল। দীর্ঘ নিরবতার পর উসমান আল মুদায়িকী বললো, ”আমি তোমাদের কারো সাথে একমত নই।” এরপর সে আদেশ দিলো, “মসজিদ স্পর্শ করো না, মাযারটি ধ্বংস করো।”

৩৯/ যদিও ওহাবী বদমায়েশরা তায়েফ নগরীতে প্রচুর মুসলমানের রক্ত ঝরিয়ে মক্কা মু’য়ায্যামা আক্রমণ করেছিল, তবুও তারা নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সাহস করেনি। কেননা, তখন হজ্জের সময় ছিল এবং মক্কা নগরীতে বিপুল সংখ্যক হাজীর সমাগম হয়েছিল। শরীফ গালিব আফেন্দী সৈন্যবাহিনী গড়বার জন্যে জেদ্দায় গিয়েছিলেন এবং মক্কাবাসীগণ তায়েফের হৃদয় বিদারক ঘটনাবলীতে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওহাবীদের নেতার কাছে জুলুম-অত্যাচার না করার জন্যে আবেদন জানিয়ে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। ওহাবীরা ১২১৮ হিজরী সালের মুহররম মাসে মক্কায় প্রবেশ করে এবং ওহাবীবাদ প্রচার করে। তারা ঘোষণা করে দেয় যে যাঁরা ওহাবী মতবাদকে গ্রহণ করবেন না এবং যাঁরা মদীনা শরীফ গমন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা মোবারকের সামনে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করবেন, তাঁদেরকে হত্যা করা হবে। চৌদ্দ দিন পরে ওহাবীরা জেদ্দা আক্রমণ করে, যার ফলশ্রুতিতে শরীফ গালিব আফেন্দী জেদ্দা দুর্গ থেকে সরাসরি ওহাবীদের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং অধিকাংশ আক্রমণকারী নিহত হয়। বাকি ওহাবী শয়তান মক্কায় পালিয়ে যায়। মক্কাবাসী মুসলমানগণ তাদের হাতে পায়ে ধরে আবেদন জানান যাতে তারা অত্যাচার না করে। ফলে তারা শরীফ গালিব আফেন্দীর ভাই শরীফ আবদুল মুঈন আফেন্দীকে মক্কার আমীর নিযুক্ত করে দারিয়ায় ফিরে যায়। শরীফ আবদুল মুঈন আফেন্দী মক্কাবাসীকে ওহাবীদের নিপীড়ন-নির্যাতন থেকে রক্ষার জন্যেই আমীরের পদটি গ্রহণ করেন। জেদ্দা হতে ওহাবীদের বিতাড়নের ৩৮ দিন পরে শরীফ গালিব আফেন্দী জেদ্দার সৈন্যবাহিনী ও জেদ্দার গভর্ণর শরীফ পাশাসহ মক্কায়

প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁরা মক্কা হতে ওহাবী সৈন্যদের বিতাড়িত করেন এবং তিনি পুনরায় আমীর হন (অর্থাৎ, নগরীর নিয়ন্ত্রণ সুন্নীদের হাতে চলে আসে)। অতঃপর মক্কায় পরাজিত হওয়ার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ওহাবীরা তায়েফের আশপাশে অবস্থিত পল্লীগুলোতে হানা দেয় এবং বহু মুসলমানকে হত্যা করে। তারা ওহাবী দুর্বৃত্ত উসমান আল মুদায়িকীকে তায়েফের গভর্নর নিয়োগ করে। উসমান সমস্ত ওহাবীদেরকে জড়ো করে একটি বিশাল লুটেরা বাহিনীসহ ১২২০ হিজরী সালে মক্কা নগরী অবরোধ করে। মক্কার সুন্নী মুসলমানগণ চরম দুর্ভোগ পোহান বহু মাস ধরে; অবরোধের শেষ দিনগুলোতে এমন কি কুকুর-বিড়াল পর্যন্ত খাওয়ার জন্যে অবশিষ্ট ছিল না। শরীফ গালিব আফেন্দী বুঝতে পারেন মুসলমানদের জীবন রক্ষার্থে ওহাবীদের সাথে সন্ধি স্থাপন করা ছাড়া আর উপায় নেই। তিনি নগরীটি সমর্পণ করেন এ শর্তে যে, তিনি-ই নগরীটির আমীর পদে বহাল থাকবেন এবং মুসলমানদের জান ও মালও নিরাপদ থাকবে।

মক্কা মু'য়ায্যামা জবর-দখলের পরে ওহাবীরা মদীনা মুনাওয়ারাও দখল করে নেয় এবং খাযিনাতুন নাবাউয়ীয়্যা [নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সংরক্ষিত বস্তু-সামগ্রীর কোষাগার]-এ সংগৃহীত বহু দামী ঐতিহাসিক রত্ন লুটপাট করে নেয়। তারা মুসলমানদের সাথে এমন রুক্ষ ব্যবহার করে যা বর্ণনাতীত। এরপর তারা মুবারক ইবনে মাদাইয়ান নামের এক ওহাবীকে নগরীর গভর্ণর নিয়োগ করে দারিয়্যায় প্রত্যাবর্তন করে। ওহাবীরা সাত বছর যাবত মক্কা ও মদীনা শরীফে অবস্থান করে আহলে সুন্নতের হাজীদেরকে হজ্ব পালন করতে দেয় নি। তারা কাবাকে 'কায়লান' নামক দুইটি কালো কাপড় দ্বারা আচ্ছাদিত করে। তারা হুক্কার ধূমপান নিষেধ করে এবং যাঁরা তা পান করতেন, তাদেরকে প্রহার করে। মক্কা ও মদীনাবাসীগণ ওহাবীদের থেকে দূরে সরে থাকতেন এবং ওহাবী মতবাদকে ঘৃণা করতেন।

'মি'রাতুল হারামাইন' গ্রন্থের প্রথম খন্ডে আল্লামা আইয়ুব সাবরী পাশা মক্কাবাসী মুসলমানদের ওপর পরিচালিত ওহাবীদের অত্যাচারের বিশদ বর্ণনা নিম্নোক্ত ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন: "মক্কার মুসলমানদের ওপর এবং প্রতি বছর হুজ্ব-এ আগমনকারী মুসলমানদের ওপর ওহাবীদের জুলুমের ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করা প্রায় অসম্ভব। ওহাবী দস্যুদের নেতা অহরহ মক্কাবাসী ও তাঁদের আমির শরীফ গালীব আফেন্দীর প্রতি ভীতি প্রদর্শন করে পত্র লিখতো। যদিও সৌদ কয়েকবার মক্কা অবরোধ করেছিল, তবুও ১২১৮ হিজরীর আগে সে নগরীতে প্রবেশ করতে পারেনি। শরীফ গালিব আফেন্দী জেদ্দার গভর্ণরকে সঙ্গে নিয়ে দামেস্ক ও মিসর হতে আগত হাজীদের কাফেলার নেতৃবৃন্দকে সমবেত করেন ১২১৭ হিজরী সালে

এবং তাঁদেরকে বলেন যে ওহাবী দুর্বৃত্তরা পবিত্র মক্কা নগরী আক্রমণ করার ফন্দি আঁটছে; এমতাবস্থায় তাঁরা যদি তাঁকে সাহায্য করেন, তাহলে সৌদকে আটক করা যাবে এবং ওহাবীদেরকে পরাস্ত করা যাবে। কিন্তু শরীফ গালিব আফেন্দীর এ প্রস্তাব গৃহীত হয় নি। অতঃপর শরীফ গারিব আফেন্দী নিজ ভাই শরীফ আবদুল মুঈনকে সহকারী আমীর নিয়োগ করে জেদ্দা গমন করেন। মক্কার আমির হিসেবে শরীফ আবদুল মুঈন আফেন্দী আহলে সুন্নতের আলেমবৃন্দ মুহাম্মদ তাহের, সাইয়েদ মুহাম্মদ আবু বকর মীর গণি, সাইয়েদ মুহাম্মদ আক্কাস ও আব্দুল হাফিয আল আযমীকে শুভেচ্ছা এবং ক্ষমা প্রার্থনাকারী দলস্বরূপ ১২১৮ হিজরী সালে সৌদ ইবনে আব্দুল আযীযের কাছে প্রেরণ করেন।

"সৌদ এতে সাড়া দেয় এবং সৈন্যসহ মক্কা গমন করে। সে আবদুল মুঈন আফেন্দীকে জেলার প্রধান কর্মকর্তা নিয়োগ করে এবং আদেশ দেয় যে সকল মাযার-রওযা ধ্বংস করতে হবে। কারণ ওহাবীদের দৃষ্টিতে মক্কা ও মদীনাবাসী মুসলমানগণ নাকি আল্লাহতা'আলার এবাদত করছিলেন না, বরং মাযার ও রওযার পূজা করছিলেন। তারা বলে যে তারা প্রকৃতপ্রস্তাবেই খোদা'লার এবাদত-বন্দেগী করবেন যদি মাযার ও রওযাগুলো ধ্বংস করে ফেলা হয়। ওহাবী মতবাদের প্রধান ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাবের মতানুযায়ী ৫০০ হিজরীর পর হতে শুরু করে সকল মুসলমানই কাফের ও মুশরিক হিসেবে মৃত্যু বরণ করেছেন; আর তার মতো অধার্মিক বিশ্বাসঘাতকের কাছেই নাকি প্রকৃত ইসলাম প্রকাশিত হয়েছে সে আরো বলে যে 'মুশরিক' (অর্থাৎ সুন্নী মুসলিম)-এর কবরের কাছে নাকি নবদীক্ষিত ওহাবীদের দাফন করা অনুমতিপ্রাপ্ত নয়।

"শরীফ গালিব আফেন্দীকে আটক ও জেদ্দা দখল করার উদ্দেশ্যে সৌদ জেদ্দা আক্রমণ করে। কিন্তু উসমানীয় তুর্কী সৈন্যদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জেদ্দাবাসীগণ শত্রুদের পরাভূত করেন এবং ওহাবীদের বিতাড়িত করেন। সৌদ মক্কায় ফিরে যায় এবং ফেরার পথে পলায়নপর ওহাবীদেরকে সংগ্রহ করে নিয়ে যায়।

"যদিও শরীফ আবদুল মুঈন আফেন্দী ওহাবীদের নিপীড়ন হতে মক্কাবাসী মুসলমানদের রক্ষাকল্পে ওহাবীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, তবুও বর্বর ওহাবীরা দিনকে দিন তাদের অত্যাচার ও লুণ্ঠনের মাত্রা বৃদ্ধি করতে লাগলো। শরীফ আবদুল মুঈন আফেন্দী তাদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান অসম্ভব উপলব্ধি করে শরীফ গালিব আফেন্দীর কাছে এ মর্মে একটি বার্তা প্রেরণ করেন যে সউদ মক্কায় আছে এবং ওহাবী দস্যুরা মু'আল্লা চত্বরে

আখড়া গেড়েছে, আর তিনি (শরীফ গালিব আফেন্দী) যদি সামান্য কিছু সৈন্য নিয়ে ওহাবীদের আক্রমণ করেন, তবে তাদেরকে পরাভূত করা সম্ভব হবে।

"এ সংবাদের ওপর ভিত্তি করে শরীফ গালিব আফেন্দী জেদ্দার শাসক শরীফ পাশাসহ কিছু চৌকশ সৈন্যকে নিয়ে এক রাতে মক্কায় (মু'আল্লায়) ওহাবীদের ওপর আঘাত হানেন। তিনি ওহাবীদের তাঁবুগুলো ঘেরাও করে ফেলেন, কিন্তু সউদ পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অতঃপর বাকি ওহাবীরা বলে যে তারা অস্ত্র সমর্পণ করতে রাজি আছে যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। মুসলমানগণ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। ফলে পবিত্র মক্কা মুয়াজ্জামা নিষ্ঠুর ওহাবীদের কাছ থেকে রক্ষা পায়। আহলে সুন্নাতের এ সাফল্য তায়েফে অবস্থিত ওহাবীদের মধ্যে চরম ভীতির সঞ্চার করে, যার দরুণ তারা বিনা রক্তাপাতেই আত্মসমর্পণ করে। নিষ্ঠুর উসমান আল মুদায়িকী তার গুন্ডাবাহিনীসহ ইয়ামেনের পাহাড়ে পালিয়ে যায়। যে সব ওহাবীকে মক্কা শরীফ হতে বিতাড়িত করা হয়েছিল তাদেরকে গ্রামাঞ্চলে গ্রামবাসী ও বিভিন্ন গোত্রভুক্তদের ওপর লুটপাট পরিচালনা করতে দেখে শরীফ গালিব আফেন্দী বনী সাকিফ গোত্রের কাছে কতিপয় দূত পাঠালেন এবং আদেশ দিলেন, "তায়েফ গমন করে ওহাবীদের আক্রমণ করো। যা আটক করবে তা-ই তোমরা গ্রহণ করতে পারবে। বণী সাকিফ গোত্র ওহাবীদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্যে তায়েফ আক্রমণ করলো এবং ফলস্বরূপ তায়েফও ওহাবীদের হাত থেকে রক্ষা পেলো।

"উসমান আল মুদায়িকী ইয়ামেনের পাহাড়ী এলাকায় অজ্ঞ, বর্বর অধিবাসীদের সংগ্রহ করে এবং পথে যে সব ওহাবীদের পেয়েছিল তাদেরকে সাথে নিয়ে পুনরায় মক্কা অবরোধ করলো। তিন মাস মক্কাবাসীগণ চরম দুর্ভোগ পোহালেন। শরীফ গালিব আফেন্দী অবরোধকারীদেরকে বিতাড়নের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন, যদিও তিনি দশবার চেষ্টা করেছিলেন। এমতাবস্থায় খাদ্যের মওজুদ সমাপ্ত হয়ে গেল। রুটির মূল্য প্রতি ওক (তুর্কী পরিমাণ যার ইংরেজি মান হলো ২৮ পাউন্ড) পাঁচ রিয়ালে এবং মাখনের মূল্য ছয় রিয়ালে চড়ে গেলো, কিন্তু শেষ দিকে আর কেউই কোনো কিছু বিক্রি করছিল না। মুসলমানগণ বিড়াল ও কুকুর খেয়ে জীবন ধারণ করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে তাও আর পাওয়া গেল না। তাঁদেরকে ঘাস ও বৃক্ষের লতাপাতা খেয়ে থাকতে হলো। যখন আর খাওয়ার মতো কিছুই বাকি রইলো না, তখন মক্কা নগরী সউদের হাতে সমর্পণ করা হলো এই শর্তে যে, সে মানুষদেরকে নির্যাতন অথবা হত্যা করবে না। শরীফ গালিব আফেন্দী এ ঘটনার জন্যে দায়ী না হলেও তিনি যদি আগে মিত্র গোত্রগুলোর সাহায্য কামনা করতেন, তাহলে তাঁকে এ ব্যর্থতার গ্লানি গ্রাস করতো না। বস্তুতঃ মক্কাবাসীগণ

শরীফ গালিব আফেন্দীর কাছে প্রার্থনা করেন, 'যদি আপনি আমাদের মুহব্বতকারী গোত্রগুলোর কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করতে সক্ষম হন, তাহলে আমরা হজ্জের সময় আসা পর্যন্ত লড়াই করতে পারবো এবং যখন মিসরীয় ও দামেশকীয় হাজীগণ আগমন করবেন, তখন আমরা ওহাবীদেরকে পরাভূত করতে পারবো।' শরীফ গালিব আফেন্দী বলেন, 'আমি এটা আগে করতে পারতাম, কিন্তু এখন তো এটা অসম্ভব।' এ কথায় তাঁর পূর্ববর্তী ভুলের স্বীকারোক্তি আছে। তিনিও ওহাবীদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে রাজি ছিলেন না, কিন্তু মক্কাবাসীগণ আরয করেন, 'হে আমীর আপনার পাক পবিত্র পূর্বপুরুষ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও তাঁর শত্রুদের সাথে সন্ধি করেছেন। আপনি কি শত্রুদের সাথে সন্ধি করবেন এবং দয়া করে আমাদেরকে এ বিপদ থেকে মুক্তি দেবেন? আপনি এ কাজ করে আমাদের মনিব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কেই অনুসরণ করবেন। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও মক্কায় কুরাইশ গোত্রের সাথে সন্ধি করার জন্যে হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে হুদায়বিয়া হতে মক্কায় প্রেরণ করেছিলেন।' শরীফ গালিব আফেন্দী শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত মানুষদেরকে আত্মসমর্পণের এ ধারণা হতে বিরত রাখতে চেষ্টা করেন এবং কোনো সন্ধিতে প্রবেশ করা হতে বিরত থাকেন। কিন্তু যখন মানুষেরা আর কষ্ট সহ্য করতে পারলেন না, তখন তিনি আবদুর রহমান নামের জনৈক ওহাবী মৌলবীর চাপের কাছে নতি স্বীকার করলেন। শরীফ গালিব আফেন্দীর এটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছিল যে তিনি আবদুর রহমানের কথা শুনেছিলেন এবং মুসলমানদের ওপর সউদের অত্যাচার পরিচালনা হতে তাকে নিবৃত্ত করার ক্ষেত্রে আবদুর রহমানকে মধ্যস্থতাকারী বানিয়েছিলেন। তিনি মক্কাবাসী ও সৈন্যদের মন জয় করেন তখনি, যখন তিনি বলেন, 'আমি ইচ্ছাকৃতভাবে এ সন্ধিতে রাজি হই নি, আমার পরিকল্পনা ছিল হজ্জের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করার।'

"সন্ধির পর সউদ ইবনে আব্দুল আযীয মক্কায় প্রবেশ করলো। মনোরম কাবার ওপর ছাউনিস্বরূপ সে একটি মোটা কাপড় বিছিয়ে দিলো। সে শরীফ গালিব আফেন্দীকে পদচ্যুত করলো। এখানে সেখানে সে ফেরাউনের মতো মানুষদেরকে আক্রমণ করতে লাগলো এবং অকথ্য অত্যাচার করতে লাগলো। উসমানীয়দের কাছ থেকে কোনো সাহায্য না আসার দরুণ শরীফ গালিব আফেন্দীও অপমানিত বোধ করলেন। তাই তিনি গুজব রটিয়ে দিলেন যে উসমানীয় সরকারের শিথিলতার জন্যেই মক্কাকে সমর্পণ করা হয়েছে। ওহাবীদের বিরুদ্ধে উসমানীয়গণ যাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তার জন্যে তিনি সউদকে মিসরীয় ও দামেস্কীয় হাজীদের মক্কায় না ঢুকতে দেয়ার উস্কানি দেন।

“শরীফ গালিব আফেন্দীর এ আচরণটি সউদকে আরো হিংস্র করে তোলে এবং সে অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। সে মক্কা শরীফের আহলে সুন্নাতের অধিকাংশ আলেমকে এবং ধনী লোকদেরকে হত্যা করে। যাঁরা ঘোষণা করেন নি যে তাঁরা ওহাবীবাদকে গ্রহণ করেছেন, তাঁদেরকে সে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। রাস্তায় এবং বাজারে তার লোকেরা চিৎকার করে বলতে থাকে, ’সউদের ধর্মকে গ্রহণ করো। তার বিস্তৃত ছায়ায় আশ্রয় নাও’ সে মুসলমানদেরকে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাবের মিথ্যা ও বানোয়াট ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করে। যে সকল মু’মিন ব্যক্তি নিজেদের সঠিক ঈমান ও মাযহাবকে হেফাযত করতে সক্ষম হলেন, তাঁদের সংখ্যা মরুভূমিতে ব্যাপকভাবে হ্রাস পেল।

”শরীফ গালিব আফেন্দী মরুভূমি অঞ্চলের মতো হিজায ও পবিত্র নগরীগুলোতেও ইসলামের বিলুপ্তি ঘটার অশুভ ভবিষ্যত উপলব্ধি করতে পেরে সউদের কাছে প্রেরিত এক বার্তায় বলেন, ’তুমি যদি হজ্জের মৌসুমের পরেও মক্কায় অবস্থান করো, তবে ইস্তাম্বুল হতে উসমানীয় সেনাবাহিনীকে পাঠানো হবে, যাকে তুমি কোনোক্রমেই প্রতিরোধ করতে পারবে না। তোমাকে ধরে হত্যা করা হবে। হজ্জের পরে মক্কায় অবস্থান করো না, চলে যাও।’ এ বার্তাটি কোনো সুফল বয়ে আনলো না, বরং মুসলমানদের ওপর অত্যাচার পরিচালনায় সউদের নিষ্ঠুরতাকে আরো বৃদ্ধি করলো।

“এ জুলুম ও শয়তানীর সময় সউদ ইবনে আব্দুল আযীয একজন সুন্নী আলেমকে জিজ্ঞেস করে: ’হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি তাঁর রওযায় জীবিত আছেন? নাকি আমরা যেভাবে বিশ্বাস করি সেভাবে তিনি অন্যান্য মৃতদের মতোই মৃত?’ ওই আলেম উত্তরে বলেন, ‘তিনি আমাদের অবোধগম্য একটি জীবনে জীবিতাবস্থায় আছেন।’ সউদ তাঁকে প্রশ্নটি করেছিল এ কারণে যে ওই আলেম সন্তোষজনক উত্তর প্রদানে ব্যর্থ হলে ফলশ্রুতিতে সে তাঁকে নিপীড়ন করে হত্যা করার মওকা পেয়ে যাবে। সউদ বললো, ’তাহলে আমাদেরকে দেখাও যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রওযায় জীবিত আছেন, যাতে করে আমরা তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি। যদি তুমি অসংলগ্ন ও এলোমেলো উত্তর দাও, তাহলে বোঝা যাবে যে তুমি আমার ধর্ম গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে একগুঁয়েমি করছো। তখন আমি তোমাকে হত্যা করবো।’ ওই সুন্নী আলেম জবাবে বলেন, ‘আমি এ বিষয়ের সাথে অসম্পৃক্ত কোনো জিনিস দেখিয়ে তোমাকে বুঝ দিতে চাই না। চলো, আমরা এক সাথে উভয়েই রওযায়ে আকদসের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। আমি তাঁকে সালাম ও সম্ভাষণ জানাবো। যদি তিনি আমার সালামের প্রত্যুত্তর দেন, তবে তুমি বুঝতে পারবে যে আমাদের মাওলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রওয়ায় জীবিতাবস্থায় আছেন এবং সালাম ও সম্ভাষণ দানকারীকে শুনতে পান এবং জবাব দিতে পারেন। যদি আমার সালামের কোনো প্রত্যুত্তর আমরা না পাই, তাহলে বুঝতে পারবে যে আমি একজন মিথ্যাবাদী। তখন তোমার খুশিমতো তুমি আমাকে শাস্তি দিতে পারবে।' সউদ সুন্নী আলেমের এ জবাবে তেলে বেগুনে চটে উঠলো, কিন্তু তাকে ছেড়ে দিলো। কেননা, সে যদি ওই আলেমের প্রস্তাব অনুযায়ী কাজটি করতো, তবে ওহাবীবাদ অনুযায়ী সে একজন কাফের ও মুশরিকে পরিণত হতো। সে বেওকুফ বনে গেলো, কারণ এ জবাবটির প্রত্যুত্তর দেয়ার মতো শিক্ষা-দীক্ষা তার ছিল না। সে ওই আলেমকে ছেড়ে দিলো যাতে সে বে-ইজ্জত না হয়, তবে সে তার একজন সৈন্যকে আদেশ করলো ওই আলেমকে হত্যা করতে এবং হত্যা করার সাথে সাথেই তাকে খবরটি জানাতে। কিন্তু খোদা তা'আলার অশেষ দয়ায় ওহাবী সৈন্যটি তার অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার কোনো সুযোগ পেলো না। এ ভয়ানক সংবাদ যখন ওই মুজাহিদ আলেমের কানে পৌঁছলো, তখন তিনি মক্কায় অবস্থান করা নিরাপদ নয় চিন্তা করে সেখান থেকে হিজরত করলেন।

"ওই সুন্নী মুজাহিদ আলেমের প্রস্থান সম্পর্কে জানতে পারার পর বদমায়েশ সৌদ তাঁর পেছনে একজন গুপ্ত ঘাতক প্রেরণ করে। ওহাবী গুপ্ত ঘাতকটি দিনরাত ভ্রমণ করতে লাগলো এ কথা চিন্তা করে যে সে একজন সুন্নীকে হত্যা করতে সক্ষম হবে এবং বহু সওয়াবের অধিকারী হবে। সে মুজাহিদ আলেমের দেখা অবশেষে পেলো, কিন্তু তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার কিছু সময় আগেই তিনি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ইন্তেকাল করলেন। ওই ওহাবী গুপ্তঘাতক মুজাহিদ আলেমের উটটি একটি গাছের সাথে বেঁধে পানির জন্যে একটি কুয়োর ধারে গেলো। সে যখন ফিরলো, তখন সে দেখতে পেলো যে ওই আলেমের মরদেহ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে এবং শুধুমাত্র উটটি-ই দাঁড়িয়ে আছে। সে সউদের কাছে ফিরে গিয়ে যা যা ঘটেছিল তার বয়ান দিলো। এ কথা শুনে সৌদ বললো, 'হ্যাঁ, আমি তাঁকে যিকর ও তসবিহ পাঠরত বহু কণ্ঠস্বরের মধ্যে আসমানে উঠে যেতে দেখেছি আমার স্বপ্নে। জ্যোতির্ময় মুখমন্ডলের অধিকারী ব্যক্তিরা বলছিলো যে মরদেশটি ওই আলেমেরই এবং তাঁর আসমানে উন্নীত হওয়ার কারণ হলো শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-তে তাঁর সঠিক ঈমান। অতঃপর ওই গুপ্ত ঘাতক বললো,'আর তুমি আমাকে প্রেরণ করেছ এ রকম একজন মহান আলেমকে হত্যা করতে তুমি তাঁর প্রতি বর্ষিত আল্লাহ তা'আলার রহমত দেখে নিজের গোমরাহ ও ত্রুটিপূর্ণ মতবাদ শুধরাচ্ছো না' সে সউদকে গালাগালি করে। অতঃপর সে তওবা করে ওহাবীবাদ ত্যাগ করে।

কিন্তু বদমায়েশ সউদ তার কথায় কানও দিলো না। সে মক্কার গভর্ণর পদে উসমান আল মুদায়িকীকে নিয়োগ করে দারিয়্যায় ফিরে গেলো।

"সউদ ইবনে আব্দুল আযীয দারিয়্যায় দুরাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতাপূর্ণ জীবন যাপন করে। সে পবিত্র মদীনা নগরীও জবর-দখল করেছিলো। এরপর যে সকল ওহাবী হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিল এবং যে সকল ওহাবী বাকপটু ছিল, তাদের সবাইকে সাথে নিয়ে সউদ মক্কা শরীফ অভিমুখে যাত্রা করলো। শিক্ষিত ওহাবীরা যাদেরকে ওহাবীবাদ প্রচার ও প্রশংসা করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, তারা মাঠে নেমে গেলো। ১২২১ হিজরীর ৭ই মুহররম, শুক্রবার ওহাবীরা মসজিদুল হারামে ইব্‌ন আবদুল ওয়াহাবের বইপত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করা আরম্ভ করলো। আহলে সুন্নাতের উলামাগণ তাদেরকে খন্ডন করেন [মক্কী উলামাদের এই খন্ডন 'সাইফুল জব্বার' শীর্ষক বইয়ে সংকলিত হয়েছে। পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত। হাকিকাত কিতাবেভী, ইস্তাম্বুল থেকে ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত]। দশ দিন পর সউদ ইবনে আবদুল আযীয মক্কায় আগমন করে।

সউদ মু'আল্লা চত্বরে শরীফ গালিব আফেন্দীর বাসভবনে অবস্থান নেয়। বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ সে তার পরিধানের একটি চাদর শরীফ গালিব আফেন্দীর গায়ে পরিয়ে দেয়। শরীফ গালিব আফেন্দীও তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করেন। উভয়েই মসজিদুল হারামে গমন করে এক সাথে মনোরম কাবা শরীফের তওয়াফ করেন।

"এমন সময় খবর এলো যে দামেশকীয় হাজীদের একটি কাফেলা মক্কা শরীফ অভিমুখে আসছে। সউদ কাফেলাটির সাথে মিলিত হয়ে তাঁদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেয়া হবে না মর্মে একটি বার্তা পৌঁছানোর জন্যে মাস'উদ ইবনে মুদায়িকীকে প্রেরণ করে। মাস'উদ কাফেলাটির সাথে মিলিত হয়ে বলে, 'তোমরা পূর্ববর্তী চুক্তি ভঙ্গ করেছো। সউদ ইবনে আব্দুল আযীয ইতিপূর্বে সালেহ ইবনে সালেহকে দিয়ে প্রেরিত এক বার্তায় তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন যে তোমরা সৈন্যসহ মক্কায় আসবে না। কিন্তু তোমরা সৈন্যসহ এসেছো তোমরা মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না, কেননা তোমরা আদেশটি অমান্য করেছো।' কাফেলার প্রধান আবদুল্লাহ পাশা ইউসুফ পাশাকে সউদের কাছে ক্ষমা এবং অনুমতি চাওয়ার জন্যে প্রেরণ করলেন। অতঃপর সউদ বললো, 'ইউসুফ পাশা, আমি তোমাকে হত্যা করতাম যদি আমি খোদাকে ভয় না করতাম। হারামাইন শরীফাইনের লোকদের এবং আরবীয় গ্রামবাসীদের মধ্যে বিতরণ করতে তোমরা যে সব স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে এসেছো, সেগুলোর থলেগুলো আমার কাছে নিয়ে আসো এবং তারপর এখান

থেকে ফিরে যাও এ বছর হজ্জ করতে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করলাম’ ইউসুফ পাশা তার কাছে স্বর্ণভর্তি থলেগুলো সমর্পণ করে স্বদেশে ফিরে গেলেন।

“দামেশকীয় কাফেলাকে হজ্জ করতে বাঁধা দেয়ার খবর মুসলিম বিশ্বে মারাত্মক মর্মবেনা ও ক্ষোভের সঞ্চার করলো। মক্কাবাসী মুসলমানগণ কান্নাকাটি ও আহাজারি করতে লাগলেন; কেননা, তাঁরা ভেবেছিলেন যে তাঁদেরকেও আরাফাতে যেতে নিষেধ করা হবে। কিন্তু পরের দিন তাঁদেরকে অনুমতি দেয়া হলো; তবে তাঁদেরকে মাহফা (উটের পিঠে লম্বালম্বিভাবে স্থাপিত ফ্রেইম যার উভয় প্রান্তভাগে একটি করে বসার সিট আছে) অথবা উঠের বাহনে করে সেখানে যেতে নিষেধ করা হলো। মক্কা মুয়াজ্জামার কাযীর পরিবর্তে জনৈক ওহাবী যিনদিক আরাফাত ময়দানে খুতবা পাঠ করলো। হজ্জের প্রয়োজনীয় আমলগুলো সম্পাদন করে তাঁরা সবাই মক্কায় ফিরে এলেন।

”মক্কা আগমনের সাথে সাথেই সউদ মক্কার কাযী খতীবযাদা মুহাম্মদ আফেন্দীকে তাঁর পদ হতে অপসারণ করে আবদুর রহমান নামের জনৈক ওহাবী যিনদিককে সেই পদে নিয়োগ করে। আবদুর রহমান পূর্ববর্তী কাযী খতীবযাদা মুহাম্মদ আফেন্দী ও মদীনার মোল্লা (প্রধান বিচারক) সু'য়াদা আফেন্দী এবং মক্কা মুয়াজ্জামার নকিব (মক্কার শরীফগণের প্রতিনিধি) আতায়ী আফেন্দীকে তলব করে মাটিতে বসিয়ে রাখলো। অতঃপর সে তাঁদেরকে সউদের আনুগত্য স্বীকার করতে বললো। এ সকল আলেম কর জোড় করে ওহাবী বিশ্বাস অনুযায়ী ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু’ এই বাক্যটি উচ্চারণ করে পুনরায় মাটিতে বসে পড়লেন। এতে সউদ হেসে উঠলো। এরপর সে বললো, ‘আমি তোমাদেরকে এবং দামেশকীয় কাফেলাকে সালেহ্ ইবনে সালেহর রক্ষনাবেক্ষণে সোপন্দ করলাম। সালেহ্ আমার উত্তম লোকদের মধ্যে একজন। আমি তাকে বিশ্বাস করি। আমি তোমাদেরকে এ শর্তে দামেশকে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছি যে তোমরা প্রতি মাহফাতে এবং মাল বোঝাইকৃত উটে তিন'শ কুরুশ, আর প্রতি গাধায় এক'শ কুরুশ আমাকে দেবে। এতো কম মূল্যে তোমরা যে দামেশকে যেতে পারছো, এটাই তোমাদের ওপর বড় এহসান (অনুগ্রহ)। আমার নিরাপত্তায় তোমরা আরাম-আয়েশে থাকতে পারবে। সকল হাজীকেই এ শর্তে ভ্রমণ করতে হবে। আর এটা আমার একটা ন্যায়বিচারও বটে। আমি বাদশাহ-এ-আল-এ-উসমান হযরত সুলতান সালিম খান ৩য়-কে একটি চিঠি লিখেছি। আমি লিখেছি যে কবরের ওপর গম্বুজ নির্মাণ, বেসালপ্রাপ্ত বুযূর্গানে দ্বীনের প্রতি নযর-মানত এবং তাঁদের মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ করা হোক।’

“ওহাবীরা চার বছর মক্কায় অবস্থান করেছিলো। মিসরের গর্ভনর মুহাম্মদ আলী পাশা ১২২৭ হিজরী সালে জেদ্দা আসেন। তিনি জেদ্দা ও মদীনা হতে যে মিসরীয় বাহিনী প্রেরণ করেন, তাঁরা একটি রক্তাক্ত যুদ্ধের পরে ওহাবীদেরকে মক্কা শরীফ হতে বিতাড়িত করেন।” [আল্লামা আইয়ূব সাবরী পাশা কৃত 'মিরাতুল হারামাইন' গ্রন্থের দীর্ঘ উদ্ধৃতি এখানে শেষ হলো]

৪০/ ইতিপূর্বে ইসলামের ৭৫তম খলিফা ও ১০ম উসমানীয় সুলতান সুলাইমান খান-১ পবিত্র মদীনা নগরীর দেয়ালগুলোকে সংরক্ষণ করেছিলেন; দুই'শ চুয়াত্তর বছর যাবত এর শক্ত দেয়ালগুলোর জোরেই নগরীটি দস্যুদের আক্রমণ হতে মুক্ত ছিল এবং মুসলমানগণ আরাম-আয়েশে ও শান্তিতে বসবাস করছিলেন ঠিক ১২২২ হিজরী সালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত; এরপরই তাঁরা ওহাবীদের শয়তানী ছোবলে আক্রান্ত হন।ওহাবী লুটেরাদের সর্দার সউদ নামের দুর্বৃত্ত মক্কা ও তার আশপাশের পল্লীগুলো কবজা করার পর গ্রামাঞ্চল হতে সংগৃহীত লুটেরা বাহিনীকে মদীনা মনোয়ারায় প্রেরণ করে। সে বদঈ ও নাদী নামের দুই ওহাবী ভ্রাতাকে লুটেরা বাহিনীর নেতৃত্বে বসিয়ে দেয়। তারা মদীনার পথে যাওয়ার সময় বহু গ্রাম লুট করে এবং বহু মুসলমানকে হত্যা করে। আর মদীনার আশপাশে অবস্থিত পল্লীগুলোকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়া হয়। আহলে সুন্নাতের উলামাবৃন্দ কর্তৃক প্রদর্শিত সঠিক পথের ওপর বিচরণকারী মুসলমানদের মালামাল লুট করা হয় এবং তাঁদেরকে হত্যা করা হয়। এতোগুলো গ্রাম পোড়ানো হয়েছিল এবং এতোজন মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছিল যে এর সঠিক হিসেব প্রদান করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। মৃত্যু, অত্যাচার ও লুটপাটের ভয়ে মদীনার পার্শ্ববর্তী পল্লীগুলোর মুসলমানরা মহাভ্রান্ত ওহাবী মতবাদকে স্বীকার করে নেয়। তারা সউদের দাসে পরিণত হয়। ওহাবীবাদের গুণকীর্তন-সম্বলিত সউদের লিখিত একটি পত্র ওহাবী সর্দার বদঈ হিংস্র ওহাবী সালেহ্ ইবনে সালেহর মারফত মদীনায় প্রেরণ করে। মদীনায় মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে সউদ লিখেছিল:“শেষ বিচার দিবসের মালিকের নামে আমি লিখছি। মদীনার উলামা, আমীর-অমাত্য ও ব্যবসায়ীদের অবগতির জন্যে জানাচ্ছি যে পৃথিবীর মধ্যে শান্তি ও সুখ শুধু তাদের জন্যেই আছে, যারা হেদায়াত অর্জন করেছে। ওহে মদীনাবাসী আমি তোমাদেরকে প্রকৃত দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ .

'আল্লাহর কাছে ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম।

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

যারা ইসলাম ভিন্ন অন্য ধর্ম গ্রহণ করে, তাদের ধর্ম কবুল হবে না। বরং তারা শেষ বিচার দিবসে ক্ষতিগ্রস্ত হবে'।[১]

তোমাদের প্রতি আমার অনুভূতি সম্পর্কে তোমাদেরকে আমি জানাতে চাই। আমি মদীনাবাসীদের প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বাস রাখি। আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র নগরীতে এসে তোমাদের সাথে বসবাস করতে চাই। তোমরা যদি আমার আদেশ মান্য করো, তবে আমি তোমাদেরকে কষ্ট দেবো না। আমি মক্কায় প্রবেশ করার পর থেকে মক্কাবাসীরা আমার দয়া ও সুদৃষ্টি ভোগ করে আসছে। আমি তোমাদের দ্বীনকে নবায়ন করতে চাই এবং তোমাদেরকে পুনরায় মুসলমান বানাতে চাই। তোমরা যদি ওহাবী মতবাদকে গ্রহণ করে নাও, তাহলে তোমরা মৃত্যু, লুটপাট ও নিপীড়ন থেকে নিরাপদ থাকবে। আল্লাহ তোমাদেরকে রক্ষা করবেন এবং আমি তোমাদের রক্ষাকারী হবো। আমি এ পত্রটি আমার বিশ্বস্ত সালেহ ইবনে সালেহ্ মারফত পাঠাচ্ছি। এটা সাবধানে পাঠ করবে এবং তাকে তোমাদের সিদ্ধান্ত জানাবে। সে যা বলবে তা আমারই বক্তব্য।"

এ পত্রটি মদীনাবাসীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলে। তাঁরা মাত্র কয়েক দিন আগে তায়েফীয় নারী ও শিশুদের প্রতি পরিচালিত নিপীড়ন ও নিধনযজ্ঞ সম্পর্কে ইতিপূর্বে জেনেছিলেন এবং তাই তাঁরা শংকিত ছিলেন। তাঁরা সউদ ইবনে আব্দুল আযীযের পত্রের প্রতি 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' কোনোটা-ই বলতে পারলেন না। তাঁরা তাঁদের জীবন কিংবা দ্বীনের কোনোটা-ই সমর্পণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

পত্রের কোনো জবাব না পেয়ে ওহাবী দুর্বৃত্তদের সর্দার বিশ্বাসঘাতক বদঈ ইয়ানবু বন্দর আক্রমণ করে। ইয়ানবু দখল করার পর সে মদীনা অবরোধ করে এবং দেয়ালের আনবারিয়্যা ফটকের ওপর প্রচন্ড আঘাত হানে। ঠিক সেই দিনই দামেশকীয় হাজীগণ তাঁদের নেতা আবদুল্লাহ পাশাসহ আগমন করেন। নগরীটিকে অবরুদ্ধ দেখতে পেয়ে হাজীগণ এবং তাঁদের সাথে আগত সৈন্যগণ ওহাবী

[১]. আল কুর'আন : আলে ইম্‌রান ৩/৮৪।

দস্যুদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। অতঃপর একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর প্রায় দুই'শ ওহাবী বদমায়েশ নিহত হয়; বাকিরা পালিয়ে যায়।

আবদুল্লাহ পাশা হজ্জকার্য সমাপন করা পর্যন্ত মুসলমানগণ মদীনায় সুখে, শান্তিতে ছিলেন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক খোদাদ্রোহী বদঈ দামেশকীয় হাজীদের প্রস্থানের পর আবারও পবিত্র নগরী অবরোধ করে। সে কুবা, আওয়ালী ও কুরবান দখল করে নেয় এবং দখলীকৃত এলাকার মধ্যে দুইটি কেল্লা নির্মাণ করে। সে নগরী অভিমুখী রাস্তাগুলোতে ব্যারিকেড দেয় এবং 'আল আইনুয যারকা' নামের খালগুলো ধ্বংস করে দেয়। ফলে মুসলমানগণ খাদ্য ও পানির তীব্র অভাবে পড়েন।

## একটি মু'জেযা

ওহাবীদের দ্বারা 'আল আইনুয যারকা' ধ্বংসপ্রাপ্ত ও নগরীর পানি সরবরাহ নিঃশেষিত হওয়ার পর মসজিদুন্ নববীর মধ্যে অবস্থিত 'বাগচার-উর-রসূল'-এর কূপের পানি অলৌকিকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং এর নোনা স্বাদ ও কাঠিন্য দূর হয়ে যায়। এতে মুসলমানগণ পিপাসার্ত হওয়া থেকে পরিত্রাণ পান। ইতিপূর্বে এ কূপটি ওর নোনা স্বাদের জন্যে খ্যাত ছিল।অবরোধটি মাসের পর মাস ধরে চলে। মুসলমানগণ কষ্ট সহ্য করতে লাগলেন এ আশায় যে দামেশকীয় হাজীগণ আগমন করবেন এবং তাঁদেরকে রক্ষা করবেন। অবশেষে হাজীগণ আগমণ করেন বটে, কিন্তু কাফেলাটির প্রধান ইব্রাহীম পাশা বলেন, 'ওহাবীদের কাছে নগরীটি সমর্পণ করো', কেননা তিনি ওহাবীদের সাথে লড়াই করার মতো পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র তখন সঙ্গে করে নিয়ে আসেন নি। মুসলমানগণ ধারণা করেছিলেন যে ইব্রাহীম পাশা বদঈ-র সাথে আলোচনা করে এমন কোনো প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যার বলে মুসলমানদের প্রতি আর নিপীড়ন ও আঘাত করা হবে না। তাঁরা চারজন প্রতিনিধি, যথা- মুহাম্মদ তাইয়্যার, হাসান সাউশ, আবদুল কাদের ইলিয়াস ও আলীর মাধ্যমে নিম্নোক্ত চিঠিটি সউদের কাছে প্রেরণ করেন:

"আমরা (মদীনাবাসীগণ) আপনার প্রতি সালাম জানাই এবং আপনার প্রতি যথাবিহিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপণ করি। আল্লাহ তা'আলার আদেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আপনার কর্মকান্ডসমূহে তিনি আপনাকে সাফল্য দান করুন। ওহে শায়খ সৌদ দামেশকীয় হাজীদের আমির ইব্রাহীম পাশা মদীনা আগমন করে দেখতে পান যে নগরীটি অবরুদ্ধ এবং বদঈ এর রাস্তাসমূহে ব্যারিকেড দিয়েছে, আর পানির সরবারাহ বন্ধ করে দিয়েছে। তিনি এর কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন যে এটা আপনার-ই একটা আদেশ। আমরা যেহেতু আশা করি যে আপনি মদীনাবাসীদের প্রতি কোনো রকম অসৎ ধারণা পোষণ করেন না, সেহেতু আমরা

বিবেচনা করেছি যে এ সকল অপ্রীতিকর ও খারাপ ঘটনা সম্পর্কে আপনি কিছু-ই জানেন না। আমরা, মদীনার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সমবেত হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমাদের প্রতি সংঘটিত এ ঘটনাবলী সম্পর্কে আমরা আপনাকে অবহিত করবো। আমরা আমাদের মধ্য থেকে চারজন সেরা ও খাঁটি ব্যক্তিকে আমাদের প্রতিনিধিস্বরূপ নির্বাচন করে আপনার দরবারে প্রেরণ করেছি। আমরা আল্লাহতা'আলার কাছে প্রার্থনা করি যেন তাঁরা ফিরে এসে আমাদেরকে শুভ-সংবাদ প্রদান করেন, যাতে করে আমরা খুশি হতে পারি।"

এ পত্রটি পাঠ করার পর সৌদ প্রতিনিধিদের সাথে চরম দুর্ব্যবহার করে এবং এ কথা বলতে লজ্জিত হয় না যে সে মদীনাবাসীদের প্রতি ক্ষিপ্ত ও অসন্তুষ্ট। প্রতিনিধিবর্গ ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে এক পর্যায়ে সৌদের অপবিত্র পায়ে নিজেদেরকে সমর্পণ করেন, কিন্তু সে বলে, "আমি সিদ্ধান্ত টানছি যে তোমরা আমার আদেশ অমান্য করবে এবং আমার সত্য ধর্মকে গ্রহণ করবে না, আর তোমরা আমাকে নরম কথা বলে ধোকা দিতে চেষ্টা করছো। কেননা, তোমরা ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও বিপদের আবর্তে পড়েছো। তাই তেমরা এ সংকট দূর করার জন্যেই কেবল আমার দ্বারস্থ হয়েছো। এখন আর কোনো পথ নেই আমার যা ইচ্ছা তা করা ছাড়া। তোমরা যদি আমার আদেশ মান্য করার বাহানা করে ভিন্ন উদ্দেশ্যপূর্ণ কথা বলো কিংবা কাজ করো, তাহলে তায়েফবাসীদেরকে যেভাবে নিশ্চিহ্ন করেছি, সেভাবে তোমাদেরও নিশ্চিহ্ন করে দেবো এবং আর্তনাদ করতে বাধ্য করবো।" সে মুসলমানদেরকে ওহাবীবাদ গ্রহণ করতে বাধ্য করে।

সউদ কর্তৃক মদীনার প্রতিনিধিদের ওপর চাপিয়ে দেয়া মহাভ্রান্ত ও গোমরাহ্ শর্তাবলী বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে 'তারিখ-এ-ওয়াহাবীয়িন' গ্রন্থে।

প্রতিনিধিগণ সৌদের আজ্ঞাসমূহ ভয়-ভীতির মুখে স্বীকার করে মদীনা শরীফ প্রত্যাবর্তন করেন। মদীনাবাসীগণ এ সব ঘটনায় হতভম্ব হয়ে অবশেষে অনিচ্ছাকৃতভাবে তা স্বীকার করে নেন, যেমনিভাবে সাগরে নিমজ্জিত ব্যক্তি শেষ সম্বল হিসেবে সামুদ্রিক সরীসৃপের দিকে হাত বাড়ায়। সন্ধির সপ্তম শর্ত অনুযায়ী তাঁরা মদীনার দুর্গটিকে বদঈ-এর সত্তর জন গুন্ডার হাতে সমর্পণ করেন। সন্ধির মধ্যে একটি শর্ত ছিল এই যে, মদীনার মাযার-রওযা ধ্বংস করতে হবে। ওহাবীদের দ্বারা নিপীড়িত না হওয়ার জন্যে তাঁরা অনিচ্ছাকৃতভাবে এ শর্তটিও পূরণ করতে বাধ্য হন। যদিও তাঁরা এটা অনিচ্ছাসহ করেন, তবুও তাঁদের এ কাজটি ভীষণ অশুভ পরিণতির দ্বার উম্মোচিত করেছিলো।

ইস্তাম্বুলের সাহায্য চেয়ে লিখিত পত্রগুলোর কোনো প্রত্যুত্তর না আসায় মদীনাবাসীগণ তিনটি বছর ওহাবীদের অত্যাচারের মধ্যে অতিবাহিত করেন। অতঃপর যখন তাঁরা ইস্তাম্বুল হতে সাহায্যপ্রাপ্তির আশা ছেড়ে দেন, তখন তাঁরা ক্ষমা প্রার্থনা করে দারিয়্যায় সৌদের কাছে একটি পত্র লিখে দুইজন মদীনাবাসী যথাক্রমে হুসাইন শাকির ও মুহাম্মদ সাগায়ীর মারফত প্রেরণ করেন। কিন্তু সৌদ প্রতিনিধিগণের সাথে সাক্ষাৎ করে নি। কেননা সে শুনেছিল যে মদীনাবাসীগণ ইতিপূর্বে ইস্তাম্বুলের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। সে মদীনাবাসীদের প্রতি জুলুম-অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে ওহাবীদের একটি বিশাল গড্ডালিকা প্রবাহসহ মদীনা অভিমুখে যাত্রা করে।

আরবের মরুভূমি অঞ্চলের সকল জংলী লোক বদমায়েশ সৌদকে নজদের রাজা হিসেবে স্বীকার করতো। সৌদও বিভিন্ন স্থানে লিখিত তার পত্রসমূহে 'আল ইমামুদ্ দারিয়্যাত আল মাজদিয়্যা ওয়াল আহকামিদ্ দা'ওয়াতিন নাজদিয়্যা" খেতাবে নিজের নাম সই করতো।

বদমায়েশ সৌদ মাযার-রওযার সকল খাদেমদারকে মাযার ধ্বংস করার আদেশ দেয়। যদিও মদীনাবাসীগণ তিন বছর আগে কৃত সন্ধির ৩য় শর্তানুযায়ী বহু মহান মাযার ধ্বংস করেছিলেন, তবুও তাঁরা এমন কতোগুলো মাযারকে স্পর্শ করতে সাহস করেন নি, যেগুলোকে তাঁরা অত্যন্ত মহান ও মহাপবিত্র জ্ঞান করতেন।

খাদেমগণ কাঁদতে কাঁদতে মাযার-রওযা ধ্বংস করেন। হযরত আমীর হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর মাযারের খাদেম সাহেব বলেন যে তিনি খুব বয়সের ভারে ঋজু এবং কোনো কাজ করতে অক্ষম। অতঃপর সৌদ তার এক দাসকে ওই মাযার ধ্বংস করার নির্দেশ নির্দেশ দেয়। ওই মোনাফেক ওহাবী মাযার ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে গুম্বজের ওপর ওঠার পর সেখান থেকে ধপাস করে পড়ে জাহান্নামবাসী হয়। ফলে পাপাত্মা সৌদ হযরত আমীর হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর মাযারের দরজার ভাঙ্গার পরপরই এ বদ পরিকল্পনা ত্যাগ করে। মাযারগুলো ধ্বংস করার নিষ্ঠুর আদেশ ব্যক্তিগতভাবে তদারকি করার পর সৌদ 'মানাহা' প্রাসাদে নির্মিত মঞ্চের ওপর উঠে এক ভাষণে বলে:

"মদীনাবাসী ওহাবীবাদকে স্বীকার করতে নারাজ, কিন্তু অত্যাচারের ভয়ে ওহাবী হবার ভান করছেন; অতএব তাঁরা মুনাফেক এবং আগের মতোই মুশরিকও।" সে আরো বলে যে যারা দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁদের উচিৎ এসে আনুগত্য স্বীকার করা। যাঁরা আসবেন না তাঁদেরকে তায়েফের অনুরূপ "ওহাবী বিচার"-এর মুখোমুখি হতে হবে।

দুর্গের দরজাগুলো যখন বন্ধ করে রাস্তায় রাস্তায় ওহাবীরা ঘোষণা করে যে সকল মদিনাবাসীকে 'মানাহা' প্রাসাদে সমবেত হতে হবে, তখন সবাই আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাঁরা ধারণা করেন যে তায়েফীয়দের মতো তাঁদেরকেও বুঝি নিপীড়ন করে হত্যা করা হবে। তাঁরা নিজ নিজ স্ত্রীর কাছে এবং নিজেদের মধ্যেও ক্ষমা চেয়ে নেন, আর সন্তানদের আদর করে বিদায় নেন। অতঃপর সকল পুরুষ ও নারী দুইটি পৃথক দলে সমবেত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মোবারক রওযার উজ্জ্বল গুম্বজের দিকে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকেন। পবিত্র নগরী মদীনা আর কখনোই এ রকম বিষাদময় দিনের অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে সঞ্চয় করেনি। সৌদ তখন মুসলমানদের প্রতি একটি অন্ধ আক্রোশে উম্মত্ত-প্রায়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তোফায়েলে মদীনা মনোয়ারাকে রক্তে রঞ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করেন। আদবের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ অশোভণ ও হীন বাক্য দ্বারা মুসলমানদের গালমন্দ করার পর সৌদ ওহাবী দুর্বৃত্তদেরকে মদীনা দুর্গে অবস্থান গ্রহণ করতে আদেশ করে। সে তার বিশ্বস্ত একজন ওহাবী দুবৃর্ত্ত হাসান সাউশকে মদীনার গভর্ণর নিয়োগ করে দারিয়্যায় প্রত্যাবর্তন করে। হজ্জের মৌসুমে সে মক্কায় হজ্জশেষে আবারো মদীনায় আগমন করে। মদীনা হতে যখন দামেশকীয় কাফেলাটি হজ্জশেষে দুই-তিন দিনের পথ অতিক্রম করে দূরে চলে যাচ্ছিল, তখনই বদমায়েশ সৌদ তার আখড়া থেকে বেরিয়ে এসে মদীনার বিচার ভবনের সামনে উপস্থিত হয়। মূল্যবান উপহারসামগ্রী, ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন শিল্পকর্ম, মহামূল্যবান স্বর্ণ ও হীরক-খচিত শিল্প সামগ্রী এবং কুরআন ও মহামূল্যবান দ্বীনী কিতাবের মনোনীত কপিসমূহ, যা গত এক সহস্র বছরের অধিক সময় ধরে মুসলমান সুলতানবৃন্দ, সেনাপতিবর্গ, শিল্পীবৃন্দ এবং উলামায়ে কেরাম পছন্দ করে প্রেরণ করেছিলেন এবং যা রওযায়ে আকদস ও মসজিদে নববীর কোষাগারে সংরক্ষণ করা হয়েছিল, তা লুটপাট করার জন্যে সৌদ তার লুটেরা বাহিনীকে লেলিয়ে দেয়। এই বর্বরতা নিজ চক্ষে দেখার সময় তার ময়লা, পাষাণ হৃদয় একটুও কাঁপে নি। মুসলমানদের প্রতি তার এ বিদ্বেষের আগুন এরপরও নির্বাপিত হয় নি, বরং সে সাহাবীগণ ও শহীদগণের অবশিষ্ট মাযারগুলোও ধ্বংস করে দেয়। যদিও সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মোবারক রওযার গুম্বজটিও ধ্বংস করতে চেয়েছিল, তবুও মুসলমানদের কান্নাকাটি ও অনুরোধ তাকে এ কাজ থেকে নিবৃত্ত করে। তথাপি সে 'শাবাকাতুস সায়াদা' (কল্যাণময় জানালা) ধ্বংস করে ফেলে, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ দেয়ালগুলো সে স্পর্শ করতে পারে নি। সে মদীনার আশপাশের দেয়ালগুলো মেরামত করার আদেশ দেয়। অতঃপর সে মদীনাবাসীকে

মসজিদে নববীর মধ্যে সমবেত করে এবং মসজিদের দরজাগুলো বন্ধ করে মঞ্চের ওপর উঠে নিম্নের ভাষণটি প্রদান করে:

“ওহে মানব সকল, আমি তোমাদেরকে এখানে সমবেত করেছি এই মর্মে উপদেশ দিতে ও সতর্ক করতে যে, তোমাদেরকে আমার আজ্ঞাসমূহ মান্য করতে হবে। ওহে মদীনাবাসী তোমাদের দ্বীন এখন পূর্ণ হয়েছে। তোমরা মুসলমান হয়েছো। তোমরা আল্লাহকে রাজি করেছো। তোমাদের বাপ-দাদাদের ভ্রান্ত-পথভ্রষ্ট দ্বীনকে আর কখনোই সম্মান করো না। তাদের প্রতি দয়া করার জন্যে কখনোই আল্লাহর কাছে দোয়া করবে না। তারা সবাই মুশরিক হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। তারা মুশরিক-ই ছিল (আজীবন)। আমি আমাদের ধর্মীয় পদে সমাসীন ব্যক্তিবর্গের কাছে প্রদত্ত বইপত্রে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছি কীভাবে তোমরা আল্লাহতা’আলার এবাদত-বন্দেগী করবে। তোমরা যদি আমার মোল্লাদের কথা না মান্য করো, তবে তোমাদের জানা উচিৎ যে তোমাদের সম্পত্তি ও মালামাল, স্ত্রী-সন্তান ও রক্ত আমার সৈন্যদের জন্যে মোবাহ (বৈধ) বিবেচিত হবে। তারা তোমাদেরকে শেকলাবদ্ধ করে নিপীড়ন করে সবাইকে হত্যা করবে। ওহাবী মতবাদ অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা মোবারকের সামনে শ্রদ্ধা সহকারে ও সালাত-সালাম জানানোর উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো নিষিদ্ধ যা তোমাদের পূর্বপুরুষেরা করতো। রওযার সামনে তোমরা দাঁড়াতেই পারবে না, বরং হেঁটে চলে যাবে এবং রওযা অতিক্রম করার সময় শুধু বলবে, ’আস্ সালামু আলা মুহাম্মদ।’ আমাদের ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাবের এজতেহাদ অনুসারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি এতোটুকু তা’যিম তথা শ্রদ্ধা-ই যথেষ্ট।”

বদমায়েশ সৌদ অনুরূপ আরো অশোভনীয় বাক্য ও কুৎসা এবং গালিগালাজ যা আমরা তাহযিবের খেলাফ হওয়ার কারণে উদ্ধৃত করলাম না, তা ব্যক্ত করার পর মসজিদ-এ-নববীর দরজাগুলো খুলে দেয়। সে তার পুত্র আব্দুল্লাহকে মদীনার গভর্নর নিয়োগ করে দারিয়ায় ফিরে যায়। অতঃপর এহেন কোনো অনিষ্ট আর অবশিষ্ট ছিল না যা আবদুল্লাহ ইবনে সৌদ মদীনাবাসী মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেয় নি।

৪১/ সেই দিনগুলোতে ওসমানীয় তুর্কী সাম্রাজ্য পররাষ্ট্র বিষয়াদি নিয়েই ব্যতিব্যস্ত ছিল এবং ফ্রি-ম্যাসনদের জ্বালিয়ে দেয়া বিদ্রোহের দাবানলকে নির্বাপিত করার প্রাণপণ চেষ্টায় ছিল রত। ১২২৬ হিজরী সালে যখন মুসলমানদের ওপর ওহাবীদের অত্যাচার ও নিপীড়ন এবং ইসলামের প্রতি তাদের কুৎসা রটনা

অসহনীয় পর্যায়ে উপনীত হয়, তখন খলিফাতুল মুসলিমীন সুলতান মাহমুদ খান-২ মিসরের গভর্ণর মুহাম্মদ আলী পাশার কাছে ওহাবীদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্যে একটি আদেশপত্র প্রেরণ করেন। রমযান মাসে মুহাম্মদ আলী পাশা তাঁর পুত্র তুসন পাশার নেতৃত্বে মিসর হতে একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। তুসন পাশা ওহাবীদের হাত থেকে ইয়ানবু শহর (মদীনার নিকটস্থ সমুদ্র বন্দর) পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু ১২২৬ হিজরীর জিলহজ্জ মাসের প্রথম দিনগুলোতেই তিনি মদীনার পথে যাওয়ার সময় সাফরা উপত্যকা ও জুদাইদা পাশের মধ্যবর্তী স্থানে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে পরাজিত হন। যদিও তুসন পাশার কোনো আঘাত লাগে নি, তবুও অধিকাংশ উসমানীয় মুসলমান সৈন্য সে যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। মুহাম্মদ আলী পাশা এ ভাগ্য বিপর্যয়ে অত্যন্ত সন্তাপগ্রস্ত হন এবং নিজেই একটি বিশাল তুর্কী বাহিনী নিয়ে ১৮টি কামান, তিনটি বড় আকৃতির মর্টার ও আরো বহু অস্ত্রশস্ত্রসহ রওয়ানা হন। ১২২৭ হিজরীর শাবান মাসে তাঁরা সাফরা উপত্যকা ও জুদাইদা পাস অতিক্রম করেন। রমযান মাসে তাঁরা বিনা যুদ্ধেই বহু পল্লী দখল করে নেন। শরীফ গালিব আফেন্দীর দেয়া পরামর্শ অনুযায়ী মুহাম্মদ আলী পাশা ১,১৮,০০০ রিয়াল গ্রামগুলোতে বন্টন করে বুদ্ধিমত্তার সাথে এই সাফল্য অর্জন করেন। গ্রামগুলো সহজেই অর্থের কাছে নতি স্বীকার করে। যদি তুসন পাশা নিজ পিতার মতো শরীফ গালিব আফেন্দীর সাথে পরামর্শ করে নিতেন, তাহলে তিনি তাঁর এতো বড় সৈন্যবাহিনীকে হারাতেন না। শরীফ গালিব আফেন্দী ওহাবীদের নিয়োগকৃত মক্কার আমীর থাকলেও তিনি সর্বান্তকরণে হিংস্র ওহাবী দস্যুদের হাত থেকে মক্কাকে মুক্ত করতে চাইছিলেন। যিলকদ মাসের শেষভাগে বিনা রক্তপাতে মুহাম্মদ আলী পাশা মদীনা শরীফও ওহাবীদের দখল হতে মুক্ত করেন। এ সকল বিজয়ের খবর মিসর পর্যন্ত পৌঁছানো হয় খলিফার কাছে প্রেরণের উদ্দেশ্যে। মিসরীয় জনগণ তিন দিন ও তিন রাত যাবত এর ফলে বিজয়োৎসব করেন এবং সকল মুসলমান রাষ্টে এ খোশ-খবরী জানানো হয়। মুহাম্মদ আলী পাশা জেদ্দা হয়ে মক্কায় এক ডিভিশন সৈন্য প্রেরণ করেন। ১২২৮ হিজরীর মুহাররম মাসের প্রথম ভাগে ডিভিশনটি জেদ্দায় আগমন করে এবং মক্কা অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। তাঁরা শরীফ গালিব আফেন্দীর প্রণীত গোপন পরিকল্পনা-মাফিক সহজেই মক্কায় প্রবেশে করতে সক্ষম হন। ওহাবীদের নেতাসহ ওহাবী সৈন্যরা যখনই জানতে পেরেছিল যে ওসমানীয় ডিভিশনটি মক্কার সন্নিকটবর্তী হয়েছে, তখনই তারা শহর ছেড়ে পাহাড়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

ওহাবীদের বদমায়েশ নেতা সউদ ইবনে আব্দুল আযীয হজ্জ ও মুসলমান রক্তে রঞ্জিত তায়েফ নগরীতে একটি সফরশেষে তার শয়তানীর আখড়া দারিয়্যায়

১২২৭ হিজরী সালেই প্রত্যাবর্তন করেছিল। সে যখন দারিয়্যায় প্রত্যাবর্তন করে, তখনই সে উসমানীয়দের দ্বারা পবিত্র নগরী মদীনা এবং পরবর্তী পর্যায়ে মক্কা পুনরুদ্ধারের খবর জানতে পেরে বিস্মিত হয়। ঠিক সেই সময়ই উসমানীয় সৈন্যগণ তায়েফ আক্রমণ করেন, কিন্তু কোনো বাধা তারা পান নি। কেননা, তায়েফের শয়তান উসমান আল মুদায়িকী ও তার সৈন্যবাহিনী ভয়ে পালিয়েছিল। এই খোশ-খবরী ইস্তাম্বুলে খলিফাতুল মুসলিমীনের কাছে পৌঁছানো হয়। সুলতান মাহমুদ অত্যন্ত খুশি মনে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আল্লাহতা'আলার এ রহমতের জন্যে শোকরিয়া আদায় করেন। তিনি মুহাম্মদ আলী পাশাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপণ ও তাঁর কাছে উপহার-সামগ্রী প্রেরণ করেন এবং তাঁকে আদেশ করেন পুনরায় হেজায-এ গিয়ে দেখাশোনা করতে; আর ওহাবী দস্যুদেরকেও নিয়ন্ত্রণে রাখতে।

সুলতান মাহমুদ খান ২-এর আদেশ অনুযায়ী মুহাম্মদ আলী পাশা আবার মিসর হতে রওয়ানা হন। সেই সময় শরীফ গালিব আফেন্দী উসমানীয় সৈন্যবাহিনীসহ উসমান আল মুদায়িকীর খোঁজে তায়েফে অবস্থান করছিলেন। একটি সুসমন্বিত তল্লাশীর পর উসমান আল মুদায়িকীকে আটক করা হয় এবং তাকে প্রথমে মিসরে, তারপর ইস্তাম্বুলে প্রেরণ করা হয়। মক্কা আগমনের পরে মুহাম্মদ আলী পাশা শরীফ গালিব আফেন্দীকেও ইস্তাম্বুলে পাঠিয়ে দেন এবং তাঁর ভ্রাতা ইয়াহইয়া ইবনে মাসউদ আফেন্দীকে মক্কার আমীর নিয়োগ করেন। মুবারক ইবনে মাগইয়ান নামের আরেক ওহাবী বদমায়েশকেও বন্দী করে ১২২৯ হিজরীর মুহররম মাসে ইস্তাম্বুলে নেয়া হয়। শত-সহস্র মুসলমানের হত্যাকারী এ দুই ওহাবী গুন্ডার যথোচিৎ শাস্তি তাদের প্রদান করা হয়; এর আগে তাদেরকে খুনী হিসেবে পরিচয় দানের জন্যে ইস্তাম্বুলের রাস্তায় রাস্তায় হাঁটানো হয়েছিল। শরীফ গালিব আফেন্দীকে ইস্তাম্বুলে এক উষ্ণ ও অন্তরঙ্গ অভ্যর্থনা দেয়া হয়। অতঃপর তাঁকে সালোনিকায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি অবসর জীবন যাপন করতে করতে অবশেষে ১২৩১ হিজরী সালে ইন্তেকাল করেন। সালোনিকায় তাঁর কবর সকল যিয়ারতকারীর জন্যে বর্তমানে খোলা আছে।

হেজাযের পবিত্র নগরীগুলো হতে ওহাবীদেরকে বিতাড়নের পরে সৈন্যবাহিনীর একটি ডিভিশনকে দূরবর্তী ইয়ামেন পর্যন্ত বিভিন্ন স্থান ওহাবীমুক্ত করার জন্যে প্রেরণ করা হয়। মুহাম্মদ আলী পাশা এ ডিভিশনটিকে সাহায্য করার জন্যে স্বয়ং সৈন্যবাহিনীসহ তথায় যান এবং সমগ্র এলাকাটিকে শত্রুমুক্ত করেন। তিনি এরপর মক্কা প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানে ১২৩০ হিজরীর রজব মাস পর্যন্ত অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি তাঁর পুত্র হাসান পাশাকে মক্কার গভর্ণর নিয়োগ করে মিসরে ফিরে যান। ওহাবী দস্যুদের নেতা হিসেবে নরঘাতকের মূল দায়িত্ব

পালনকারী সউদ ইবনে আব্দুল আযীয ১২৩১ হিজরী সালে মৃত্যুবরণ করে। তার পুত্র আবদুল্লাহ্ ইবনে সউদ তার স্থলাভিষিক্ত হয়। মুহাম্মদ আলী পাশা তাঁর পুত্র ইব্রাহিম পাশাকে এক ডিভিশন সৈন্যসহ আবদুল্লাহ ইবনে সৌদকে দমন করার জন্যে পাঠান। ইতিপূর্বে আবদুল্লাহ ইবনে সৌদ তুসন পাশার সাথে একটি চুক্তি করেছিল এই শর্তে যে সে উসমানীয়দের প্রতি অনুগত থাকবে, আর এ আনুগত্যের পরিবর্তে তাকে দারিয়্যায় গভর্নর হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হবে; কিন্তু মুহাম্মদ আলী পাশা এ চুক্তিটিকে স্বীকার করে নেন নি। অতঃপর ১২৩১ হিজরী সালের শেষভাগে ইব্রাহীম পাশা মিসর হতে রওয়ানা হন এবং ১২৩২ হিজরী সালের শুরুতেই দারিয়্যায় পৌঁছেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে সৌদ তার সকল সৈন্য-সামন্ত নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, কিন্তু কয়েকটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১২৩৩ হিজরী সালের জিলকদ মাসে (১৮১৮ খ্রীঃ) বন্দী হয়। বিজয়ের খোশ-খবরীকে মিসরের দুর্গ হতে এক'শটি তোপ-ধ্বনি দ্বারা স্বাগত জানানো হয় এবং সাত দিন সাত রাত মিসরে উৎসব চলে। সকল রাস্তা-ই ফ্ল্যাগ দ্বারা সাজানো হয়েছিল। আর মিনারার ওপর তাকবীর এবং মু'নাজাত ও পাঠ করা হয়েছিল।

মুহাম্মদ আলী পাশা আরবের পবিত্র নগরীগুলো হতে ওহাবী গোমরাহদের বিতাড়ন করাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। এই কারণে তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা চালান এবং স্বর্ণমুদ্রা খরচ করেন।আবদুল্লাহ্ ইবনে সৌদ ও তার হিংস্র ওহাবী লুটেরা বাহিনীকে আটক করে মিসরে নেয়া হয়। ১২৩৪ হিজরীর মুহাররম মাসে তাদেরকে কায়রোতে অসংখ্য মানুষের চোখের সামনে উপস্থিত করা হয়। মুহাম্মদ আলী পাশা আবদুল্লাহ ইবনে সৌদকে একটি দয়াপূর্ণ ও আনন্দঘন অভ্যর্থনা জানান। তাঁদের বাক্যালাপ নিম্নে উদ্ধৃত হলো:

পাশা বলেন: "আপনি অত্যন্ত কঠিন সংগ্রাম করেছেন।"ইবনে সৌদ উত্তর দেয়: "যুদ্ধ তাকদীর ও ভাগ্যের বিষয়।""আমার পুত্র ইব্রাহীম পাশাকে আপনার কেমন মনে হয়েছে?""তিনি অত্যন্ত সাহসী। তবে তাঁর সাহসের চেয়ে বুদ্ধি আরো বেশি। আমরাও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। কিন্তু আল্লাহ যা ডিক্রি করেছেন, তাই হয়েছে।""দুশ্চিন্তা করবেন না মুসলিমগণের খলিফার কাছে আমি একটি সুপারিশপত্র লিখবো।""যা তাকদীরে লেখা হয়েছে, তাই ঘটবে।""আপনি ওই কৌটাটি আপনার সাথে কেন বহন করেন?""ওর ভেতর বহু দামী জিনিসপত্র আছে, যা আমার পিতা হুজরাতুন নববী হতে নিয়েছিলেন। এগুলো আমি আমাদের মহামান্য সুলতানের কাছে উপহার হিসেবে পেশ করবো।"মুহাম্মদ আলী পাশা কৌটাটি খোলার আদেশ দেন। মহামূল্যবান মোড়কে আবৃত তিন কপি কুরআন শরীফ, তিন'শ ত্রিশটি বড় আকৃতির মুক্তা, একটি বড় আকারের পান্না ও স্বর্ণের

চেইনসমূহ যা হুজরাতুন নববী হতে চুরি করা হয়েছিল, তা দৃশ্যমান হয়। পাশা জিজ্ঞেস করেন, "খাযিনাতুন নববী" হতে চুরি করা মালামালের মধ্যে এগুলো তো সব নয়। আরো থাকার কথা, তাই নয় কি?"ইবনে সৌদ জবাবে বলে, "আপনি ঠিক বলেছেন, মাননীয় পাশা। কিন্তু আমার পিতার ধনভান্ডারে আমি এগুলোই পেয়েছি। হুজরাতুস সায়াদা লুটপাটকারীদের মধ্যে আমার পিতা-ই একমাত্র ব্যক্তি নন। আরবীয় গোত্র-পতিগণ, মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, শরীফ গালিব আফেন্দীও তাঁর শরীকদার ছিলেন। যে যা লুট করতে পেরেছে তা তারই হয়ে গিয়েছে।"মুহাম্মদ আলী পাশা বলেন, 'হ্যাঁ, তা সত্য আমরা শরীফ গালিব আফেন্দীর সাথেও অনেক জিনিস পেয়েছি এবং তা তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করেছি।" [আইয়ুব সাবরী পাশা তাঁর 'মিরাতুল হারামাইন' গ্রন্থে মন্তব্য করেন: "এটা বোঝা উচিৎ যে শরীফ গালিব আফেন্দী এ সব সামগ্রীকে ওহাবী লুটেরাদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যেই নিয়েছিলেন। মুহাম্মদ আলী পাশা 'হ্যাঁ, তা সত্য'- এ কথা বলেছিলেন এ কারণে নয় যে তিনি শরীফ গালিব আফেন্দীকে লুণ্ঠনকারী হিসেবে বিশ্বাস করতেন, বরং এ কারণে যে কৌটার মধ্যে এতো কম জিনিস থাকার হেতু হিসেবে ওই যুক্তিকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন।[১]

এই আলাপের পরে আবদুল্লাহ্ ইবনে সৌদকে তার সহযোগীদের সাথে ইস্তাম্বুলে পাঠানো হয়। শত-সহস্র মুসলমান হত্যার দায়ে অভিযুক্ত এ সকল হিংস্র ডাকাতকে তোপকাপি প্রাসাদের ফটকের সামনে ফাঁসি দেয়া হয়।অতঃপর ইব্রাহীম পাশা দারিয়্যা দুর্গ ধ্বংস করে দেন এবং ১২৩৫ হিজরী সালে মিসর প্রত্যাবর্তন করেন। অপর দিকে পথভ্রষ্ট ওহাবী মতবাদের প্রবর্তক ও সহস্র সহস্র মুসলমানের গোমরাহকারী মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাবের পুত্রকে মিশরে নিয়ে আসা হয় এবং কারারুদ্ধ করা হয়, যেখানে সে অবশেষে মৃত্যুবরণ করে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে সৌদের পরে একই বংশের তারকি ইবনে আব্দুল্লাহ ওহাবীদের নেতৃত্বভার গ্রহণ করে। তারকির বাবা আব্দুল্লাহ ছিল সউদ ইবনে আব্দুল আযীযের চাচা। পরবর্তী সময়ে মাশশারী ইবনে সউদ নামের একই বংশোদ্ভূত আরেক ওহাবী তারকি ইবনে আব্দুল্লাহকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করে। অতঃপর তারকির পুত্র ফয়সল মাশশারীকে হত্যা করে তার স্থলাভিষিক্ত হয়। যদিও সে মুহাম্মদ আলী পাশা কর্তৃক প্রেরিত সৈন্যদেরকে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করেছিল, তবুও সে মিরলিউয়ী (ব্রিগেডিয়ার জেনারেল) খুরশিদ পাশার হাতে ১২৫৭ হিজরী সালে আটক হয় এবং মিসরে প্রেরিত হয়, যেখানে তাকে কারারুদ্ধ করা হয়।

---

[১]. মির'আতুল হারামাইন।

এরপর সউদের পুত্র খালিদ বে যিনি ওই সময় পর্যন্ত মিসরে বসবাস করছিলেন, তাঁকে দারিয়্যার আমীর নিয়োগ করা হয় এবং জেদ্দায় প্রেরণ করা হয়। উসমানীয় আদব-কায়দায় শিক্ষাপ্রাপ্ত খালিদ বে ছিলেন আহলে সুন্নাতের আকিদায় বিশ্বাসী একজন ভদ্র-নম্র ব্যক্তি। অতঃপর তিনি মাত্র দেড় বছর আমীরের পদে বহাল থাকতে পেরেছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে সাইয়্যান উসমানীয় রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত হওয়ার ভান করে বহু পল্লী জবরদখল করে নেয়। সে দারিয়্যা আক্রমণ করে নিজেকে আমীর ঘোষণা করে। খালিদ বে মক্কায় আশ্রয় নেন। মিসরে কারারুদ্ধ শায়খ ফয়সল পালিয়ে গিয়ে জাবালুস সামর-এর আমীর ইবনে রশীদের সহযোগিতায় নজদে গমন করে এবং ইবনে সাইয়্যানকে হত্যা করে। তাকে উসমানীয় রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়ে দারিয়্যার আমীর পদে নিয়োগ করা হয়। সে ১২৮২ হিরজী সালে মৃত্যু অবধি তার কথা রক্ষা করে।

শায়খ ফয়সলের তিন জন পুত্র ছিল, যথা  আবদুল্লাহ, সউদ এবং মুহাম্মদ সাঈদ। জ্যেষ্ঠ আবদুল্লাহকে নজদের আমীর পদে নিয়োগ করা হয়। সউদ তার বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বাহরাইন দ্বীপের লোকজনকে সাথে নিয়ে। আবদুল্লাহ তার ভ্রাতা মুহাম্মদ সাঈদকে প্রেরণ করে সৌদকে দমন করার জন্যে, কিন্তু তার সৈন্য বাহিনী পরাজিত হয়। নজদের সকল নগরী দখল করার অভিলাষ সউদের অন্তরে ছিল; সুতরাং ফারিক [মেজর জেনারেল] নাফিয পাশাকে ষষ্ঠ আর্মীসহ সউদকে দমন করার জন্যে প্রেরণ করা হয়। কেননা, আবদুল্লাহ ছিল উসমানীয় রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োগকৃত আমীর। ফলে সউদ এবং তার সহযোগী লুটেরা বাহিনী পরাস্ত হয় এবং নজদরাজ্যে পুনরায় সুখ-শান্তি ফিরে আসে। মুসলমান সর্বসাধারণ মু'মিনগণের খলীফার জন্যে আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন। তবে পরবর্তীকালে মুহাম্মদ ইবনে রশীদ নজদ দখল করে নেয় এবং আবদুল্লাহকে বন্দী করে। ওহাবীরা যখন ইয়ামেন দখল করেছিল, তখন তারা আসির অঞ্চলে দশ লাখ জংলীকে ধোকা দিয়ে ওহাবী মতবাদ গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল, যে জংলীরা তায়েফ ও সা'না শহরের মধ্যবর্তী সাওয়াত পাহাড়সমূহে বসবাস করতো। মুহাম্মদ আলী পাশা ওহাবীবাদের মূলোৎপাটন করে পাহাড়ী জংলী এ সব ওহাবীকে বিতাড়নের সময়সীমা কিছুটা পিছিয়ে দিয়েছিলেন। এ এলাকাটিকে উসমানীয় নিয়ন্ত্রণে আনা হয় সুলতান আবদুল মাজিদ খানের খেলাফত আমল ১২৬৩ হিজরী সালে।

আসির অঞ্চলের লোকেরা যাকে নির্বাচন করতো, সেই ব্যক্তি-ই হতো তাদের আমীর, আর উসমানীয় সরকার নিয়োগ করতেন তাদের গভর্ণরকে। গভর্ণর তাদের প্রতি সদয় আচরণ করা সত্ত্বেও তারা অহরহ তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতো।

পক্ষান্তরে তারা তাদের আমীরকে অনুসরণ করাকে একটি এবাদত মনে করতো। এমন কি কুন্দী মাহমুদ পাশা যখন গভর্ণর ছিলেন, তখন তারা বিদ্রোহ করে ইয়ামেনের হোদাইদা বন্দর আক্রমণ পর্যন্ত করেছিল। কিন্তু তারা ভয়ংকর সাইমুম দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। যদিও তারা আবারো ১২৮৭ হিজরী সালে বিদ্রোহ করে হোদাইদা অবরোধ করেছিল, তবুও অল্প সংখ্যক উসমানীয় সৈন্যই অসীম সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে নগরীটিতে তাদেরকে ঢুকতে না দিয়ে তাদেরকে সহজেই পরাভূত করেন। অতঃপর রাদিফ পাশার অধীনে এক ডিভিশন সৈন্যকে প্রেরণ করা হয় এবং রাদিফ পাশা ও অন্যান্য উসমানীয় সেনাপতিদের সুকৌশলপূর্ণ পরিকল্পনা দ্বারা দুর্গম, খাড়া পার্বত্য এলাকায় অবস্থিত ওহাবী দাঙ্গাবাজদের আখড়াগুলো একের পর এক সুন্নীদের দখলে নিয়ে আসা হয়। ফিতনা ও বিদ্রোহের আখড়াগুলোকে নির্মূল করা হয়। যখন রাদিফ পাশা অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন ইয়ামেনের মরুভূমি ও আসির পার্বত্য এলাকার ওহাবী জংলীদেরকে সভ্য-ভব্য বানাবার এবং সেই এলাকায় ইসলামী জ্ঞান ও নৈতিকতার প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব দেয়া হয় গাযী আহমদ মুখতার পাশাকে।

ইয়াভুজ সুলতান সেলিম খান যখন ৯২৩ হিজরী সালে মিসর জয় করে প্রথম তুর্কী খলিফা হন, তখন থেকেই আরবীয় উপদ্বীপ উসমানীয়দের শাসনাধীন হয়েছিল। যদিও নগরীগুলোকে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির মধ্যে শাসন করা হতো, তবুও মরুভূমি ও পার্বত্য এলাকার অজ্ঞ, ভবঘুরে লোকদেরকে তাদের নিজ নিজ আমীর কিংবা শায়খদের দ্বারা শাসিত হওয়ার জন্যে ছেড়ে দেয়া হয়। এ শায়খরা কখনো কখনো বিদ্রোহ করতো। তাদের অধিকাংশই ওহাবী হয়ে যায় এবং নিজেদের লোকদেরকে আক্রমণ ও মুসলমানদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করে। তারা হাজীদের ওপর লুটপাট ও তাঁদেরকে হত্যা করতে থাকে।

১২৭৪ হিজরী সালে বৃটিশরা জেদ্দায় চরম ফিতনার আগুন জ্বালিয়ে দেয়, কিন্তু মক্কায় সেই সময়কার গভর্ণর নামিক পাশার নীতির কারণে শান্তি বজায় রাখা সম্ভবপর হয়। ১২৭৭ হিজরী সালে সকল বিদ্রোহী, বর্বর আমীরকে উসমানীয় সাম্রাজ্যের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করা হয়।

'মিরাতুল হারামইন' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে যে বইটি যখন ১৩০৬ হিজরী সালে প্রণীত হয়, তখন আরবীয় উপদ্বীপে এক কোটি বিশ লাখ মানুষ বসবাস করতো। যদিও তারা অত্যন্ত বুদ্ধি ও উপলব্ধিসম্পন্ন ছিল, তবুও তারা চরম অজ্ঞ, নিষ্ঠুর ও হানাহানিপ্রবণ ছিল। ওহাবীবাদে তাদের বিশ্বাস তাদের বর্বরতাকে আরো বৃদ্ধি করেছিল।

ইবনে রশীদের প্রপৌত্র আমীর ইবনে রশীদ ইতিপূর্বে উসমানীয়দের সাথে যোগ দিয়ে বৃটিশদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর পুত্র শায়খ আলী মদীনার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত হা'ইল শহরের আমীর ছিলেন। তিনি ১২৫১ হিজরী [১৮৩৫ খৃ:] সালে ইন্তেকাল করেন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহ আল রশীদ, যিনি তের বছর আমীর হিসেবে শাসন করেন। আবদুল্লাহ আল রশীদের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও উত্তরাধিকারী তালালকে ফয়সল ইবনে সৌদ বিষ প্রয়োগ করে, যার দরুন তালাল পাগল হয়ে যান এবং একটি রিভলভার দ্বারা ১২৮২ হিজরী (১৮৬৬ খৃ:) সালে আত্মহত্যা করেন। তাঁর ভ্রাতা মু'তাব তাঁর পরে আমীর হন, কিন্তু বন্দর ইবনে তালাল তাঁর চাচা মু'তাবকে হত্যা করেন এবং শাসনভার গ্রহণ করেন। এই আমীরও তাঁর চাচা মুহাম্মদ আল রশীদ কর্তৃক নিহত হন, যিনি পরবতীকালে নজদ ও রিয়াদ দখল করে নেন এবং সৌদি বংশের আমীর আবদুল্লাহ ইবনে ফয়সলকে বন্দী করে হাইল-এ নিয়ে যান। সউদের দুই পুত্র আবদুল আযীয ও মুহাম্মদ, যারা আবদুল্লাহ ইবনে ফয়সলের ভাই ছিল, তারা পালিয়ে কুয়েতে আশ্রয় নেয়। মুহাম্মদ আল রশীদ ১৩১৫ হিজরী (১৮৯৭ খৃ:) সালে ইন্তেকাল করেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয় তাঁরই ভাইয়ের পুত্র আবদুল আযীয, যার নিষ্ঠুরতার দরুন ওহাবী ফিতনার আগুন আবার দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। রিয়াদ, কাসিম ও বুরাইদার শায়খবর্গ সেই সৌদ ইবনে ফয়সলের সাথে একতাবদ্ধ হয়। আবদুল আযীয ইবনে সৌদ কুয়েত হতে ১২টি উটসহ রিয়াদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ১৩২০ হিজরী (১৯০২ খৃ:) সালের এক রাতে সে রিয়াদে আগমন করে। আবদুল আযীয ইবনে আল রশীদের নিয়োগকৃত রিয়াদের গভর্ণর আজলানকে সে এক ভোজসভায় হত্যা করে। রিয়াদের মানুষেরা, যারা সেই সময় পর্যন্ত চরম নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছিল, তারা ইবনে সৌদকে আমীর নির্বাচন করে। তিনটি বছর যাবত বহু যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়। অবশেষে আবদুল আযীয ইবনে আল রশীদ নিহত হয়। উসমানীয়গণ এ বিরোধের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন ১৩৩৩ হিজরী (১৯১৫ খৃ:) সালে এবং আবদুল আযীয ইবনে সৌদের সাথে একটি চুক্তি করেন এ শর্তে যে, সে-ই হবে রিয়াদের প্রধান কর্মকর্তা। পরবর্তীকালে রশীদী ও সৌদিদের মধ্যে কাসিম-এ একটি যুদ্ধ হয়; আবদুল আযীয ইবনে সৌদ পরাজয় বরণ করে এবং রিয়াদে পশ্চাদপসারণ করে।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুন তারিখে আবদুল আযীয ইবনে সৌদ বৃটিশদের ইন্ধন পেয়ে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে এ মর্মে যে মক্কার আমীর শরীফ হুসাইন পাশা ও তাঁর সঙ্গীগণ সবাই কাফের এবং সে তাঁদের সাথে জেহাদরত। সে মক্কা মু'য়ায্যামা ও তায়েফ আক্রমণ করে, কিন্তু শরীফ হুসাইন পাশার কাছ থেকে

সেগুলো দখল করতে ব্যর্থ হয়। পরবর্তী পর্যায়ে বৃটিশ সৈন্যরা শরীফ হুসাইন ইবনে আলী পাশাকে আটক করে এবং ১৩৪২ হিজরী (১৯২৪ ইং) সালে তাঁকে সাইপ্রাসে নিয়ে যায়। পাশাকে যে হোটেলে অন্তরীন রাখা হয়েছিল, সেই হোটেলেই ১৩৪৯ (১৯৩১ খৃ:) সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। আবদুল আযীয ইবনে সৌদ ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে সহজেই মক্কা ও তায়েফ জবরদখল করে নেয়। ইতিপূর্বে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ফেবরুয়ারী তারিখে উসমানীয় সৈন্যগণ, যাঁরা শরীফ হুসাইন পাশার আক্রমণ হতে মদীনাকে রক্ষা করছিলেন, তাঁরা মন্দ্রস সন্ধি অনুযায়ী হিজায ত্যাগ করেন। ওই সময় শরীফ হুসাইন পাশা তুরস্কের ক্ষমতা গ্রহণকারী ইত্তেহাদ-জিলার-এর সাথে সৌহাদ্যপূর্ণ মনোভাবসম্পন্ন ছিলন না। শরীফ হুসাইন পাশার পুত্র আবদুল্লাহ মদীনায় বসবাস করে আসছিলেন বহু পূর্ব হতেই, কিন্তু তাঁর পিতার ইন্তেকালের পর বৃটিশ সরকার তাঁকে মদীনা হতে আম্মানে নির্বাসিত করে। তিনি ১৩৬৫ হিঃ (১৯৪৬ খৃ:) সালে জন্দান রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন। কিন্তু তাঁকে মসজিদুল আকসায় নামায আদায়রত অবস্থায় বৃটিশ আততায়ীদের হাতে প্রাণ দিতে হয় ১৩৭০ (১৯৫১ খৃ:) হিজরী সালে। তাঁর পুত্র তালাল তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। অতঃপর অসুস্থতার জন্যে তালাল অনতিবিলম্বেই তাঁর পুত্র মালিক হুসাইনকে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। শরীফ হুসাইন পাশার দ্বিতীয় পুত্র শরীফ ফয়সল ১৩৩৯ (১৯২১ খৃ:) হিজরী সালে ইরাক রাষ্ট্রের পত্তন করেন এবং ১৩৫১ হিজরী (১৯৩৩ খৃ:) সালে ইন্তেকাল করেন। তাঁর উত্তরসূরী হন তাঁরই পুত্র গাযী যিনি মাত্র ২১ বছর বয়সে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র ফয়সল ইরাকের পরবর্তী শাসনকর্তা হন; কিন্তু তিনি ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট তারিখে জেনারেল কাসিমের নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থানে মাত্র ২৩ বছর বয়সে নিহত হন। দ্বিতীয় অভ্যুত্থানে কাসিমও নিহত হন। বহু সামরিক অভ্যুত্থানের পরে ইরাক ও সিরিয়া সোশেলিষ্ট বাথ পার্টির ক্ষমতাধীন হয়ে যায় এবং রাশিয়ার কলোনীতে পরিণত হয়।

আবদুল আযীয ইবনে সৌদ বহু বার মদীনা মনোয়ারা আক্রমণ করে। এমন কি সে ১৯২৬ সালে যে আক্রমণ পরিচালানা করেছিল, তাতে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মোবারক রওযায়ও বোমা-গোলা বর্ষণ করেছিল। কিন্তু তবু সে নগরীটি দখল করতে পারে নি। নিম্নোক্ত খরবটি ইস্তাম্বুলের ‘সন সা’আত গ্যাজেটেসী’ পত্রিকায় ১৯২৬ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রকাশিত হয়:

”মদীনায় বোমা হামলা: আমরা পূর্বেই জানিয়েছি যে ভারতীয় মুসলমানগণ আবদুল আযীয ইবনে সৌদ কর্তৃক মদীনায় বোমা হামলা করায় উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ। ভারতে প্রকাশিত ‘দি টাইমস অফ ইন্ডিয়া’ বলে,মদীনা আক্রমণ ও রওযায়ে

আকদস-এ বোমা হামলার সাম্প্রতিক খবর ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এমন এক অসন্তোষ ও ক্ষোভের সঞ্চার করেছে যে এ রকম আর কোনো ঘটনায়ই হয় নি। ওই পবিত্র স্থানটিকে ভারতীয় মুসলমানগণ কতোটুকু শ্রদ্ধা করেন তা তাঁরা প্রদর্শন করেছেন। ভারত ও ইরানে এ সিরিয়াস অসন্তোষ ও ক্ষোভ নিশ্চিতভাবে ইবনে সৌদের ওপর প্রভাব ফেলবে, যার দরুণ সে এই ধরনের অপকর্ম সংঘটন থেকে বিরত থাকবে, যাতে করে সকল মুসলমান রাষ্ট্রের রোষানল হতে সে মুক্ত থাকতে পারে। ভারতীয় মুসলমানগণ প্রকাশ্যে এটা ইবনে সৌদের কাছে ব্যক্ত করেছেন।”

ওহাবীরা দাবি করেছিল যে আহলে সুন্নাতের মুসলমানগণ যাঁরা তাদের ভ্রান্ত, গোমরাহ ধ্যান-ধারণা গ্রহণ করেন নি, তাঁরা সবাই কাফের। তারা বলেছিল যে যাঁরা অ-ওহাবীদেরকে কাফের মনে করবেন না, তাঁরাও কাফের হয়ে যাবেন, এবং তাঁদেরকে হত্যা করা ও তাঁদের মালামাল জবরদখল করা নাকি হালাল। ওহাবীদের এ সকল বক্তব্য তাদের কৃত ’ফাতহুল মজীদ’ ও ’কাশফুশ শুবহাত’ বইগুলোতে লিপিবদ্ধ আছে। এ ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা মরুভূমির জংলীদের স্বার্থকে সংরক্ষণ করায় ওহাবীবাদ সমগ্র আরবে দ্রুত প্রসার লাভ করে। জংলীরা মুসলমানদেরকে হত্যা করতে থাকে এবং তাঁদের মালামাল লুটপাট করতে থাকে। তারা যেখানে গেছে সেখানেই তারা সন্ত্রাস ও অত্যাচারকে সাথে নিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা’আলা মুসলমানদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন; উসমানীয় বাদশাহ্ সুলতান মাহমুদ খান-২য় হযরত খিযির আলাইহিস্ সালাম-এর মতো যথাসময়ে মুসলমানদেরকে রক্ষা করতে আবির্ভূত হন। তিনি বদমায়েশ, না-পাক ওহাবীদেরকে পবিত্র স্থানসমূহ হতে বিতাড়িত করেন এবং তাদেরকে ধ্বংস করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত ওই সকল পবিত্র স্থান উসমানীয়দের দ্বারা ন্যায় ও ইনসাফের সাথে শাসিত হয়েছিল। মুসলমানগণ তাঁদের মানবাধিকার, স্বাধীনতা, সুখ ও শান্তি নিরবচ্ছিন্নভাবে ভোগ করেছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় উসমানীয় সাম্রাজ্যকে শাসনকারী ‘ইউনিয়ন ও প্রগ্রেস পার্টির’ গোঁড়াপন্থী সদস্যরা ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। তাদের মধ্যে ইসলামী শিক্ষা ও নৈতিকতার ঘাটতি ছিল। সরকারের মধ্যে যারা সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল, তাদের অধিকাংশই ছিল ফ্রি-ম্যাসন (যিনদিক, মোনাফেক) যারা সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানের মুসলমানদের মতো আরবীয় মুসলমানদের প্রতি জুলুম-নিপীড়ন পরিচালনা করতো। সুলতান আবদুল হামিদ খান ২য়-এর শাসনামলের ন্যায়বিচার, দয়া, অনুগ্রহ ও শ্রদ্ধাতে অভ্যস্ত আরবীয় জনগণ তুর্কীদেরকে নিজেদের ভাইয়ের মতো ভালোবাসতেন। কিন্তু তাঁরা ইউনিয়নপন্থীদের অত্যাচার ও ডাকাতি

দেখে বিস্মিত হন। মক্কার আমীর শরীফ হুসাইন ইবনে আলী পাশার আত্মীয়-স্বজন ও মেয়ের জামাইকে এবং আরো বহু আরবীয় সুধীজনকে দামেশক শহরে ইউনিয়নপন্থী জামাল পাশা অত্যাচার করে হত্যা করে।

ইউনিয়নপন্থী দস্যুরা সুলতান আবদুল হামিদ খান ২য়-কে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং সরকারের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও খলিফার আমলের উলামায়ে কেরাম, লেখকবৃন্দকে বন্দী করে এবং আরো বহু ব্যক্তিকে নামাযশেষে মসজিদ ত্যাগ করার সময় কিংবা কর্মশেষে কার্যালয় ত্যাগ করার সময় পেছন থেকে গুলী করে হত্যা করে। সুলতান রাশাদ খাঁকে তারা খেলাফতে সমাসীন করে তাঁকে এবং তাদের নিয়োগকৃত আইন প্রণেতাদেরকে পিস্তলের মুখে সাম্রাজ্যটিকে এক যুদ্ধ থেকে আরেক যুদ্ধে, এক ধ্বংসযজ্ঞ থেকে আরেক ধ্বংসযজ্ঞে ধাবিত করতে বাধ্য করে। তারা জনগণকে নিপীড়ন করতে থাকে, আর ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে যায় এবং শরীয়তকেও অবজ্ঞা করে। যে সকল একনিষ্ঠ, দূরদর্শী ও দেশপ্রেমিক মুসলিম এই গড্ডলিকা প্রবাহকে বাধা দিতে চেষ্টা করেন, তাঁদেরকে তারা ফাঁসি কিংবা নির্বাসনে দেয়। শরীফ হুসাইন ইবনে আলী পাশা ওই সকল বুদ্ধিমান মুসলমানদের একজন ছিলেন, যিনি সুলতান আবদুল হামিদ খানের খিলাফত আমলে মীর-ই-মীরান অথবা বেগলার বেগী (প্রাদেশিক শাসনকর্তা) পদবী ধারণ করে খলিফা ও সাম্রাজ্যের খেদমতে করেছিলেন। তাকে মক্কার আমীর হিসাবে নিয়োগ করে ইস্তাম্বুল হতে প্রেরণ করা হয়েছিল। অতঃপর তিনি ইউনিয়নপন্থীদের বিরোধিতা করেন, যারা সাম্রাজ্যকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞে ঠেলে দেয়। আনোয়ার পাশার প্রণীত ও ২২শে জেলহজ্জ ১৩৩২ হিজরী (অক্টোবর ২৮/১৯১৪ইং) সালে সুলতান রাশাদের সইকৃত যুদ্ধের ঘোষণাকে ইউনিয়নপন্থীরা "জিহাদে আকবর"-এর মিথ্যা খেতাব দিয়ে সকল মুসলমান রাষ্ট্রে এর কপিসমূহ প্রেরণ করে। বেচারা সুলতান রাশাদ মনে করেছিলেন যে তিনি বুঝি সত্যি একজন খলিফা এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচরদের কাছে বাধ্য হয়ে অভিযোগ করেছিলেন: "তারা আমার কথা একদম শোনে না" তাঁর এ অভিযোগে প্রমাণ মেলে যে তিনি যখন ইসলামবিরোধী আজ্ঞা সই করতে বাধ্য হতেন, তখন কূটচালগুলো সম্পর্কে তিনি বুঝতে পারতেন।

শরীফ হুসাইন পাশা দেখতে পেয়েছিলেন যে ইউনিয়নপন্থীরা মুসলমানদের ঈমান ও সরল বিশ্বাসকে ব্যবহার করে এবং অ-মুসলিমদের সাথে জেহাদের বুলি আওড়ে বিশাল সাম্রাজ্যটিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছিল এবং সহস্র সহস্র যুবককে আগুনে নিক্ষেপ করছিল এবং তাদের গাফিলতি ও অবক্ষয় তাদের বুলির সাথে ন্যূনতম সামঞ্জস্যও বজায় রাখছিল না। তিনি মুসলমানদেরকে এ দস্যুদের হাত হতে এবং সাম্রাজ্যটিকে ভবিষ্যতের অশুভ পরিণতি হতে রক্ষা করার একটি উপায় অন্বেষণ

করেছিলেন। যখন তিনি শুনতে পেলেন যে দামেশকে শরীফগণের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে উন্মত্ত চিত্তে জামাল পাশা নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, তখন তিনি নিজ পুত্র শরীফ ফয়সল আফেন্দীকে সেখানে পাঠালেন বিষয়টি তদন্ত করতে। ফয়সল আফেন্দী দেখতে পেলেন যে তাঁরা যা শুনেছিলেন তাই সত্য। তিনি তাঁর পিতাকে এই বাজে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন। শরীফ হুসাইন পাশা আর সহ্য করতে পারলেন না। অতঃপর তিনি দুইটি ঘোষণাপত্র জারি করলেন; প্রথমটি ১৩৩৪ হিজরীর ২৫শে শা'বান (১৯১৬ইং) তারিখে এবং দ্বিতীয়টি ১৩৩৪ হিজরীর ১১ই জেলকদ তারিখে। এর উদ্দেশ্য ছিল ঘটনাবলী সম্পর্কে মুসলমানদেরকে অবহিত করা। ইউনিয়নপন্থীরা এ দুইটি ন্যায্য শ্বেতপত্রকে "বিদ্রোহের ঘোষণাপত্র" আখ্যা দিয়েছিল। ইস্তাম্বুলে অবস্থিত ইউনিয়নপন্থী সংবাদ মাধ্যমের ভাড়াটে কলমগুলো শরীফ হুসাইন পাশার প্রতি অত্যন্ত নিচু ও হীন ভাষায় কুৎসা রটনা করে এবং গালমন্দ করে। শরীফ হুসাইন পাশার ঘোষণাপত্রের প্রতি মনোযোগ দেয়ার পরিবর্তে ইউনিয়নপন্থীরা তাঁকে দেশদ্রোহী ঘোষণা করে দেয়। তারা তাঁকে পরাভূত করার উদ্দেশ্যে সৈন্য প্রেরণ করে। বহু বছর ধরে তারা ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ বাধিয়ে রাখে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর বংশধর ওই সকল খালেস মুসলমানদের হাতে মক্কা মু'য়ায্যামা ও মদীনা মোনাওয়ারা সমর্পণ না করার জন্যে তারা বহু নিদ্দোষ মানুষকে হত্যা করে। সবচেয়ে খারাপ কথা, তারা এ সব বরকতময় স্থানকে ইসলামের হত্যাকারী, মরু-দস্যু, অজ্ঞ ও নিষ্ঠুর ওহাবীদের কাছে সমর্পণ করে। তবে এটা চূড়ান্ত পর্যায়ে দৃশ্যমান হয় যে শরীফ হুসাইন পাশা-ই সঠিক ছিলেন। ইউনিয়নপন্থীরা উসমানীয় সাম্রাজ্যকে শত্রুদের হাতে তুলে দিয়ে পলায়ন করে। ১৩৪০ হিজরী/ ৩০শে আগষ্ট ১৯২২ইং-এর তুর্কী মুক্তি ও বিজয় না হলে তুর্কী ও ইসলাম শরীফ হুসাইন পাশার আশংকা অনুযায়ী সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো এবং বৃটিশ সরকারের আরোপিত সেভার্স সন্ধি (আগষ্ট ২০, ১৯২০ইং)-এর কষাঘাতে মুসলিম বিশ্বও বিলুপ্ত হয়ে যেতো। শরীফ হুসাইন পাশার ঘোষণাগুলোর একটি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা হলে এটা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাবে যে তিনি "আরবীয় স্বাধীনতা" জাতীয় কোনো ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি জাতিয়তাবাদী ছিলেন না। তিনি ইসলামের পতাকার নিচে সকল মুসলমানকে ভ্রাতৃসুলভ মনোভাব নিয়ে বসবাস করতে দেখতে চেয়েছিলেন। মক্কা ও মদীনার খাঁটি মুসলমানগণ বিশ্বাস করতেন যে সকল মুসলমান জাতি-ই পরস্পর পরস্পরের ভাই এবং তাঁরা তাঁদেরকে ভাইয়ের মতো ভালোবাসতেনও। অপর পক্ষে, ইউনিয়নপন্থী পত্র-পত্রিকাগুলো আরবীয়দেরকে অপমান করতো কালো ককুরকে "আরব, আরব" আখ্যা দিয়ে এবং কোঁকড়া চুলকে "আরবীয়

চুল", নরম সাবানকে "আরবীয় সাবান" ও তেলাপোকাকে "কালো ফাতমা (ফাতিমা-রাঃ)" ইত্যাদি জঘন্য খেতাবে ভূষিত করে। বড়ই আফসোস, ইউনিয়ন গোঁড়াপন্থীরা শরীফ হুসাইন পাশার মতো নির্মল আত্মা ও মহান উপলব্ধি হতে শূন্য ছিল এ সকল একনিষ্ঠ মুসলমানকে বিদ্রোহী জ্ঞান করে তারা ওহাবীদের বিদ্রোহকে অসৎ পরিকল্পনা দ্বারা ইন্ধন যুগিয়েছিল, যারা তুর্কী সৈন্যদের ওপর হামলা চালিয়ে উসমানীয় ভূমি জবরদখল করে নিয়েছিল। ইউনিয়নপন্থীরা, যারা তুর্কী সৈন্যদেরকে বার বার বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর বংশের খাঁটি মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্যে আদেশ দিতো, তারা বিদ্রোহী হিংস্র ওহাবী আবদুল আযীয ইবনে সৌদের কাছে মিত্রতার চিঠিপত্র লিখতো এই বলে, "তোমার সৈন্যসহ মদীনায় আগমন করো, আমরা তোমার সাথে মক্কায় যাবো এবং সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী আমীর হুসাইন পাশাকে বন্দী করবো"। আবদুল আযীয ইবনে সৌদ তাদের চিঠির কোনো জবাবই দেয় নি। কেননা, সে তুর্কীদেরকে মক্কায় দেখতে চায় নি। সে ইতোমধ্যেই তদানীন্তনকালে বাহরাইন দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত বৃটিশ বাহিনীর কর্তাব্যক্তির (কমান্ডারের) সাথে একটি চুক্তি করে ফেলেছিল। পারসিক উপসাগরের তীরে অবস্থিত উসমানীয় শহরগুলো বৃটিশদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা আক্রমণ ও জবরদখল করার ব্যাপারেই সে সংগ্রামরত ছিল এবং সে আশা করছিল যে আরব রাজ্য (জাযিরাতুল আরব) ওহাবীদের হাতেই সমর্পণ করা হবে। অতঃপর তাই ঘটে গেলো।

নজদ মরুভূমিতে ইবনে রশীদ ও আবদুল আযীয ইবনে সৌদ গোত্র দুইটির রক্তক্ষয়ী সংঘাত বন্ধ করার জন্যে ফারুকী সামী পাশাকে কাসিম শহরের মুতাসাররীফ (প্রদেশের উপ-বিভাগের গভর্ণর) নিয়োগ করা হয়। যদিও আবদুল আযীয ইবনে সৌদ সামী পাশা ও তুর্কী সৈন্যদেরকে বন্দী করে রিয়াদ নিয়ে যাওয়ার ফন্দি আঁটতে থাকে, তবু কাসিম শহরের শায়খগণ তাকে এ কাজ হতে বিরত রাখতে সমর্থন হন এ মর্মে পরামর্শ দিয়ে যে উসমানীয় সাম্রাজ্য হতে উদ্ভূত এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সামাল দেয়া দুষ্কর হবে। কিন্তু সে সামী পাশার ওপর একটি চাল খাটায়; সে পরামর্শস্বরূপ তাঁকে বলে, "কাসিম শহরে এতোজন সৈন্যের খাদ্য সরবরাহ করতে আপনার ভীষণ অসুবিধা হবে। হয়তো আপনারা খাদ্যাভাবে ক্লিষ্ট হবেন। মদীনায় প্রত্যাবর্তন করাই আপনাদের জন্যে ভাল হবে।" সামী পাশা এটাকে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ উপদেশ মনে করেন এবং মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। সৈন্যরা চলে যাওয়ার পর আবদুল আযীয ইবনে সৌদ দুর্গ হতে উসমানীয় পতাকাটি নামিয়ে ফেলে এবং ফলস্বরূপ কাসিম শহরের পতন ঘটে। এরপর সে নজদ প্রদেশের রাজধানী আল খাসসা আক্রমণ করে এবং উসমানীয় সৈন্যদেরকে

পরাস্ত করে শহরটি জবরদখল করে নেয়। ইউনিয়নপন্থীরা আবদুল আযীয ও ওহাবীদের এ বৈরিতাকে আস্কারা দিতে থাকে। বিশেষ করে বসরার সহকারী ও ইসলামের একজন "প্রগতিবাদী সংস্কারক" তালিব নকীব আবদুল আযীয ইবনে সৌদের আক্রমণগুলোকে ইসলামের খেদমত হিসেবে আখ্যা দিতে থাকে। এতে অনুপ্রাণিত হয়ে আবদুল আযীয ইবনে সৌদ ইবনে রশীদের ওপরও আক্রমণ পরিচালনা করেছিল, কিন্তু সে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে এবং মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সৌদ পরিবারের অনেকেই নিহত হয়। আবদুল আযীয হতে প্রাপ্ত যুদ্ধের সরঞ্জামাদির মধ্যে বৃটিশের তৈরি অস্ত্রশস্ত্র এবং বহু 'হ্যাট' পাওয়া যায়। আবদুল আযীযের এ পরাজয়ের দরুণ তার মক্কা ও মদীনা আক্রমণের পরিকল্পনা কিছুকাল বিলম্বিত হয়। তবুও সে কুখ্যাত বৃটিশ গুপ্তচর ক্যাপটেন (পরবর্তীকালে কর্ণেল) লরেন্স-এর উস্কানিতে তার বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কুকর্ম চালিয়ে যেতে থাকে। সে শরীফ হুসাইন পাশার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে দেয় এবং ১৩৩৬ (১৭ই জুন, ১৯১৮ খৃ:) সালে মক্কা আক্রমণ করে বসে; কিন্তু সে পরাজিত হয় এবং নজদে ফিরে যায়।[আবদুল আযীয ইবনে সউদ বৃটিশ সৈন্যদের কাছ থেকে ১৩২৪ হিজরী/১৯২৪ সালে মক্কা ও তায়েফের দখল বুঝে নেয় এবং ১৩৪৯ হিজরী/১৯৩১ খৃষ্টাব্দ সালে মদীনার দখলও বুঝে নেয়। অতঃপর ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে সৌদি আরব রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করে। ১৩৭২ হিজরী/১৯৫৩ খৃষ্টাব্দ সালে তার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী হয় তারই পুত্র সৌদ, যে নাকি সৌদি বংশের বিংশতম উত্তরাধিকারী ছিল। লাম্পট্য জীবন যাপন করে সে ১৯৬৪ ইং সালে মদ্যপ অবস্থায় এথেন্সে মৃত্যুবরণ করে। তার উত্তরসূরী তারই ভাই ফয়সাল তেল কোম্পানীগুলো ও প্রতি বছরের হাজীদের কাছ থেকে সংগৃহীত কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা ওহাবীবাদ সারা মুসলিম বিশ্বে প্রচারের উদ্দেশ্যে মুক্ত হস্তে খরচ করে এবং মুসলমানদেরকে ধোকা দেয়। ১৩৯৫ হিজরী/১৯৭৫ খৃষ্টাব্দ সালে রিয়াদ প্রাসাদে তার ভাগ্নে কর্তৃক সে নিহত হলে তার ভাই খালেদ সৌদি আরবের রাজা হয়।]

মদীনার সামরিক অধিনায়ক দুইজন, যথাক্রমে বসরী পাশা ও ফখরী পাশা যদিও আবদুল আযীয ইবনে সৌদের বে-ঈমানী কাজ-কারবার কাছে থেকে লক্ষ্য করছিলেন, তবুও তাঁরা ইউনিয়নপন্থীদের আদেশ মান্য করাকে কর্তব্য বিবেচনা করে শরীফ হুসাইন পাশা ও তাঁর পুত্রদেরকে বিদ্রোহী হিসেবে ঘোষণা করেন। মুসলিম ভ্রাতাদের পরস্পর হানাহানিতে এই দুইজনকে ঘুটিস্বরূপ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু হেজাযের গভর্নর ও কমান্ডার গালিব পাশা ইউনিয়নপন্থীদের দ্বারা ধোকাপ্রাপ্ত হন নি। কেননা, তিনি দূরদর্শী ও ব্যাপক ইসলামী জ্ঞানসম্পন্ন এবং অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ অধিনায়ক ছিলেন। তিনি তাঁর ব্যাপক অনুসন্ধানী ও সতর্ক তদন্ত

এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতে বুঝতে পেরেছিলেন যে শরীফ হুসাইন পাশা-ই সঠিক এবং তিনি তাঁর দুইটি ঘোষণাপত্র ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি মুহব্বতের কারণেই প্রকাশ করেছিলেন। গালিব পাশা নিম্নোক্ত "দৈনিক আদেশ" শরীফ হুসাইন পাশাকে কুৎসা হতে রক্ষা করার জন্যে জারি করেন:

"হযরত আমীরের (শরীফ হুসাইন পাশার) নিষ্ঠা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকা উচিৎ নয়। তিনি বিদ্রোহকে উস্কে দেবেন এমন কোনো সম্ভাবনাও নেই। তাঁর সম্পর্কে যে গুজব চলছে, তা মোটেও সত্য নয়। শরীফ হুসাইন পাশা খলিফাতুল মুসলিমিনের প্রতি পূর্ণ অনুগত এবং তাঁর মহামান্য সত্তার দীর্ঘায়ুও তিনি কামনা করে থাকেন সদাসর্বদা।"

গালিব পাশা এ মন্তব্যের কপিসমূহ চতুর্থ আর্মীর অধিনায়ক ও ইউনিয়নপন্থী দস্যু-চক্রের নেতা জামাল পাশার কাছে এবং ইস্তাম্বুলে প্রেরণ করেন। তিনি প্রকাশ্যে শরীফ হুসাইন পাশাকে সমর্থন করেন এ কথা বলে যে শরীফ পাশা একজন খালেস মুসলমান এবং তাঁর অভিযোগে তিনি সঠিক। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইউনিয়নপন্থীরা শরীফ হুসাইন পাশা ও তাঁর পুত্রদেরকে তাদের পথে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচনা করেছিল এবং অত্যন্ত শংকিত ছিল এই মর্মে যে তাঁরা তাদের অসৎ উদ্দেশ্য ও মুসলমানদের প্রতি পরিচালিত অত্যাচার-অবিচার সম্পর্কে মুসলমানদেরকে অবহিত করবেন। ফলে তারা শরীফদেরকে বিদ্রোহী হিসেবে প্রতিপন্ন করার জন্যে নানা কূটচাল প্রয়োগ করতে থাকে। মদীনার বীর তুর্কী সেনা অফিসারদেরকে তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়। অতঃপর বহু বছর ধরে ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতের সূত্রপাত হয়। অবশেষে অধিকাংশ অফিসার একতাবদ্ধ হয়ে সেনা ডিভিশনের প্রধান কর্মকর্তা কর্ণেল আমীন বেগের নেতৃত্বে "মারকায হায়াতী" (কেন্দ্রীয় কাউন্সিল) গঠন করেন। বহু ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে তাঁরা হেজাযে সংঘটিত হত্যাকান্ডগুলোর তথ্য ফাঁস করে দেন। তাঁরা বলেন:

"সেনা অধিনায়ক (ফখরী কিংবা ফখরুদ্দীন পাশা) ও তার চামচারা মিথ্যা কথা বলছেন। আরবীয় ও তুর্কীগণ দুই ভ্রাতৃপ্রতিম জাতি পূর্বেকার মতো এক সাথে সৌহান্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করে যাবেন। আমরা কি আগে থেকেই ভাই নই? আমরা কি ঐতিহাসিক ও দ্বীনী বন্ধনে পরস্পর পরস্পরের সাথে আবদ্ধ নই? মহান আরব জাতি (কওম-ই-নাজিব-ই-আরব) যদি স্বাধীন হয়ে যায়, তাহলে কি তাঁরা আমাদের শত্রু হয়ে যাবেন? এ প্রশ্নের উত্তরে তাঁরাও 'না' বলবেন। আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে অস্তিত্বশীল থাকবো। হযরত শরীফ (হুসাইন পাশা) ইয়ানবু বন্দরে যাওয়ার জন্যে আমাদেরকে উটও সেধেছিলেন। তিনি অসুস্থদের জন্যে ওষুধ-

সামগ্রীও পাঠিয়েছিলেন। ইয়ানবুতে আমাদের সফরের সময় তিনি আমাদের আরামের প্রতিও সহৃদয় চিন্তাভাবনা করেছিলেন। এটা কি একটা মানবতার উজ্জ্বল নিদর্শন নয়? ভ্রাতৃত্বের কি এর চেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ আছে? যদি এ সহৃদয়তার স্থলে তিনি বলতেন, আপনারা পদব্রজে ইয়ানবু যেতে পারেন, তাহলে কি আমরা বলতামঃ 'না, আমরা বীর। আমরা এখানে মাটি কামড়ে পড়ে থেকে তোমাকে হত্যা করবো। আমরা কার (মটর গাড়ী) চাই?' এখন থেকে উদ্দেশ্যহীনভাবে মৃত্যু বরণ করা সাহসিকতার পরিচায়ক হবে না। যারা সত্যকে দেখতে পাচ্ছিলেন না, তাঁদের জন্যেই আমাদের এ ঘোষণা। সংখ্যাগরিষ্ঠ-ই সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। আমাদের মনিব হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কি এ নিষ্ঠুরতাকে অনুমোদন করতেন?" মদীনার অধিনায়ক ফখরুদ্দীন পাশা এরপরও ইউনিয়নপন্থী সরকারকে মান্য করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ১৩৩৭ হিজরী (জানুয়ারী ১০,১৯১৯ইং) সালে তুর্কী সেনা অফিসারগণ তাঁর শয়নকক্ষ ঘেরাও করে ফেলেন। তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী (--) প্রথম লেফটানেন্ট শওকত বে আওয়াজ শুনতে পেয়ে বেরিয়ে আসেন। তিনি সকল কর্ণেল, লেফটানেন্ট-কর্ণেল, লেফটানেন্ট, বাছাইকৃত পদাতিক সৈন্য এবং সশস্ত্র পুলিশকে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে দেখেন। তাঁরা সহকারীকে অন্যত্র অপসারণ করেন। যাঁরা শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন, তাঁরা পাশাকে দুই হাতের কব্জিতে ধরেন এবং একটি গাড়ির মধ্যে দুইজন অফিসারের মাঝখানে বসিয়ে ইয়ানবু বন্দরে নিয়ে আসেন। অতঃপর অফিসারবৃন্দ ও সৈনিকগণ ইস্তাম্বুলের বাসভূমি অভিমুখী হতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত হন। কিন্তু বৃটিশ বাহিনী তাঁদের মিসরে নিয়ে যায় এবং সেখানে ছয় মাস কারারুদ্ধ করে রাখে। অগাষ্ট ৫ তারিখ পাশাকে মাল্টায় নির্বাসনে দেয়া হয়। সেখানে তিনি দুই বছর বন্দী ছিলেন। যেহেতু তিনি ইউনিয়নপন্থীদের উন্মাদ আজ্ঞাসমূহ মান্য করাকে কর্তব্য মনে করেছিলেন, সেহেতু এ সাহসী তুর্কী অধিনায়ক মদীনায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলেন এবং ইসলামের হিংস্র শত্রু বৃটিশদের সাথে যুদ্ধ করার কোনো সুযোগই পান নি। সরকারী ক্ষমতা হস্তগত করার পর ইউনিয়নপন্থীরা শুধুমাত্র বীরদের এ দেশটিকে দ্বিধা-বিভক্তই করে নি, তারা ফখরুদ্দীন পাশার মতো বহু দেশপ্রেমিককে শত্রু কয়েদখানায় আর্তনাদ করতেও বাধ্য করেছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর বংশধর শরীফদের মতো খালেস মুসলিমদের হাতে পবিত্র ভূমি মক্কা ও মদীনা অর্পণ না করার উদ্দেশ্যে তারা সহস্র সহস্র নিরপরাধ মুসলমান ও তুর্কী মুসলমানদের রক্ত ঝরিয়েছিল। তারা পবিত্র ভূমিকে রক্ত-পিপাসু, পাষাণ-হৃদয়ের ওহাবীদের হাতে সমর্পণ করেছিল, যে ওহাবীরা ঐতিহাসিকভাবে প্রকৃত মুসলমান ও তুর্কীদের শত্রু ছিল।

**শরীফ হুসাইন পাশার প্রথম ঘোষণা**

ইতিহাসের জ্ঞান যাঁদের ভাল আছে তাঁরা ভালই জানেন যে মক্কা মোকাররমার আমীরগণই মুসলমান নেতৃবৃন্দ ও শাসকগণের মধ্যে প্রথম, যাঁরা মুসলিম ঐক্যকে সুদৃঢ় করার জন্যে 'আদ-দাওলাতুল আলীয়্যাত আল উসমানিয়্যা' (উসমানীয় সাম্রাজ্য)-এর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন।আরবীয় আমীরগণের উসমানীয়দের প্রতি দৃঢ় আনুগত্য ছিল। কেননা, উসমানীয় সুলতানগণ আল্লাহতা'আলার পাক কিতাব (আল-কুরআন) ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতকে জারি রাখতে এবং শরীয়তকে মান্য করতে সদা-তৎপর ছিলেন, আর তাঁরা এ মহৎ উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগও করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, আদ্ দাওলাতুল উসমানীয়্যার সম্মান ও মাহাত্ম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে আমি ১৩২৭ হিজরী (১৯০৯ ইং) সালে আরবদের মধ্য হতে সংগৃহীত সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা আরবীয়দের ওপর আক্রমণ করে 'আবহা' অবরোধ নস্যাত করতে চেষ্টা করেছিলাম। এক বছর পর একই উদ্দেশ্যে আমার পুত্রদের মধ্য হতে একজনের নেতৃত্বে আমি সাফল্যের সাথে এ কাজটি সুসম্পন্ন করি। প্রত্যেকেই জানেন, আমি কখনোই এই মহান লক্ষ্য হতে বিচ্যুত হই নি।

ইত্তেহাদ ওয়া তরক্কী জামিয়্যাতী'র আবির্ভাব ও তাদের দ্বারা সরকারী ক্ষমতা গ্রহণ,যার ভিত্তিপ্রস্তরই ছিল দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ, সবাই জ্ঞাত যে তার কারণে বহু অভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক অনিয়মের উদ্ভব হয়েছে এবং সাম্রাজ্যের মাহাত্ম্য ও ক্ষমতাকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। আর গত যুদ্ধে (১ম বিশ্বযুদ্ধে) জড়িয়ে তারা সাম্রাজ্যকে একটি মহাবিপজ্জনক অবস্থায় ঠেলে দিয়েছে। এ নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে না এমন কেউই নেই, বিস্তারিত বিবরণ দেয়া এ ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়।

আমরা ইসলামের কোনো সম্প্রদায়কে এ মহান মুসলিম সাম্রাজ্যের সাথে সম্পর্কচ্যুত এবং দুঃখ ও কষ্টের মধ্যে জর্জারিত দেখতে চাই না। উসমানীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে জনগণের ঐক্য নষ্ট করা হয়েছে এবং আমাদের সাম্রাজ্যের শেষ প্রান্তের মুসলমান ও অমুসলিম নাগরিকদের ওপর ফাঁসি, নির্বাসন ও কারাবাস চাপিয়ে দেয়ার ফলশ্রুতিতে মানুষের জান-মালের নিরাপত্তাবোধও তিরোহিত হয়েছে। পবিত্র ভূমির জনসাধারণকে এতো মারাত্মক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে যে তাঁরা এমন কি নিজেদের ঘর-বাড়ির দরজা-জানালা ও গৃহ সামগ্রী এবং ছাদের পাল্লাগুলো পর্যন্ত বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন।

ইউনিয়নপন্থীরা এতেও সন্তুষ্ট না হতে পেরে সালতানাত আস্ সানিয়্যাত আল উসমানিয়্যা ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যের সেতু বন্ধন রচনাকারী কিতাবুল্লাহ্ (আল্লাহর গ্রন্থ অর্থাৎ কুরআন মজিদ) এবং সুন্নাতুস সানিয়্যা (মহান সুন্নাত)-এর প্রতি অপবাদ দেয়ার অপচেষ্টায়ও লিপ্ত হয়েছে। সালতানাত আস্ সানিয়্যাত্ আল উসমানীয়্যা (মহান উসমানীয় সাম্রাজ্য)-এর রাজধানীতে সদর-ই-আযম (প্রধানমন্ত্রী), শায়খুল ইসলাম ও সকল মন্ত্রী ও সাংসদগণের চোখের সামনে প্রকাশিত ‘ইজতেহাদ’ পত্রিকাটি অশোভনীয় লেখনী দ্বারা আমাদের হুজূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অবমাননা করতে মোটেও কুণ্ঠিত হয়নি। উপরন্তু, গোপন আঁতাতের সুযোগ গ্রহণ করে মনগড়াভাবে পত্রিকাটি পবিত্র কুরআন মজিদের আয়াতসমূহের অপব্যাখ্যা করেছে এবং মিরাস্ (উত্তরাধিকার) সংক্রান্ত আয়াতটিকে হেয় করার দুঃসাহস দেখিয়েছে। [জিয়া গোকালপের এ সব বেয়াদবিপূর্ণ লেখনীর জন্যে আমার বইটি দেখুন]

এ ছাড়া তারা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি বিলুপ্ত করার অপচেষ্টাও চালিয়েছে। যথা রুশীয় বাহিনীর সাথে ইতিপূর্বে যুদ্ধে লিপ্ত সৈন্যদের অনুরূপ অনুভূতি সঞ্চার করার জন্যে তারা মক্কা মোকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারা এবং দামেশকের সৈন্যদেরকে সম্মানিত রমযান মাসের রোযা রাখতে নিষেধ করেছে। ইসলামের মৌল-স্তম্ভসমূহ বিলোপ করা ও আল্লাহ তা'আলার নিষেধকৃত কাজসমূহ নিজেরা সম্পাদন করা এবং অন্যান্যদেরকেও তা সম্পাদনে বাধ্য করা হতে ইউনিয়নপন্থীরা বিরত হয় নি।

আমাদের মহান সুলতানকে প্রাসাদের জন্যে একজন মহাসচিব নিয়োগ করার অধিকার হতেও ইউনিয়নপন্থীরা বঞ্চিত করেছে, যেমনিভাবে 'যাত-ই-শাহানা' (মহামান্য সুলতান) হতে তাঁর সকল অধিকার তারা হরণ করেছে। নিজেদের লিখিত এবং বিশ্বের কাছে ঘোষিত সংবিধানকে তারা নিজেরাই লংঘন করে মুসলমানগণের বিষয়াদিতে খেদমত করার অধিকার থেকে উসমানীয় সুলতানকে বঞ্চিত করেছে। তারা উসমানীয় বাদশাহকে তাঁর সাংবিধানিক অধিকার হতেও বঞ্চিত করেছে। সকল মুসলমান এই বদমায়েশি আচরণ দেখতে পাচ্ছেন এবং ক্ষুব্ধ হচ্ছেন। অতীতে তাদের আচরণ প্রকৃতপক্ষে শরীয়তকে বিলোপ করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল; তা আমরা মেনে নিয়েছিলাম এবং তার প্রশংসা করেছিলাম এই কারণে যে আমরা মনে করেছিলাম অমান্য করলে বুঝি হয়তো বা মুসলিম সমাজে ফিতনার বীজ বপণ করা হবে।

আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে আদ্ দাওলাতুল আলিয়্যাত আল উসমানীয়্যাকে আনোয়ার ও জামাল এবং তালা'ত পাশার হাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল মর্মে গুজবটি ভিত্তিহীন ছিল না। এ গুজবের অর্থ দিনের পর দিন স্পষ্টতর হচ্ছে; সকলেই প্রকাশ্যে বুঝতে সক্ষম হচ্ছেন যে তারা (ইউনিয়নপন্থী আনোয়ার, জামাল ও তালা'ত পাশা) যা ইচ্ছা তা-ই করছে এবং তারা অন্যদেরকেও তাদের খেয়াল-খুশিমতো চালিত হতে বাধ্য করছে, আর তাদের আদেশসমূহ সংবিধান ও আইন হতেও অধিক ক্ষমতাশালী। মক্কা মুয়াজ্জামার মাহকামাতুশ্ শরীয়্যাত (ইসলামী বিচারালয়)-এর কাযীর কাছে প্রেরিত একটি আদেশ ঘোষণা করছে যে কাযী (বিচারক)-এর উপস্থিতিতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য শ্রবণ করতে হবে এবং 'তাযকিয়া' (সাক্ষীর ইতিবৃত্ত তদন্তের ঘোষণা, যাতে করে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য কিনা তা নিরূপণ করা যায়) বিচারকের সামনে নথিভুক্ত না করলে গ্রহণযোগ্য হবে না।

উপরন্তু, আমীর উমর আল্ জাযাইরী, আমীর আরিফ আশ্ শাহাবী, শফিক বেগ, আল মুয়াইয়্যাদ, শুকরু বেগ, আল্ আসানী, আবদুল ওয়াহহাব, তৌফিক বেগ, আল্ বাসাত, আবদুল হামিদ আয্ যারাউয়ী ও আবদুল গণী আল্ আরিসী প্রমুখ উলামায়ে ইসলাম এবং বিশিষ্ট আরবীয় নাগরিক এবং তাঁদের মতো আরো বহু মহান ব্যক্তিকে বিচার ছাড়াই অবৈধ পন্থায় গুলি করে অথবা ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। মদ্যপ অবস্থায় তাদের জারিকৃত আজ্ঞাসমূহ দ্বারা বহু পরিবার ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। হয়তো আমি ওই সব হত্যাকান্ডের জন্যে একটি অজুহাত পাবো, যেগুলো পাষাণ হৃদয়ের স্বৈরাচারী একনায়কও সংঘটন করবে না; কিন্তু তাঁদের (নিহতদের) বাদ-বাকি নিষ্পাপ, নিরপরাধ পরিবারগুলোকে, স্ত্রী-সন্তানদেরকে তাঁদের ঘর-বাড়ি ও দেশ হতে নির্বাসিত করার এবং ফলশ্রুতিতে এক দুঃখের ওপরে আরেক দুঃখ এবং এক ধ্বংসের ওপরে আরেক ধ্বংস তাঁদের ওপর চাপাবার পেছনে কী অজুহাত থাকতে পারে?

এটা নিশ্চিত যে মহিলা ও সন্তানদেরকে নিপীড়ন করা এবং তাঁদেরকে নির্বাসিত করা যুক্তি, ন্যায় ও মানবতার সাথে কোনোক্রমেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়, যেখানে তাঁদের স্বামী ও পিতাদেরকে তাঁরা যে কোনো কারণেই হোক বন্দী হয়ে নিঃশেষ হতে দেখে চরম শাস্তি পেয়েছেন। আল্লাহতা'আলা ইরশাদ ফরমান: "অপরের অপরাধের জন্যে কাউকেই শাস্তি দেয়া উচিৎ নয়" (আল আয়াত)। ন্যায়কে আলোকিত করে এ আদেশটি যেখানে খোলাসাভাবে বিরাজমান, সেখানে ইউনিয়নপন্থীদের এ নৃশংস কার্যটি কোন্ আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে? যদি আমরা এই দ্বিতীয় খুনটির (অর্থাৎ, নির্বাসনের) পক্ষে কোনো রাজনৈতিক কারণ তথা আইন খুঁজে পাইও, তবুও স্বামী ও পিতাদেরকে হারানো এ সকল

মহিলা এবং তাঁদের সন্তানদের মালামাল ও সম্পত্তি অবৈধভাবে হরণ করার কী অজুহাত থাকতে পারে? ইউনিয়নপন্থীদের এই নিকৃষ্ট ও হীন কাজটি সম্পর্কে আমরা আপাততঃ কিছুক্ষণ চুপ থাকবো; দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলার খাতিরে আমরা নিরপরাধ এবং নিপীড়িত মানুষদের রক্ষা করার দায়িত্ব পালনে অবহেলা করবো। কিন্তু প্রখ্যাত মুজাহিদ ও বীর আমীর হযরত আবদুল কাদের আল জাযাইরীর সতী, সাধ্বী, সম্মানিত কন্যার মান-ইযযত নিয়ে খেলা করার কী ওযর প্রদশন করা যেতে পারে? কেন তাঁর ওপর লালসা চরিতার্থ করা হলো? মুসলমানদের নয়নমণি ঐতিহাসিকভাবে সনদপ্রাপ্ত পুতঃপবিত্র মহিলাদের ওপর আক্রমণকারীদের ধ্যান-ধারণা ও উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না এমন কেউ কি আছেন?

সবার জানা ইউনিয়নপন্থীদের এ সব অবৈধ, দুর্নীতিমূলক, সীমাছাড়া ও আহাম্মকীপূর্ণ অপকর্মের কয়েকটি আমরা ওপরে উল্লেখ করেছি। আমি এগুলো বিশ্বমানবতা ও আমাদের বিশ্বস্ত ভ্রাতৃকুলের কাছে প্রকাশের জন্যে বলছি। যাঁরা পড়বেন এবং বুঝবেন, তাঁরা তাদের বিবেকসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এ সকল দাঙ্গাবাজ বদ লোকদের (ইউনিয়নপন্থীদের) আরেকটি হৃদয় বিদারক, হীন ও গোস্তাখিমূলক অপকর্মের উল্লেখ এখানে না করে পারছি না:

জান ও ইযযতের ওপর আঘাত বন্ধ করার লক্ষ্যে মক্কা মোকাররমার জনগণ যখন বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিলেন, তখন ইউনিয়নপন্থী জনৈক কমান্ডারের আদেশক্রমে ‘কাল’আতুল জিয়্যাদ’ হতে কামানের যে দু’টি গোলা মুসলমানদের কেবলা ও কাবা বায়তুলাহ্ শরীফের দিকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তার একটি হাজরে আসওয়াদ নামক কাল পাথরটির এক মিটার ও অপরটি তিন মিটার দূরে এসে পড়ে। এতে সতরাতুশ শরীফা (কাবা ঘরের চাদর)-এ আগুন ধরে যায় এবং মানুষদেরকে কাবা ঘরের দরজা খুলে কা’বাতুল মেয়াযযমার ওপর চড়ে আগুন নেভাতে হয়। যদিও সৈন্যরা আগুন দেখতে পেয়েছিল, তবুও তারা মাকাম আল্ ইবরাহীম ও মসজিদ-এ-হারামের দিকে কামান দাগাতে থাকে এবং কয়েকজন মুসলমানকে হত্যা করে। বহু দিন মানুষেরা মসজিদে প্রবেশ করতে পারে নি এবং সালাতও আদায় করা যায় নি। কাবা ও মসজিদসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা মুসলমানদের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য হওয়া সত্ত্বে কা’বাতুল মুয়াযযমাকে অপমান এবং ক্ষতি করার অপচেষ্টা চালায় যারা, তাদের মতবাদ ও ধ্যান-ধারণা খতিয়ে দেখার জন্যে আমি সারা বিশ্বের মুসলমানদের কাছে বিষয়টি ছেড়ে দিচ্ছি। এ ধরনের মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণাসম্পন্ন ইউনিয়নপন্থীদের হাতে খেলার পাত্র হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার জন্যে আমরা দ্বীন ইসলামের এবং আমার সকল

সহকর্মীদের ভবিষ্যতকে ছেড়ে দিতে পারি না। আল্লাহতা'আলা আমাদের জাতিকে গাফলাত হতে রক্ষা করেছেন। হেজাযের মুসলমানগণ এখন নিজ প্রচেষ্টায় স্বাধীনতা অর্জন করেছেন এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে তাঁরা বীরদের এ দেশটিকে অশান্তি সৃষ্টিকারী ফিতনাবাজ ইউনিয়নপন্থীদের কাছ থেকে রক্ষা করবেন। তাঁরা নিজেদের বিশ্বাস ও বীরত্বের বদৌলতে একটি ত্রুটিহীন ও পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করেছেন, যা কোনো বিদেশী শক্তির সাথে চুক্তি বা আঁতাত করে করা হয় নি এবং যা ইতিহাসে স্বর্ণ অধ্যায় সংযোজন করেছে।

ইসলামী জনগণকে নিপীড়নকারী চালবাজ ইউনিয়নপন্থীদের যাঁতাকলে পিষ্ট আর্তনাদকারী দেশগুলো হতে পৃথক হয়ে আমরা দ্বীন ইসলামকে রক্ষা ও কলেমা তৌহিদ সমুন্নত রাখার মহান লক্ষ্যে অগ্রসর হতে শুরু করেছি। ইসলামের জন্যে উপযোগী ও প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি জ্ঞানের শাখাই আমরা শিক্ষা করবো। আমরা আধুনিক শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা করবো। সভ্যতার পথে অগ্রসর হতে আমরা আমাদের জান প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করবো। আমরা আশা করি যে মুসলিম বিশ্বে আমাদের দ্বীনি ভ্রাতাগণ আমাদের এ কাজকে ভ্রাতৃসুলভ মনোভাব নিয়ে সমর্থন করবেন, যা ওয়াজিব তথা অবশ্য কর্তব্যকে পালনের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে এবং আমরা আরো আশা করি যে তাঁরা আমাদের এ পবিত্র জিহাদে আমাদেরকে সাহায্য করবেন।

আমরা আমাদের হাতগুলোকে মহান আল্লাহতা'আলার কাছে সমর্পণ করি, যিনি মনিবদের মনিব এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাই যেন তিনি তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালোবাসার কারণে আমাদেরকে সঠিক পথের ওপর সাফল্য দান করেন। যে ব্যক্তি তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন, তাঁর জন্যে খোদা তা'আলার সাহায্য মঞ্জুর হয় এবং তাঁর সাহায্যই যথেষ্ট। কেননা, তিনি হলেন সেরা সাহায্যকারী।

২৫ শে শা'বান, ১৩৩৪ (১৯১৫ ইং)মক্কাতুল মুকাররমা-এর আমীরশরীফ হুসাইন ইবনে আলী।

**<u>শরীফ হুসাইন পাশার দ্বিতীয় ঘোষণা</u>**

প্রথম ঘোষণায় ব্যক্ত আমাদের, অর্থাৎ, হেজাযবাসীদের আরম্ভকৃত কর্মকান্ড এবং আমাদের ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে কিছু সন্দেহ বিদ্যমান থাকতে পারে বিবেচনা করে আমি জ্ঞানী সহকর্মী ও মুসলমানদের জন্যে দ্বিতীয় ঘোষণাটি প্রকাশ করা যথাবিহিত মনে করেছি। আমি সর্বশেষ সুনিশ্চিত প্রামাণ্য দলিলাদির আলোকে আমাদের ভাইদেরকে হুঁশিয়ার করে দিতে চাই।

উসমানীয় সমাজের দূরদর্শী, জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্বগণ এবং সারা বিশ্বের বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী মানুষ উসমানীয় সাম্রাজ্যের মহাযুদ্ধে (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ) প্রবেশ করার বিষয়টি অনুমোদন করেননি। এ অস্বীকৃতির পেছনে দুইটি কারণ রয়েছে:

প্রথম কারণটি হলো অভ্যন্তরীন; আদ্ দাওলাতুল আলিয়্যাত আল উসমানিয়্যা সম্প্রতি দ্রাবুস গারব (ত্রিপোলী) ও বলকান যুদ্ধ হতে বেরিয়ে এসেছে; এর সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা এখন নিঃশেষিত, এমন কি বিধ্বস্ত এবং এর ক্ষমতার উৎস জনগণও রনক্লান্ত। উসমানীয় সৈন্যগণ এক যুদ্ধ শেষ করে নিজেদের গৃহস্থালী ও জীবিকার কাজ আরম্ভ করামাত্রই আরেক যুদ্ধে তাঁদেরকে ঠেলে দেয়া হয়েছে, আর এ পরিস্থিতি জাতির জন্যে একটি ট্র্যাজেডী হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেহেতু এ নতুন মহাযুদ্ধ, যার মধ্যে ইউনিয়নপন্থীরা জড়িয়ে পড়েছে, তার বিধ্বংসী ক্ষমতা ব্যাপক এবং ভয়ংকর, সেহেতু জনগণের ওপর ভারী করারোপ করে ও কষ্টদায়ক দায়িত্ব চাপিয়ে একটি রনক্লান্ত জাতিকে এ রকম একটি ভয়াবহ যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলা চরম নির্বুদ্ধিতার কাজ হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণটি বৈদেশিক; ইউনিয়নপন্থী সরকার যুদ্ধে পক্ষ অবলম্বনের ক্ষেত্রেও একটি বড় ভুল করেছে। উসমানীয় সাম্রাজ্য হলো একটি ইসলামী সাম্রাজ্য। এর ভৌগোলিক সীমান্তের চেয়ে নৌ-সীমানা অধিক বড়; সুতরাং উসমানীয় খান্দান তথা মহান সুলতানগণ প্রায় সর্বসময়ই সেই সকল রাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতা করেছিলেন, যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মুসলমান ছিলেন এবং যাদের শক্তিশালী নৌবাহিনী ছিল। তাঁদের এ নীতি প্রায় সবসময়ই সফল হয়েছিল। ইউনিয়নপন্থীদের অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ নেতারা ভিত্তিহীন মিথ্যা কথা ও বাহ্যিক আবরণ দ্বারা ধোকাপ্রাপ্ত হয়ে উসমানীয় সুলতানদের এই নীতিকে পরিবর্তন ও বিনষ্ট করে ফেলেছে। যাঁরা সত্যকে মিথ্যা হতে পৃথক করতে সক্ষম এবং যাঁরা ইতিহাসের জ্ঞানে সমৃদ্ধ, তাঁরা এ আহাম্মকীপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষতিকর, তিক্ত ফলাফল নিজেদের দূরদৃষ্টি দ্বারা দেখতে পেয়েছেন এবং তাঁরা ইউনিয়নপন্থীদের সাথে সহযোগিতা বন্ধ করে দিয়েছেন।

এমন কি আমিও তাদেরকে আমার দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তারিত জানিয়েছি এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি যখনই তারা এ শেষ যুদ্ধে, এ ধ্বংসযজ্ঞে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে আমার মতামত জানতে চেয়েছিল টেলিগ্রামে। আমি যে জবাব টেলিগ্রামে পাঠিয়েছি, তা সাম্রাজ্যের প্রতি আমার আনুগত্য ও শুভেচ্ছা, দ্বীন ইসলামের সম্মান রক্ষার্থে আমার সংগ্রাম এবং আমার দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলনকারী একটি নির্ভরযোগ্য দলিল।যুদ্ধের প্রারম্ভে আমরা যে তিক্ত ফলাফলের আশংকা

করেছিলাম এবং বেদনার্ত হৃদয়ে বলেছিলাম, তা এখন বাস্তবে পরিণত হয়েছে। ইউরোপে অবস্থিত উসমানীয় সাম্রাজ্যের সীমান্ত এখন সংকুচিত হয়ে ইস্তাম্বুল নগরীর দেয়ালে এসে ঠেকেছে। সিভাস ও মুসুল অঞ্চলে রুশীয় বাহিনীর সীমান্তরক্ষীরা উসমানীয় জনগণকে নিপীড়ন করছে। বৃটিশ বাহিনী বসরা ও বাগদাদ দখল করে নিয়েছে। জামাল পাশার আহাম্মকীপূর্ণ নেতৃত্বের কারণে আল্ আরিশ মরুভূমিতে সহস্র সহস্র উসমানীয় শিশুকে বন্দী হতে হয়েছে। এই দুঃখজনক পরিণতি ও ইউনিয়নপন্থীদের নেয়া এ ধারার জন্যে সাম্রাজ্যের যে দুর্দশা হবে, তা দেখে বিশ্বস্ত ও দেশ প্রেমিকগণ নিম্নোক্ত দুটো জিনিসের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বাধ্য হবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রথমটি হলো বিশ্বের মানচিত্র হতে উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিলুপ্তিকে স্বীকার করে নেয়া।

দ্বিতীয়টি হলো এই ধ্বংসাত্মক বিলুপ্তি হতে সাম্রাজ্যেকে রক্ষা করার উপায় খুঁজে বের করা। আমি মুসলিম বিশ্বের কাছে এ বিষয়টি চিন্তাভাবনা করার এবং পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ করার এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তাব পেশ করার দায়িত্ব অর্পণ করছি। দেশকে বিপদ গ্রাস করার এবং মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার আগেই আমরা সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছি। যদি আমরা জানতে পারতাম অথবা আশা করতে পারতাম, উসমানীয় সাম্রাজ্যের এই জ্ঞানহীন আহাম্মক প্রশাসন, যা একনায়কতান্ত্রিক সংখ্যালঘু একটি গোষ্ঠীর হাতে একটি ক্রীড়নকস্বরূপ, তার অনুগত হলে দেশ ও মুসলিম সমাজের জন্যে আমরা উপকারে আসবো, তাহলে আমরা কিছুই বলতাম না অথবা কিছু করতামও না, বরং ধৈর্য্য ধরতাম এবং কষ্ট স্বীকার করতাম, এমন কি মৃত্যুও বরণ করতাম। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে এ নিরবতা কোনো উপকারে আসবে না, বরং এতে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটবে। এটা কীভাবে নিশ্চিত নয় যখন ইউনিয়নপন্থীরা আমাদেরকে যে পথ অনুসরণে বাধ্য করেছে তা অনুসরণ করলে ওই পথ অনুসরণকারী বিভিন্ন জাতি যে শাস্তি ভোগ করেছে, তা আমাদেরও ভোগ করার শতভাগ সম্ভাবনা রয়েছে? ইউনিয়নপন্থীরা যে বিশাল সাম্রাজ্যটিকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে এবং জাতিকে চরম বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে তা দেখতে পাচ্ছে না এমন কোনো ব্যক্তি কি আছেন? আনোয়ার, জামাল, তাল'আত পাশা ও তাদের বন্ধুদের ফূর্তির জন্যে বিশাল সাম্রাজ্যটিকে বলি দিতে হচ্ছে।

উসমানীয় সাম্রাজ্যের পররাষ্ট্র নীতি ছিল সেই প্রতিষ্ঠিত নীতি, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শ দ্বারা

উসমানীয় সুলতানগণ গ্রহণ করেছিলেন। এ নীতিটি হলো বৃটিশ ও ফরাসী সরকারের সাথে সহযোগিতার নীতি। ইতিহাসব্যাপী এ নীতিটি আমাদের সাম্রাজ্য ও জনগণের জন্যে কল্যাণকর হয়েছে। যারা আমাদেরকে এ নীতিটির প্রতি অবহেলা করতে বাধ্য করেছে, তারা-ই হলো কথিত ইউনিয়নপন্থী, একনায়কতন্ত্রী ব্যক্তিবর্গ।

এখন আমরা ইউনিয়নপন্থীদের অজ্ঞ, আহাম্মকীপূর্ণ নীতির ও তাদের নিপীড়ক, বর্বর, প্রশাসনের বিরোধিতা করি। আমরা দেখছি যে, সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছে এবং আমরা একে অনুমোদন করতে পারি না। এটা সবারই জ্ঞাত হওয়া উচিৎ যে আমাদের বিরোধিতা কেবলমাত্র আনোয়ার, জামাল, তাল'আত ও তাদের সহযোগীদের প্রতি-ই। প্রত্যেক মুসলমানই এ ন্যায্য কাজকে অনুমোদন করছেন। প্রত্যেক স্বদেশপ্রেমিকই আমাদের এ ন্যায্য দাবিকে সমর্থন করছেন এবং আমাদের সাথে আছেন। এমন কি সাম্রাজ্যের প্রধান, খলিফাতুল মুসলিমীনও আমাদের আন্দোলনকে মন-প্রাণসহ সমর্থন করছেন। এর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দালিলিক প্রমাণ হলো এই যে ওয়ালী আহাদ (মসনদের উত্তরাধিকারী) ইউসুফ ইযযুদ্দীন আফেন্দীর ওপর ইউনিয়নপন্থীরা হামলা করেছে এবং তাঁকে শহীদ করেছে।

আমি আবার বলি: মহান উসমানীয় সাম্রাজ্যকে এ সকল একনায়কের বদ উদ্দেশ্যের ও ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডের কারণে বলি দেয়া হচ্ছে। তাদের বদমায়েশী হতে আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি।মহান তুর্কী জাতিকে ইউনিয়নপন্থীদের আরেকটি কুকর্ম সম্পর্কে অবহিত না করে পারছি না, যা আমাদেরকে সতর্ক করেছিল এবং ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করেছিল। তা হলো, ইউনিয়নপন্থী সমাজে সবচেয়ে সীমা-লংঘনকারী জামাল পাশা যাকে খুশি তাকে গুলী করে কিংবা ফাঁসি দিয়ে হত্যা করে থাকে দামেশকে। সে দামেশকে একটি নৈশ ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছে; পতিতাবৃত্তি ও মদ্যপানের কেলেংকারীপূর্ণ এই ঘরে সেই নগরীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কন্যাদেরকে দাসীস্বরূপ ব্যবহার করা হচ্ছে তখন থেকে, যখনি সে আদেশ জারি করে অফিসারদেরকে তার সাথে মদের আসরে নিয়ে বসানোর ব্যবস্থা করেছে। আমাদের দ্বীনী ও জাতীয় অনুভূতির প্রতি অপমানজনক বক্তৃতাসমূহ চিৎকার করে ঝাড়া হয়েছে। তুর্কী মহিলাদের সতীত্ব ও ব্যক্তিত্বকে পদদলিত করা এবং কুরআন মজীদের সূরা নূরে বর্ণিত আজ্ঞাকে অবজ্ঞা করা কি তার একটি বদ আচরণ নয়? জামাল পাশার এ আচরণটি কি প্রতিভাত করে না যে ইউনিয়নপন্থীরা দ্বীন ইসলামকে এবং আরবীয় ও তুর্কী প্রথাকে মোটেই শ্রদ্ধা করে না?

আমি ইউনিয়নপন্থী সদস্যদের কিছু দুঃখজনক, ধ্বংসাত্মক আচার-আচরণ এখানে উল্লেখ করলাম, যেগুলো জনগণ ও সাম্রাজ্যকে বিলুপ্তির দিকে নিয়ে গিয়েছে। আমি এ সব লিখছি যাতে উসমানীয় রাজ্যের অধীন মুসলমান দেশসমূহে বসবাসকারী মুসলিম ভাইদেরকে জাগ্রত করতে সক্ষম হই এবং ফলশ্রুতিতে আমি আমার মিল্লাত (জাতি) ও দেশকেও খেদমত করতে পারি। আমি আমার স্বদেশবাসীর কাছে জানাতে চাই যে ইউনিয়নপন্থীরা খামখেয়ালীভাবে সাম্রাজ্যের ও জাতির নিরাপত্তার কথা চিন্তা না করেই কাজ করছে। খোদায়ী আদেশ-নিষেধের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা দূরের কথা, তারা এমন কি এ সব পবিত্র আইন-কানুনকে পরিবর্তন ও বিনষ্ট করার অপচেষ্টায়ও লিপ্ত। অতএব, আমি আমার মুসলিম ভ্রাতাদেরকে তাদের এ ধ্বংসাত্মক, বিভক্তি সৃষ্টিকারক, আহাম্মকীপূর্ণ ও বদ ধারাকে সমর্থন না করার অনুরোধ জানাচ্ছি। যারা আল্লাহতা'আলাকে অমান্য করে এবং মানুষদের ওপর অত্যাচার করে তাদেরকে মান্য করা সঠিক নয় তাদের কর্মকান্ডের স্রোতকে বিপরীত দিকে প্রবাহিত করার ক্ষমতা যে ব্যক্তি রাখেন, তাঁর উচিৎ নিজ হাত, জিহ্বা ও অন্তর দ্বারা তা বাস্তবায়ন করা যদি এমন কেউ থেকে থাকেন যে ইউনিয়নপন্থীদের ক্ষতিকর প্রভাব স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন না এবং তাদের কর্মকান্ডের অনুমোদন করছেন, তবে আমি তাঁদের বক্তব্য শ্রবণ করতে প্রস্তুত আছি। যাঁরা সত্য, সঠিক পথের ওপর কায়েম আছেন এবং যাঁরা উপকারী কর্ম সম্পাদন করছেন তাঁদের প্রতি আমাদের সালাম।

**১১ই যিলক্বদ, ১৩৩৪ (১৯১৬ইং)মক্কাতুল মুকাররমার আমীর শরীফ হুসাইন ইবনে আলী**

শরীফ হুসাইন পাশার দুইটি ঘোষণা তাঁর খালেস নিয়্যত ও পরিপূর্ণ বিশ্বাস প্রতিফলন করে; সেই সাথে তাঁর ভ্রান্ত ধারণাসমূহ এবং ক্ষতিকর সিদ্ধান্তসমূহেরও প্রতিফলন করে। তাঁর সবচেয়ে বড় ভুল ছিল এই যে তিনি ইতিহাস জুড়ে ইসলামের প্রতি বৃটিশের বৈরিতা উপলব্ধি করতে পারেননি। এটা পরিদৃষ্ট হয়েছে যে তিনি সুলতান সেলিম খাঁন ৩য়-এর শাসন আমলে উসমানীয়দেরকে নিশ্চিহ্ন করার অসৎ উদ্দেশ্যে ইস্তাম্বুলে বৃটিশ বাহিনীর আক্রমণ সম্পর্কে কিছুই শুনতে পান নি। সেই একই সময়ে বৃটিশরা এশিয়া ও আফ্রিকার মুসলমান রাষ্ট্রসমূহে বর্বরোচিত আক্রমণ পরিচালনা করেছে এবং সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করে তাঁদেরকে নিস্পেষণ করেছে। সেই সব দেশে তারা মুসলিম উলামায়ে কেরাম, ইসলামী কিতাবপত্র, ইসলামী সংস্কৃতি ও নৈতিকতাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। বৃটিশরা উসমানীয় সুলতান আবদুল মজিদ খাঁনকে ধোকা দিয়ে উসমানীয় রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে ফ্রি ম্যাসন (যিনদিক)-দেরকে বসিয়ে তাদের মাধ্যমে মুসলমানদের ঈমান ও নৈতিকতাকে নষ্ট করতে আরম্ভ করে। এ সকল ফ্রি-ম্যাসন

সে সব লোককে গড়ে তোলে যারা বৃটিশদের পক্ষে গুপ্তচর হিসেবে কাজ করে। তারা মহান উসমানীয় সাম্রাজ্যটিকে ভেতর এবং বাইরে উভয় দিক থেকেই ধ্বংস করে ফেলে। শরীফ হুসাইন পাশা ধারণা করেছিলেন যে ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু (বৃটিশ) বুঝি সাহায্য করবে; এটা সম্ভবতঃ তাঁর ঐতিহাসিক তথ্যাদি না অধ্যয়ন করার কারণেই হয়েছিল।

শরীফ হুসাইন পাশার মতো এমন একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি যিনি ইউনিয়নপন্থীদের বদমায়েশী সম্পর্কে বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি দামেশকে বৃটিশদের দ্বারা ভাড়া করা জামাল পাশা ও দুরাচারীদেরকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করতে পারতেন এবং ফিলিস্তিন সীমান্তে উচ্চপদলোভী ব্যক্তিদের কৃত বিশ্বাসঘাতকতাকে প্রতিরোধ করতে পারতেন। এটা তিনি অতি সহজেই করতে পারতেন। যদি তিনি এটা করতেন,তাহলে উসমানীয়গণ পরাজয় বরণ করতেন না এবং আরবীয় উপদ্বীপে (জাযিরাতুল আরবে) একটি মহান হাশেমী মুসলিম রাষ্ট্রের পত্তন হতো; আর পবিত্র নগরী মক্কা, মদীনা ও জেরুজালেমও তাঁর হাতেই থেকে যেতো।

৪২/ মুসলমানদের খলিফা সুলতান মাহমুদ আদলী খাঁন ২য়-এর আদেশক্রমে মিসরীয় গভর্ণর মুহাম্মদ আলী পাশা কর্তৃক হেজায অঞ্চল থেকে কুচক্রী ওহাবীদেরকে বিতাড়ন করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীগণের, তাঁর পবিত্র বিবিগণের এবং শহীদগণের মাযারগুলো পুনঃনির্মাণ করা হয়; আর হুজরাতুন্ নববী ও মসজিদুস সায়াদাহ্-ও পুনঃস্থাপিত হয়। এগুলোর নির্মাণ, অলংকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে সুলতান আবদুল মাজিদ খাঁন শত-সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করেন। এ ক্ষেত্রে তার প্রচেষ্টাটি বিস্ময়করভাবে বিশাল। ১২৮৫ হিজরী সালে সুলতান আবদুল আযীয খাঁন মদীনার চারপাশের দেয়ালগুলো পুনঃস্থাপন করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় একটি অস্ত্র কারখানা, একটি সরকারী কার্যালয়, একটি কয়েদখানা এবং একটি অস্ত্রের গুদাম ও একটি গোলা-বারুদের গুদাম নির্মাণ করা হয়।

সুলতান আবদুল হামিদ খাঁন-২য় দামেশক হতে মদীনা পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ করেন। মদীনাগামী প্রথম ট্রেনটি পবিত্র নগরীতে পৌঁছে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট (১৩২৬ হিজরী) তারিখে। এ সময় ১৬তম ডিভিশন মক্কায় অবস্থানরত ছিল।

সুলতান আবদুল হামিদ খাঁন-২য় যখন শাসন করছিলেন, তখন মক্কায় ছয়টি মিনারাযুক্ত ও সাতষট্টিটি মিনারাবিহীন ছোট মসজিদ, ছয়টি মাদ্রাসা, দুইটি

গণগ্রন্থাগার, তেতাল্লিশটি প্রাথমিক ও একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দুইটি ছাউনিযুক্ত বাজার, নয়টি সরাইখানা, ঊনিশটি টাককা (খানকাহ) দুইটি গণস্নানাগার, পঁচিশটি বিরাটকায় গুদামঘর, তিন সহস্রটি দোকান, একটি হাসপাতাল ও চল্লিশটি পানির ফোয়ারা বিদ্যমান ছিল। হাজীদের জন্যে আরামদায়ক বিশালাকার অতিথি ভবনও নির্মাণ করা হয়েছিল। খলিফা হারুনূর রশীদের শাসনামলে আরাফাহ হতে তিন দিনের পথের দূরত্বে একটি পানি সরবরাহ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছিল। মেহর-উ-মাহ্ সুলতান, যিনি ১০ম উসমানীয় সুলতান সুলাইমান খাঁনের কন্যা, তিনি এই পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকে মক্কা পর্যন্ত বর্ধিত করেন। সেই সময় মক্কার জনসংখ্যা ছিল প্রায় আশি হাজার।

মদীনা মুনাওয়ারা একটি দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, যেটা ত্রিশ মিটার উঁচু এবং চল্লিশটি পানি নিষ্কাশন প্রণালী ও চারটি দরজা সম্পন্ন। হারাম শরীফের দৈর্ঘ্য এক'শ পঁয়ষট্টি কদম এবং প্রস্থ এক'শ ত্রিশ কদম। হারাম শরীফের উত্তর-পশ্চিম কোণায় অবস্থিত আছে মার্বেল ও স্বর্ণখচিত লেখনীসম্পন্ন বাবুস্ সালাম দরজা। হারাম শরীফের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় দেদীপ্যমান আছে হুজরাতুন্ নববী। যখন কেউ কেবলামুখী হয়ে কেবলার দেয়ালের সামনে দাঁড়ায়, তখন বাবুস্ সালাম তার ডান দিকে এবং হজরাতুস সায়াদাহ্ বাম দিকে বিরাজমান থাকে। হুজরাতুন নববীকে সর্বত্র অত্যন্ত দামী অলংকরণ দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছে। মদীনার অধিকাংশ বাড়ীঘরই মক্কার মতো প্রস্তরনির্মিত এবং চার কিংবা পাঁচ তলাবিশিষ্ট। সুলতান সুলাইমান খান কুবা হতে মদীনা পর্যন্ত পানি সরবরাহ লাইন নির্মাণ করে দেন। উহুদ পাহাড়টি নগরীর উত্তর দিকে অবস্থিত এবং দুই ঘণ্টা পথের দূরত্বে বিরাজমান। নগরীটিতে দশটি মসজিদ, সতেরোটি মাদ্রাসা, এগারোটি প্রাথমিক ও একটি উচ্চ বিদ্যালয়, বারোটি গণগ্রন্থাগার, আটটি টাককা (খানকাহ), নয়'শ বত্রিশটি দোকান ও গুদামঘর, চারটি সরাইখানা, দুইটি গণস্নানাগার, এক'শ আটটি অতিথিশালা বিদ্যমান ছিল। জনসংখ্যা ছিল বিশ হাজার।

ওহাবীরা বর্তমানে মক্কা ও মদীনা নগরীতে মহামূল্যবান ঐতিহাসিক ও শৈল্পিক কীর্তিগুলোকে ধ্বংস করে ফেলছে।

'মিরাতুল মদীনা' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে যে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক হিজরী প্রথম বর্ষেই মসজিদুশ শরীফ মদীনায় নির্মিত হয়। পরবর্তী বছর যখন বায়তুল মোকাদ্দস হতে কাবার দিকে কিবলা পরিবর্তন করার আদেশ জারি করা হয়, তখন মসজিদের মক্কামুখী দরজাটি বন্ধ করে দেয়া হয় এবং বিপরীত দিকে, অর্থাৎ, দামেশকমুখী

একটি নতুন দ্বার উন্মোচন করা হয়। এই দরজাকে বর্তমানে "বাবুত্ তাওয়াসসুল" বলা হয়। মদীনায় কুদসমুখী হয়ে প্রায় পনেরো মাস যাবত নামায আদায় করা হয়েছিল, আর হিজরতের কিছু আগে কুদসের দিকে নামায আদায় করতে আদেশ দেয়া হয়েছিল। মসজিদের কেবলা যখন পরিবর্তন করা হয়, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর দ্বারা নিজ পবিত্র চোখে কাবা শরীফ দর্শনের ফলশ্রুতিতে কেবলার দিক নির্ধারিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যেখানে নামায পড়তেন, সেই স্থানটি মিম্বর ও হুজরাতুস্ সায়াদার প্রায় মধ্যখানে অবস্থিত এবং এটা মিম্বরের একটু কাছে। মদীনাতুল মুনাওয়ারায় হাজ্জাজ কর্তৃক একটি কাঠের বাক্সে প্রেরিত এক কপি কুরআন মজিদ বাক্সটিসহ স্তম্ভের ডান দিকে স্থাপন করা হয়, যা নামাযের স্থানটির সামনে অবস্থিত। প্রথম মেহরাবটি এখানে স্থাপন করেন খলিফা উমর ইবনে আব্দুল আযীয। দ্বিতীয় অগ্নিকান্ডের পরে মসজিদুস সায়াদাহ্ মেরামত করা হয় এবং ৮৮৮ হিজরী সালে বর্তমানকার মার্বেলনির্মিত মেহরাবটি নির্মাণ করা হয়। কিন্তু এ মার্বেল মেহরাবটি হুজরাতুস্ সায়াদাহর একটু কাছে স্থাপন করা হয়েছিল। ইতিপূর্বে মসজিদে নববীতে কোনো মিম্বর ছিল না; আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম খুতবা পাঠ করতেন দাঁড়িয়ে, যেখানে পরবর্তীকালে একটি খেজুর গাছের ডাল দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছিল। আরো কিছুকাল পরে চারটি সিঁড়ির একটি মিম্বর নির্মাণ করা হয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তৃতীয় সিঁড়িটিতে দাঁড়িয়ে খুতবা পাঠ করতেন। হযরত মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর সময় মিম্বরের দরজায় একটি পন্দা ঝুলানো হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর যমানায় মসজিদুন্ নববীতে আটটি স্তম্ভ ছিল। যখন মসজিদের সম্প্রসারণ সংক্রান্ত শরয়ী আবশ্যকীয়তা সম্পন্ন হলো, তখন স্তম্ভের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো ৩২৭টিতে। রওযাতুল মুতাহহারা-তে স্তম্ভসমূহের তিনটি সারি আছে এবং প্রতিটি সারিতেই চারটি করে স্তম্ভ দেয়ালের মধ্যে অবস্থিত। দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্তম্ভের সংখ্যা ২২৯টি। মসজিদের দক্ষিণ দেয়ালটি কেবলামুখী। আসহাবুস্ সুফফা যে গোপন কক্ষে বসবাস করতেন, সেটা উত্তর দিকের দেয়ালের বাইরে অবস্থিত। এ পবিত্র ও রহমতপ্রাপ্ত স্থানটিকে কালের গর্ভে না হারানোর লক্ষ্যে এর ভিত্তিকে সমতল হতে অর্ধ মিটার ওপরে তোলা হয় এবং অর্ধ মিটার উচ্চতাসম্পন্ন একটি কাঠের বেষ্টনী দ্বারা এটাকে ঘিরে দেয়া হয়।

মসজিদুশ্ শরীফ নির্মাণকালে (মসজিদের পার্শ্বে) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর দুইজন পবিত্র বিবি সাহেবার দুইটি পৃথক ঘর নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে ঘরের সংখ্যা নয়টি হয়ে যায়। ওগুলোর ছাদ দেড় মিটার উচ্চতাসম্পন্ন

ছিল। ওগুলো মসজিদের পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ছিল। প্রত্যেকটি ঘরের এবং কতিপয় সাহাবীর ঘরগুলোর দুইটি দরজা ছিল, যার একটি মসজিদের দিকে খুলতো এবং অপরটি রাস্তার দিকে খুলতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রায়শ হযরত মা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘরে অবস্থান করতেন, যার মসজিদমুখী দরজাটি সেগুন কাঠ দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। চার খলিফার আমলে সাহাবায়ে কেরাম জুমআর নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে আটটি ঘরের মধ্যে একটিতে স্থান করে নিতে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করেন।

হযরত মা ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘরটি ছিল হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘরের পার্শ্বেই, ঠিক উত্তর দিকে। এ ঘরটি পরবর্তীকালে শাবাকাতুস সায়াদাহ-তে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়। কেবলমাত্র হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর দরজা ছাড়া মসজিদমুখী বাকি দরজাগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর বেসালের পাঁচ দিন আগে জারিকৃত তাঁরই নিন্দেশে বন্ধ করে দেয়া হয়।

হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু খলিফার দায়িত্বভার গ্রহণের পরপরই মুরতাদ্দ (ধর্মচ্যুত)-দের বিরুদ্ধে আরব উপদ্বীপে সংগ্রামে রত হন এবং তিনি মসজিদুস সায়াদাহ্ সম্প্রসারণ করার সময় পান নি।

১৭ হিজরী সালে হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সকল সাহাবীকে সমবেত করে তাঁদের কাছে “মসজিদুশ শরীফ সম্প্রসারণ করতে হবে” হাদীসটি বর্ণনা করেন। সাহাবায়ে কেরাম সর্বসম্মতভাবে এটা গ্রহণ করে নেন এবং মসজিদের দামেশকীয় ও পশ্চিম দিকের দেয়ালগুলো ভেঙ্গে ১৫মিটার সম্প্রসারণ করা হয়। বহু ঘর-বাড়ি কেনা হয় এবং সেগুলোর প্লটগুলো মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ৩৫ হিজরী সালে হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আসহাবুশ শুরা-এর সাথে পরামর্শক্রমে এবং সাহাবীগণের সর্বসম্মতি গ্রহণ করে দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিম দিকের দেয়ালগুলো ভেঙ্গে দিয়ে বিশ মিটার দৈর্ঘ্যে এবং দশ মিটার প্রস্থে মসজিদকে সম্প্রসারণ করেন। ইত্যবসরে হযরত হাফসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত তালহা ইবনে আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আবাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘরগুলোকে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মদীনার গভর্ণর উমর ইবনে আব্দুল আযীযের কাছে প্রেরিত তাঁর ভাই খলিফা ওয়ালিদের লিখিত আদেশ দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র বিবি সাহেবাগণের এবং মা ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘরগুলো, যেগুলো উত্তর দিকে অবস্থিত ছিল, সেগুলো ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং সেগুলোর প্লটগুলো মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

আসহাবে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, আইম্মায়ে মাযাহিব (চার মাযহাবের ইমামগণ) এবং মুসলিম উলামাগণ চৌদ্দ'শ বছর যাবত কেউই এর বিরুদ্ধে কিছু বলেন নি। সউদী আরবের রিয়াদস্থ 'জামেয়াতুল ইসলামিয়্যা' নামের ওহাবী মাদ্রাসা হতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'আদ দা'ওয়া' পত্রিকার শা'বান ১৩৯৭ হিজরী (১৯৭৭ ইং) সংখ্যায় লেখা হয়েছে, "মসজিদুন্ নববীর আসন্ন সম্প্রসারণ কাজে শুধুমাত্র পশ্চিম দিককেই বাড়ানো করা হবে এবং বড় বেদআতটি সমাপ্ত হবে। এই বেদআত হলো মসজিদের মধ্যে তিনটি কবরের অন্তর্ভুক্তি। পূর্ব দিকের দেয়ালটি পূর্ববর্তী স্থানে ফিরিয়ে আনা হবে এবং কবরগুলো মসজিদের বাইরে রেখে দেয়া হবে।" ওহাবীদের এই ধারণাটি এজমায়ে উম্মতের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন ছাড়া আর কিছু নয় এবং মুসলিম সমাজের মধ্যে ফিতনাবাজীও বটে। এটা যে কুফর (অবিশ্বাস), তা চার মাযহাবের উলামায়ে কেরাম কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আমরা আশা করি যে সউদী আরবীয় সরকার এ রকম একটি হীন কাজে নিজেদেরকে জড়াবে না এবং সারা বিশ্বের মুসলমনাদের হৃদয়ে আঘাত দেবে না। হুজরাতুস্ সায়াদার প্রতি বেয়াদবি বহুবার পরিদৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু যারা এটা করেছে, তাদেরকে আল্লাহতা'আলা এমন কি ইহ-জগতেও মর্মন্তুদ শাস্তি দিয়েছেন, যার দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি বিদ্যমান। 'মিরাতুল মদীনা' গ্রন্থের শেষভাগে লিপিবদ্ধ আছে, "যখন হেজাযের গভর্ণর হালত পাশা ১২৯৬ হিজরী (১৮৭৯ ইং) সালে মদীনা সফর করতে গেল, তখন হুজরাতুস্ সায়াদার খাদেমগণের প্রধান তাহসিন আগা গভর্ণর পাশার সুদৃষ্টি লাভের আশায় বললো, 'আপনার ঘরের মহিলাদেরকে হুজরাতুস সায়াদাহ্ যেয়ারতে নিয়ে আসি চলুন। কেননা, এ রকম সুযোগ আর আসবে না।' যদিও পাশা প্রথম বারে এর থেকে বিরত ছিল, তবুও তাহসিন আগার চাপে মধ্যরাতে নিকট ও দূর সম্পর্কের মহিলা আত্মীয়দেরকে শাবাকাতুস সায়াদার ভেতরে নিয়ে গেল। যেহেতু তাদের মধ্যে ওযুবিহীন না-পাক মেয়েলোক ছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি এটা চরম গোস্তাখি হওয়ায় পরের দিন সকালে মদীনায় তিন দফা ভয়াবহ ভূমিকম্প অনুভূত হয়। মানুষেরা ভয়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করতে থাকে। যখন এর কারণ জানা যায়, তখন পাশাকে বে-ইযযত করা হয় এবং মদীনা হতে বের করে দেয়া হয়। এর অব্যবহিত পরেই সে মারা যায় এবং তার বংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।" অনুরূপভাবে যারাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর রওয়া মোবারকের প্রতি বেয়াদবি করেছে তারাই বিধ্বস্ত ও লাঞ্ছিত হয়েছে।

হুজরাতুস সায়াদাহ-র খাদেমগণের প্রধান শামসউদ্দীন আফেন্দীর সময় আলেপ্পো নগরীর রাফেযী শিয়ারা এক রাতে হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর পবিত্র মরদেহকে সরিয়ে নেয়ার অসৎ উদ্দেশ্যে মসজিদুন্ নব্বীতে প্রবেশ করে। কিন্তু তারা সবাই মাটির মধ্যে তলিয়ে গিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এ ঘটনাটি বিস্তারিত লিপিবদ্ধ আছে 'মিরাতুল মদীনা' ও 'রিয়াযুন্ নাদেরা' গ্রন্থে।

দামেশকের নিকটবর্তী নাবলুস শহরের উপকন্ঠ এলাকার পল্লীগুলো ও কারাক দুর্গের শাসক দাঙ্গাবাজ আরতাত্ হুজূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর দেহ মোবারক সরাবার কু-মতলবে ৫৭৮ হিজরী (১১৮৩ খ্রীঃ) সালে ছোট ছোট জাহাজ নিমার্ণ করেছিল ত্বরিত স্থানান্তরের সুবিধার্থে। সে লোহিত সাগর দিয়ে জাহাজগুলোকে মদীনার বন্দর ইয়ানবুতে ৩৫০ জন দস্যুসহ পাঠায়। মদীনার শরীফগণ এটা জানতে পেরে হার্রানে অবস্থানকারী সুলতান গাযী সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর কাছে খবর দেন। গাযী সালাহউদ্দীন এ খবরে অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং তিনি মিসরের গভর্ণর হুসামউদ্দীন সাইফ-উদ্-দৌলার কাছে একটি আদেশ পাঠান। হুসামউদ্দীন সেনাপতি লুলুর নেতৃত্বে সৈন্য প্রেরণ করেন, যিনি কিছু দস্যুকে হত্যা করেন এবং বাকিদেরকে বন্দী করে মিসরে পাঠিয়ে দেন। এ ঘটনাটি 'রওদাতুল আবরার' গ্রন্থে বিস্তারিত লিপিবদ্ধ আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর যাহেরী (প্রকাশ্য) জীবনে কিংবা বেসালপ্রাপ্তির পর যারা তাঁর সাথে বেয়াদবি করার অপপ্রয়াস পেয়েছে, তাদেরকে খোদাতা'আলা মর্মন্তুদ শাস্তি দিয়েছেন। আর যদি কোনো দিন নিজেদের মহাভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা ও অসৎ উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার মানসে ওহাবীরা ওই ধরনের কোনো অপচেষ্টা চালায়, তাহলে এটা তাদের ভাল করে জেনে রাখা উচিৎ যে সেই দিনটি-ই হবে তাদের মাযহাব ও রাষ্ট্রের জন্যে শেষ দিন এবং তাদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত অভিসম্পাতসহ স্মরণ করা হবে।

[আল্লাহতা'আলার রহমত (করুণা) ও ফযলে (অনুগ্রহে) "ওহাবীদের প্রতি নসীহত" গ্রন্থটির অনুবাদ এখানেই শেষ হলো]

**সমাপ্ত**

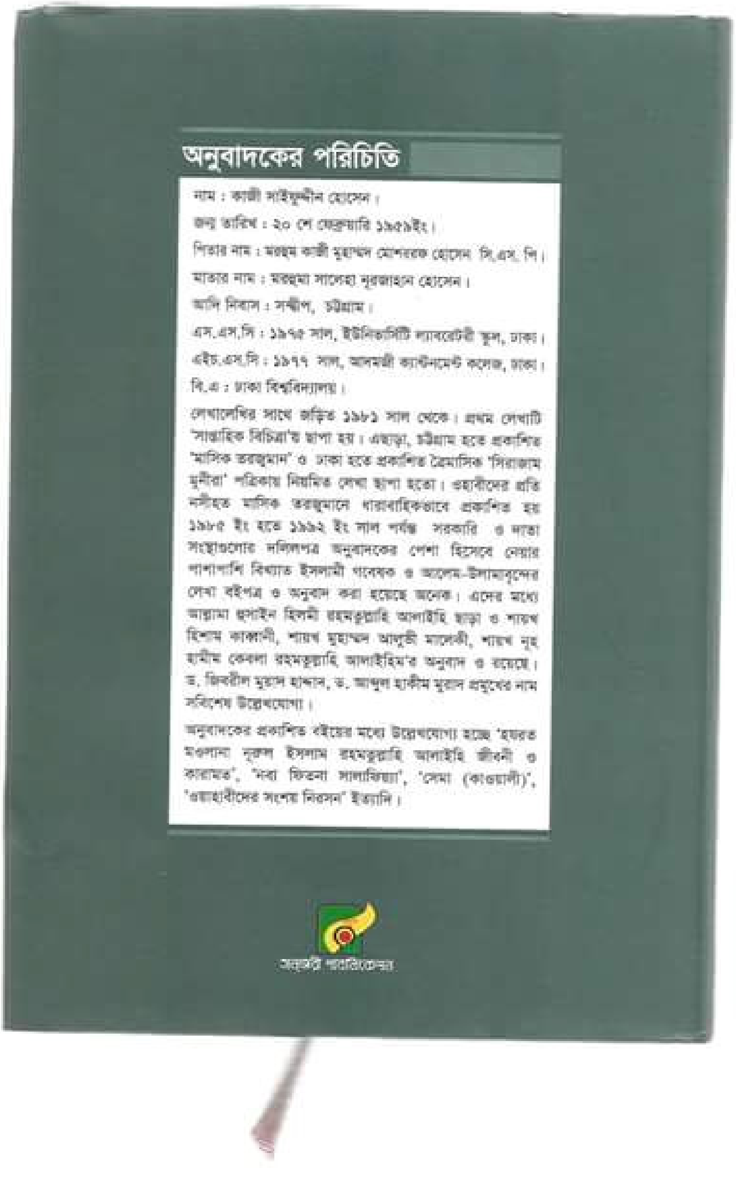

## অনুবাদকের পরিচিতি

নাম : কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন।

জন্ম তারিখ : ২০ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯ইং।

পিতার নাম : মরহুম কাজী মুহাম্মদ মোশররফ হোসেন সি.এস.পি।

মাতার নাম : মরহুমা সালেহা নূরজাহান হোসেন।

আদি নিবাস : সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম।

এস.এস.সি : ১৯৭৫ সাল, ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুল, ঢাকা।

এইচ.এস.সি : ১৯৭৭ সাল, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা।

বি.এ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

লেখালেখির সাথে জড়িত ১৯৮১ সাল থেকে। প্রথম লেখাটি 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা'য় ছাপা হয়। এছাড়া, চট্টগ্রাম হতে প্রকাশিত 'মাসিক তরজুমান' ও ঢাকা হতে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক 'সিরাজাম মুনীরা' পত্রিকায় নিয়মিত লেখা ছাপা হতো। ওহাবীদের প্রতি নসীহত মাসিক তরজুমানে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ ইং হতে ১৯৯২ ইং সাল পর্যন্ত সরকারি ও দাতা সংস্থাগুলোর দলিলপত্র অনুবাদকের পেশা হিসেবে নেয়ার পাশাপাশি বিখ্যাত ইসলামী গবেষক ও আলেম-উলামাবৃন্দের লেখা বইপত্র ও অনুবাদ করা হয়েছে অনেক। এদের মধ্যে আল্লামা হুসাইন হিলমী রহমতুল্লাহি আলাইহি ছাড়া ও শায়খ হিশাম কাব্বানী, শায়খ মুহাম্মদ আলুভী মালেকী, শায়খ নূহ হামীম কেলার রহমতুল্লাহি আলাইহিম'র অনুবাদ ও রয়েছে। ড. জিবরীল ফুয়াদ হাদ্দাদ, ড. আব্দুল হাকীম মুরাদ প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অনুবাদকের প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'হযরত মওলানা নূরুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাইহি জীবনী ও কারামত', 'নব্য ফিতনা সালাফিয়া', 'সেমা (কাওয়ালী)', 'ওয়াহাবীদের সংশয় নিরসন' ইত্যাদি।